মাসুদ রানা

ডেথ ট্র্যাপ

অখন্ড সংস্করন

কাজী আনোয়ার হোসেন

মাসুদ রানা

বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের
এক দুর্দান্ত, দুঃসাহসী স্পাই
গোপন মিশন নিয়ে ঘুরে বেড়ায় দেশ-দেশান্তরে।
বিচিত্র তার জীবন। অদ্ভুত রহস্যময় তার গতিবিধি।
কোমলে কঠোরে মেশানো নিষ্ঠুর, সুন্দর এক অন্তর।
একা।
টানে সবাইকে, কিন্তু বাঁধনে জড়ায় না।
কোথাও অন্যায়-অবিচার-অত্যাচার দেখলে
রুখে দাঁড়ায়।
পদে পদে তার বিপদ-শিহরন-ভয়
আর মৃত্যুর হাতছানি।
আসুন, এই দুর্ধর্ষ, চিরনবীন যুবকটির সঙ্গে
পরিচিত হই।
সীমিত গণ্ডিবদ্ধ জীবনের একঘেয়েমি থেকে
একটানে তুলে নিয়ে যাবে ও আমাদের
স্বপ্নের এক আশ্চর্য মায়াবী জগতে।

আপনি আমন্ত্রিত।
ধন্যবাদ।

এক

যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, রাশা ও অস্ট্রেলিয়ার মত কয়েকটি দেশ মিলে ভাগ করে নিয়েছে ওই বিরান-বিশাল-শীতল-ধবল প্রান্তর। বছরের এক তৃতীয়াংশ সময়ে হয়ে ওঠে আকারে দ্বিগুণ। দিনের পর দিন বয় ওখানে তুমুল তুষার-ঝড়। তাপমাত্রা শূন্যের অনেক নীচে। বরফমোড়া কোনও সাধারণ দেশ নয় ওটি, বরং প্রকাণ্ড একটি জীবিত, জাগ্রত মহাদেশ। এবং সেখানেই শুরু হতে চলেছে মহা জটিল এক নাটকের প্রথম অংক।

উইলকক্স আইস স্টেশন, অ্যান্টার্কটিকা।

১৩ই জুলাই।

তিনঘণ্টা হলো স্টেশনের সঙ্গে রেডিয়ো যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে দুই ডুবুরির।

গভীরে নামবার সময় ডাইভিং ছিল নিখুঁত। নেমেছে তারা অনেক নীচে। স্টেশনের দুই সেরা ডুবুরি স্টোন ও অ্যাডাম্‌স্ মাঝে মাঝেই আলাপ করেছে ইণ্টারকমে।

আধাআধি নামবার পর রিপ্রেশারাইয করেছে, এরপর পুরো তিন হাজার ফুট নীচে গিয়ে থেমেছে। বেরিয়ে এসেছে ডাইভিং বেল থেকে, একপাশে সরু এক বরফের টানেল ধরে আবারও উঠে গেছে বিশাল এক গুহার দিকে।

পানির তাপমাত্রা ছিল এক দশমিক নয় ডিগ্রি সেলসিয়াস।

দু'বছর আগেও অ্যান্টার্কটিকায় ডাইভিং ছিল প্রায় অসম্ভব, দশ মিনিট পানিতে থাকলে হাইপোথারমিয়ায় মরতে হতো। কিন্তু এখন নেভির জন্য তৈরি থার্মাল-ইলেকট্রিক সুটের কারণে প্রায়-জমে যাওয়া পানিতে তিন ঘণ্টারও বেশি ডুবে থাকা যায়।

গভীর পানির ভিতর সরু, খাড়া বরফের সুড়ঙ্গ দিয়ে উঠবার সময় রেডিয়োতে আলাপ করেছে ডুবুরিরা। বরফের দেয়ালের ফাটল ও রুক্ষতা নিয়ে মন্তব্য করেছে। তাদের কাছে স্বর্গীয় মনে হয়েছে চারপাশের বরফের দেয়াল, যেন গভীর সুনীল আকাশ।

তারপর হঠাৎ করেই থেমে গেছে সব কথা। উপরে দেখতে পেয়েছে স্থির পানি। ওখানে শুধু কালো কাঁচের মত নিথর, গাঢ় অন্ধকার। সাধারণত এত শান্ত হয় না পানি। চারপাশে আলো ফেলেছে ওদের মিলিটারি-স্পেক হ্যালোজেন ফ্লাশলাইট। স্ফটিকের মত জ্বলজ্বল করেছে নীলচে বরফ। এরপর উপরের দিকে উঠতে শুরু করেছে ডুবুরিরা।

আর ঠিক তখনই শুনতে পেয়েছে আওয়াজটা।

থেমে গেছে দুই ডুবুরি।

স্বচ্ছ ও বরফ-ঠাণ্ডা পানির ভিতর প্রথমে ওটা ছিল একটি মাত্র হুইসল। ওরা ভেবেছে, গান গাইছে কোনও তিমি।

খুব সম্ভব ওটা কিলার ওয়েইল। কয়েক দিন হলো স্টেশনের ভিতর দেখা দিয়েছে একজোড়া তরুণ কিলার ওয়েইল। খুবই ছোট ঝাঁক, বারবার উইলকক্স আইস স্টেশনের ভিতরের পুলে দম নিতে উঠছে ওগুলো।

অবশ্য, কিলার ওয়েইল না-ও হতে পারে, হয়তো ওই শিসের মালিক কোনও নীল তিমি, সঙ্গী জোগাড় করবার জন্য গান গাইছে পাঁচ কি ছয় মাইল দূরে। তিমির গান নিয়ে এই এক বড় সমস্যা। পানি এত ভাল কণ্ডাক্টার, কেউ বোঝে না

তিমি এক মাইল দূরে, না দশ মাইল।

কয়েক সেকেণ্ড স্থির থেকে আবারও উপরে উঠতে শুরু করল দুই ডুবুরি।

আর ঠিক তখনই প্রথম শিসের জবাব দেয়া হলো।

এরপর বেজে উঠল আরও কমপক্ষে এক ডজন শিস। দুই ডুবুরিকে ঘিরে চলেছে আওয়াজ। প্রথম শিসের চেয়ে অনেক কাছে পরের শিসগুলো।

গাঢ় নীল পানির ভিতর চরকির মত ঘুরে চারপাশে চোখ বুলালো দুই ডুবুরি।

কোথা থেকে আসছে এসব আওয়াজ?

কাঁধ থেকে হারপুন গান নামিয়ে নিয়েছে ডুবুরিদের একজন, দেরি হয়নি হ্যামার কক করতে। হঠাৎ থেমে গেছে তীক্ষ্ণ শিস, শুরু হয়েছে বেশ কিছু করুণ আর্তচিৎকার ও কুকুরের মত ঘেউ-ঘেউ গর্জন।

তারপর হঠাৎ করেই জোরালো ধুপ-ধড়াস্ আওয়াজ হয়েছে। ঝট্ করে উপরে চেয়েছে দুই ডুবুরি। চারপাশ ছিল আয়নার মত পরিষ্কার, কোথাও কোনও কম্পন ছিল না, কিন্তু সেই নিথর পানি এখন বিস্ফোরিত হয়েছে হাজার টুকরোয়—উপর থেকে নেমে আসছে বিশাল কিছু!

জোর ছলাৎ আওয়াজ তুলে সারফেসে ভেসে উঠল প্রকাণ্ড ডাইভিং বেল।

গোলাকার পুলের ধারে পায়চারি করছে জন প্রাইস, ধমকের সুরে নির্দেশ দিয়ে চলেছে। সুঠাম দেহে পরনে তার কালো ইনসুলেটেড় ওয়েট সুট। প্রাইস মেরিন বায়োলজিস্ট, পাশ করেছে স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটি থেকে। এই উইলকক্স আইস স্টেশনের কর্ণধার সে।

সি-ডেকে উইঞ্চ কন্ট্রোল নিয়ে কাজ করছে তরুণ এক টেকনিশিয়ান, তাকে বলল সে, 'ঠিক আছে, ওখানেই রাখো! ওকে, লেডিজ অ্যাণ্ড জেন্টলমেন, হাতে সময় নেই। সবাই উঠে পড়ুন।'

পুলের ধারে হাজির হয়েছে ছ'জন ওয়েট সুট পরা ডাইভার, একে একে বরফ-ঠাণ্ডা পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল তারা। এক মিনিট পেরুনোর আগেই উঠে পড়ল ডাইভিং বেলে। পুলের মাঝে জিনিসটা গম্বুজ আকৃতির, অর্ধেক অংশ পানির নীচে।

বিশাল পুলের ধারে, পানির কাছে এসে দাঁড়িয়েছে প্রাইস। এই গোল পুল ঘিরে তৈরি হয়েছে উইলকক্স আইস স্টেশন। কঠিন বরফ খুঁড়ে তৈরি সিলিণ্ডারের মত পাঁচতলা গভীর ফ্যাসিলিটি, বহু দূরের উপকূলীয় রিসার্চ স্টেশন হিসাবে কাজ করছে। প্রকাণ্ড ব্যারেলের মত ফাঁকা জায়গার চারপাশে সরু ক্যাটওয়াক ও মই, সবই মিশেছে একেকটা করে দরজায়—ওপাশে বরফের তৈরি দালান। আগে আসা বহু মানুষের মতই উইলকক্স আইস স্টেশনের বাসিন্দারা ভাল করেই জানে, পোলার ওয়েদারে বেঁচে থাকতে হলে বরফের প্রান্তরের নীচে বাস করতে হবে।

দুই কাঁধে স্কুবা গিয়ার ঝুলিয়ে নিল জন প্রাইস, শতবারের মত হিসাব কষতে শুরু করেছে।

ডাইভারদের সঙ্গে তিনঘণ্টার বেশি রেডিয়ো লিঙ্ক বিচ্ছিন্ন। একঘণ্টা বরফের সুড়ঙ্গের ভিতর দিয়ে উপরের দিকে উঠেছে স্টোন ও অ্যাডাম্‌স্। তার আগে, একঘণ্টা ধরে ডাইভিং বেল চেপে নীচে নেমেছে।

নামবার সময় 'ফ্রি' এয়ার পেয়েছে ওরা। উপর থেকে ডাইভিং বেলের ভিতর তাজা বাতাসের ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু বেল থেকে বেরিয়ে আসবার পর থেকেই স্কুবা ট্যাঙ্কের অক্সিজেন

ব্যবহার করেছে। ওই প্রথম মুহূর্ত থেকে প্রতিটি সেকেণ্ড হিসাব করতে হবে।

তার মানে, চারঘণ্টা হলো ওরা স্কুবা ট্যাঙ্কের অক্সিজেন ব্যবহার করছে...

কিন্তু সমস্যা: ওদের স্কুবা ট্যাঙ্কে আছে মাত্র তিনঘণ্টা চলবার বাতাস!

এ থেকে অনেক কিছুই আঁচ করে নেয়া যায়।

দুই ডুবুরির কাছ থেকে শেষ যে কথা ওরা শুনেছে, তার পর থেকে পাওয়া গেছে শুধু স্ট্যাটিকের আওয়াজ। সেই সঙ্গে অদ্ভুত কিছু শিসের শব্দ।

ওই শিস তৈরি করতে পারে নীল, মিঙ্কস বা অন্য কোনও নিরীহ তিমি। অথবা, আধ মাইল বরফ ও পানির কারণে তৈরি হয়েছে রেডিয়ো ইণ্টারফেয়ারেন্স। প্রাইস আন্দাজ করছে, রেডিয়ো যোগাযোগে ছেদ পড়তেই ফিরতি পথ ধরেছে স্টোন ও অ্যাডাম্‌স্, রওনা হয়েছে ডাইভিং বেলের দিকে। তখন নির্দিষ্ট সময়ের আগেই বেল টেনে তুললে সুড়ঙ্গের ভিতর আটকা পড়ত দুই ডুবুরি। তাদের কাছে যথেষ্ট অক্সিজেনও ছিল না।

কিন্তু, সত্যি যদি দুই ডুবুরি বিপদে পড়ে— কিলার ওয়েইল বা লেপার্ড সিল হামলা করে— প্রাইসের প্রথম কাজ হওয়া উচিত ছিল ডাইভিং বেল তুলে একদল ডাইভারকে পাঠানো।

শেষে প্রাইস ঠিক করেছে, ডাইভিং বেল টেনে তুলে ওটাতে করে আবারও কাউকে নীচে নামানোর সময় নেই। স্টোন ও অ্যাডাম্‌স্ যদি বেঁচে থাকে, হয়তো ওটাতে নিরাপদে উঠতে পারবে ওরা। এখন উচিত নীচেই রেখে দেয়া ডাইভিং বেল।

কিন্তু সেটা তিন ঘণ্টা আগের কথা। এই সময়টা ডুবুরিদের দিয়েছে প্রাইস। এরপর একঘণ্টা ধরে টেনে তুলেছে ডাইভিং বেল। আর এখন নতুন করে নামবার জন্য তৈরি হয়ে গেছে

দ্বিতীয় দলটি।

'শুনুন।'

ঘুরে চাইল জন প্রাইস। ওর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে স্টেশনের প্যালিয়োণ্টোলজিস্ট, নিনা ভিসার।

মহিলাকে পছন্দ করে প্রাইস। নিনা ভিসার বুদ্ধিমতী ও প্র্যাকটিক্যাল; প্রয়োজনে কঠোর হতে জানে, হাত নোংরা হবে ভেবে কাজ ফেলে রাখে না। মহিলার বারো বছরের একটা মেয়েও আছে জেনে খুব অবাক হয়নি প্রাইস। গত এক সপ্তাহ হলো এই স্টেশনে বেড়াতে এসেছে কিশোরী মেরি ভিসার।

'কিছু বলবে?' জানতে চাইল প্রাইস।

'ঝড়ে ভেঙে পড়েছে উপরের অ্যাণ্টেনা, সিগনাল পাঠানো যাচ্ছে না,' বলল নিনা ভিসার। 'আরও সমস্যা আছে, খুব কাছে চলে এসেছে একটা সোলার ফ্লেয়ার।'

'মুশকিল।'

'আমি রাফায়লাকে প্রতিটা মিলিটারি ফ্রিকোয়েন্সি স্ক্যান করতে বলেছি, কিন্তু আপনাকে আশাব্যঞ্জক কিছু শোনাতে পারছি না।'

'বাইরের অবস্থা কী?'

'খুবই খারাপ। সাগর-তীরের ক্লিফের উপর আছড়ে পড়ছে আশি ফুটি ঢেউ। সমতলের বরফ ছুঁয়ে বইছে এক শ' নট গতিবেগের ঝড়। কেউ যদি আহত হয়, তাকে বাইরে নিয়ে যেতে পারব না আমরা।'

ডাইভিং বেলের দিকে ঘুরে চাইল প্রাইস। 'আর রাশেদ হাবিব?'

'তাকে তার ঘরে আটকে রাখা হয়েছে,' নার্ভাস চোখে বি-ডেকের দিকে চাইল নিনা ভিসার।

'আর দেরি করতে পারছি না,' বলল প্রাইস। 'এবার যেতে

হয়।'

তার দিকে চাইল নিনা ভিসার। 'জন...'

'ভুলেও অনুরোধ করতে যেয়ো না, নিনা,' মহিলার পাশ থেকে রওনা হয়ে গেল প্রাইস, চলেছে ডাইভিং বেলের দিকে। পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়বার আগে বলল, 'আমি চাই তুমি উপরেই থাকো। তোমার মেয়ের তোমাকে দরকার পড়তে পারে। চেষ্টা করো সিগনাল পাঠাতে। আমরা স্টোন আর অ্যাডাম্‌স্‌কে নিয়েই ফিরব।'

'আমরা তিন হাজার ফুট গভীরতায় পৌঁছে গেছি,' দেয়ালের আটকে রাখা স্পিকারে কড়-কড় করে উঠল জন প্রাইসের কর্কশ কণ্ঠ।

উইলকক্স আইস স্টেশনের অন্ধকার রেডিয়ো রুমে বসে আছে নিনা ভিসার। 'রজার দ্যাট, জন,' সামনের মাইক্রোফোনে বলল সে।

'বাইরে কোনও নড়াচড়া নেই, কন্ট্রোল। কোথাও কোনও অস্বাভাবিকতা দেখছি না। ঠিক আছে, লেডিজ অ্যাণ্ড জেন্টলমেন, আমরা উইঞ্চ বন্ধ করছি। এবার ডাইভিং বেল থেকে বের হওয়ার প্রস্তুতি নিন।'

সাগরের এক কিলোমিটার নীচে একটা ঝাঁকি খেয়ে থামল ডাইভিং বেল। ওটার পেটের ভিতর ইন্টারকম ব্যবহার করল জন প্রাইস: 'কন্ট্রোল, প্লিয ২১৩২ আওয়ার্স কনফার্ম করো।'

ডগলাস মওসন বেলের বদ্ধ পরিবেশে পরস্পরের দিকে চাইল সাত ডুবুরি, ধুকপুক করছে সবার বুক।

স্পিকারে ভেসে এল নিনা ভিসারের কণ্ঠ: 'আই কপি, ডাইভিং বেল। সময় কনফার্ম করা হলো, এখন রাত নয়টা বত্রিশ মিনিট।'

'কণ্ট্রোল, মার্ক করতে হবে আমরা ২১৩২ আওয়ার্সে নিজেদের অক্সিজেন ব্যবহার করতে শুরু করছি।'

'মার্ক্ড্।'

দেয়ালের হুক থেকে ভারী ফেস মাস্ক নিল সাত ডুবুরি, এক মিনিট পেরুনোর আগেই সুটের কলারবোনের গোলাকার বাক্‌ল্‌সে আটকে নিল মুখোশ।

'কণ্ট্রোল, আমরা এখন বেল থেকে বেরিয়ে পড়ছি।'

সামনে বাড়ল জন প্রাইস, মুহূর্তের জন্য ডাইভিং বেলের অভ্যন্তরের পুলের কালো পানি দেখল, তারপর দুই কদম বেড়ে ঝপাস্ করে নেমে পড়ল গাঢ় অন্ধকারে।

মাইক্রোফোনে বলে উঠল নিনা ভিসার, 'ডাইভার্স, ২২২০ আওয়ার্স, ডাইভ টাইম ফরটি-এইট মিনিট্স্। রিপোর্ট।'

রেডিয়ো রুমে নিনা ভিসারের পিছনে বসেছে রাফায়লা ম্যাকানটায়ার, সে স্টেশনের রেসিডেন্ট মিটিয়োরোলজিস্ট। গত দুই ঘণ্টা ধরে স্যাটালাইট রেডিয়ো কন্সোলের সামনে বসে আছে, কিন্তু বাইরে কোথাও একচুল ফ্রিকোয়েন্সি নেই।

খড়খড় আওয়াজ করে উঠল ইণ্টারকম। এক সেকেণ্ড পর যোগাযোগ করল জন প্রাইস: 'কণ্ট্রোল, আমরা এখনও বরফের সুড়ঙ্গ ধরে উপরের দিকে উঠছি। অস্বাভাবিক কিছু দেখিনি।'

'রজার, ডাইভার্স,' বলল নিনা। 'আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবেন।'

ওর পিছনে আবারও টক বাটন টিপল রাফায়লা। 'কলিং অল ফ্রিকোয়েন্সি, দিস ইয ফোর-ওয়ান-এইট স্টেশন। আই রিপিট, দিস ইয ফোর-ওয়ান-এইট, রিকোয়েস্টিং ইমিডিয়েট অ্যাসিস্ট্যান্স। আমাদের এখানে দু'জন আহত, সম্ভবত গুরুতর ভাবে। আমাদের ইমিডিয়েট সাপোর্ট দরকার। দয়া করে

সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিন। আবারও বলছি, দয়া করে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিন।' বাটনের উপর থেকে আঙুলের চাপ সরিয়ে নিয়ে বিড়বিড় করে বলল রাফায়লা, 'যে-কেউ, সাড়া দিন!'

বরফের সুড়ঙ্গের উপরের অংশ চওড়া হতে শুরু করেছে।

সবাইকে নিয়ে ধীরে-ধীরে উপরের দিকে উঠছে জন প্রাইস, পানির নীচে প্রত্যেকের চোখে পড়েছে চার দেয়ালে মস্ত সব গর্ত।

প্রতিটা গর্ত একেবারেই গোল, ব্যাসে কমপক্ষে দশ ফুট। সব শেষ হয়েছে বরফের সুড়ঙ্গের ভিতর। একটা গর্তের ভিতর আলো ফেলল এক ডুবুরি। নিকষ কালো অন্ধকার ছাড়া কিছুই দেখা গেল না।

হঠাৎ ইণ্টারকমে বলে উঠল জন প্রাইস, 'ঠিক আছে, সবাই কাছাকাছি থাকুন। আমরা সারফেসের কাছে চলে এসেছি।'

ওদিকে স্টেশনের রেডিয়ো রুমে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসল নিনা ভিসার। মনোযোগ দিয়ে শুনছে জন প্রাইসের কথা।

'সারফেস খুব শান্ত মনে হচ্ছে। এখনও অ্যাডাম্স্ বা স্টোনের হদিশ মেলেনি।'

পরস্পরের দিকে চাইল রাফায়লা ও নিনা। ইণ্টারকমের বাটন টিপল নিনা। 'ডাইভার্স, কণ্ট্রোল থেকে বলছি। ওসব আওয়াজ কীসের ছিল? এখন কি কোনও আওয়াজ পাচ্ছেন? বন্ধ হয়ে গেছে তিমি মাছের গান?'

'কোথাও কোনও আওয়াজ নেই। এক মিনিট, কণ্ট্রোল। আমি সারফেসে উঠে আসছি।'

মাত্র আধ মিনিট পর কাঁচের মত সারফেস ভেদ করে উঠে এল প্রাইসের হেলমেট। ফেসপ্লেট থেকে গড়িয়ে নামল বরফ-ঠাণ্ডা পানি। পানির উপর প্রিন্সটন-টেক ডাইভ লাইট তুলল

প্রাইস। চারপাশে ছড়িয়ে পড়ল হ্যালোজেন বালবের আলো, গুহার দূরের কোণ আবছা ভাবে দেখা গেল।

চারপাশ দেখতে শুরু করেছে প্রাইস। বড়সড় এক পুকুরের মাঝে ভেসে উঠেছে সে। একটু দূরে বিশাল পাতাল গুহা।

একবার ঘুরে চারদিক দেখে নিল প্রাইস। এই বিশাল গুহার চার দেয়াল বরফ দিয়ে তৈরি, সত্যিকারের দেয়ালের মতই খাড়া।

চতুর্থ দেয়ালে চোখ আটকে গেল প্রাইসের, চমকে গেল। ইণ্টারকমে বলে উঠল, 'কণ্ট্রোল, আমি কী দেখছি তোমরা কেউ বিশ্বাস করবে না!'

'কী দেখেছেন, জন?' মাইক্রোফোনে বলল নিনা ভিসার।

'বিশাল গুহা। চারপাশে বরফের খাড়া দেয়াল। কোনও একসময়ে সাইসমিক অ্যাক্টিভিটির কারণে তৈরি হয়েছে। বলতে পারি না এই গুহা কোথায়। কিন্তু সমতল থেকে কমপক্ষে কয়েক শ' ফুট নীচে হবে।'

'আচ্ছা!'

'আর হ্যাঁ... ওদিকে কিছু একটা দেখতে পাচ্ছি, নিনা!'

ভুরু কুঁচকে রাফায়লার দিকে চাইল নিনা ভিসার, ইণ্টারকমের বাটন টিপল, 'বলুন কী ওটা, জন।'

'নিনা...' দীর্ঘ বিরতি নিয়ে বলল প্রাইস, 'নিনা, আমার ভুল না হয়ে থাকলে, ওটা একটা স্পেসশিপ!'

বরফের দেয়ালের নীচে প্রায় চাপা পড়েছে ওটা। পুরো কালো রঙের। উইংস্প্যান নব্বুই ফুট। অনেকটা উপরে উঠেছে চকচকে ডর্সাল টেইল ফিন। আকাশযানের পিছনের অংশ ঢাকা পড়েছে বরফের প্রাচীরের নীচে। খুব পোক্ত তিনটে ল্যাণ্ডিং স্ট্রাট দেখা গেল। দারুণ সুন্দর কালো একটা আকাশযান। সাধারণ বিমান এত অ্যারোডাইন্যামিক হয় না। জাহাজটা এতই অপূর্ব,

দেখলে মনে হয় ওটার মালিক হতে পারলে আর কিছু চাওয়ার থাকত না।

পিছনে ঝপাৎ আওয়াজ হতেই চরকির মত ঘুরল জন প্রাইস। ডুবুরিরা ভেসে উঠেছে। সবার চোখ আটকে গেছে স্পেসশিপের উপর। কিন্তু তাদের পিছনের পানিতে যেন ঢিল পড়েছে, তৈরি হচ্ছে বড় একটা বৃত্ত। পানিতে ভারী কিছু পড়লে ওরকম গোলাকার ঢেউ হয়।

'ঢেউ কীসের, উপর থেকে কী পড়ল?' জানতে চাইল প্রাইস, 'হ্যানলন?'

'জানি না, মিস্টার প্রাইস। কিন্তু মনে হলো পাশ দিয়ে কী যেন গেল।'

তার দিকে চেয়ে আছে প্রাইস, দুই সেকেণ্ড পর দেখল চোখের সামনে টুপ করে ডুবে গেল হ্যানলন।

'হ্যানলন?'

পরক্ষণে আরেকজন আর্তচিৎকার করে উঠল। লোকটার নাম টম সামার।

পানির ভিতর ঘুরে গেল প্রাইস, আর ঠিক তখনই এক পলকের জন্য দেখতে পেল চকচকে কালো একটা পিঠ। বিশাল কোনও প্রাণী, সারফেস ভেদ করে উঠে এসেছে, তারপর বিপুল ওজন নিয়ে ঝপাস্ করে পড়ল পানিতে। টম সামারের বুকের উপর চেপে বসেছে ওটা, পরক্ষণে তাকে নিয়ে তলিয়ে গেল।

এক সেকেণ্ড পর উন্মাদ হয়ে উঠল জন প্রাইস, যে করে হোক তীরে গিয়ে উঠতে হবে! পুলের সারফেসের নীচে মাথা তলিয়ে যেতেই অদ্ভুত কিছু আওয়াজ পেল। খুব জোরে শব্দ হচ্ছে। শুরু হয়েছে তীক্ষ্ণ চিৎকার। কর্কশ ধ্বনি ছাড়ছে কী যেন। সেই সঙ্গে কুকুরের ডাকের মত ঘেউ-ঘেউ গর্জন!

দ্বিতীয়বার যখন সারফেসে ভেসে উঠল প্রাইস, পুকুরের

হিম-শীতল দেয়াল দেখতে পেল। সারফেস থেকে একটু উপরে, সামনে বিশাল এক গর্ত। ওই জিনিস আগেও দেখেছে সে, বরফের সুড়ঙ্গে, পানির নীচে।

তারপর হঠাৎ করেই একটা গর্ত থেকে কী যেন বেরিয়ে এল!

'হায় যিশু!' ফিসফিস করে বলল প্রাইস।

ইন্টাকমে ভেসে এল একের পর এক আর্তচিৎকার। আইস স্টেশনের রেডিয়ো রুমে ভীষণ চমকে গেছে নিনা ভিসার, চোখ পড়ে আছে কন্সোলের উপর। ওর পাশে বসে আছে রাফায়লা, এক হাতে চেপে ধরেছে মুখ। ফ্যাকাসে হয়ে গেছে চেহারা। দেয়ালের স্পিকারে ভেসে আসছে একের পর এক করুণ আর্তনাদ ও ভয়ার্ত চেঁচামেচি।

'জনসন!'

'ওকে নিয়ে গেছে!'

'হায় ঈশ্বর! নাহ্!'

'যিশু, ওই দেয়াল থেকে... ওই দেয়াল থেকেই আসছে ওগুলো!'

তারপর হঠাৎ জন প্রাইসের কণ্ঠ শোনা গেল: 'সবাই পানি থেকে উঠে যাও! পানি থেকে উঠে যাও!'

আরেকটা আর্তচিৎকার ভেসে এল। পরক্ষণে আরেকটা।

মাইক্রোফোন চেপে ধরল নিনা। 'মিস্টার প্রাইস! প্রাইস! কথা বলুন!'

ইন্টারকমে কর্কশ কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল প্রাইস, দ্রুত বলে চলেছে, তার ফাঁকে হাঁসফাঁস করছে: 'নিনা... শালার কপাল... আমি ওগুলোকে দেখছি না। আমাদের কেউ নেই। ওদের টেনে নিয়ে গেছে...' বিরতি দিল প্রাইস, কয়েক সেকেণ্ড পর বলল,

'হায় যিশু! নিনা... সাহায্য চেয়ে রেডিয়ো করো। সবাইকে জানাও আমাদের সাহায্য দরকার...'

পরক্ষণে ইণ্টারকমে ভেসে এল কাঁচ ভাঙবার আওয়াজ। দীর্ঘ কয়েক মুহূর্ত পেরিয়ে গেল, আর যোগাযোগ করল না জন প্রাইস।

নতুন করে রেডিয়োর মাইক্রোফোনে বলতে শুরু করল রাফায়লা: 'গড্‌স্ সেক, কেউ সাড়া দিন! দিস ইয ফোর-ওয়ান-এইট স্টেশন, রিকোয়েস্টিং ইমিডিয়েট অ্যাস্টিস্ট্যান্স! আবারও বলছি, এটা ফোর-ওয়ান-এইট স্টেশন! আমাদের বেশ কয়েকজন পাতাল গুহার ভিতর মারা পড়েছে! আপনারা কেউ কি শুনতে পাচ্ছেন? দয়া করে সাড়া দিন! আমাদের ডাইভাররা... হায় যিশু... আমাদের ডাইভাররা বলেছে পাতাল গুহার ভিতর ওটা একটা স্পেসশিপ! ওদের উপর হামলা করেছে কারা যেন! আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন! পানির নীচে মেরে ফেলছে ওদেরকে!'

কারও কাছ থেকে কোনও সাড়া পেল না উইলকক্স আইস স্টেশনের কেউ। বৃথা হলো ডিসট্রেস সিগনাল পাঠানো। কেউ কোনও জবাব দিল না।

কিন্তু আসলে অন্তত তিনটি রেডিয়ো ইন্সটলেশন থেকে শোনা গেছে রাফায়লার জরুরি বার্তা।

দুই

১৬ই জুলাই।

ভোর সাড়ে ছয়টা।

তুষারের উপর দিয়ে তীব্র গতি তুলে ছুটছে হোভারক্রাফট। ওটা ধবধবে সাদা, কিন্তু অ্যান্টার্কটিকায় ওই রঙের যান ব্যবহার করা হয় না। চট্ করে চিনবার জন্য বেশির ভাগ যানের রং হয় গাঢ় কমলা। খুব দ্রুত চলেছে সাদা হোভারক্রাফট। অনেকেই জানে, অ্যান্টার্কটিকায় যারা আসে, তাদের সত্যিকারের ব্যস্ততা বলতে কিছুই থাকে না। কিন্তু মনে হচ্ছে এই হোভারক্রাফটের আরোহীদের খুবই তাড়া আছে।

রিইনফোর্সড্ ফাইবার গ্লাস উইণ্ডস্ক্রিনের ভিতর দিয়ে সামনে চেয়ে আছে মাসুদ রানা। ওর হোভারক্রাফটের স্টারবোর্ডে এক শ' গজ দূরে দ্বিতীয় হোভারক্রাফট দেখতে পেল। ওটাও সাদা, বরফে ছাওয়া সমতলের উপর দিয়ে ছুটে চলেছে পাশাপাশি।

থমথম করছে রানার মুখ। হঠাৎ করেই অ্যান্টার্কটিকায় আসতে হয়েছে ওকে। গতকাল মাঝসকালে আমেরিকান স্টেশন ম্যাকমার্ডোয় পৌঁছে পরিস্থিতি ওর কাছে সুবিধাজনক মনে হয়নি।

ফ্রেইটার দ্য মার্ভেল অভ গ্রিস নিয়ে তাসমানিয়ার দক্ষিণ সাগরে ছিল রানা, ওর কাজ ছিল বাংলাদেশ আর্মির ছোট একটা দলকে এ.ও.এস অর্থাৎ অ্যাসল্ট অন সি'র উপর ট্রেইনিং দেয়া। চলছে ট্রেইনিং, সকাল ন'টা। এমনসময় হঠাৎ করেই বাংলাদেশ কাউণ্টার ইন্টেলিজেন্সের চিফ মেজর জেনারেল (অব.) রাহাত খানের কল এল ওর স্যাটালাইট মোবাইল ফোনে।

রানার বুকের ভিতর ছলাৎ করে উঠল উষ্ণ রক্ত। নিশ্চয়ই কিছু একটা ইমার্জেন্সি দেখা দিয়েছে— নিশ্চয়ই নতুন কোনও অ্যাসাইনমেন্ট দেবে বুড়ো?

কল রিসিভ করে 'জী, স্যর,' বলতেই গুরুগম্ভীর স্বরে জানালেন রাহাত খান, 'রানা, আপাতত তোমাদের ট্রেইনিং বন্ধ রাখতে হবে। জরুরি একটা কাজে তোমাদেরকে দরকার।'

চুপ করে অপেক্ষা করেছে রানা।

কয়েক মুহূর্ত পর বললেন রাহাত খান, 'অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন যোগাযোগ করেছিল। আমার মাধ্যমে তোমার কাছে সাহায্য চাইছে। এর সঙ্গে আমাদের দেশের স্বার্থও জড়িত।'

'অ্যাডমিরাল আমাদের কাছে কী চাইছেন, স্যর?' জানতে চেয়েছে রানা।

খুক-খুক করে কাশলেন চিফ, তারপর বললেন, 'ওর নুমার কয়েকজন বিজ্ঞানী আটকা পড়েছেন উইলকক্স আইস স্টেশনে। তাঁদের তিনজন মারা পড়েছেন গভীর পানিতে নেমে। এ মুহূর্তে আমেরিকান সেনাবাহিনী বলতে ম্যাকমার্ডোয় মেরিন কর্পসের মাত্র কয়েকজন সৈনিক। ওই স্টেশন পাহারা দিতেই তাদের বেশির ভাগকে লাগবে। অবশ্য, তাদের কাছ থেকে সব ধরনের সহায়তা পাবে। হ্যামিলটন জানে, মার্ভেল নিয়ে তাসমানিয়ার কাছেই আছ। বাংলাদেশ আর্মির ট্রেইনি অফিসার, সার্জেন্ট এবং কর্পোরালদের নিয়ে সাহায্যে যেতে পারো। ...আমাদের প্রধানমন্ত্রী ও আর্মি চিফের সঙ্গে কথা বলার পর হ্যামিলটনকে জানিয়ে দিয়েছি, তুমি তোমার দল নিয়ে যাবে।' বিরতি দিলেন রাহাত খান।

'তুই বললেই যেখানে-সেখানে আমাকে যেতে হবে, শালা?' ধমকের সুরে জানতে চাইল রানা, মনে মনে। মুখে বলল, 'জী, স্যর।'

'ওখানে কয়েকজন বিখ্যাত বাংলাদেশি ও আমেরিকান বিজ্ঞানী কাজ করছিলেন। তোমাদের কাজ হবে তাঁদেরকে উদ্ধার করে নিরাপদে ম্যাকমার্ডোয় পৌঁছে দেয়া।' চুপ হয়ে গেলেন রাহাত খান। কয়েক মুহূর্ত পর বললেন, 'গতরাতে উইলকক্স আইস স্টেশন থেকে রেডিয়ো বার্তা পাওয়া গেছে। ওরা আকুল হয়ে সাহায্য চেয়েছে। বলেছে, ওদের ওখানে নাকি

একটা স্পেসশিপ আছে। অবিশ্বাস্য! ...তোমার যদি সুযোগ হয়, সরেজমিনে দেখবে ওখানে আসলে কী ঘটছে।'

'জী, স্যর।'

'এবং ধরে নিতে পারো, ক্ষমতাশালী বেশ কিছু দেশ এরই ভিতর আগ্রহী হয়ে উঠেছে।'

'তার মানে, স্যর, ওখানে পৌঁছবার পর আমাদের উপর হামলা আসতে পারে?'

'হ্যাঁ, আমি ভয়ানক বিপদের আশঙ্কা করছি। খুব সতর্ক থাকতে হবে তোমাদের।'

রানাকে কথা বলবার সুযোগ দিয়েছেন রাহাত খান, তারপরও প্রাণ-প্রিয় শিষ্য চুপ করে আছে দেখে সাত সেকেণ্ড অপেক্ষার পর কেটে দিয়েছেন লাইন।

উইণ্ডস্ক্রিনের ভিতর দিয়ে আবারও সামনের ধূসরতার দিকে চাইল রানা।

'ফিসফিস এক, শুনছেন, স্যর?'

রেডিয়োতে বলল রানা, 'ফিসফিস দুই, ফিসফিস এক বলছি। ...কী?'

'স্যর...' সার্জেন্ট হোসেন আরাফাত দবিরের গম্ভীর, মোটা কণ্ঠ হঠাৎ করেই হারিয়ে গেল। গত বিশ ঘণ্টায় অ্যাণ্টার্কটিকা মহাদেশের আয়োনোস্ফেরিক পরিস্থিতি খুব মন্দ হয়ে উঠেছে। শুরু হয়েছে প্রচণ্ড একটা সোলার ফ্লেয়ার। ওটার কারণে ব্যাহত হচ্ছে সব ধরনের ইলেকট্রোম্যাগনেটিক স্পেকট্রাম। এমন কী বন্ধ হয়েছে সাধারণ শর্ট-রেঞ্জ ইউএইচএফ ট্র্যান্সমিশনও। মাত্র এক শ' গজ দূরের হোভারক্রাফটে যোগাযোগ করা কঠিন হয়ে উঠেছে। উইলকক্স আইস স্টেশনে বার্তা পাঠানো তো পুরোপুরি অসম্ভব।

স্ট্যাটিক আবারও কমে এসেছে, স্পিকারে আরাফাতের কণ্ঠ

ফিরল, 'স্যর, আপনার মনে পড়ে একঘণ্টা আগে মুভিং কণ্ট্যাক্ট ধরা পড়ে?'

'হ্যাঁ।'

গত একঘণ্টা ধরে 'ফিসফিস দুই'য়ের ইলেকট্রনিক ইকুইপমেণ্ট উল্টো দিক থেকে আসা এমিশন ধরেছে। ওই হোভারক্রাফট দ্রুত চলেছে ফ্রেঞ্চ উপকূলীয় রিসার্চ স্টেশন ডুমো ডি'খ-ঈলেখের দিকে।

'তাতে কী, সার্জেন্ট?'

'স্যর, এখন আমি আর ওটাকে খুঁজে পাচ্ছি না।'

দূরে চাইল রানা। 'আপনি শিয়োর?'

'এখন আর আমাদের স্কোপে কোনও রিডিং নেই, স্যর। হয় ইঞ্জিন বন্ধ করেছে, নয়তো হঠাৎ করেই অদৃশ্য হয়েছে।'

এক মুহূর্ত ভাবল রানা, চট্ করে পিছনে দেখে নিল পারসোনেল কম্পার্টমেণ্টের ভিতরটা। দুই পাশে বসেছে চারজন। মাঝে একজন। তাদের দু'জন আমেরিকান মেরিন কর্পসের সদস্য। অন্য তিনজন বাংলাদেশ আর্মির। প্রত্যেকের পরনে স্নো ফেটিগ। কোলের উপর সাদা-ধূসর কেভলার হেলমেট, বুকে একই রঙা বডি আর্মার। পাশে ঠেস দিয়ে রাখা ধূসর-সাদা অটোমেটিক রাইফেল। রানা, বাংলাদেশ আর্মির অফিসার ও সৈনিকদের জন্য ওই একই জিনিস দেয়া হয়েছে। এ ছাড়া, প্রত্যেককে সরবরাহ করা হয়েছে অন্যান্য আরও অস্ত্র ও যন্ত্রপাতি।

উইলকক্স আইস স্টেশন থেকে ডিসট্রেস সিগনাল পাওয়ার পর এরইমধ্যে কেটে গেছে দুই দিনেরও বেশি। আদেশ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রওনা হয়ে প্রায় তিন হাজার কিলোমিটার পেরিয়ে পৌঁছেছে রস সাগরে। ওই সাগরের তীরে উত্তর আমেরিকা সারাবছর এক শ' চারজন লোক রাখে স্টেশন

ম্যাকমার্ডোয়। উনিশ শ' বাহাত্তর সালে ওখানেই ইউএস নেভি তাদের নিউক্লিয়ার বোমা পরীক্ষা করেছিল। ছি-ছি করেছিল পৃথিবীর মানুষ। এরপর নতুন করে ওখানে বোমা ফাটানো হয়নি, দক্ষিণ পোল যেতে হলে ওই পথেই যেতে হয় ইউএসএ-কে। গত বিকেলে ম্যাকমার্ডো থেকে রওনা হয়েছে রানার দল ও কয়েকজন মেরিন সৈনিক। ওদের গন্তব্য: নয় শ' মাইল তুষার ছাওয়া প্রান্তর পাড়ি দিয়ে ইউএস রিসার্চ ফ্যাসিলিটি উইলকক্স আইস স্টেশন।

নির্জন এলাকায় খুব ছোট একটা স্টেশন। অ্যান্টার্কটিকায় এ ধরনের খুদে স্টেশনও খুব কম। সবচেয়ে কাছের প্রতিবেশী ছয় শ' মাইল দূরে। উইলকক্স স্টেশন একটা আমেরিকান পোস্ট, ডাল্টন আইসবার্গ থেকে একটু দূরে কোস্টাল আইস শেলফের উপর। শত শত মাইল বিরান ভূমিতে, বরফের ধূ-ধূ প্রান্তরের উপর বইছে ঝোড়ো হাওয়া। সাগরের দিকে তিন শ' ফুট উঁচু পাথুরে ক্লিফ, ওখানে সারা বছরই ষাট ফুট উঁচু ঢেউ আছড়ে পড়ে।

আকাশ পথে উইলকক্স স্টেশনে যাওয়া অসম্ভব কাজ। এই শীতে বইছে মাইনাস তিরিশ ডিগ্রি ব্লিযার্ড, পর পর তিন সপ্তাহ ধরে চলছে। বিশেষজ্ঞরা ধারণা করছেন: কমপক্ষে আরও একমাস চলবে এই চরম পরিবেশ। হেলিকপ্টারের রোটর বা জেট ইঞ্জিন মাঝ আকাশে জমে গিয়ে বিধ্বস্ত হবে নির্ঘাত।

সাগরের দিক দিয়ে যেতে হলে ডিঙিয়ে আসতে হবে তিন শ' ফুট উঁচু বরফের ক্লিফ। ইউএস নেভি এককথায় বলে দিয়েছে: ওদিক দিয়ে উঠতে যাওয়া মানেই আত্মহত্যা করা।

অর্থাৎ, তুষার ছাওয়া জমির উপর দিয়েই আসতে-যেতে হবে। তার মানেই, ব্যবহার করতে হবে হোভারক্রাফট। বাংলাদেশ আর্মির পাঁচজন অফিসার ও সৈনিক ও রানা, মোট

ছয়জন চলেছে। ওদিকে আমেরিকান কর্তৃপক্ষ থেকে দেয়া হয়েছে মেরিন কর্পস-এর ছয়জন সৈনিক। এদের সবার নেতৃত্বে রয়েছে মাসুদ রানা।

হোভারক্রাফটের ওই সিগনাল নিয়ে আবারও ভাবল রানা। মানচিত্রে ম্যাকমার্ডো, ডি'খ-ঈলেখ ও উইলকক্স আইস স্টেশন প্রকাণ্ড এক ত্রিকোণ তৈরি করেছে। উপকূলে দুটো বাহু ডি'খ-ঈলেখ ও উইলকক্স স্টেশন, ওদিকে বহু দূরের জমিতে রস সাগরের তীরে ম্যাকমার্ডো শেষ বাহু।

দ্বিতীয় ফিসফিস যে সিগনাল পেয়েছে, ওটা গেছে উপকূলে ডুমো ডি'খ-ঈলেখের দিকে। হোভারক্রাফটের গতিবেগ ছিল কমবেশি চল্লিশ মাইল। এ থেকে আঁচ করা যায়, ওটা সাধারণ হোভারক্রাফট। অবশ্য এমনও হতে পারে, উইলকক্স স্টেশনের ডিসট্রেস সিগনাল ধরতে পেরেছে ডি'খ-ঈলেখের ফ্রেঞ্চরা, এবং সে কারণেই সাহায্য করতে ছুটে এসেছে। এখন ফিরছে নিজ স্টেশনের দিকে।

আবারও রেডিয়ো চালু করল রানা, 'সার্জেন্ট, শেষ কখন সিগনাল পেয়েছেন?'

খড়মড় করে উঠল রেডিয়ো। 'আট মিনিট আগে, স্যর। রেঞ্জফাইণ্ডার কণ্ট্যাক্ট। আগের ইলেকট্রনিক সিগনেচারের মতই। একইদিকে গেছে। একই সিগনাল, স্যর। আট মিনিট আগে ওখান থেকেই হারিয়ে গেছে।'

যেন নরক হয়ে উঠেছে পরিবেশ, দিগন্ত থেকে কাত হয়ে আসছে আশি মাইল গতিবেগের তুমুল ঝড়। সাদা তুষার ছাড়া কিছুই দেখা যায় না। সাধারণ রেইডার স্ক্যানিং কোনও কাজে আসবে না। আয়োনোস্ফেয়ারে সোলার ফ্লেয়ারের কারণে বিকল হয়েছে রেডিয়ো কমিউনিকেশন। তার উপর লো প্রেশার সিস্টেম কানা করে দিয়েছে সবার রেইডার।

এমন জটিল পরিস্থিতি হতে পারে ভেবেই হোভারক্রাফটের ছাতে বসানো হয়েছে রেঞ্জফাইণ্ডার। প্রতিটি রিভলভিং টারেটে এক শ' আশি ডিগ্রি নজরে রাখছে রেঞ্জফাইণ্ডার, 'নিড্‌ল্‌' নামে পরিচিত হাই-পাওয়ার্ড ফোকাল বিম ছুঁড়ছে। ওটা সাধারণ রেইডার নয় যে পৃথিবীর বাঁকে গিয়ে ক্ষমতা হারাবে। নিডল পৃথিবীর মাটি ছুঁয়ে চলে, দিগন্ত পেরিয়ে পৌঁছে যায় প্রায় পঞ্চাশ মাইল দূরে। কোনও লাইভ অব্‌জেক্ট, সেটা কেমিকেল, জন্তু বা ইলেকট্রনিক হোক, ঠিকই ওটাকে রেকর্ড করবে নিডল। ম্যাকমার্ডো থেকে রওনা হওয়ার পর রেঞ্জফাইণ্ডার অপারেটার কর্পোরাল নাজমুল বলেছে, 'স্যর, পরীক্ষা করেছি, কোনও জিনিস যদি বলকে ওঠে, শ্বাস নেয়, বা বিপবিপ আওয়াজ করে, এই রেঞ্জফাইণ্ডার ঠিকই তাকে ধরে ফেলে।'

রেডিয়ো চালু করল রানা, 'সার্জেন্ট, সিগনাল কোথায় বন্ধ হয়েছে? আমরা ওটা থেকে কত দূরে?'

'আমরা কমবেশি নব্বুই মাইল দূরে, স্যর,' জবাব দিল সার্জেন্ট হোসেন আরাফাত দবির।

ধবধবে সাদা দিগন্তের দিকে চাইল রানা। এক মুহূর্ত পর বলল, 'ঠিক আছে। যান, চেক করে দেখে আসুন।'

'জী, স্যর।'

এবারের ট্রেইনিঙে গত একমাস ধরে সার্জেন্ট হোসেন আরাফাত দবিরকে নতুন করে চিনছে রানা। পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সী শক্তপোক্ত লোক সে, মুষ্টিযোদ্ধার মত কঠোর চেহারা, কমপক্ষে তিনবার ভেঙেছে নাক। চোখদুটো গভীর গর্তে বসানো, মোটা বিছার মত ভুরু। কাজে কোনও খুঁত রাখে না সে। কাজের সময় গম্ভীর, কিন্তু কাজ না থাকলে সবসময় হাসির কথা বলে। কেন যেন প্রথম থেকেই রানাকে খুব শ্রদ্ধার সঙ্গে নিয়েছে সে, প্রায় প্রতিটা কথা 'স্যর' না বলে শুরু বা শেষ করে না।

'আমরা উইলকক্স আইস স্টেশনের দিকে চলেছি,' বলল রানা। 'আপনারা দেখে আসুন কোথায় গেছে ওই সিগনাল। কাজ শেষে সোজা স্টেশনে চলে আসবেন।'

'জী, স্যর।'

'দুই ঘণ্টার ভিতর ফিরবেন। রেঞ্জফাইণ্ডার পিছন দিকে চালু করুন। পিছনে কেউ থাকলে আমি আগেই জানতে চাই।'

'জী, স্যর।'

'ও, আরেকটা কথা,' বলল রানা।

'সেটা কী, স্যর?'

'কাউকে বেশি খাটাবেন না।'

'জী, স্যর।'

'ফিসফিস এক, আউট।'

'ফিসফিস দুই, আউট।'

পাঁচ সেকেণ্ড পর ডানদিকে বাঁক নিল দ্বিতীয় হোভারক্রাফট, সোজা ঢুকে পড়ল তুষার-ঝড়ের ভিতর।

তিন

একঘণ্টা পর উপকূল চোখে পড়ল, হাই-পাওয়ার্ড ফিল্ডগ্লাসের ভিতর দিয়ে প্রথমবারের মত উইলকক্স আইস স্টেশন দেখল মাসুদ রানা।

বরফে ছাওয়া জমিতে প্রথমে ওটাকে কোনও স্টেশন মনে হলো না। বড়জোর বলা যেতে পারে পেটমোটা গম্বুজওয়ালা

কয়েকটা দালান। সবই তুষারের ভিতর ডুবে আছে আধাআধি।

কমপ্লেক্সের ঠিক মাঝে মেইন বিল্ডিং। চারকোনা ভিত্তির উপর প্রকাণ্ড গোল গম্বুজ। দালানের ভিত্তি দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে এব শ' ফুটের বেশি হবে না। উচ্চতা বড়জোর দশ ফুট।

প্রধান গম্বুজের একটু দূরে অপেক্ষাকৃত ছোট আরেকটা দালান। ওটার ছাতের উপর এক পায়ে দাঁড়িয়ে আছে বিধ্বস্ত রেডিয়ো অ্যান্টেনা। উপরের অর্ধেক কোমর ভেঙে নীচের দিকে নেমে এসেছে। নীচের অংশ এখনও দাঁড়িয়ে আছে শুধু কয়েকটা টানটান কেবলের জোরে। নানা জায়গা থেকে ঝুলছে বরফ। চারপাশে বাতি বলতে শুধু মেইন ডোম, ওটার ভিতর থেকে আসছে সাদা আলো।

স্টেশন থেকে আধ মাইল দূরে হোভারক্রাফট রাখতে বলেছে রানা। যানটা থেমে যেতেই খুলে গেল পোর্ট-সাইড দরজা, একইসঙ্গে হোভারক্রাফটের ফুলে ওঠা স্কার্টে পা রাখল সবাই, তারপর লাফ দিয়ে নেমে পড়ল শক্ত জমাট তুষারে। একপলক চারপাশ দেখে নিয়ে স্টেশনের দিকে ডাবল-মার্চ শুরু করল দলটি। হৌউউ-হৌউউ করুণ আওয়াজ তুলছে ঝোড়ো হাওয়া, সাগরের দিক থেকে ক্লিফের উপর ঢেউ আছড়ে পড়বার বুম বুম আওয়াজ আসছে।

'তোমরা সবাই জানো কী করতে হবে,' হেলমেট মাইকে বলল রানা।

বরফ-সাদা ব্লিযার্ডের ভিতর ছড়িয়ে পড়ল দলটি। ছুটে চলেছে স্টেশনের দিকে।

•

সার্জেন্ট হোসেন আরাফাত দবির তুবড়ে যাওয়া হোভারক্রাফট দেখবার অনেক আগেই সামনের বরফে দেখতে পেয়েছে চওড়া ফাটল।

তুষারের মাঝে মানুষের হাস্যরত দুই ঠোঁট যেন ওটা, কমপক্ষে চল্লিশ গজ বিস্তৃত, অনেক গভীর।

মস্ত ফাটল থেকে এক শ' গজ দূরে হোভারক্রাফট রেখেছে সার্জেন্ট। সে নামবার পর তুষারযান থেকে নেমে এল কয়েকজন মেরিন এবং বাঙালি সৈনিক। পিচ্ছিল বরফের ভিতর সাবধানে সামনে বাড়ল সবাই, পৌঁছে গেল ফাটলের কাছে।

এই দলের ক্লাইম্বার কর্পোরাল নাজমুল, তাকে হার্নেসে আটকে দিল সার্জেন্ট হোসেন আরাফাত দবির। নাজমুল বিড়ালের মতই সাবলীল, চটপটে, ওজনেও কম, বয়স মাত্র তেইশ। ওর আরেক নাম: প্রফেসর শঙ্কু। ছেলেমি চেহারা। পাগলের মত পড়ে সায়েন্স ফিকশন।

হার্নেসে দড়ি আটকে দিতেই উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল নাজমুল, পেটের উপর ভর করে ক্রল শুরু করল। দেখতে না দেখতে চলে গেল ফাটলের কিনারায়, গলা বাড়িয়ে দেখে নিল নীচের দিক।

'হায় আল্লা...'

দশ গজ পিছনে হেলমেট মাইকে সার্জেন্ট হোসেন আরাফাত দবির জিজ্ঞেস করল, 'কী হয়েছে, নাজমুল?'

'ওরা সব নীচে, স্যর,' চাপা শ্বাস ফেলল কর্পোরাল। 'কনভেশনাল ক্রাফট। গায়ে ফ্রেঞ্চ ভাষায় কী যেন লেখা। ক্রাফটের তলা থেকে খসে পড়েছে পাতলা বরফের মেঝে। তুষারের ব্রিজ পেরুতে গিয়েই এই অ্যাক্সিডেন্ট।'

সার্জেন্ট দবিরের দিকে মাথা ঘোরাল সে, থমথম করছে মুখ। শর্ট-রেঞ্জ রেডিয়ো ফ্রিকোয়েন্সিতে হালকা শোনাল ওর কণ্ঠ: 'সবাই মরে ভূত, স্যর!'

'নেমে পড়ো, বাছা।'

আড়াই মিনিট পর খাতের তলদেশের কাছে পৌঁছে গেল নাজমুল।

চল্লিশ ফুট উপর থেকে পড়ে ভচকে গেছে হোভারক্রাফটের নাক, ফাটল ধরেছে প্রতিটি জানালার কাঁচে— ওখানে তৈরি হয়েছে অসংখ্য মাকড়সার জাল। এরই ভিতর সবকিছুকে ছেয়ে ফেলেছে হালকা তুষার, ইতিহাস থেকে মুছে দিতে শুরু করেছে ওদের অস্তিত্ব।

হোভারক্রাফটের সামনের উইণ্ডস্ক্রিন ভেদ করে ছিটকে পড়েছে দুই আরোহী, ফাটলের দূর-প্রান্তে মৃতদেহ, মরেছে ঘাড় মটকে। বরফ হয়ে যাওয়া রক্তের পুকুরের ভিতর নিথর।

ভুতুড়ে পরিবেশ, বার কয়েক শিউরে উঠল নাজমুল।

হোভারক্রাফটে আরও লাশ আছে, আবছা দেখা গেল। ফাটা কাঁচের ওপাশে নক্ষত্র আকৃতির জমাট রক্তের দাগ।

'নাজমুল?' হেলমেট ইণ্টারকমে শুনল কর্পোরাল। 'নীচে কেউ বেঁচে আছে?'

'মনে হয় না, স্যর,' বলল নাজমুল।

'ইনফ্রা-রেড দিয়ে পরীক্ষা করে দেখো,' পরামর্শ দিল দবির। 'হাতে বিশ মিনিট, তারপর রওনা হব। কেউ বেঁচে থাকলে তাকে ফেলে যেতে চাই না।'

আমেরিকান মেরিনদের হেলমেটের ইনফ্রা-রেড ভাইযার চালু করল নাজমুল, এখন দেখলে কেউ ভাববে ও ফাইটার বিমানের পাইলট।

বিধ্বস্ত হোভারক্রাফটের উপর মনোযোগ দিল, দেখতে পেল ইলেকট্রনিক নীল ইমেজারি। হোভারক্রাফটের ইঞ্জিন শীতল, কোথাও হলুদ রং নেই। ভাইযারের কারণে কালোর উপর নীল রঙা দেখাল ক্র্যাশ সাইট। তার চেয়ে বড় কথা, হোভারক্রাফটের ভিতর কমলা বা হলুদ রঙের কোনও দেখা নেই। বরফের মতই ঠাণ্ডা হয়ে গেছে লাশগুলো।

নাজমুল বলতে শুরু করল, 'স্যর, ইনফ্রা-রেড থেকে যা

বুঝলাম...'

ঠিক তখনই ওর নীচ থেকে সরে গেল জমিন। সাবধান হওয়ার কোনও সুযোগই পেল না নাজমুল, ওজন নিতে গিয়ে মটমট করে ওঠেনি বরফের মেঝে, স্রেফ খসে পড়ল সব।

এতই দ্রুত ঘটল, আরেকটু হলে বুঝত না সার্জেন্ট দবির। ফাটলের কিনারায় শুয়ে নীচে চেয়েছে সে, পরমুহূর্তে দেখল এক সেকেণ্ডে উধাও হয়েছে কর্পোরাল। ছেলেটির পিছু নিয়ে সরসর করে ছুটছে কালো দড়ি!

'নাজমুল পড়ল! দড়ি ধরো!' হুঙ্কার ছাড়ল সার্জেন্ট দবির। আলগা হাতে দড়ি ধরেছে দুই মেরিন, কিন্তু কথাটা শুনে দেরি করল না, দুই হাতে খপ্ করে ধরল লাইন। তারা দু'জন অপেক্ষা করছে জোর ঝাঁকির জন্য।

ফাটলের কিনারা থেকে সরসর করে নামছে দড়ি, কিন্তু দুই সেকেণ্ড পর ঝটাং করে টানটান হয়ে গেল।

উঠে দাঁড়িয়েছে সার্জেন্ট দবির, কিনারা থেকে এক পা পিছাল, তারপর উঁকি দিল খাতের ভিতর।

পড়ে আছে বিধ্বস্ত হোভারক্রাফট, বরফের দেয়ালের কাছে দুই মৃতদেহ। তারপর নাজমুলকে দেখল দবির, হোভারক্রাফটের স্টারবোর্ড দরজা থেকে দুই ফুট উপরে দড়ি থেকে ঝুলছে সে।

'বাছা, ঠিক আছ তো?' হেলমেট মাইকে জানতে চাইল দবির।

'জানতাম, স্যর, আমাকে মরতে দেবেন না,' বলল নাজমুল।

'একমিনিট ঝুলে থাকো, তুলে আনছি।'

'জী, স্যর।' হোভারক্রাফটের স্টারবোর্ড দরজার দিকে চাইল নাজমুল, পরক্ষণে আঁৎকে উঠল। 'হায় আল্লা! স্য- - -র!'

কাঠের প্রকাণ্ড দরজার উপর করাঘাত করল মাসুদ রানা।

উইলকক্স আইস স্টেশনের চারকোনা ভিত্তির মাঝে দরজা। ওখানে যেতে হলে সরু এক র‍্যাম্প বেয়ে আট ফুট নামতে হয়।

আবারও করাঘাত করল রানা। মূল ভিত্তির প্যারাপেটে আছে ও, উপর থেকে দরজার উপর টোকা দিচ্ছে।

দশ গজ পিছনে, র‍্যাম্পের মুখে দুই পা ছড়িয়ে উপুড় হয়ে শুয়েছে গানারি সার্জেন্ট পল সিংগার, ম্যাকমার্ডো থেকে রওনা হওয়ার আগে নিজেকে সার্জেন্ট ভাইপার বলে পরিচয় দিয়েছে। এখন তার হাতে এম-সিক্সটিন ই অ্যাসল্ট রাইফেল, তাক করেছে বদ্ধ দরজার উপর।

কয়েক মুহূর্ত পর কর্কশ কট-কট আওয়াজ তুলল কাঠের দরজা, শ্বাস আটকে ফেলল রানা। তুষারের মেঝেতে এসে পড়ল সরু রুপালি আলো। ধীরে ধীরে খুলে যাচ্ছে দরজা।

রানার নীচে র‍্যাম্পে এসে দাঁড়াল এক লোক। পরনে তার কমপক্ষে সাত পরত পোশাক। হাতে কোনও অস্ত্র নেই।

হঠাৎ সতর্ক হয়ে উঠল লোকটা, বোধহয় সামনের র‍্যাম্পে সার্জেন্ট ভাইপারকে শুয়ে থাকতে দেখেছে। তার নাকের উপর তাক করা হয়েছে এম-১৬ ই অ্যাসল্ট রাইফেল।

'এক পা নড়বেন না,' লোকটার পিছন থেকে বলল রানা। 'আমরা বাংলাদেশ আর্মির সদস্য, সঙ্গে ইউনাইটেড স্টেট্সের মেরিন।'

জমাট বরফের মূর্তি হয়ে গেল লোকটা।

রানার ইয়ারপিসে এক নারী কণ্ঠ বলল, 'দুই নম্বর ইউনিট, হাজির। সব সিকিউর করা হয়েছে।'

'তিন নম্বর ইউনিট, সব সিকিউর।'

'ঠিক আছে, আমরা সদর-দরজায় পৌঁছে গেছি।' বরফের শেলফ থেকে লোকটার পাশে নেমে এল রানা, দ্রুত হাতে সার্চ করল।

র‍্যাম্প বেয়ে নামল গানারি সার্জেন্ট, হাতের রাইফেল তাক করেছে দরজার উপর।

বরফের মূর্তিকে বলল রানা, 'আপনি আমেরিকান? নাম কী?'

'নন, জে সুই ফ্রাঁসোয়া,' আড়ষ্ট স্বরে বলল সে। এবার ইংরেজিতে জানাল, 'আমার নাম ম্যাথিউ ফ্যেনুয়্যা।'

চার

অ্যান্টার্কটিকা মহাদেশকে বিশ্বের শেষ নিরপেক্ষ এলাকা মনে করেন বহু অ্যাকাডেমিক পর্যবেক্ষক। এই মহাদেশে প্রথাগত কোনও পবিত্র-ভূমি নেই যে সেজন্য ধর্ম-যুদ্ধ হবে, এখানে কোনও সীমানা নিয়ে লড়তে হয় না। সবার কাছে চাঁদের ভূমির মত এই সুদূর মহাদেশ, বিশাল-বিরান প্রান্তরে সবাই মিলেমিশে বাস করতে পারবে। অবশ্য, যদি এই চরম পরিবেশে টিকে থাকতে পারে!

উনিশ শ' একষট্টি সালের অ্যান্টার্কটিকা চুক্তি দেখলে মনে হতে পারে, বিশাল এক পিঠা ভাগ করা হয়েছে। এক অংশ করে পেয়েছে প্রতিটি পক্ষ। এর ভিতর চিলি, আর্জেণ্টিনা ও ব্রিটেন মিলে ভোগ করবে একই এলাকা। অন্যরাও বিশাল এলাকা পেয়েছে। অস্ট্রেলিয়া পেয়েছে একাই অ্যান্টার্কটিকার চার ভাগের এক ভাগ জমি। মহাদেশের এক অংশ অ্যামুণ্ডসেন সাগর ও বায়ার্ড ল্যাণ্ড, এসব এলাকার কর্তৃত্ব কারও হাতেই নেই।

সাধারণ বুদ্ধি থেকে মনে হতে পারে: এই মহাদেশ আসলে সত্যিকারের আন্তর্জাতিক এলাকা। কিন্তু বাস্তবে বিষয়টি অত সহজ নয়। অনেকে বলবেন: অ্যান্টার্কটিকায় সবার রাজনৈতিক সম অধিকার আছে। কিন্তু তাঁরা কথা দিয়ে যতই উড়িয়ে দিতে চান, বাস্তব হচ্ছে: অ্যান্টার্কটিকার জমি নিয়ে প্রচণ্ড বিরোধ রয়েছে আর্জেন্টিনা ও গ্রেট ব্রিটেনের ভিতর। শক্তিশালী বেশ কয়েকটি দেশ মেনেও নেয়নি ঊনিশ শ' পঁচাশি সালের ইউএন রেযোলিউশন, তারা কখনও মানবে না অ্যান্টার্কটিকার গোটা এলাকা হওয়া উচিত সমস্ত মানব-সভ্যতার জন্য মুক্ত। চুক্তিবদ্ধ দেশগুলো বেশ কিছু বিষয়ে একদম চুপ থেকেছে। ঊনিশ শ' পঁচানব্বুই সালে গ্রিনপিসের রিপোর্টে বলা হয়েছে: ফ্রেঞ্চ সরকার ভিক্টোরিয়া ল্যাণ্ডের উপকূলে গোপনে নিউক্লিয়ার বোমার পরীক্ষা চালিয়েছে। বড়রা কেউ এ নিয়ে কোনও উচ্চবাচ্য করেনি। আসল কথা হচ্ছে: সাধারণ সব দেশকে শক্তিশালী সব দেশের আঙুল শাসানি মেনেই চলতে হবে।

তার চেয়ে বড় কথা: সীমান্ত-বিহীন এই এলাকায় শত্রু হামলা হলে কীভাবে তা ঠেকানো হবে, সে বিষয়ে কোনও আইন বা নীতিও প্রণয়ন করা হয়নি।

হাজার মাইল দূরে একেকটা রিসার্চ স্টেশন, কিন্তু সেসব এলাকায় মাঝে মাঝেই আবিষ্কার হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ, দুষ্প্রাপ্য ও মূল্যবান বস্তু— যেমন ইউরেনিয়াম, প্লুটোনিয়াম, সোনা ইত্যাদি। এমনও তো হতে পারে, ভিন কোনও দেশ বাধ্য হয়ে কাঁচা-রসদ বা মূল্যবান কিছুর খোঁজ পেলে দখল করতে সেনাবাহিনী পাঠাবে। হয়তো সে জিনিস সম্বন্ধে সাধারণ মানুষ এখনও জানে না।

আগে কখনও দেশগুলোর ভিতর এমন ধরনের লড়াই শুরু হয়নি অ্যান্টার্কটিকা মহাদেশে।

কিন্তু প্রথমবার বলে একটা কথা আছে।

উইলকক্স আইস স্টেশনের ভিতর ফ্রেঞ্চম্যান ম্যাথিউ ফ্যেনুয়্যার পাশে হাঁটতে গিয়ে এই কথাগুলোই ভাবছে মাসুদ রানা।

ম্যাকমার্ডোতে পৌঁছে রেকর্ড করা রাফায়লা ম্যাকানটায়ারের ডিসট্রেস সিগনাল শুনেছে ও। মহিলা জানিয়েছে, উইলকক্স আইস স্টেশনের নীচে চাপা পড়ে আছে একটা স্পেসক্রাফট। এখন সত্যিই যদি ওই স্টেশনের বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করে থাকেন এক্সট্রা-টেরেস্ট্রিয়াল স্পেসশিপ, সন্দেহ নেই অন্য দেশও ওই জিনিস দখল করতে আগ্রহী হয়ে উঠবে। কিন্তু তারা আমেরিকান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে স্ট্রাইক টিম পাঠাতে সাহস পাবে কি না, সেটা সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়।

'চিফ আমাকে সব ঘুরে দেখতে বলেছেন,' মনে মনে বলল রানা। এখনও খচ্-খচ্ করছে ওর মন। আমেরিকান রিসার্চ স্টেশনের দরজায় ফ্রেঞ্চ লোক দেখে কু ডাকতে শুরু করেছে মন। বরফের টানেলের ভিতর হেঁটে চলেছে এখন। এক পা পিছনে আসছে ম্যাথিউ ফ্যেনুয়্যা। আগের চেয়ে একটু বেশি শক্ত করে অটোমেটিক পিস্তলের বাঁট ধরল রানা।

আঁধার টানেল ফুরিয়ে এল, সামনে আলোকিত ফাঁকা এক জায়গায় পৌঁছে গেল ওরা। দাঁড়িয়ে পড়ল রানা, পায়ের নীচে সরু, কালো, ধাতব ক্যাটওয়াক। চোখ ফেলল চারপাশে। জায়গাটা মস্ত এক ড্রামের মত। নীচে ফাঁকা শূন্যতা।

মাটির নীচে, থুক্কু, বরফের নীচে এটা বিশাল এক ব্যারেল, মনে মনে বলল রানা। ব্যারেলের চারদিকে গেছে কালো রঙের সরু সব ক্যাটওয়াক। মাঝে বিশাল শাফট। ওপাশে বোধহয় সায়েন্টিস্টদের ল্যাব ও কোয়ার্টার। এই ব্যারেলের অনেক নীচে গোলাকার পানির প্রকাণ্ড এক নীল পুল। তার মাঝখানে স্টেশনের

ডাইভিং বেল ভাসছে।

'এই পথে আসুন,' হাতের ইশারা করে ডানদিক দেখাল ফ্যেনুয়্যা। 'সবাই ডাইনিংরুমে।'

ফ্রেঞ্চ লোকটাকে এক ফুট পিছনে নিয়ে বিশ কদম যাওয়ার পর আলোকিত ঘরে পৌঁছে গেল রানা। ওর মনে হলো প্লে গ্রুপের ক্লাসরুমে ঢুকে পড়েছে। ও এমন এক আগন্তুক, যাকে দেখে ভয় পেতে পারে বাচ্চারা।

গোলাকার এক টেবিল ঘিরে বসা পাঁচজন পুরুষ ও নারী। পুরুষদের গালে খোঁচা-খোঁচা দাড়ি, ময়লা হয়ে গেছে মহিলার পোশাক। সবাইকে হতক্লান্ত মনে হলো। রানা দরজা দিয়ে ঢুকতেই ওর দিকে চাইল বিষণ্ন চোখগুলো।

এরা কেউ বাঙালি নয়, বুঝল রানা। বাঙালি বিজ্ঞানীদের বোধহয় আগেই হোভারক্রাফট করে সরিয়ে নেয়া হয়েছে।

ঘরে আরও দু'জন লোক, টেবিলের পিছনে। এরা আলাদা, পরনে নতুন পোশাক, চেহারায় কোনও ক্লান্তি নেই। বোধহয় ম্যাথিউ ফ্যেনুয়্যার সঙ্গে এসেছে। ডানদিকের লোকটার হাতে ধোঁয়া ওঠা কফি, সুপ বা চায়ের ট্রে। টেবিল ঘুরে এগুতে শুরু করেছিল, কিন্তু রানা ঘরে ঢুকতেই থমকে দাঁড়িয়েছে সে।

ডিসট্রেস সিগনাল পেয়ে এসেছে ডি'খ-ঈলেখের ফ্রেঞ্চ বিজ্ঞানীরা, ভাবল রানা। অবশ্য, তা না-ও হতে পারে।

চুপ সবাই। চোখ রানার উপর। ওকে ভিন-গ্রহের মানুষ মনে হচ্ছে তাদের কাছে। হেলমেট, বডি আর্মার, তুষারের ফেটিগ, কাঁধে এমপি-৫ মেশিন পিস্তল, হাতে .৪৪ অটোমেটিক পিস্তল।

রানা ও ফ্যেনুয়্যার পর ঘরে ঢুকেছে সার্জেন্ট পল সিংগার। এবার তার উপর স্থির হলো সবার চোখ। অন্য গ্রহের প্রাণী আরেকটা বেড়েছে। হেলমেটের ভাইযারের কারণে রানা ও

ভাইপারকে মনে হচ্ছে যেন দুই যমজ ভাই। কিন্তু একজনের চামড়া বাদামি, অন্যজনের ত্বক ফকফকে সাদা।

'আপনাদের কোনও ভয় নেই,' নরম সুরে বলল ম্যাথিউ ফেনয়্যা। 'এঁরা আমেরিকান মেরিন, সঙ্গে বাংলাদেশ আর্মির ইউনিট। এঁরা আপনাদেরকে সরিয়ে নেবেন।'

ফোঁস করে দম ফেলল মহিলা। 'ওহ্, যিশু,' অস্পষ্ট সুরে বলল। কাঁদতে শুরু করেছে। 'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ!'

আমেরিকান উচ্চারণ, খেয়াল করেছে রানা। চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়াল মহিলা, ওর দিকে এগিয়ে এল। গাল বেয়ে দরদর করে গড়াচ্ছে অশ্রু। ভেজা স্বরে বলল, 'জানতাম, আপনারা ঠিকই আসবেন।'

রানার শোল্ডারপ্লেট আঁকড়ে ধরল মহিলা, ভিনদেশি সৈনিকের বুকে মাথা রেখে ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করেছে। কোনও সান্ত্বনা দিতে গেল না রানা। মহিলা থেকে একটু দূরে রেখেছে পিস্তল। প্রয়োজন পড়লে দেরি না করে ব্যবহার করবে।

'ঠিক আছে, ম্যাম,' নিচু স্বরে বলল রানা। তাকে পথ দেখিয়ে কাছের এক সিটের পাশে চলে গেল, হাতের ইশারা করল বসতে। 'চিন্তা করবেন না, ম্যাম। এখান থেকে আপনাদেরকে সরিয়ে নেয়া হবে।'

মহিলা চেয়ারে বসবার পর সবাইকে দেখে নিল রানা। 'লেডিজ অ্যাণ্ড জেন্টলমেন, আমরা ক'জন বাংলাদেশ থেকে এসেছি, সঙ্গে ইউনাইটেড স্টেটসের মেরিন কর্পসের সাত নম্বর ইউনিটের কয়েকজন।' হাতের ইশারায় সার্জেন্টকে দেখাল রানা। 'ও ইউএস মেরিন কর্পস্-এর গানারি সার্জেন্ট পল সিংগার। আমি বাংলাদেশের, মেজর মাসুদ রানা। আমরা ডিসট্রেস সিগনাল পেয়ে এসেছি। আপনাদেরকে এখান থেকে সরিয়ে নেব। তার আগে সিকিউর করা হবে এই স্টেশন। আমাদের কাজ আপনাদেরকে

নিরাপদ রাখা, এবং ম্যাকমার্ডোয় পৌঁছে দেয়া।'

টেবিলের ওপাশে স্বস্তির বড় শ্বাস ফেলল এক লোক।

'আশা করি কোনও ভুল ধারণা করবেন না,' বলল রানা, 'আমাদের সঙ্গী মেরিন সৈনিকরা রিকনিস্যান্স ইউনিট, তারা আপনাদেরকে এখান থেকে সরিয়ে নেবে না। তাদের কাজ স্টেশন পাহারা দেয়া। এদিকে বাংলাদেশ আর্মির দায়িত্ব আপনাদেরকে নিরাপদে ম্যাকমার্ডোয় পৌঁছে দেয়া। ঝড় কমে এলেই এ কাজে হাত দেব আমরা। অবশ্য, ধারণা করছি তার আগেই পুরো ইকুইপড় এক্সট্র্যাকশন টিম পৌঁছে যাবে।'

ম্যাথিউ ফ্যেনুয়্যা এবং টেবিলের পিছনে দাঁড়ানো দুই লোকের দিকে চাইল রানা। 'আপনারা বিজ্ঞানী, এসেছেন ডি'খ-ঈলেখ থেকে। ...ভুল ধারণা করেছি?'

ট্রে হাতে লোকটা মস্ত ঢোক গিলল। বিস্ফারিত হয়ে উঠেছে দুই চোখ।

'না, ঠিকই বলেছেন,' বলল ফ্যেনুয়্যা। 'আমরা রেডিয়ো মেসেজ পেয়ে যত দ্রুত সম্ভব এখানে এসেছি। এঁদের সাহায্য করতে।'

এক নারী-কণ্ঠ বলে উঠল রানার ইয়ারপিসে, 'ইউনিট টু। চারপাশ ঘুরে দেখেছি, সব ঠিক আছে, স্যর।'

'ইউনিট থ্রি। আমরা তিনটা... না, চারটে কণ্ট্যাক্ট পেয়েছি ড্রিলিং রুমে। আমরা এখন তাদের নিয়ে উঠে আসছি।'

ফ্যেনুয়্যার দিকে চাইল রানা। 'আপনাদের সবার নাম?'

'আমি প্রফেসর ম্যাথিউ ফ্যেনুয়্যা,' বলল ফ্রেঞ্চম্যান। 'ইনি গ্যাসোঁয়া ভিঁভাদিয়েখ, আর ট্রে হাতে উনি ডক্টর স্যাঁ ডেনি পেঁয়েযি।'

এদের নাম মিলে গেছে। ম্যাকমার্ডো থেকে দ্য মার্ভেল অভ গ্রিসে ফ্রেঞ্চ বিজ্ঞানীদের নামের লিস্ট পাঠানো হয়েছে, তার সঙ্গে

মিলছে সব। সন্দেহ নেই, এঁরা ফ্যেনুয়্যা, ভিঁভাদিয়েখ এবং পেঁয়েযি, এসেছেন ডি'খ-ঈলেখ থেকেই।

দরজার উপর টোকা পড়তেই ঘুরে চাইল রানা।

খোলা দরজার উপর এসে দাঁড়িয়েছে সার্জেন্ট জনি ওয়াকার। গাঁট্টাগোট্টা লোক সে, বয়স ছিচল্লিশ, মেরিন দলে সবচেয়ে বয়স্ক। বেশিরভাগ সময় কুঁচকে রাখে নাক, দেখায় কুকুরের মত। বহুবছরের অভিজ্ঞতার ছাপ চেহারায়। তার দশ গজ পিছনে তার পার্টনার কর্পোরাল টনি কেলগ। স্বাভাবিকের চেয়ে দীর্ঘ সে, চিকন-চাকন, কুচকুচে কালো চেহারা, বয়স মাত্র একুশ বছর।

দুই মেরিনের মাঝে তাদের খাটুনির ফসল: এক রূপবতী মহিলা, এক লোক, এক কিশোরী আর একটা সিল মাছ— অবশ্য 'মাছ' বলা হলেও আসলে এরা তিমির মতই স্তন্যপায়ী জন্তু, ম্যাম্যাল।

পাঁচ

'ওঁরা চারঘণ্টা আগে এসেছেন,' বলল নিনা ভিসার।

এ-ডেকের ক্যাটওয়াকে দাঁড়িয়েছে নিনা ভিসার ও রানা, এখান থেকে আইস স্টেশনের মূল অংশ চোখে পড়ছে।

নিনা এরই ভিতর রানাকে জানিয়েছে, উইলকক্স আইস স্টেশনটা বরফের শেলফের ভিতর খাড়া করে গাঁথা বিশাল একটা ব্যারেলের মত। এই ফ্যাসিলিটি পুরো পাঁচতলা। একেবারে নীচতলা সাগর-সমতলে।

সিলিণ্ডারের প্রতি তলায় রয়েছে কিছু ধাতব ক্যাটওয়াক; দু'পাশের দেয়ালে খাড়া, সরু রাং ল্যাডার; ওগুলো দিয়েই ওঠা-নামা করতে হয়। এই ফ্যাসিলিটি ফাঁকা ফায়ার এস্কেপের মতই। চারপাশে বরফের দালান। প্রতিটি তলায় ক্যাটওয়াক মিশেছে চারটে সমতল মেঝের টানেলে। মাঝের মস্ত শাফট ঘিরে এসব টানেল। কমপাসের চার কাঁটার মতই উত্তর-দক্ষিণ-পুব ও পশ্চিমে গেছে।

একেককটি লেভেলকে একতলা ধরে নেয়া হয়েছে। 'এ' থেকে শুরু করে 'ই' লেভেল নাম দেয়া হয়েছে। ফ্যাসিলিটির সবচেয়ে উপরে এ-ডেক। আর ই-ডেক একদম নীচে, ওখানে রয়েছে ধাতব একটি প্ল্যাটফর্ম। তার ভিতর সাগরের পানির মস্ত পুল। নিনা জানিয়েছে, ব্যারেলের মাঝে সি-ডেক, ওখানে রিট্র্যাক্টেবল একটা সেতু বাড়িয়ে দেয়া যায় স্টেশনের শাফটের উপর।

'এরা ক'জন এসেছে?' জানতে চাইল রানা।

'প্রথমে তিনজন, তারপর আরও দু'জন,' বলল নিনা। 'আমাদের সঙ্গে রয়ে গেছে চারজন। শেষজন আমেরিকান ও বাঙালি বিজ্ঞানীদেরকে নিয়ে হোভারক্রাফটে করে ডি'খ-ঈলেখের দিকে রওনা হয়েছে।'

'আপনি এদের চেনেন?'

'স্যাঁ ডেনি পেঁয়েযি ও ম্যাথিউ ফ্যেনুয়্যাকে চিনি,' বলল নিনা। 'আমার ধারণা, ভীষণ ভয় পেয়ে প্রস্রাব করে ফেলেছে পেঁয়েযি, আপনারা যেভাবে অস্ত্র নিয়ে এসে ঢুকলেন! ...আর চতুর্থ লোকটাকেও চিনি, তার নাম দু লা বোয়াবার্থেলিউ।'

সার্জেন্ট জনি ওয়াকার একটু আগে নিনা ভিসারকে নিয়ে ডাইনিংরুমে ঢুকবার দু' মিনিটের ভিতর রানা বুঝে গেছে, কিছু জানতে চাইলে এই মহিলার কাছেই প্রশ্ন করতে হবে। ম্যাকমার্ডো

থেকে রওনা হওয়ার আগে ওকে বলা হয়েছে, গত এক সপ্তাহের পরিস্থিতি কেমন ছিল তা জেনে নিলে ওর সুবিধে হবে।

অন্যরা ক্লান্ত এবং ভীত, কিন্তু নিনা ভিসার শক্ত রয়েছে। মনে হচ্ছে সবার দায়িত্বে আছে সে-ই। ওয়াকার ও কেলগ রানাকে বলেছে, ফ্যাসিলিটি সিকিউর করতে গিয়ে ই-ডেকে মহিলাকে পেয়েছে। আধহাত কালো দাড়িওয়ালা এক ফ্রেঞ্চ বিজ্ঞানীকে ড্রিল রুম ঘুরিয়ে দেখাচ্ছিল সে।

স্টেশনের বিশাল শাফটের দিকে চেয়ে আছে নিনা ভিসার, আপাতত গভীর চিন্তার ভিতর ডুবে গেছে। তার দিকে চাইল রানা। নিনা ভিসারের চেহারাটা খুবই আর্কষণীয়, দেখলে মনে হয় না বয়স পঁচিশের বেশি। গাঢ় বাদামি চোখ, কাঁধে ফুলে ওঠা কালো চুলের মেঘ। একটু উঁচু চোয়াল, কিন্তু বেমানান লাগে না। ঠোঁট দুটো মায়াবী কবিতার মত। মহিলার কণ্ঠে চকচক করছে রুপালি চেইনে ঝোলানো একটা লকেট।

হঠাৎ করেই ক্যাটওয়াকে এসে দাঁড়াল ছোট্ট একটি মেয়ে। রানা আঁচ করল, ওর বয়স বড়জোর দশ। খাটো করে ছাঁটা সোনালি চুল, বোতামের মত ছোট্ট নাক, চোখে ভারী কাঁচের চশমা। কমিকের চরিত্রের মত লাগছে মেয়েটিকে, ফুলে ওঠা বড় একটা পারকা পরেছে— উলের হুড ঝুলছে ওর মাথার পিছন অংশে।

মেয়েটির পিছনে ক্যাটওয়াকে এসে থেমেছে সিল মাছটি।

'ওর নাম কী?' নিনা ভিসারের কাছে জানতে চাইল রানা।

'ও আমার মেয়ে, মেরি,' মেয়েটির কাঁধ চাপড়ে দিল নিনা। 'মেরি, ইনি মেজর রানা।'

'হাই, মেরি,' বলল রানা।

কয়েক সেকেণ্ড চুপ রইল মেয়েটি, নিষ্পলক দেখছে রানাকে। চোখ আটকে গেছে মেরিনদের দেয়া আর্মার, হেলমেট ও অস্ত্রের উপর।

‘দেখতে দারুণ লাগছে আপনাকে,’ শেষ পর্যন্ত বলল।

‘তা-ই?’ মৃদু হাসল রানা।

‘চোখদুটো যেন কালো সাগরের মত গভীর।’

‘তোমার বয়স কত, মেরি?’

‘বারো, প্রায় তেরো হতে চলেছে।’

‘আচ্ছা?’

‘হ্যাঁ। বয়সের তুলনায় একটু খাটো আমি।’

‘আমিও,’ বলল রানা। পায়ের দিকে চাইল। থপথপ করে এগিয়ে এসেছে সিল, শুঁকে দেখছে ওর হাঁটু। ‘আর তোমার বন্ধু? ওর নাম কী?’

‘ও একটা মিষ্টি মেয়ে, নাম লিলি।’

উবু হলো রানা, হাত বাড়িয়ে দিতেই ওটা শুঁকল সিল মাছ। খুব বড় নয় লিলি, আকারে মাঝারি কুকুরের সমান। গলা থেকে ঝুলছে সুন্দর একটা লাল কলার।

‘লিলি কী ধরনের সিল?’ জানতে চাইল রানা। আলতো চাপড় দিল ওটার মাথায়।

‘আর্কটাসেফালাস্ গেযেলা,’ বলল মেরি। ‘আর্কটিকের ফার সিল।’

রানার হাতের চারপাশে মাথা দিয়ে গুঁতো দিতে শুরু করেছে লিলি, বুঝিয়ে দিচ্ছে ওর কানের পিছন দিকটা চুলকে দিতে হবে। নীরব নির্দেশ পালন করল রানা, তারপর হঠাৎ করেই কাত হয়ে পড়ে গেল সিল, চিত হয়ে বাগিয়ে ধরল পেট।

‘ও বলছে ওর পেট চুলকে দিতে হবে,’ হেসে ফেলল মেরি। ‘খুব খুশি হয়।’

ক্যাটওয়াকে শুয়ে অপেক্ষা করছে লিলি। ফ্লিপারগুলো উঁচু করে দেহ থেকে সরিয়ে রেখেছে। আরও নিচু হলো রানা, ব্যস্ত হাতে চুলকে দিল মসৃণ পেট।

'আপনি সারাজীবনের জন্যে একজন বন্ধু পেলেন,' মন্তব্য করল নিনা ভিসার। মনোযোগ দিয়ে রানাকে দেখছে সে।

'ভাল বন্ধু পেলে সব সময়েই ভাল লাগে,' সোজা হয়ে দাঁড়াল রানা।

'জানতাম না যারা যুদ্ধ করে, তারা বন্ধুত্বও করে,' হঠাৎ করেই বলল নিনা। অস্বস্তির ভিতর ফেলে দিয়েছে রানাকে।

এক মুহূর্ত পর বলল রানা, 'সবাই তো আর পাষণ্ড হয় না।'

'কিন্তু আপনারা এখানে এসেছেন একটা জিনিস নিতে।'

সুন্দরী মহিলার চোখে চোখ রাখল রানা। কয়েক সেকেণ্ড পর চোখ সরিয়ে নিল নিনা। রানা বুঝে গেল, বোকা নয় মহিলা।

'আগের প্রসঙ্গে ফেরা যাক,' বলল ও। 'আপনি ওঁদের দু'জনকে ভাল করেই চেনেন। আর তৃতীয়জনের সঙ্গেও পরিচয় হয়েছে, ঠিক?'

'হ্যাঁ।'

'আর চতুর্থজন... গ্যাসোঁয়া ভিঁভাদিয়েখ?'

'তাঁর সঙ্গে আগে কখনও দেখা হয়নি।'

রানা জানতে চাইল, 'ওঁরা মোট ক'জনকে ডি'খ-ঈলেখ-এ নিয়ে গেছেন?'

'হোভারক্রাফটে বড়জোর ছয়জন আঁটে, কাজেই পাঁচজন বিজ্ঞানীকে নিয়েছেন।'

'আর নিজেদের চারজনকে এখানে রেখে গেছেন।'

'ঠিকই ধরেছেন।'

মহিলার দিকে চেয়ে আছে রানা। 'এবার কয়েকটা বিষয় পরিষ্কার করে নেয়া যাক। যেমন, বরফের নীচে আপনারা কী পেয়েছেন; বা রাশেদ হাবিব... স্টেশনে যে অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটেছে...' থেমে গেল রানা।

কী ইঙ্গিত করা হয়েছে, বুঝতে পেরেছে মহিলা। বাঙালি

মেজর চাইছে না, বাচ্চা মেয়ের সামনে খুন নিয়ে আলাপ হোক।

'হ্যাঁ, আলাপটা সেরে নেয়াই ভাল,' আড়ষ্ট মুখে বলল নিনা ভিসার।

উইলকক্স আইস স্টেশনের চারপাশে নজর বোলাল রানা। অনেক নীচে সুনীল পানির পুল। একতলা উপর থেকে শুরু হয়েছে ক্যাটওয়াক। তারপর টানেলের ওপাশে বরফের দালান। সেসব অবশ্য দেখা যাচ্ছে না। রানার চোখ ভাসা ভাসা ভাবে সবই দেখছে, কিন্তু মন অন্যখানে। অন্তর বলছে, এখানে বড় ধরনের কোনও গোলমাল চলছে। কিন্তু আঙুল তুলে নির্দিষ্ট কিছু দেখাতে পারবে না।

কয়েক সেকেণ্ড পর জানতে চাইল রানা, 'আমি যদি ভুল বলি, আমাকে শুধরে দেবেন। এই স্টেশন তো বরফের শেলফ খুঁড়ে তৈরি? প্রতিটি দেয়াল বরফের, সেক্ষেত্রে বরফ গলছে না কেন? আপনারা নানান মেশিনারি ব্যবহার করছেন, এতে প্রচুর তাপ হওয়ার কথা।'

আগেও অ্যাণ্টার্কটিকায় এশিয়ানদের দু'একটা স্টেশনে বিসিআইয়ের কাজে এসেছে রানা। শেষবার মস্ত বিপদে পড়েছিল, সেবার ঠেকাতে হয় শ্বেতাঙ্গদের ভয়ঙ্কর চক্রান্ত এবং হামলা।

এখন নিনা ভিসারের কাছ থেকে এই আমেরিকান স্টেশনের বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য চাইছে ও। কখন-কী-কোন্ তথ্যের প্রয়োজন পড়বে, বলা যায় না।

'আপনি খুবই ভাল প্রশ্ন করেছেন,' বলল নিনা ভিসার। 'আমরা আমেরিকানরা যখন এখানে এলাম, দেখা গেল কোর ড্রিলিং মেশিন থেকে প্রচণ্ড তাপ তৈরি হচ্ছে। ফলে বরফের দেয়াল গলতে শুরু করল। তখন সি-ডেকে কুলিং সিস্টেম বসানো হলো। তারপর থেকে একটা থার্মোস্ট্যাট সারাক্ষণ স্টেশনের তাপমাত্রা মাইনাস এক ডিগ্রিতে রাখে। মজার ব্যাপার, উপরে হয়তো

হিমাঙ্কের তিরিশ ডিগ্রি নীচে আবহাওয়া, কাজেই কুলিং সিস্টেম ভিতরের পরিবেশ উষ্ণ করে। এতে আমরা সবাই খুশি।'

'খুশি হওয়ারই কথা,' চারদিক দেখছে রানা। আবার ডাইনিংরুমের দরজার উপর চোখ পড়ল ওর। ম্যাথিউ ফ্যেনুয়্যা এবং অন্য তিন ফ্রেঞ্চ ভিতরে, উইলকক্স আইস স্টেশনের বাসিন্দাদের সঙ্গে একই টেবিলে বসেছে। ক্যাটওয়াক থেকে তাদেরকে চোখে পড়ছে।

'আপনি আমাদের সবাইকে ফিরিয়ে নিতে এসেছেন?' হঠাৎ রানার পিছন থেকে জানতে চাইল মেরি।

চিন্তিত চোখে চার ফ্রেঞ্চকে দেখছে রানা, কয়েক সেকেণ্ড পর মেয়েটির দিকে ফিরল। 'এখনই নয়, মেরি। তার আগে কিছু কাজ শেষ করতে হবে।'

ছয়

চওড়া বরফের টানেলের ভিতর হেঁটে চলেছে নিনা ভিসার ও রানা। ওদের পিছনে কর্পোরাল কেলগ ও সার্জেন্ট ওয়াকার।

ওরা চারজন রয়েছে বি-ডেকে, প্রধান লিভিং এরিয়ায়। বড় একটা মোড় ঘুরতেই বরফের দেয়ালের ভিতর দু'পাশে শুরু হয়েছে দরজা, ওপাশে রয়েছে বেডরুম, কমনরুম, নানা ল্যাবোরেটরি ও স্টাডিরুম। একটা দরজা মনোযোগ কেড়ে নিল রানার। ওটার উপর বায়োহ্যাযার্ড সাইন আঁকা। ত্রিকোণ প্লেটে লেখা:

বায়োটক্সিন ল্যাবোরেটরি।

'ম্যাকমার্ডো পৌঁছবার পর জানতে পারলাম, বাঙালি এক বিজ্ঞানী অন্য আরেক বিজ্ঞানীকে খুন করেছেন,' বলল রানা। 'তাঁর অভিযোগ ছিল, চুরি করা হচ্ছে তাঁর রিসার্চের তথ্য।'

রানার দিকে চাইল নিনা ভিসার। 'পাগলামি ছাড়া আর কী! তাঁর রিসার্চের তথ্য অন্য কেউ চুরি করবে কেন!'

টানেলের শেষে পৌঁছে গেছে সবাই, সামনে বরফের ভিতর বড় একটা দরজা। তার উপর পেরেক ঠুকে কাঠের তক্তা আড়াআড়ি ভাবে আটকে দেয়া হয়েছে।

'রাশেদ হাবিব,' বিড়বিড় করে বলল রানা, পরক্ষণে নিনার দিকে চাইল। 'উনিই না প্রথম স্পেসশিপ আবিষ্কার করেন?'

'ভুল শুনেছেন। ওটা প্রথম দেখতে পেয়েছিলেন জন প্রাইস। রাশেদ হাবিব খুন করেছেন চার্লস মুনকে। আসলে রিসার্চ পেপার নিয়ে দুজনের এমন কোনও বিবাদ হয়নি যে একেবারে খুনই করে ফেলতে হবে। নিশ্চয়ই এর ভিতর কোনও জটিলতা ছিল।'

রানা এবং ওর দল ম্যাকমার্ডো পৌঁছে উইলকক্স আইস স্টেশনের উপর সংক্ষিপ্ত ব্রিফিং পেয়েছে। তাতে মনে হয়েছে খুবই সাধারণ ফ্যাসিলিটি ওটা। ওখানে কাজ করেন কয়েক পেশার লোক। যেমন: সাগরের প্রাণী নিয়ে গবেষণা করছেন মেরিন বায়োলজিস্টরা; বরফের ভিতর আটকা পড়া ফসিল পরীক্ষা করছেন প্যালিয়োনটোলজিস্টরা; খনিজ সম্পদ খুঁজছেন জিয়োলজিস্টরা; বরফের ভিতর গভীর গর্ত খুঁড়ে হাজার বছরের কার্বন মনোক্সাইড ও অন্যান্য গ্যাস খুঁজছেন রাশেদ হাবিবের মত জিয়োফিযিসিস্টরা।

ক'দিন আগে উইলকক্স আইস স্টেশনে অত্যন্ত অস্বাভাবিক

একটা ঘটনা ঘটেছে। রাফায়লা ম্যাকানটায়ার ডিসট্রেস সিগনাল পাঠানোর দু' এক দিন আগে আরেকটি হাই-প্রায়োরিটি সিগনাল পাঠানো হয়েছে এই স্টেশন থেকেই। তাতে বলা হয়েছে, যত দ্রুত সম্ভব যেন এক স্কোয়াড মিলিটারি পুলিশ পাঠানো হয়।

ওই সিগনালের বক্তব্য অস্পষ্ট ছিল, কিন্তু আঁচ করা যায়, এক ঝঙালি বিজ্ঞানী খুন করে ফেলেছেন তাঁর এক কলিগকে।

তক্তা দিয়ে আটকানো দরজা দেখছে রানা, একবার চারপাশের টানেল দেখে নিল। ভাবছে, আপাতত জানবার উপায় নেই আসলে এখানে কী ঘটেছে। মেজর জেনারেল (অব.) রাহাত খানের কথা মনে পড়ল। ওকে আবছা কিছু নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। ওর বুঝতে দেরি হয়নি, উনি আসলে কী চান।

মেরিন দলের সঙ্গে উইলকক্স আইস স্টেশনে পৌঁছবে, বাঙালি বিজ্ঞানী ও নুমার রিসার্চারদের পৌঁছে দেবে ম্যাকমার্ডো স্টেশনে। কিন্তু তার আগে, সুযোগ হলে দেখবে ওই স্টেশনে ওটা সত্যিই স্পেসশিপ কি না। যদি পারো, ওটা সম্বন্ধে তথ্য জোগাড় করবে।

এদিকে ম্যাকমার্ডোর ব্রিফিং রুমে আমেরিকার আণ্ডার-সেক্রেটারি অভ ডিফেন্স স্পিকারফোনে বলেছেন: 'সন্দেহ নেই ওই ডিসট্রেস সিগনাল অন্য দেশের কর্তৃপক্ষও শুনতে পেয়েছে। মিস্টার রানা, সত্যি যদি ওখানে এক্সট্রা-টেরেস্ট্রিয়াল ভেহিকেল থাকে, আপনাদের উপর যে-কোনও রকম হামলা আসতে পারে। আমেরিকান সরকার চাইছে না এমন নাজুক পরিস্থিতি হোক। এবং সেজন্য মেরিনদের পাঠানো হচ্ছে। অবশ্য, এই মুহূর্তে আমাদের সেনাবাহিনীর বড় কোনও দল ম্যাকমার্ডোয় নেই। আর সে-কারণেই অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনের মাধ্যমে আপনার কাছে সাহায্য চেয়েছি আমরা। মেরিন সৈনিকরা ওই স্পেসশিপের নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে। ...এখন আমরা চাই, আপনি তাদের নেতা হিসাবে থাকুন। শুনেছি আপনার সঙ্গে বাংলাদেশ আর্মির কয়েকজন

অফিসার ও নন-কমিশণ্ড অফিসার রয়েছে। তাদেরকে পাশে পেলে আমরা খুবই খুশি হব। পরে আমাদের সেনাবাহিনী ওখানে পৌঁছে গেলে আপনারা বিজ্ঞানীদের ম্যাকমার্ডোয় পৌঁছে দেবেন। মিস্টার রানা, দয়া করে মনে রাখবেন, যে ভাবেই হোক, ওই স্পেসশিপ আমাদের হাতে আসতে হবে। অন্য কারও হাতে ওই জিনিস পড়লে গোটা পৃথিবী জুড়ে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হতে পারে। আবারও বলছি, ওই স্পেসশিপের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। অন্য সব বিষয় এখন গৌণ হয়ে উঠেছে।'

ভদ্রলোক তাঁর বক্তব্যে, বাঙালি বা আমেরিকান বিজ্ঞানীদের নিরাপত্তা বা তাদের ভালমন্দের বিষয় একটিবারও উল্লেখ করেননি। আবার একটু আগে নিনা ভিসার একই কথা বলেছে: সরকার আমাদের নিরাপত্তা নিয়ে ভাবছে না, তাদের প্রথম এবং শেষ কথা, বিজ্ঞানীরা মরলে মরুক, স্পেসশিপ হাতে পেতে হবে।

রানা স্থির করেছে, পাতাল বরফের টানেলে স্পেসশিপ দেখতে এখনই ডুবুরি পাঠাবে না। ওর মন বলছে, এই স্টেশনে বড় ধরনের সমস্যা চলছে। তার উপর পরিস্থিতি একদম বদলে গেছে ফ্রেঞ্চ লোকগুলো আসবার পর। এখন নিজের ইউনিট ও মেরিনদের ছাড়া কারও উপর বিশ্বাস রাখা মস্ত ভুল হবে।

দরজার দিক থেকে চোখ সরাল না রানা, নিনা ভিসারকে বলল, 'সংক্ষেপে বলুন কী ঘটেছে।'

'রাশেদ হাবিব স্ট্যানফোর্ডের জিয়োফিযিসিস্ট, দ্বিতীয়বার পিএইচ.ডি.-র জন্য কাজ করছিল। তার রিসার্চ ছিল আইস কোরের উপর। তার সুপারভাইযার ছিলেন ডক্টর চার্লস মুন। আইস কোরের বিষয়ে অদ্ভুত সব তথ্য পাচ্ছিল রাশেদ হাবিব। অন্য কেউ বরফের এত গভীরে গর্ত করতে পারেনি। সে পৌঁছে যায় এক কিলোমিটারের বেশি নীচে।'

আইস কোর বিষয়ে সামান্য ধারণা আছে রানার। সাধারণত বরফের শেলফে তিরিশ সেন্টিমিটার চওড়া গর্ত করা হয়, অনেক গভীর থেকে তুলে আনা হয় সিলিণ্ডারের মত কোর। সেই বরফের কোরের ভিতর বদ্ধ গ্যাসগুলো পরীক্ষা করা হয়। পাওয়া যায় হাজার বছর আগের বাতাস, বোঝা যায় সে আমলে কেমন ছিল পরিবেশ।

'তা যাই হোক,' বলল নিনা, 'সপ্তাহখানেক আগে দুর্দান্ত একটা আবিষ্কার করল রাশেদ হাবিব। উপরের দিকে উঠে আসা বরফ ভেদ করল তার ড্রিল। সেই বরফ ছিল প্রিহিস্টোরিক। কোনও এককালে, বড় কোনও ভূমিকম্পে ওই বরফ উঠে আসে নীচ থেকে। রাশেদ হাবিব কোরের পকেটে তিন শ' মিলিয়ন বছর আগের বাতাস পেয়ে গেল। যে-কোনও জিয়োফিযিসিস্টের জন্য এটা সারাজীবনের সবচেয়ে বড় অসামান্য সুযোগ। আগে কখনও কেউ ওই সময়ের পরিবেশ সম্পর্কে জানতে পারেনি। চিন্তা করুন, তখনও পৃথিবীতে ডাইনোসর আসেনি।' শ্রাগ করল নিনা ভিসার। 'কোনও অ্যাকাডেমিকের জন্য ওটা রং-ধনুর শেষ প্রান্তে সোনার কলস বলতে পারেন। খ্যাতি ছাড়াও শুধু লেকচার সার্কিটেই লক্ষ লক্ষ ডলার উপার্জন করতে পারবেন তিনি। ...তারপর দু'এক দিন পর তার ড্রিলিং ভেক্টর সামান্য বদলে নিল রাশেদ হাবিব— ভেক্টর বলতে বরফের ভিতর ড্রিলের অ্যাঙ্গেল বদল করা— এবং, কপাল কাকে বলে, পনেরো শ' ফুট নীচে পেয়ে গেল বরফের ভিতর চার শ' মিলিয়ন বছর আগের ধাতু।'

রানাকে এর গুরুত্ব বুঝতে দেয়ার জন্য একটু থামল নিনা ভিসার।

চুপ রইল রানা।

'এরপর আমরা ডাইভিং বেল নীচে পাঠালাম,' বলল নিনা।

'বরফের শেলফের ভিতর কিছু সনিক-রেসোন্যান্স টেস্ট করা হলো। আর ওখানেই একটা গুহার ভিতর আবিষ্কার করা হলো প্রাগৈতিহাসিক সেই ধাতু। আরও পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখা গেল, ওই গুহা থেকে একেবারে তিন হাজার ফুট নীচে নেমে গেছে এক বরফের সুড়ঙ্গ। তখন সাগরে নেমে ওই সুড়ঙ্গ দিয়ে ডুবুরিদের উপরে উঠতে বলা হলো। সেখানেই জন প্রাইস খুঁজে পেলেন ওই স্পেসশিপ। আর এর পর হারিয়ে গেল সব ক'জন ডুবুরি।'

রানা জানতে চাইল, 'এসবের সঙ্গে ডক্টর চার্লস মুন হত্যাকাণ্ডের কী সম্পর্ক?'

'মুন ছিলেন রাশেদ হাবিবের সুপারভাইযার,' বলল নিনা। 'সবসময় রাশেদ হাবিবের কাঁধের উপর দিয়ে অদ্ভুত সব আবিষ্কার দেখছিলেন তিনি। ক্রমে প্যারানয়ার ভিতর চলে যায় হাবিব। বলতে শুরু করে মুন তার রিসার্চ চুরি করছেন। তার আবিষ্কার নিয়ে গোপনে আর্টিকেল লিখছেন।

'আসলে রাশেদ হাবিবের ভয় পাওয়ারই কথা, বহির্বিশ্বে অনেক বেশি যোগাযোগ ছিল ডক্টর মুনের। জার্নালে লিখলে তাঁর কথাই বিশ্বাস করবে সবাই। এডিটররা তাঁকে ভাল করেই চিনতেন। একমাসের ভিতর তাঁর আর্টিকেল ছাপা হবে, কিন্তু হাবিব চাইলেও ছয় মাসের মধ্যে নিজের আর্টিকেল প্রকাশ করতে পারত না। এর পর, ধাতু আবিষ্কার হওয়ার পর হাবিব মনে করল, তার হীরার খনি চুরি করছেন মুন।'

'এ কারণে ডক্টর মুনকে খুন করে ফেললেন হাবিব?'

'হ্যাঁ। গত শুক্রবার রাতে। ডক্টর মুনের ঘরে গেল রাশেদ হাবিব, তারপর শুরু হলো চেঁচামেচি। আমরা সবাই শুনতে পেয়েছি সেই চিৎকার। ভীষণ খেপে গেল হাবিব। আগেও এমন করেছে, তাই আমরা বেশি গা করিনি। কিন্তু, এবার ডক্টর মুনকে

খুনই করে ফেলল সে।

'কীভাবে খুন করল?' দরজার উপর চোখ রানার।

'সে...' একপলক দ্বিধা করল নিনা ভিসার। 'ডক্টর মুনের ঘাড়ে হাইপোডারমিক নিডল গেঁথে দিল। ভিতরে ছিল বিষাক্ত ইণ্ডাস্ট্রিয়াল-স্ট্রেংথ ড্রেন-ক্লিনিং ফ্লুইড।'

'আচ্ছা।' দরজার দিকে ইশারা করল রানা। 'ঘরে আছেন উনি?'

'ওই ঘটনার পর নিজেই নিজেকে আটকে রেখেছে,' বলল নিনা। 'এক সপ্তাহের খাবার নিয়ে ঘরে ঢুকে বলেছে, আমরা যদি তাকে ধরতে চাই, সে আমাদেরকেও খুন করবে। ভীষণ ভয় পেয়েছি আমরা। পুরো পাগল হয়ে গেছে লোকটা। তারপর একরাতে... নীচের গুহায় ডুবুরি নামাবার আগের রাত ছিল সেটা... আমরা সবাই মিলে বাইরে থেকে তক্তা দিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলাম। দরজার দু'পাশে রানার লাগালেন জন প্রাইস, আর আমরা ঠিক জায়গায় ধরলাম আড়া। তারপর একটা রিভেট গান দিয়ে দরজা আটকে দিলেন প্রাইস।'

'ভদ্রলোক এখনও বেঁচে আছেন?' জানতে চাইল রানা।

'হ্যাঁ। তার নড়াচড়ার আওয়াজ পাবেন। এখন বোধহয় ঘুমিয়ে আছে। নইলে নানান আওয়াজ তৈরি করত।'

দরজার কিনারা দেখতে শুরু করল রানা। শক্ত ভাবেই দরজায় রিভেট লাগানো হয়েছে। 'আপনাদের বন্ধু পোক্ত কাজই করেছেন,' বলল রানা। ঘুরে দাঁড়াল। 'অবশ্য উনি ভিতরে থেকে থাকলে। আপাতত তাঁকে নিয়ে ভাবছি না। ...আপনারা তো নিশ্চিত ওই ঘর থেকে কোনও পথে বেরুনো যায় না?'

'এটাই একমাত্র দরজা।'

'অন্য কোনও পথে বেরুনো যায় না? যদি বরফের দেয়াল, মেঝে বা ছাত খুঁড়ে বের হন?'

'ইস্পাতের পাত দিয়ে মোড়া সিলিং এবং মেঝে, খুঁড়ে বেরুতে পারবে না। আর এই ঘর করিডোরের শেষমাথায়। পিছনে বা দু'পাশে কোনও ঘরও নেই। জমাট বরফ দিয়ে তৈরি দেয়াল। বেরুনোর কোনও উপায় নেই তার।'

'সেক্ষেত্রে আপাতত ওখানেই থাকুন,' বলল রানা, বরফের টানেলে ফিরতি পথ ধরল, 'আমাদের হাতে এখন অন্য কাজ আছে।'

'কী করবেন ভাবছেন?'

'প্রথমে জানতে হবে গুহার ভিতর ডুবুরিদের কী হয়েছে।'

সাত

ওয়াশিংটন ডি.সি.-র আকাশে ঘন কালো মেঘ জমেছে, থমথম করছে পরিবেশ। এঁকেবেঁকে ঝলসে উঠছে নীলচে বিদ্যুৎ। যে-কোনও সময়ে ঝমঝম করে নামবে বৃষ্টি। অথচ, মাত্র ঘণ্টা দুয়েক আগে নীল আকাশে ঝলমল করছিল সোনালী সূর্য।

বিলাসবহুল লাল কার্পেট মোড়া ক্যাপিটল বিল্ডিঙের এক প্রান্তে এইমাত্র মিটিং হল-এ বিরতি নিয়েছেন ডেলিগেটরা। সবার ফোল্ডার বন্ধ হয়ে গেছে। চেয়ার পিছনে ঠেলে উঠে দাঁড়িয়েছেন সবাই, কোটের পকেটে চলে গেছে রিডিং গ্লাস। বিরতি ঘোষণা হতেই যার যার বসের পাশে চলে গেছে এইডরা, হাতে সেলুলার ফোন, ফোল্ডার ও ফ্যাক্সের বার্তা।

'কী বুঝলে, এরিক?' নিজ এইডকে বললেন স্থায়ী ইউএস

রিপ্রেযেন্টেটিভ, জ্যাক মার্টিন। এইমাত্র নেগোশিয়েটিং রুম ত্যাগ করেছেন গোটা ডেলিগেশনের বারোজন ফ্রেঞ্চ। 'আজ এই নিয়ে চারবার বিরতি নিল ওরা।'

ফ্রেঞ্চ মিশনের নেতা মোটা এক লোক, নাম জ্যাঁ পিয়েরে কুই। তাঁর চাহনি দেখলে মনে হতে পারে, অন্যদেরকে অনেক নিচু শ্রেণীর মানুষ মনে করেন তিনি। এইমাত্র দলের সবাইকে নিয়ে বেরিয়ে গেছেন। আপনমনে আরেকবার মাথা নাড়লেন জ্যাক মার্টিন।

তিনি সারাটা জীবন ধরেই কূটনীতিক, বয়স চলছে ছাপ্পান্ন বছর, বেশ বেঁটে মানুষ; কখনও স্বীকার করবেন না, কিন্তু গত দু'বছরে একটু মোটাও হয়ে গেছেন। পূর্ণিমার চাঁদের মত গোল মুখ, ঘোড়ার ক্ষুরের আকৃতির ধূসর চুলগুলো খুলি কামড়ে আরও পিছাতে শুরু করেছে। হাড়ের ফ্রেমের চশমা ব্যবহার করেন, পুরু কাঁচের কারণে স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক বড় দেখায় নীল চোখদুটো।

উঠে দাঁড়ালেন তিনি, আড়মোড়া ভাঙলেন। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে চোখ রাখলেন বিশাল হলরুমে। ঘরের মাঝে প্রকাণ্ড গোলাকার টেবিল ঘিরে নির্দিষ্ট জায়গা ছেড়ে ষোলোটি আরামদায়ক, নরম চামড়া মোড়া চেয়ার।

এই সভার মূল এজেণ্ডা: নতুন করে নিজেদের ভিতর সব ধরনের বিরোধের নিষ্পত্তি করে নেবে মিত্রশক্তির দেশগুলো।

টিভির খবরে আন্তর্জাতিক মিত্রপক্ষীয় নেতারা হাতে-হাত মিলিয়ে যে হাসিখুশি ভাব দেখান, বেশির ভাগ সময়ই তা নকল হয়; প্রায়ই দেখা যায় বানোয়াট হাসি দিয়ে নিজেদের দুশ্চিন্তা লুকিয়ে রাখছেন। হয়তো দেখা গেল হোয়াইট হাউস থেকে বেরিয়ে এলেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ও অন্য দেশের প্রধানমন্ত্রী— দুই দেশের পতাকার পাশে ক্যামেরার সামনে

করমর্দন করলেন, কিন্তু বাস্তব হচ্ছেঃ কোনও চুক্তি সম্পাদন, প্রতিজ্ঞা ভাঙা, পরস্পরের উপর এসপিয়োনাজ, কূটনীতিকদের কামড়া-কামড়ি— এসবই গোপনে চলে মিটিংরুমে, ক্যামেরার আড়ালে। আজ সে-কাজেই ব্যস্ত ইউএস রিপ্রেযেণ্টেটিভ জ্যাক মার্টিন। কূটনীতিকদের হাসি ও করমর্দন আসলে জটিল এক প্রক্রিয়ার কেকের বড়জোর আইসিং। কূটনীতিকরা একে অপরের কাছ থেকে কী সুবিধা আদায় করবেন, সেটাই একমাত্র উদ্দেশ্য।

আন্তর্জাতিক মিত্রপক্ষীয় দেশ মানেই সত্যিকারের মিত্র দেশ নয়। এটা আসলে একে অপরকে ল্যাং মেরে পিছনে ফেলে এগিয়ে যাওয়ার প্রতিযোগিতা। বন্ধুত্ব যদি সুবিধা এনে দেয়, তো খুবই ভাল। সুবিধা যদি না পাওয়া যায়, সেক্ষেত্রে সাধারণ সম্পর্ক বজায় রাখাই যথেষ্ট। আন্তর্জাতিক বন্ধুত্ব মানেই বৈদেশিক সাহায্য, অন্য দেশের সামরিক ক্ষমতাকে মেনে নেয়া এবং ব্যবসায়িক সহায়তা পাওয়া। এতে প্রয়োজন পড়ে হাজার হাজার কোটি ডলার। এ বিষয়কে হালকা ভাবে উড়িয়ে দেয়া যায় না।

সে-কারণেই ওয়াশিংটন ডি.সি.-র গ্রীষ্মের এই মেঘলা দিনে ক্যাপিটল বিল্ডিঙে হাজির হয়েছেন জ্যাক মার্টিন। তিনি একজন নেগোশিয়েটার। তার চেয়েও বড় কথা: তিনি একজন দক্ষ কূটনীতিক। আজ তাঁর সমস্ত কূটনৈতিক দক্ষতা কাজে লাগছে।

মিত্রপক্ষীয় দেশ আমেরিকা ও ফ্রান্সের ভিতর আজকের বিশেষ এই সভা শুধু নিজ বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য নয়, তার চেয়েও জটিল কিছু বিষয় স্থির করবার জন্য।

একবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকের পর মিত্রপক্ষীয় দেশগুলো আগে কখনও এমন গুরুত্বপূর্ণ সভায় বসেনি।

আজ কূটনীতিক বা নেগোশিয়েটাররা বসেছেন দ্য নর্থ

আটলান্টিক ট্রিটি অর্গানাইযেশন বা ন্যাটোর জন্য নিজেদের দরদাম কষতে।

'এরিক, তুমি কি জানো গত চল্লিশ বছর ধরে ফ্রান্সের বৈদেশিক নীতি হচ্ছে পশ্চিমা বিশ্বে ইউনাইটেড স্টেটসের ক্ষমতা হ্রাস করা?' জানতে চাইলেন জ্যাক মার্টিন। বুঝে গেছেন ফ্রেঞ্চ ডেলিগেশন ফিরতে দেরি করবে।

তাঁর এইড এরিক হোমসের বয়স পঁচিশ বছর। ছেলেটি হারভার্ড থেকে ব্যাচেলার ডিগ্রি নিয়েছে আইনের উপর। কোনও জবাব দেয়ার আগে দ্বিধা করল সে। বুঝতে পারছে না কেন তাজা বোমার মত কথা বলছেন মার্টিন। সুইভেলিং চেয়ারে ঘুরে এরিকের দিকে চাইলেন কূটনীতিক। পুরু কাঁচের ওপাশ থেকে তরুণকে দেখছেন।

'না, স্যর, আমি এ বিষয়ে তেমন কিছুই জানি না,' বলল এরিক।

চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা দোলালেন মার্টিন। 'ওরা আমাদেরকে বুনো ষাঁড় মনে করে। আমরা যেন কোনও মানুষই নই, বিয়ার গিলতে থাকা লাল ঘাড়ওয়ালা বেবুন। তাদের মনের দুঃখ: দুর্ঘটনাবশত আমাদের হাতে এসে পড়েছে পৃথিবীর ইতিহাসের সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্র। আর সে কারণেই আমরা হয়ে উঠেছি পৃথিবীর হর্তাকর্তা। এ কারণে বড় কষ্ট ওদের মনে। ওরা তো এখন ন্যাটোর পূর্ণ সদস্য পদেও নেই। ওদের ধারণা, ইউএসএ শুধু অস্ত্রের জোরে ইউরোপের ঘাড়ে চেপে বসেছে। এটা ইউরোপিয়ান দেশগুলোর জন্য ভয়ঙ্কর অপমানজনক।'

হাসি চাপলেন মার্টিন। তাঁর মনে পড়েছে, উনিশ শ ছিষট্টি সালে ন্যাটোর সম্মিলিত সামরিক কমাণ্ড থেকে পদত্যাগ করে ফ্রান্স, তার মূল কারণ ছিল, তারা চায়নি ন্যাটোর অধীনে থাকুক তাদের নিউক্লিয়ার ওয়েপন্স। তারা ধরেই নেয়, যে-কোনও

সময়ে ওসব বোমা চলে যেতে পারে আমেরিকার হাতে। সে সময়ের ফ্রেঞ্চ প্রেসিডেন্ট চার্লস দ্য গল পরিষ্কারভাবে বলে দেন, 'ন্যাটো আসলে আমেরিকানদের একটা সংগঠন।' ফ্রান্স এখন ন্যাটোর নর্থ আটলান্টিক কাউন্সিলে সাধারণ পদ নিয়েছে, এবং সেটা করেছে সবার উপর চোখ রাখতেই।

এরিক বলল, 'স্যর, অনেকে ফ্রেঞ্চদের সঙ্গে একমত। তাঁরা অ্যাকাডেমিক ও ইকোনমিস্ট। তাঁরা বলেন ন্যাটো আসলেই আমেরিকানদের সংগঠন। আমরা ইউরোপের উপর নিজেদের অস্ত্রের ক্ষমতা দেখাচ্ছি।'

হাসলেন জ্যাক মার্টিন। তিনি জানেন, ভাল ছেলে এরিক, কলেজে লেখাপড়াও করেছে, কোনও মৌলবাদী নয়, কিন্তু কফির আসরে বসে ফিলোসফিক্যাল তর্ক করতে বসা ছেলে-মেয়েদের মতই বোকা। এই ধরনের তরুণ বা তরুণীরা আরও ভাল কোনও দুনিয়া আশা করে। সেজন্য অনেক কথাই বলে; কিন্তু বাস্তব কথা হচ্ছে: দুনিয়া সম্পর্কে এদের কোনও ধারণাই নেই। এরিকের কথায় রাগ করেননি মার্টিন। বরং এরিকের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে ভাল লাগছে তাঁর। 'কিন্তু মিটিং থেকে কী বুঝলে, এরিক?' আবারও জানতে চাইলেন তিনি।

কয়েক মুহূর্ত চুপ রইল এরিক। তারপর বলল, 'আমেরিকা ন্যাটোর মাধ্যমে ইউরোপিয়ান দেশগুলোকে অর্থনৈতিক এবং টেকনোলজির দিক থেকে পঙ্গু করে রেখেছে। বিশেষ করে নিরাপত্তার দিক থেকে। এমন কী উন্নত দেশ ইংল্যাণ্ড বা ফ্রান্সও জানে, তাদের যদি সেরা অস্ত্রের সিস্টেম পেতে হয়, তা হলে হাত পাততে হবে আমাদের কাছে। এ ধরনের অবস্থায় অদের সামনে মাত্র দুটো পথ খোলা— হয় হাতে হ্যাট নিয়ে আমাদের দরজায় টোকা দেবে, নইলে যোগ দিতে হবে ন্যাটোতে। যতটা জানি, আমেরিকা কখনও ন্যাটোর বাইরের কোনও দেশকে

প্যাট্রিয়ট মিসাইল সরবরাহ করেনি। জী, স্যর, আমি মনে করি ন্যাটোর মাধ্যমে ইউরোপের উপর ছড়ি ঘোরাচ্ছি আমরা।'

'মন্দ বলোনি, এরিক। কিন্তু একটা কথা মন দিয়ে শুনে নাও, গোটা পরিস্থিতি আরও অনেক জটিল,' বললেন মার্টিন। 'হোয়াইট হাউস প্রথম থেকেই আমেরিকার জাতীয় নিরাপত্তা দেখছে। সেখান থেকেই নির্দেশ আসছে, দুনিয়ার উপর ছড়ি ঘোরাতে হবে। আমরা ইউরোপের উপর নিজেদের কর্তৃত্ব হারাতে চাই না, এরিক। বিশেষ করে অর্থনৈতিক ও প্রকৌশলের দিক থেকে। এদিকে ফ্রান্স চাইছে আমরা যেন আমাদের কর্তৃত্ব হারাই। এবং সে কারণেই গত দশ বছরেরও বেশি হলো ফ্রেঞ্চ সরকার চাইছে ইউরোপে যেন দাপট কমে আসে আমেরিকার।'

'কোনও উদাহরণ দেবেন, স্যর?' বলল এরিক।

'তুমি কি জানো, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠার পিছনে সবচেয়ে বড় শক্তি ছিল ফ্রান্স?'

'তাই? জানতাম না, স্যর। আমি তো জানতাম...'

'তুমি কি জানো, ফ্রান্স প্রথম ইউরোপিয়ান দেশ যেটা প্রথম থেকেই ইউরোপিয়ান ডিফেন্স চার্টার চেয়েছে?'

চুপ হয়ে গেলেন জ্যাক মার্টিন।

'জী, না, স্যর, জানতাম না।'

'এটা কি জানো, ইউরোপিয়ান স্পেস এজেন্সিকে সাবসিডি দিয়ে অনেক কম দামে কক্ষপথে কমার্শিয়াল স্যাটালাইট ছাড়তে সাহায্য করছে ফ্রান্স? তারা নাসার চেয়ে অনেক কম দামে এসব দিচ্ছে।'

'জী-না, জানতাম না।'

'বাছা, গত দশ বছর ধরে গোটা ইউরোপকে একত্রিত করতে চাইছে ফ্রান্স। তারা তাদের সাধারণ সব পণ্য গোটা

পৃথিবীর মানুষের কাছে বিক্রি করতে চায়। ফ্রান্স এর নাম দিয়েছে রিজিওনাল প্রাইড। আমরা আমেরিকান কূটনীতিকরা বুঝতে পারছি: এসব করে ইউরোপিয়ান দেশগুলো বোঝাতে চাইছে, তারা এখন আর আমেরিকাকে তাদের পাশে চায় না।'

'ইউরোপের কি আসলেই আমেরিকাকে দরকার?' চট্ করে জানতে চাইল এরিক হোম্‌স্। ভুরু কুঁচকে গেছে ওর।

দুষ্ট হাসি ফুটে উঠল মার্টিনের ঠোঁটে। 'যতদিন ইউরোপ আমাদের ওয়েপন্স টেকনোলজির সমান হতে না পারে— হ্যাঁ, আমাদেরকে ওদের খুবই দরকার। আমাদের ডিফেন্স টেকনোলজি অনেক আধুনিক বলে বড় কষ্ট ফ্রেঞ্চদের মনে। ওদের আজও এমন সাধ্য হয়নি যে আমাদের ধারেকাছে আসতে পারবে। এই কারণে নিজেদের ছোট মনে হয় ওদের।

'আমরা যত দিন এগিয়ে থাকব, ওরা জানবে ওদের সামনে কোনও পথ নেই, বাধ্য হয়ে পিছু পিছু চলতে হবে। কিন্তু...' ডানহাতের তর্জনী তুললেন মার্টিন। 'একবার যদি নতুন কিছু পেয়ে যায় ওরা, সেই জিনিস যদি আমাদের অস্ত্রের চেয়ে আধুনিক হয়, সেক্ষেত্রে পরিস্থিতি হঠাৎ করেই পাল্টে যেতে পারে।

'মনে রাখতে হবে ঊনিশ শ' ছেষট্টি নয় এটা। রাজনৈতিক পরিবেশ অনেক বদলে গেছে। এখন যদি ন্যাটো থেকে বেরিয়ে যায় ফ্রান্স, ধরে নিতে পারো, তার সঙ্গে ওই সংগঠন থেকে বেরিয়ে যাবে অর্ধেকের বেশি ইউরোপিয়ান দেশ। নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ যে...'

ঠিক তখনই প্রকাণ্ড ঘরের দরজা খুলে গেল, পিছনে ফ্রেঞ্চ ডেলিগেশন নিয়ে টেবিলের দিকে এগিয়ে এলেন দলের নেতা জ্যাঁ পিয়েরে কুই।

সবাই যে যার সিটে বসে পড়তেই এরিকের কানে বললেন

মার্টিন, 'আমার দুশ্চিন্তা হচ্ছে। এমনও হতে পারে, খুব আধুনিক কোনও আবিষ্কারের খুব কাছে পৌঁছে গেছে ফ্রেঞ্চরা। আজকে ওদের আচরণ খেয়াল করেছ? এরই ভিতর চারবার মিটিঙে বিরতি নিয়েছে। পুরো চারবার! তার মানে বোঝো?'

'তেমন কিছুই বুঝিনি, স্যর।'

'ওরা মিটিঙে বসে খামোকা সময় নষ্ট করছে। এমনটা করা হয় শুধু জরুরি তথ্য পাওয়ার অপেক্ষায়, কোনও খবরের আশায় থাকলে। বারবার বিরতি নিচ্ছে, যাতে ফ্রেঞ্চ ইন্টেলিজেন্সের লোক তাদেরকে বর্তমান অবস্থা জানাতে পারে। আর নেগোশিয়েটারদের চেহারা দেখে মনে হচ্ছে, জিনিসটা যাই হোক, ওটা পাল্টে দিতে পারে ন্যাটোর বর্তমান অবস্থান। ...হয়তো ধ্বংসই হয়ে যাবে সংগঠনটা।'

আট

সামান্যতম আওয়াজ না করে পানির উপর ভেসে উঠল মসৃণ, কালো মাথা। আকারে বেশ বড়, দেখলে অস্বস্তি হয়। মাথার দু'পাশে নিষ্প্রাণ কুচকুচে কালো দুটো চোখ, একটু সামনে ভোঁতা নাক। প্রাণীটা পুলের ভিতর কিছুক্ষণ স্থির থাকল, একটু পর তার পাশে দেখা দিল আরেকটা কালো মাথা। কৌতূহল নিয়ে ই-ডেকের ব্যস্ততা দেখছে দুই দানব।

উইলকক্স আইস স্টেশনের পুলে এই দুই কিলার ওয়েইল আসলে ছোট স্পেসিমেন। যদিও, প্রতিটির ওজন কমপক্ষে পাঁচ

টন। দৈর্ঘ্যে লেজ থেকে শুরু করে মাথা পর্যন্ত কমবেশি পনেরো ফুট।

একটু দূরে ধাতব ডেকে কী যেন করছে দু' পেয়ে প্রাণীগুলো, কৌতূহল মিটে যেতেই নিস্পৃহ চোখে চারপাশ দেখল দুই তিমি। গোলাকার পুলের কিনারা ধরে ঘুরতে শুরু করল। একটু পর পর পুলের মাঝে ডাইভিং বেল ঘিরে চক্কর কাটছে।

রানার নির্দেশে ডাইভিং সুট পরছে ডুবুরিরা।

তিমি দুটোর নড়াচড়া খুবই নিয়ন্ত্রিত, পুলের কিনারা ধরে ঘুরছে। একটা এক দিকে চাইলে, অন্যটা উল্টো দিক দেখছে। ভাব দেখে মনে হয় কী যেন খুঁজছে তারা।

'ওরা খাপ পেতে আছে লিলির জন্য,' সি-ডেকের ক্যাটওয়াক থেকে দুই তিমি দেখছে মেরি। নির্বিকার এবং ঠাণ্ডা কণ্ঠ শুনে মনেই হয় না আসলে ও বারো বছরের কিশোরী।

প্রায় দু'ঘণ্টা হলো ওর দল নিয়ে উইলকক্স আইস স্টেশনে এসেছে রানা। আপাতত আছে ই-ডেকে, ওর দলের ডুবুরিরা ডগলাস মওসন ডাইভিং বেল নিয়ে ডুব দেবে জন প্রাইস ও অন্যদের খোঁজে।

সি-ডেক থেকে রানা ও ডুবুরিদের দিকে চেয়ে ছিল মেরি, এমন সময় পুলের ভিতর দেখা দিয়েছে দুই কিলার ওয়েইল। মেরির পাশে উইঞ্চ কণ্ট্রোলে কাজ করছে দু'জন।

এদেরকে পছন্দ করে মেরি। অন্যদের মত বয়স্ক নয়, কিছু জানতে চাইলে হুঁ-হাঁ করে না, সব ভাল করে বুঝিয়ে দেয়। মেরি খুশি যে এদের দু'জনের একজন মেয়ে।

লেফটেন্যান্ট তিশা করিম ছিপছিপে, সুন্দরী, দেখলে মনে হয় এমপি-৫ অস্ত্রটা ওর হাতের বাড়তি অংশ হয়ে উঠেছে। হেলমেটের নীচে চকচকে কালো দীর্ঘ চুল। মিষ্টি মুখটা দেখলে

মনেই হয় না কঠোর হতে জানে। বয়স মাত্র তেইশ বছর। বাংলাদেশ আর্মির যুবক অফিসাররা ওর নাম দিয়েছে: 'বিদুষী'। কোনও প্রেমাকাঙ্ক্ষী অফিসার এক পা সামনে বাড়লে তাকে ভাল ব্যবহারে দশ গজ পিছিয়ে দেয় তিশা। আপাতত নীচের পুলে দুই তিমির চক্কর কাটা দেখছে ও।

'ওরা লিলির জন্য অপেক্ষা করছে?' চট্ করে ক্যাটওয়াকে চোখ ফেলল তিশা। ওর পাশেই আছে গেযেলা সিল। অস্বস্তি বোধ করে ক্যাটওয়াকের কিনারা থেকে সরে গেল ওটা। মনে হলো ভয় পাচ্ছে: চল্লিশ ফুট নীচ থেকে উঠে আসবে দুই খুনি তিমি।

'ওরা লিলিকে পছন্দ করে না,' বলল মেরি।

'কারণটা কী?' জানতে চাইল তিশা।

'ওরা একাকী, তার উপর তরুণ বয়সী,' বলল মেরি। 'ওরা কাউকে পছন্দ করে না। ওদের যেন প্রমাণ দিতে হবে ওরা অন্যদের চেয়ে আকারে অনেক বড়। ছেলেরা এমনই তো হয়। কিলার ওয়েইলগুলো এমনিতেই কমবয়সী কাঁকড়া-খেকোদের ধরে খায়। কিন্তু এই দুটো কয়েকদিন আগে পুলের ভিতর লিলিকে সাঁতার কাটতে দেখেছে, তারপর থেকে বারবার ঘুরে ঘুরে আসছে।'

'কাঁকড়া-খেকো বলতে কী বোঝাচ্ছ?' উইঞ্চ কন্ট্রোল থেকে জানতে চাইল টনি কেলগ।

'এক ধরনের সিল,' বলল মেরি। 'বেশ বড় আর মোটা। ওদেরকে তিন কামড়ে খেয়ে ফেলে কিলার ওয়েইলরা।'

'আস্ত সিল মাছ খেয়ে ফেলে?' অবাক হয়ে জানতে চাইল টনি।

'হ্যাঁ,' মাথা দোলাল মেরি।

'বাপরে!' আগে হাইস্কুলের ছাত্র ছিল টনি, কোনও দিন ওর

মনে হয়নি বই পড়া উচিত। স্কুল জীবনটা খুব কষ্টে কেটেছে। আর্মিতে যোগ দেয়ার পর ওর মনে হয়েছে কাজের কাজ করেছে, আর কখনও পড়াশোনা করতে হবে না। লিলির উপর চোখ রাখল টনি, আঁচ করছে সিলের আকার ও বয়স। 'তুমি এত কিছু জানলে কী করে, মেরি?'

সচেতন ভাবে শ্রাগ করল মেরি। 'আমি অনেক বই পড়ি।'

'ও।'

টনির দিকে চেয়ে হাসছে তিশা।

ভুরু কুঁচকে ওকে দেখল টনি। 'অত হাসছেন কেন?'

'ভাবছি তুমি মোট কয়টা বই পড়েছ।'

'অনেক,' মাথা দোলাল টনি।

'তাই?'

'হ্যাঁ।'

'কমিকের বই, টনি?'

'আমি শুধু কমিকের বই পড়ি না, মাঝে মাঝে প্রেমের বইও পড়ি।'

হাসতে শুরু করেছে মেরিও।

কুচকুচে কালো টনি খেয়াল করেছে মেরির হাসি, ভুরু আরও কুঁচকে ফেলল সে। 'হা-হা করার কিছু নেই। জানি কখনও কলেজের প্রফেসর হব না, তা হলে বেশি বই পড়তে যাব কেন!' তিশা এখনও হাসছে, ওর দিকে চেয়ে ডান ভুরু ন্যাচাল টনি। 'আপনি বুঝি খুব বই পড়েন?'

'না, কিন্তু তোমার চেয়ে বেশি।'

'আমিও পড়ি,' বলল টনি। 'বইয়ের মতই মানুষের মন পড়তে পারি। আপনি যার জন্য জান দিতে চান, সে যে কে, তা-ও বুঝে ফেলেছি।'

তিশার চোখের পাতা বার কয়েক কাঁপল। চোখের ভাষা

হয়ে উঠল বিমর্ষ। ঘুরে তিমিগুলোর দিকে চাইল।

একবার ওকে দেখে নিল মেরি। ইতস্তত করে জানতে চাইল, 'আমি কি জানতে পারি আপনার সেই মানুষটা কে?'

'না, আসলে কেউ নেই,' পুলের দিকে চেয়ে রইল তিশা।

'আমাদের দলে দেখতে সবচেয়ে সুন্দর যে পুরুষ, তাকে খুঁজে পেলেই বুঝবে সে কে,' বলল টনি।

রেলিঙে কনুই রেখে কিলার ওয়েইল দেখছে তিশা, ঠিক করেছে পাত্তা দেবে না এদেরকে। স্টেশনের ভিতর চক্কর কাটছে দুই তিমি, এখনও খুঁজে চলেছে লিলিকে। একবার থমকে গেল একটা তিমি, মনে হলো দেখছে তিশাকে। তারপর এক পাশে মাথা সরাল ওটা, আরও মনোযোগ দিয়ে চাইল।

'ওরা এত দূর থেকে পরিষ্কার দেখে?' মেরির কাছে জানতে চাইল তিশা। 'আমি তো জানতাম পানি থেকে চোখ তুললে তিমির দৃষ্টি অস্বচ্ছ হয়ে ওঠে।'

'অন্য সব তিমির চেয়ে কিলার ওয়েইলের চোখ অনেক বড় আর পরিষ্কার,' বলল মেরি। 'পানি থেকে উঠলেও ভাল দেখে। ...আপনি ওদের সম্পর্কে আর কিছু জানেন?'

'কিছু বই পড়েছি, অল্প-স্বল্প জানি ওদের বিষয়ে,' কিলার ওয়েইলের দিকে চেয়ে আছে তিশা।

পুলের কিনারা দিয়ে ঘুরছে দুই তিমি। ওরা যেন পানির ভিতর টর্পেডো। ধৈর্যের অভাব নেই, শান্ত-শিষ্ট ভঙ্গি। নীচের ডেকে রানা ও অন্যদেরকে দেখছে তিশা। আবার চাইল পুলের দিকে, সাঁতার কেটে চলেছে দুই তিমি। মেরির কাছে জানতে চাইল, 'ভিতরে কীভাবে ঢুকল? বরফের শেলফের নীচ দিয়ে?'

উপর-নীচ মাথা দোলাল মেরি। 'হ্যাঁ। এই স্টেশন তো সাগর থেকে মাত্র এক শ' গজ দূরে। আর বরফের শেলফ খুব গভীরও নয়, বড়জোর পাঁচ শ' ফুট। শেলফের নীচ দিয়ে আসে

ওরা, এখানে এসে ভেসে ওঠে স্টেশনের ভেতর।'

পুলের আরেক দিকে চলে গেছে দুই তিমি, ওগুলোর দিকে আবারও চাইল তিশা। ওগুলোর ভঙ্গি খুব শান্ত, যেন দুই কুমির অপেক্ষা করছে শিকার ধরবার জন্য।

চারপাশ দেখা শেষে খুব ধীরে ডুবে গেল তিমি দুটো। পানিতে তৈরি হলো ছোট দুটো ঢেউ। চোখ খুলে রেখেছে তিমিদুটো, চেয়ে আছে উপরের দিকে।

'ওরা হঠাৎ করেই বিদায় নিচ্ছে,' মন্তব্য করল তিশা।

ডাইভিং প্ল্যাটফর্মের পাশে পুল এখন খালি। দক্ষিণের সুড়ঙ্গ থেকে সার্জেন্ট জনি ওয়াকারকে বেরিয়ে আসতে দেখল তিশা। লোকটার কাঁধের উপর কয়েকটা স্কুবা ট্যাঙ্ক। নিনা ভিসার ওদেরকে জানিয়েছে, দক্ষিণ সুড়ঙ্গে ছোট একটা মালবাহী এলিভেটার আছে, ওটা দিয়ে ই-ডেকে নামানো যায় ডাইভিং গিয়ার। ওই লিফট ব্যবহার করেছে ওয়াকার।

প্ল্যাটফর্মের আরেক দিকে চোখ গেল তিশার। ওখানে মাথা ঝুঁকিয়ে কী যেন করছে মাসুদ রানা। ডান হাত রেখেছে কানের উপর। যেন হেলমেট ইন্টারকমে কিছু শুনছে। তারপর হঠাৎ করেই কাছের একটা রাং-মইয়ের দিকে রওনা হলো সে। হাঁটতে হাঁটতে হেলমেট মাইকে কী যেন বলছে।

স্টেশনের আরেক প্রান্তে রাং-ল্যাডারের কাছে থেমে চট্ করে তিশার দিকে চাইল। খড়খড় আওয়াজের ভিতর দিয়ে মানুষটার কণ্ঠ শুনল তিশা: 'তিশা, টনি, এ-ডেকে ওঠো। জলদি।'

কাছের রাং-ল্যাডারের দিকে রওনা হলো তিশা, হেলমেট মাইকে বলল, 'কী হয়েছে, স্যর?'

খুব গম্ভীর কণ্ঠে রানা বলল, 'বাইরে ট্রিপ-ওয়ায়ারে ছেদ পড়েছে। সার্জেন্ট ভাইপার ওখানে আছে। এইমাত্র বলল, ওটা

একটা ফ্রেঞ্চ হোভারক্রাফট।'

হোভারক্রাফটের দিকে রাইফেলের মাযল ঘোরাল সার্জেন্ট ভাইপার।

নাইট-ভিশন গান সাইটে উজ্জ্বল সবুজ আলোয় দেখা গেল ভেহিকেলের এক পাশে লেখা: ডুমো ডি'খ-ঈলেখ — ০২'।

স্টেশনের কমপ্লেক্সের বাইরে তুষারের উপর শুয়ে আছে পল সিংগার। শাঁ-শাঁ হাওয়া বইছে, সেই সঙ্গে ঝড়ের ভিতর উড়ছে সাদা তুষার। সার্জেন্ট তার ব্যারেট এম৮২এ১এ স্নাইপার রাইফেলের নল তাক করেছে হোভারক্রাফটের উপর।

গানারি সার্জেন্ট বয়স্ক লোক, বেশ লম্বা-চওড়া, কালো চোখদুটোর চাহনি খুবই গম্ভীর। তার ইউনিটের মেরিনদের মত নয় সে, নিজ ইউনিফর্মে পরিবর্তন এনেছে। শোল্ডারপ্লেটের উপর ভয়ঙ্কর হিংস্র এক ভাইপার সাপের উল্কি আঁকা। নীচে লেখা: 'যদি পারো তো চুমু দাও।'

পল সিংগার ক্যারিয়ার সোলজার, বাইশ বছর মেরিন কর্পসের সঙ্গে আছে। সাধে গানারি সার্জেন্ট হয়নি। মেরিনদের নন-কমিশণ্ড অফিসারদের এই র‍্যাঙ্ক খুব অল্প লোক অর্জন করেছে। সিংগারের পক্ষে সহজেই উচ্চ পদে যাওয়া সম্ভব ছিল, কিন্তু সে ঠিক করেছে, তার জন্য গানারি সার্জেন্ট পদ যথেষ্ট। নিজ ইচ্ছাতেই মেরিন ফোর্সের রিকনিসেন্স ইউনিটে রয়ে গেছে।

রিকনিসেন্স ইউনিটগুলোর ভিতর র‍্যাঙ্ক নিয়ে বাড়াবাড়ি নেই। এই দলে যোগ দেয়া খুব কঠিন, এসব যোদ্ধাদের সমান সম্মান পায় না বহু অফিসার। অনেক সময়েই দেখা যায় চার-তারা জেনারেল সিনিয়র রিকন সদস্যদের সঙ্গে আলাপ করছেন যুদ্ধের কৌশল ও অস্ত্রের বিষয়ে। বেশ কয়েকবার সিংগারের কাছেও এসব বিষয়ে জানতে চেয়েছেন জেনারেলরা।

রিকনিসেন্সের বেশির ভাগ যোদ্ধা সার্জেন্ট বা কর্পোরাল, কিন্তু এই দলে পদ নিয়ে মাতামাতি নেই। এটাই যথেষ্ট যে তারা রিকন, ইউনাইটেড স্টেটসের মেরিন কর্পস— এলিট ফোর্স। ওটাই পদ হিসাবে যথেষ্ট।

উইলকক্স আইস স্টেশনে পৌঁছবার পর স্টেশনের ওদিকে তুষার-প্রান্তরে দুই শ' গজ দূরে সার্জেন্ট ভাইপারকে লেসার ট্রিপ-ওয়ায়ার বসানোর দায়িত্ব দিয়েছে রানা। আসলে হোভারক্রাফটের রেঞ্জফাইণ্ডারের মত করেই কাজ করে ট্রিপ-ওয়ায়ার। বাক্সের মত কয়েকটা ইউনিট, সেসবের ভিতর দিয়ে চলে সরু অদৃশ্য লেসার বিম। কোনও কিছু ওই বিম ভেদ করে এলে সিংগারের বাহুর গার্ডে জ্বলে উঠবার কথা লাল বাতি।

এ ক্ষেত্রে তাই হয়েছে।

এরপর দেরি না করে এ-ডেকে মাসুদ রানাকে রেডিয়ো করেছে সিংগার। তখনই দেখে আসতে বলেছে রানা। এমনও হতে পারে, দলবল নিয়ে ফিরছে সার্জেন্ট হোসেন আরাফাত দবির। তাকে দু'ঘণ্টার ভিতর ফিরতে বলেছে রানা। আর সে সময়ও প্রায় ফুরিয়ে এল। দু'ঘণ্টা হলো উইলকক্স আইস স্টেশনে পৌঁছেছে রানা ওর দল নিয়ে। এখন যে-কোনও সময়ে এসে যাবে সার্জেন্ট দবির।

কিন্তু যে বা যারা আসছে, তারা দবির নয়।

সার্জেন্টের হেলমেট ইন্টারকমে শোনা গেল রানার কণ্ঠ: 'সার্জেন্ট সিংগার, ওটা কোথায়?'

'দক্ষিণ-পুব কোণে। বাইরের দালানগুলোর পাশ দিয়ে আসছে।' সিংগার দেখছে, তুষারে ছাওয়া ছোট সব দালানের মাঝ দিয়ে খুব ধীরে সামনে বাড়ছে হোভারক্রাফট।

'আপনি কোথায়?' তুষার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে জানতে চাইল সে। রাইফেল হাতে মূল গম্বুজের দিকে ছুটতে শুরু করেছে।

'সদর দরজার আগে,' বলল রানা। 'পিছন থেকে কাভার পজিশনে থাকুন।'

'আমি প্রায় পৌঁছে গেছি ওখানে।'

আকাশ থেকে কাত হয়ে পড়ছে ঘন তুষার, চোখ চলে না বেশি দূর। খুব সাবধানে আসছে হোভারক্রাফট। এক শ' গজ তফাৎ রেখে ওটার সঙ্গে ছুটছে ভাইপার। প্রধান গম্বুজের কাছে থামল ভেহিকেল। বেশিরভাগ বাতাস বেরিয়ে যেতেই নিচু হয়ে গেল হোভারক্রাফট। চল্লিশ গজ দূরে তুষারের ভিতর শুয়ে পড়ল সার্জেন্ট সিংগার, গাড়ির দরজার উপর স্নাইপার রাইফেল তাক করেছে।

টেলিস্কোপে চোখ রেখেছে, এমনি সময় হোভারক্রাফটের স্লাইডিং দরজা খুলে গেল, টপাটপ চারজন লোক নেমে পড়ল তুষার-ঝড়ের ভিতর।

নয়

'গুড মর্নিং,' হাসি-হাসি সুরে ফ্রেঞ্চে বলল রানা।

চার বিজ্ঞানী দাঁড়িয়ে পড়েছে দরজার সামনে। চেহারা বোকা-বোকা। সামনে ও পিছনে দু'জন করে পাশাপাশি দাঁড়িয়েছে, মাঝে বড় একটা করে কন্টেইনার।

তাদের সামনে গিয়ে দাঁড়াল রানা, হাতে আলগা ভাবে ঝুলছে এমপি-৫। ওর পিছনে এমপি-৫ কাঁধে তুলে ফেলেছে কর্পোরাল টনি কেলগ ও সার্জেন্ট জনি ওয়াকার। অস্ত্রের নলের

উপর দিয়ে সামনের লোকগুলোকে দেখছে তারা।

'ভিতরে ঢুকে পড়ুন,' আমন্ত্রণ জানাল রানা।

লোকগুলো এক মুহূর্ত ইতস্তত করল, তারপর সামনে বাড়ল। একপাশে সরে গেল রানা। সবাই দরজা দিয়ে ঢুকতেই পিছনে রওনা হলো। আড়ষ্ট পায়ে চলেছে ফ্রেঞ্চরা। বোঝা গেল ভারী কন্টেইনার বইতে কষ্ট হচ্ছে তাদের।

একমিনিট হাঁটতেই ফুরিয়ে গেল সুঁড়ঙ্গ, ক্যাটওয়াকে বেরিয়ে এল ওরা। একটু দূরে ডাইনিংরুমে উজ্জ্বল আলো জ্বলছে। ওদিকে হাতের ইশারা করল রানা। ওর পিছনে দু'পাশ থেকে কাভার করছে টনি কেলগ ও জনি ওয়াকার।

'আপনারা ইংরেজি জানেন?' সবাই ডাইনিংরুমে ঢুকতেই জানতে চাইল রানা।

নতুন এই দলের নেতা বললেন, 'জী। তবে একটু আগে আপনি যেমন সাবলীল ফ্রেঞ্চ বললেন, তেমনি করে ইংরেজি জানি না আমরা।'

দুই কন্টেইনার মেঝের উপর রেখে চারপাশ দেখছেন তাঁরা। চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে সতীর্থদের দেখে।

কাঁধে অস্ত্র ঝুলিয়ে তাঁদের পাশে চলে গেল কেলগ, ভাল ভাবে সার্চ করে দেখল। কারও সঙ্গে অস্ত্র নেই। মাথা নাড়ল রানার দিকে চেয়ে।

ইংরেজিতে জানতে চাইল রানা, 'এখানকার সব সায়েন্টিস্ট ফ্রেঞ্চ স্টেশনে পৌঁছেছেন?' সবাইকে একটা টেবিলের পিছনে বসতে ইশারা করল।

'হ্যাঁ, নিরাপদে ডুমো ডি'খ-ঈলেখ পৌঁছেছেন,' প্রথম ভদ্রলোক জানালেন।

তাঁর চেহারা দেখে মনে হয় নিয়মিত খেতে পান না। দুই গালে বড় দুটো গর্ত, উঁচু চোয়ালের হাড়ের কারণে দেখতে

খারাপ লাগে, চোখদুটোও খোড়লের ভিতর বসা। সুড়ঙ্গ দিয়ে আসবার সময় নিজের নাম বলেছেন জ্যাকুস ফিউভিল। লিস্টে এই নাম আছে, জানে রানা। এঁর নামের নীচে সংক্ষিপ্ত বায়োডেটায় লেখা: জ্যাকুস ফিউভিল, জিয়োলজিস্ট, কণ্টিনেন্টাল শেলফের প্রাকৃতিক গ্যাসের উপর গবেষণা করছেন।

সুড়ঙ্গ ধরে আসবার পথে অন্য তিন ফ্রেঞ্চের নামও জেনে নিয়েছে রানা। এঁদের সবার নাম আছে ওই লিস্টে।

অন্য চার ফ্রেঞ্চ বিজ্ঞানী এখনও ডাইনিংরুমেই আছেন। তাঁরা ম্যাথিউ ফ্যেনুয়্যা, গ্যাসোঁয়া ভিঁভাদিয়েখ, স্যাঁ ডেনি পেঁয়েযি ও দু লা বোয়াবার্থেলিউ। এদিকে উইলকক্স আইস স্টেশনের আসল বাসিন্দারা চলে গেছেন নিজেদের কোয়ার্টারে। আগেই রানা বলে দিয়েছে, আপাতত তাঁদেরকে ওখানেই থাকতে হবে। আর এ দিকে ওর দলের কয়েকজনকে নিয়ে নতুন আগন্তুকদের সঙ্গে দেখা করতে গেছে রানা। সে-সময়ে ওর দলের মেরিন ল্যান্স-কর্পোরাল কেভিন হাক্সলে ডাইনিংরুমের দরজা পাহারা দিয়েছে।

'আমরা যতটা সম্ভব দ্রুত ফিরেছি,' বললেন জ্যাকুস ফিউভিল। 'সঙ্গে টাটকা খাবার আর ফিরতি পথের জন্য ব্যাটারি চালিত কম্বল এনেছি।'

তিশা করিমের দিকে চাইল রানা। ডাইনিংরুমের আরেক দেয়ালের কাছে মেয়েটি। ওখানে ফ্রেঞ্চদের আনা সাদা রঙের কণ্টেইনার দুটো পরীক্ষা করে দেখছে।

'এসব আনার জন্য ধন্যবাদ,' ঘুরে জ্যাকুস ফিউভিলের দিকে চাইল রানা। 'অনেক করেছেন। আমরা এসেছি কয়েক ঘণ্টা পর, এখানে পৌঁছে দেখলাম ইতিমধ্যেই ফ্রেঞ্চরা সাহায্য করছে।'

'তা তো করবেই,' বললেন জ্যাকুস ফিউভিল। 'প্রতিবেশীর খোঁজ নেয়া তো সবারই দায়িত্ব।' ক্লান্ত হাসলেন তিনি। 'অ্যান্টার্কটিকায় কেউ জানে না কখন কার কী সাহায্য লাগবে।'

'ঠিকই বলেছেন,' তাঁর এক সঙ্গী বললেন।

রানার ইয়ারপিসে বলে উঠল সার্জেন্ট সিংগার: 'মেজর, আরেকটা কণ্ট্যাক্ট। এইমাত্র ট্রিপ-ওয়ায়ার পেরুল।'

ভুরু সামান্য কুঁচকে গেল রানার। বড় দ্রুত ঘটছে সব। আট বিজ্ঞানীকে সামলাতে পারবে ওরা, কিন্তু এখন উইলকক্স আইস স্টেশনে আরও লোক এলে...

'একমিনিট, মেজর, সব ঠিক। ওটা আমাদের হোভারক্রাফট। সার্জেন্ট দবির ফিরছে।'

আস্তে করে শ্বাস ফেলল রানা। ঘুরে দাঁড়িয়ে দরজার দিকে পা বাড়াল। ক্যাটওয়াকে পৌঁছে রওনা হলো সদর-দরজার দিকে।

ওদিকে ডাইনিংরুমের দেয়ালের কাছে দুই কণ্টেইনারের একটার ভিতর হাত ভরে দিয়েছে তিশা করিম। উপর থেকে সরিয়ে ফেলেছে কয়েকটা কম্বল ও টাটকা পাউরুটি। বাক্সের নীচে বেশ অনেকগুলো ক্যান। বেশির ভাগই মাংসের— গরুর, শুয়োরের ও মুরগির। প্রতিটি ক্যান সিল করা। মাথার উপর রিং, ওটা ধরে টান দিলে ছাতের সরু পাত উঠে আসবে।

কয়েকটা ক্যান সরিয়ে বাক্সের নীচে মনোযোগ দিল তিশা। আর ঠিক তখনই কী যেন চোখে পড়ল।

কী যেন বড় অস্বাভাবিক!

বেশিরভাগ ক্যানের চেয়ে বড় ওই ক্যানটা। আকারে মাঝারি, ত্রিকোণাকৃতির। প্রথমে তিশা নিশ্চিত হতে পারল না, কেন ওর সন্দেহ জেগেছে। কিন্তু আকারটা বড় বেঢপ।

পরক্ষণে বুঝে গেল।

এই ক্যানের সিল ভাঙা। পাত উঠিয়ে নিয়ে আবারও ঠিক ভাবে রাখতে চেয়েছে। খুঁতটা প্রায় চোখেই পড়ছে না। ভাল করে খেয়াল করলে বোঝা যায়, ক্যানের মুখে সরু একটা কালো রেখা।

চট্ করে ঘুরে চাইল তিশা, ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেছে মাসুদ

রানা। চোখ পড়ল ফ্রেঞ্চ বিজ্ঞানীদের উপর। ওকেই দেখছেন জ্যাকুস ফিউভিল, চকিতে চাইলেন বোয়াবার্থেলিউয়ের দিকে।

রানার সঙ্গে সার্জেন্ট হোসেন আরাফাত দবিরের দেখা হলো এন্ট্র্যান্স টানেলের কাছেই, ডাইনিংরুম থেকে তিরিশ ফুট দূরের ক্যাটওয়াকে।

'কী অবস্থা?' জানতে চাইল রানা।

থমথম করছে সার্জেন্টের মুখ। 'খুব খারাপ খবর, স্যর।'

'খুলে বলুন।'

'সিগনাল হারিয়ে যায়। ওটা একটা ফ্রেঞ্চ হোভারক্রাফট। ডুমো ডি'খ-ঈলেখের। একটা গভীর খাদের ভিতর পড়ে।'

'তারপর?' চট্ করে ডাইনিংরুমের দরজার দিকে চাইল রানা। ওখানে রয়েছে ফ্রেঞ্চরা। কয়েক মিনিট আগে জ্যাকুস ফিউভিল বলেছে দ্বিতীয় হোভারক্রাফট নিরাপদে ডুমো ডি'খ-ঈলেখ পৌঁছে গেছে। 'কী হয়েছিল? পাতলা বরফের কারণে দুর্ঘটনা?'

'না, স্যর। আমরা প্রথমে তা-ই ভেবেছি। পরে কাছ থেকে দেখল কর্পোরাল নাজমুল।'

'কী দেখল?' চট্ করে জানতে চাইল রানা।

মাথা নাড়ল দবির। 'হোভারক্রাফটের ভিতর পাঁচটা লাশ, স্যর। সবার মাথার পিছনে গুলি করা হয়েছে।'

রানার হেলমেট ইন্টারকমে শোনা গেল তিশার কণ্ঠ: 'স্যর, মস্ত কোনও গোলমাল। খাবারের ক্যান আগেই খোলা হয়েছে।'

ঝট করে ঘুরে দাঁড়াল রানা। ডাইনিংরুম থেকে বেরিয়ে এসেছে তিশা করিম। দ্রুত হেঁটে আসছে। হাতে তিনকোনা একটা ক্যান। ওটার মুখ খোলা।

মেয়েটির পিছনে ডাইনিংরুমে জ্যাকুস ফিউভিলকে দেখতে

পেল রানা। লোকটা চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। চেয়ে আছে তিশার দিকে, তারপর তার চোখ পড়ল রানার চোখে।

ওদের চোখ আটকে গেছে পরস্পরের উপর।

এর এক সেকেণ্ড পর যা বোঝার বুঝে গেল দু'জনেই।

তিশা এগিয়ে আসছে বলে ফিউভিলকে আর দেখতে পেল না রানা। ক্যানের মুখ খুলে ফেলেছে মেয়েটি, ভিতর থেকে কী যেন বের করছে। জিনিসটা ছোট এবং কালো। যেন কোনও ক্রুশ। তফাৎ হচ্ছে ওটা খুদে আকারের, হাতলের জায়গাটা পিছন দিকে বেঁকে গেছে।

জিনিসটার উপর চোখ পড়তেই বিস্ফারিত হলো রানার চোখ। সতর্ক করতে মুখ হাঁ করল ও, কিন্তু ততক্ষণে দেরি হয়ে গেছে।

ডাইনিংরুমে সাদা দুই কণ্টেইনার লক্ষ্য করে ঝাঁপ দিয়েছে ফিউভিল। একইসঙ্গে উঠে দাঁড়িয়েছে দু লা বোয়াবার্থেলিউ। স্টেশনে পৌঁছে তাকে সার্চ করেনি রানারা। ঝটকা দিয়ে পারকা সরিয়ে দিয়েছে সে, দুই হাতে বেরিয়ে এসেছে ফ্রেঞ্চদের তৈরি খাটো ব্যারেলের ফ্যাম্যাস অ্যাসল্ট রাইফেল। ওই একই সময়ে ফ্রেঞ্চ বিজ্ঞানী গ্যাসোঁয়া ভিঁভাদিয়েখ দুই পকেট থেকে বের করেছে দুটো ক্রুশ। ওই একই জিনিস তিশার হাতে। ভিঁভাদিয়েখের ডান হাতের ক্রুশ থেকে ছিটকে বেরুল কী যেন। তিশাও ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করেছে, ওই মুহূর্তে রানা দেখল হঠাৎ করেই মেয়েটির মাথা পিছনে ঝটকা খেল। পরক্ষণে মেঝের উপর ধড়াস্ করে পড়ল তিশা।

এক সেকেণ্ড পর ব্রাশ ফায়ারের আওয়াজে খানখান হলো নীরবতা। অ্যাসল্ট রাইফেলের ট্রিগার পেঁচিয়ে ধরেছে দু লা বোয়াবার্থেলিউ, ডাইনিংরুম থেকে বেরুল একপশলা গুলি। দরজার সামনে দু' টুকরো হয়ে গেল কর্পোরাল কেভিন হাক্সলে।

দশ সেকেণ্ডে কয়েক দফায় গুলিবর্ষণ করল বোয়াবার্থেলিউ,

ততক্ষণে মেঝের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে তার শত্রুপক্ষের প্রত্যেকে। সবাই বুঝে গেছে, উইলকক্স আইস স্টেশন হয়ে উঠেছে যুদ্ধক্ষেত্র।

'মাসুদ রানা বলছি!' হেলমেট মাইকে শান্ত কণ্ঠে বলল রানা, দুই লাফে চলে গেছে কাছের টানেলের দরজার আড়ালে। 'ওরা আটজন! আবার বলছি, ওরা আটজন! ছয়জন মিলিটারি পারসোনেল! দু'জন সায়েন্টিস্ট। এরা কমাণ্ডোদের জন্যে অস্ত্র লুকিয়ে এনেছে। কাউকে কোনও ছাড় দিতে যেয়ো না!'

রানার চারপাশে ছিটকে পড়ছে বরফ-কুঁচি, দু লা বোয়াবার্থেলিউয়ের গুলি লাগছে মাথার উপরের বরফ-দেয়ালে।

ক্রসবো দেখে ফেলেছে বুঝেই কাজে নেমে পড়েছে ফ্রেঞ্চ কমাণ্ডোরা।

পৃথিবীর প্রতিটি এলিট মিলিটারি ইউনিটের বিশেষ কিছু চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য থাকে। ইউনাইটেড স্টেটসের নেভি সিল মুখোমুখি লড়াই-এ বারো গেজ পাম্প-অ্যাকশন শটগান ব্যবহার করে। ব্রিটিশ স্পেশাল এয়ার সার্ভিস, বা এসএএস ব্যবহার করে নাইট্রোজেন চার্জ। ইউএস মেরিন ফোর্স রিকনিসেন্স ইউনিট বা রেগুলার ইউনাইটেড স্টেট্স্ মেরিন কর্পস ব্যবহার করে আর্মালাইট এমএইচ-১২ ম্যাগহুক। ওটা গ্র্যাপলিং হুকসহ লঞ্চার। ধাতব দেয়াল বেয়ে উঠবার সময় ব্যবহার করা হয় হাই-পাওয়ার্ড ম্যাগনেট। ম্যাকমার্ডো স্টেশনে রানার দলের সবার জন্য এই একই জিনিস দেয়া হয়েছে।

মাত্র একটি এলিট ফোর্স ব্যবহার করে ক্রসবো।

দো খমিয়েখ খেযিমন্ত প্যাখাশুতিস্ট দো'ইনফেন্তেখিয়্য দে মেখিন হচ্ছে ফ্রেঞ্চদের ক্র্যাক কমাণ্ডো ইউনিট— অন্য দেশে এরা ফার্স্ট মেরিন প্যারাশুট রেজিমেন্ট নামে পরিচিত। এদের কাজ ব্রিটিশ এসএএস বা ইউএসএ-র সিলের মতই।

এই রেজিমেন্ট ইউএস মেরিন বা বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর রেগুলার ফোর্সের মত নয়। এদের কাজ এক ধাপ উঁচু স্তরের। অফেন্সিভ ইউনিট বা অ্যাটাক টিম, এলিট কভার্ট ফোর্স— এদের একমাত্র কাজ শত্রুপক্ষের এলাকায় ঢুকে পড়া এবং দেখামাত্র সবাইকে হত্যা করা।

রানা যখন তিশাকে ক্যানের ভিতর থেকে খুদে ক্রসবো বের করতে দেখেছে, ও বুঝে গেছে ওই লোকগুলো ডুমো ডি'খ-ঈলেখের বিজ্ঞানী নয়।

ফ্রেঞ্চ এলিট ফোর্সের কমাণ্ডোরা ধরেই নিয়েছে রানা ডুমো ডি'খ-ঈলেখের বিজ্ঞানীদের নাম জেনে আসবে, কাজেই তাদের নাম ধার করে এসেছে উইলকক্স আইস স্টেশনে। নিজেদেরকে আরও বিশ্বাসযোগ্য করবার জন্য সঙ্গে এনেছে সত্যিকারের দু'জন বিজ্ঞানীকে।

ডুমো ডি'খ-ঈলেখের ম্যাথিউ ফ্যেনুয়্যা ও স্যাঁ ডেনি পেঁয়েযিকে আগে থেকেই উইলকক্স আইস স্টেশনের বাসিন্দারা চিনত।

নিষ্ঠুর ধোঁকাবাজি করেছে এরা।

রানা যখন ওর দল দিয়ে স্টেশনে এল, ওরা দেখল এই দলের নেতা ম্যাথিউ ফ্যেনুয়্যা, যাকে এখানকার বাসিন্দারা ভাল করেই চেনে। কাজেই ওরা ধরে নিয়েছে এরা সবাই বিজ্ঞানী। এদের একজন উইলকক্স আইস স্টেশনের পাঁচ বিজ্ঞানীকে সরিয়ে নিয়েছে, ভঙ্গি করেছে নিরাপদে পৌঁছে দেবে ফ্রেঞ্চ স্টেশনে। অথচ নির্দ্বিধায় ওরা নিরীহ সিভিলিয়ান মানুষগুলোকে বিনা অপরাধে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে তুষারের প্রান্তরে। ভাবতে গিয়ে এখন রাগে ফুঁসছে রানা, মনের চোখে দেখছে: বাঙালি ও আমেরিকান বিজ্ঞানী— নারী-পুরুষ, সবাই কাঁদছে, করুণ স্বরে প্রাণ-ভিক্ষা চাইছে: 'আমাদেরকে মারবেন না, দয়া করুন, বাঁচতে দিন!'

তাদের পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে ফ্রেঞ্চ কমাণ্ডোরা, তারপর মাথার পিছনে পিস্তলের নল ঠেকিয়ে গুলি করল। হোভারক্রাফটের ভিতর ছিটকে পড়ছে ধূসর মগজ ও রক্ত।

ম্যাথিউ ফ্যেনুয়্যা ও স্যাঁ ডেনি পেঁয়েযি আসলে বিজ্ঞানী?

ভাবতে গিয়ে ঘৃণায় মুখ কুঁচকে ফেলল রানা। নিরীহ অসহায় বিজ্ঞানীদের হত্যার সঙ্গে নিজেদের জড়াতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেনি, এদেরকে কী লোভ দেখিয়েছে ফ্রেঞ্চ সরকার?

অবশ্য, জবাবটা পাওয়া খুবই সোজা।

ফ্রেঞ্চদের হাতে স্পেসশিপ এলে পরীক্ষা করবার প্রথম সুযোগ দেয়া হবে এদেরকে।

হেলমেট ইন্টারকমে একের পর এক চিৎকার শুনল রানা।

'পাল্টা গুলি করো!'

'সরে এসো!'

'হাক্সলে মারা গেছে! তিশাও!'

'শালার কপাল! ওই হারামজাদাকে গুলি করতে...'

দরজার কবাটের আড়াল থেকে সামনের দিক দেখল রানা। ডাইনিংরুম এবং মেইন এণ্ট্র্যান্স প্যাসেজওয়েের মাঝে ক্যাটওয়াকে পড়ে আছে তিশা।

রানার চোখ স্থির হলো কেভিন হাক্সলের উপর। ডাইনিংরুম ও ক্যাটওয়াকের মাঝে সে। বড় বড় দুই চোখ খোলা, মুখটা ভেসে গেছে রক্তে, ছেঁড়াখোঁড়া পেট থেকে এসেছে ওই রক্ত। ওকে পয়েন্ট-ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জে গুলি করেছে দু লা বোয়াবার্থেলিউ।

একটু দূরে স্টেশনের মেইন এণ্ট্র্যান্সের মুখে কর্পোরাল নাজমুল আছে, ঝট্ করে বেরিয়ে এসেই গুলি করে আবার আড়াল নিচ্ছে। ফ্রেঞ্চদের ফ্যাম্যাস রাইফেল দুর্বল র‍্যাট-ট্যাট আওয়াজ তুলছে, তার জবাবে জার্মানদের তৈরি এমপি-৫ যেন বাতাস ভরা টিউব ফুটো হওয়ার আওয়াজ করছে। কর্পোরাল নাজমুলের

পাশে যোগ দিয়েছে কর্পোরাল টনি কেলগ।

চারপাশ দেখে নিতে চাইল রানা। পশ্চিম টানেলের মুখে জবুথবু হয়ে বসেছে সার্জেন্ট জনি ওয়াকার। 'ওয়াকার, ঠিক আছেন?' জানতে চাইল রানা।

দু লা বোয়াবার্থেলিউ যখন গুলি শুরু করল, ডাইনিংরুমের সবচেয়ে কাছে ছিল সার্জেন্ট জনি ওয়াকার ও কর্পোরাল কেভিন হাক্সলে। গুলি শুরু হতেই, ঝট্ করে কবাটের আড়ালে সরে গেছে ওয়াকার। ওদিকে সরাসরি গুলির তোড়ে পড়েছে কেভিন। দ্রুত পিছিয়েছে ওয়াকার, ঝেড়ে দৌড় দিয়ে পৌঁছে গেছে পশ্চিম টানেলের আপাত নিরাপদ আড়ালে।

পঞ্চাশ ফুট দূরে তাকে হেলমেট মাইকে কথা বলতে দেখল রানা। ওর হেডসেটে বলে উঠল ঘড়ঘড়ে কণ্ঠ: 'ঠিক আছি, স্যর। একটু চমকে গেছি, তবে কিছু হয়নি।'

'গুড।'

রানার মাথা থেকে একফুট উপরে বরফের দেয়ালে লাগল একপশলা গুলি। আবারও দরজার কবাটের আড়ালে চলে গেল ও। পরক্ষণে কবাটের পাশ থেকে উঁকি দিল। অবশ্য, এবার শিসের মত একটা আওয়াজও পেল।

এক সেকেণ্ড পর কানের কাছে ধাতব খট্ আওয়াজ শুনে চমকে গেল। চার ইঞ্চি দৈর্ঘ্যের একটা তীর এসে বিঁধেছে ওর ডান চোখের দুই ইঞ্চি দূরের বরফ-দেয়ালে। ডাইনিংরুমে জ্যাকুস ফিউভিলকে দেখতে পেল রানা। লোকটার হাতে উদ্যত ক্রসবো। তীর মারা হতেই তার দিকে খাটো ব্যারেলের সাবমেশিনগান বাড়িয়ে দিল বিজ্ঞানী ম্যাথিউ ফ্যেনুয়্যা। এক সেকেণ্ড পর গোলাগুলিতে যোগ দিল ফিউভিল।

চৌকাঠের আড়াল থেকে আবারও উঁকি দিল রানা, তিশাকে দেখতে পেল। ডাইনিংরুম এবং মেইন এণ্ট্র্যান্সের মাঝে

ক্যাটওয়াকের উপর পড়ে আছে মেয়েটা, নিথর।

তারপর হঠাৎ করেই নড়ে উঠল ওর হাত।

জ্ঞান ফিরছে বলেই বোধহয় ওটা স্বাভাবিক রিফ্লেক্স।

হাত নাড়া দেখেছে রানা, হেলমেট মাইকে বলল, 'রানা বলছি, তিশা বেঁচে আছে। কিন্তু একদম খোলা জায়গায়। আমাকে কাভার দিতে হবে। আমি ওকে নিয়ে আসব। তোমরা কনফার্ম করো।'

একের পর এক বক্তব্য এল:

'কেলগ, চেক।'

'নাজমুল আছি।'

'জনি ওয়াকার, চেক।'

'দবির আছি,' বলল সার্জেন্ট। 'আপনি যেতে পারেন, স্যর। কাভার দিচ্ছি। ...এবার, স্যর!'

'ঠিক আছে!' আড়াল থেকে ছিটকে বেরুল রানা, চলে এসেছে ক্যাটওয়াকে।

বাঙালি সৈনিক ও আমেরিকান মেরিনরা একইসঙ্গে বেরিয়ে এসেছে কাভার পজিশন থেকে, গুলি শুরু করেছে ডাইনিংরুমের দরজা লক্ষ্য করে। কানে তালা লেগে গেল রানার। ডাইনিংরুমের দেয়াল থেকে চারপাশে ছিটকে পড়ছে বরফের কুঁচি। শ' খানেক বুলেট কয়েক সেকেণ্ডে দেয়াল খুবলে তৈরি করল অসংখ্য গর্ত। সবার গুলিবর্ষণে পিছিয়ে গেছে জ্যাকুস ফিউভিল, ডাইভ দিয়ে কাভার নিয়েছে।

এদিকে বাইরে ক্যাটওয়াকে তিশার পাশে হাঁটু গেড়ে বসেছে রানা। চট্ করে দেখে নিল মেয়েটির মাথা। কেভলার হেলমেটের ফোরহেড গার্ড থেকে রক্তের সরু রেখা নামছে কপাল বেয়ে। এক ইঞ্চি পুরু কেভলার বর্ম ভেদ করে কপালে এসে থেমেছে রুপালি তীর, চিকচিক করছে উজ্জ্বল আলোয়। ত্বক ফুটো করে করোটির এক মিলিমিটার আগে থেমে গেছে তীর।

‘ঠিক আছে, এবার উঠে পড়ো, মেয়ে!’ তাড়া দিল রানা, নিশ্চিত নয় তিশা শুনতে পেয়েছে। চারপাশ থেকে কাভার ফায়ার দিচ্ছে ওর দলের সবাই। হ্যাঁচকা টানে তিশাকে কোলে তুলে নিল রানা, পরক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েই ছুটতে শুরু করল মেইন এণ্ট্র্যান্স টানেলের প্যাসেজওয়ে লক্ষ্য করে।

হঠাৎ কোথা থেকে উদয় হলো এক ফ্রেঞ্চ কমাণ্ডো। লোকটা আছে ডাইনিংরুমের বরফের দেয়ালের ওপাশে। এইমাত্র বুলেটে তৈরি গর্তের ভিতর দিয়ে রাইফেল বের করছে সে।

মুহূর্ত দেরি না করে তিশাকে কোল থেকে বাম কাঁধে নিল রানা, পরক্ষণে হোলস্টার থেকে ছোঁ দিয়ে তুলে নিল পিস্তল, পর পর দু'বার গুলি করল। দুর্বল আওয়াজ তোলে ফ্যাম্যাস রাইফেল, এমপি-৫ করে চাকার টিউব ফুটো হওয়ার আওয়াজ, কিন্তু মেরিনদের আই.এম.আই ডেযার্ট ঈগল অটোমেটিক পিস্তল সত্যিকারের বজ্রপাত। রানার দুটো গুলিই ঠিক জায়গায় লেগেছে— বিস্ফোরিত হলো ফ্রেঞ্চ কমাণ্ডোর মাথা, ওখানে একটা লাল বাষ্পের বল তৈরি হলো। রানা দেখেছে দু'বার লোকটার মাথা ঝাঁকি খেয়েছে, তারপর ধপ্ করে পড়ে গেছে সে।

‘জলদি ভাগুন, স্যর!’ ইয়ারপিসে হোসেন আরাফাত দবিরের কণ্ঠ শুনল রানা।

‘প্রায় পৌঁছে গেছি!’ গুলির আওয়াজের উপর দিয়ে বলল ও। ইণ্টারকমে আরেকটা কণ্ঠ শুনল। খুব ঠাণ্ডা গলা এর। ওদিকে কোনও গোলাগুলি নেই।

‘মেরিন ফোর্স, ভাইপার বলছি। আমি এখনও বাইরের পোস্টে। আরও ছয়জন ফ্রেঞ্চ কমাণ্ডো বেরুচ্ছে দ্বিতীয় হোভারক্রাফট থেকে। আবারও বলছি, পরের হোভারক্রাফট থেকে নেমেছে ছয়জন কমাণ্ডো। স্টেশনের এণ্ট্র্যান্স টানেলের দিকে যাচ্ছে।’

এক সেকেণ্ড পর ইন্টারকমে গুলির আওয়াজ শুনল রানা। ওটা ভাইপারের স্নাইপার রাইফেল।

'ভাইপার বলছি, মেরিন ফোর্স। ওরা এখন পাঁচজন। মেইন এণ্ট্র্যান্সের দিকে ছুটছে।'

কাঁধের উপর দিয়ে মেইন এণ্ট্র্যান্স টানেলের দিকে চাইল রানা। তিশাকে নিয়ে ওদিকেই ছুটবে ভেবেছিল। এই মুহূর্তে ওখানে আছে হোসেন আরাফাত দবির ও টনি কেলগ, ডাইনিংরুমের দিকে গুলি পাঠাচ্ছে। ওখানে ওই একই কাজ করছে সার্জেন্ট জর্জ মারফি।

এর এক সেকেণ্ড পর বিস্ফোরিত হলো যুবকের বুক। শক্তিশালী কোনও অস্ত্র থেকে গুলি করে ছিন্নভিন্ন করে দেয়া হয়েছে ওর পিঠ-বুক। প্রচণ্ড ঝাঁকি খেয়েছে মারফি, পাঁজরের খাঁচা থেকে ছিটকে বেরিয়েছে রক্ত। কোমর থেকে শুরু করে ঘাড় পর্যন্ত ভয়ঙ্কর আঘাতে এক ঝটকায় পিছিয়ে গেছে, তরুণ সৈনিকের মেরুদণ্ড ভাঙবার মড়াৎ আওয়াজটা স্পষ্ট শুনল রানা।

এক সেকেণ্ডের দশ ভাগের এক ভাগ সময়ে এণ্ট্র্যান্স প্যাসেজওয়ে থেকে ছিটকে বেরুল হোসেন আরাফাত দবির ও টনি কেলগ। ঘুরেই পিছন-টানেলের শত্রুদল লক্ষ্য করে গুলি পাঠাল ওরা। এক মুহূর্ত ওখানে থামল না, কয়েক কদম সরে চলে গেল সবচেয়ে কাছের রাং-ল্যাডারের সামনে, দেরি না করে নামতে শুরু করেছে বি-ডেকের দিকে।

রানা এবং ওর দলের সবার কপাল মন্দ, এইমাত্র ফিরেছে হোসেন আরাফাত দবির ও ওর দলের সবাই। হঠাৎ করেই গুলি শুরু হতে ভাল কোনও অবস্থান বেছে নিতে পারেনি কেউ। ওরা মেইন এণ্ট্র্যান্সের কাছে দুই দল ফ্রেঞ্চের মাঝে আটকা পড়েছে। পিছনে ডাইনিংরুমে একদল কমাণ্ডো, ওদিকে মেইন এণ্ট্র্যান্স দিয়ে ঢুকে পড়েছে তাদের দ্বিতীয় দল।

পরিস্থিতি বুঝতে সময় লাগেনি রানার, মাইকে বলল, 'দবির! নীচে নামুন! সবাইকে নিয়ে বি-ডেকে!'

'এখন তা-ই করছি, স্যর!'

এর চেয়ে ঢের খারাপ পজিশনে রানা ও তিশা। ওরা আছে ক্যাটওয়াকে। একপাশে ডাইনিং হল, আরেক পাশে এণ্ট্র্যান্স প্যাসেজওয়ে। কোথাও যাওয়ার নেই। কোনও দরজা নেই আড়াল নেবে। লুকাতে পারবে না কোনও প্যাসেজওয়েতে। মাত্র তিন ফুট চওড়া ধাতব ক্যাটওয়াক— একদিকে জমাট বরফের দেয়াল, অন্য দিক শুধু শূন্য, সত্তর ফুট নীচে নীল পানির পুল।

যে-কোনও সময়ে মেইন এণ্ট্র্যান্স প্যাসেজওয়ে দিয়ে ভিতরে ঢুকবে দ্বিতীয় ফ্রেঞ্চ কমাণ্ডো দল, এবং একদম সামনে পাবে রানা ও তিশাকে।

মাথার পাশে বরফ-দেয়াল বিস্ফোরিত হতেই চরকির মত ঘুরল রানা। ডাইনিংরুমে উঠে দাঁড়িয়েছে জ্যাকুস ফিউভিল, একের পর এক গুলি শুরু করেছে অ্যাসল্ট রাইফেল থেকে। ডেযার্ট ঈগল পিস্তল দিয়ে ডাইনিংরুমে ফিউভিলের দিকে পর পর ছয়বার গুলি ছুঁড়ল রানা। চট্ করে দেখে নিল মেইন এণ্ট্র্যান্স। আর বড়জোর দশটা সেকেণ্ড পাবে।

মনে মনে বলল রানা, 'কপাল মন্দ।' ওর কাঁধের উপর এলিয়ে পড়ে আছে তিশা।

ক্যাটওয়াকের রেলিঙে ঝুঁকল রানা। অন্তত সত্তর ফুট নীচে স্টেশনের পুল। ওদের বাঁচবারই কথা। কিন্তু কিলার ওয়েইল...

অন্য কোনও উপায় নেই?

পায়ের নীচের ক্যাটওয়াক দেখল রানা, তারপর চাইল পিছনের বরফ-দেয়ালের দিকে।

'মেজর, ওখান থেকে সরে যান, নইলে মরবেন!' বলে উঠেছে সার্জেন্ট জনি ওয়াকার। স্টেশনের দক্ষিণ ক্যাটওয়াকে বেরিয়ে

এসেছে সে। ওখান থেকে পরিষ্কার দেখছে উত্তর এণ্ট্র্যান্স টানেল। যা দেখছে, তাতে খুশি হওয়ার কিছু নেই।

'সরে যেতেই চেষ্টা করছি,' বলল রানা।

ডাইনিংরুমে ফিউভিলের দিকে আরও দুটো গুলি পাঠাল ও, তারপর হোলস্টারে রেখে দিল পিস্তল। কাঁধে ঝুলন্ত হোলস্টার থেকে বের করে নিল ম্যাগহুক। আর্মালাইট এমএইচ-১২ দেখতে পুরনো আমলের টমি গানের মত। দুটো পিস্তল গ্রিপ; একটা সাধারণ গ্রিপ, সঙ্গে ট্রিগার, আরেক দিকে মাযলের নীচে সাপোর্ট গ্রিপ। আসলে ম্যাগহুক একটা কমপ্যাক্ট পিস্তল, দু' হাতলওয়ালা লঞ্চার, নল দিয়ে প্রচণ্ড গতিতে ছুঁড়ে দেয় গ্র্যাপলিং হুক।

কাঁধের উপর গুটিয়ে উঠেছে তিশা। বরফ-দেয়ালের দিকে লঞ্চার তাক করল রানা, টিপে দিল ট্রিগার। জোরালো ধাতব ঘটাং আওয়াজ তুলে মাযল থেকে ছিটকে বেরুল গ্র্যাপলিং হুক, তীব্র গতি তুলে ঢুকেছে জমাট বরফের দেয়ালে, চারপাশ বিস্ফোরিত করে পৌঁছে গেছে ডাইনিংরুমে। ওদিকে পৌঁছে যেতেই খুলে গেছে ওটার আঁকশি।

'মেজর! সরে যান!'

ভাল করেই জ্ঞান ফিরেছে তিশার। প্রায় জোর করেই কাঁধ থেকে নেমে পড়ল।

'আমাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরো!' নির্দেশ দিল রানা।

'কেন?' এক পলকে লালচে হয়ে গেল তিশার গাল।

'জলদি! সময় নেই!' মেয়েটির কাঁধে দুই হাত রাখল রানা, কাছে টেনে নিল। দু'জনের ঠোঁট খুব কাছাকাছি। কেউ দেখলে ভাববে: দুই প্রেমিক-প্রেমিকা পরস্পরকে জড়িয়ে ধরেছে, এবার চুমু দেবে একে অপরকে। বামহাতে আরও শক্ত করে তিশাকে জাপ্টে ধরল রানা, ঘুরেই নিতম্ব রাখল রেলিঙে। একবার দেখে নিল মেইন এণ্ট্র্যান্স টানেল, ওখানে প্যাসেজওয়ের বরফ-দেয়ালে

কালো ছায়া। এক সেকেণ্ড পর ওখান থেকে এল গুলির আওয়াজ।

'শক্ত করে ধরো,' তিশার কানে বলল রানা।

মেয়েটির পিছনে দুই হাতে লঞ্চার শক্ত করে ধরেছে ও। গলা জড়িয়ে ধরেছে তিশা। হঠাৎ করেই পিছনে ভর দিল রানা, তারপর তিশাকে নিয়ে রেলিং টপকে নীচের দিকে পড়তে লাগল।

মুহূর্ত পর একপশলা গুলি রেলিঙে লেগে নানা দিকে ছুটে গেল। পড়তে শুরু করে কয়েক ফুট উপরে সাদা-কমলা আগুন ছিটকাতে দেখল রানা। কানের কাছে বাতাসের শোঁ-শোঁ আওয়াজ।

ওদের উপরে সরসর করে বেরুচ্ছে ম্যাগহুকের কেবল। বি-ডেক ছাড়িয়ে নেমে চলেছে ওরা, একপলক দবির ও কেলগকে দেখল, অবাক বিস্ময় নিয়ে ওদেরকে পড়তে দেখছে তারা।

তারপর লঞ্চারের সামনের গ্রিপে কালো বাটনে চাপ দিল রানা। মাযলের ভিতর দ্রুত খুলে যাওয়া কেবলকে আঁকড়ে ধরল ক্ল্যাম্পিং মেকানিজম।

প্রচণ্ড ঝটকা খেয়ে থামল রানা ও তিশা। একটু উপরে বি-ডেক। ক্যাটওয়াকের দিকে ওদেরকে দুলিয়ে নিয়ে চলেছে কেবল। কয়েক ফুট নীচে সি-ডেকের ক্যাটওয়াক, দু' সেকেণ্ড অপেক্ষা করল রানা, তারপর তিশাকে নিয়ে নেমে পড়ল ধাতব গ্যাংওয়েতে।

সি-ডেকের ক্যাটওয়াকে পা রাখতেই লঞ্চারের ট্রিগারে দু'বার চাপ দিল রানা। এ-ডেকে 'স্ন্যাপ্' আওয়াজ তুলে সঙ্কুচিত হলো গ্র্যাপলিং হুকের আঁকশি, ডাইনিংরুমের দেয়ালে নিজের তৈরি গর্তের ভিতর দিয়ে বেরিয়ে এল। আইস স্টেশনের বিশাল শাফটে পড়তে শুরু করেছে। ওটাকে নিজের পেটে টেনে নিচ্ছে লঞ্চার। পাঁচ সেকেণ্ড পর আবারও ছুঁড়বার অবস্থায় পৌঁছে গেল যন্ত্রটা।

তিশাকে নিয়ে সবচেয়ে কাছের ডোরওয়ের দিকে রওনা হলো রানা।

দশ

'গ্রেনেড!'

বি-ডেকের উত্তর টানেল ধরে ছুটছে হোসেন আরাফাত দবির ও টনি কেলগ, বাঁক ঘুরেই ঝাঁপিয়ে পড়ল সামনের মেঝেতে।

পিছনে বিকট আওয়াজে বিস্ফোরিত হলো গ্রেনেড, থরথর করে কেঁপে উঠেছে গোটা টানেল। বিস্ফোরণের এক মুহূর্ত পর এল জোরালো কংকাশন ওয়েভ। সঙ্গে এল তীব্র গতিতে সুইয়ের মত কালো কী যেন, ছিটকে গেল দুই সৈনিকের উপর দিয়ে, লাগল উল্টো দিকের দেয়ালে।

হতবাক বিস্ময় নিয়ে পরস্পরের দিকে চাইল দুই সৈনিক।

এইমাত্র ফ্র্যাগমেন্টেশন গ্রেনেড ফেটেছে।

ওটা সাধারণ বিস্ফোরকই, কিন্তু পেটের ভিতর থাকে অসংখ্য ছোট ধাতব টুকরো, প্রতিটি ছোরার মত ধারালো, একবার গায়ে বিঁধলে খুঁটে বের করা ডাক্তারদের পক্ষে প্রায় অসম্ভব। বিস্ফোরিত হলে চারদিকে ছিটকে পড়ে টুকরোগুলো।

'আমি আগেই ভেবেছি,' শুকনো স্বরে বলল টনি কেলগ, এমপি-৫-এর রিসিভারে নতুন ম্যাগাজিন ভরল সে। 'অনেককে বলেওছি, ওই চুতিয়া ফ্রেঞ্চদের বিশ্বাস করা যায় না। ওদের ভিতর কী যেন আছে। ওই খুদে চোখ, সাপের মত চাহনি... আর কুত্তার বাচ্চারা নাকি আমেরিকার মিত্র!'

'আরেকটু হলে শেষ করে দিয়েছিল,' বলল দবির।

উঠে দাঁড়িয়ে আবার বাঁকের কাছে চলে গেছে কেলগ, খুব সাবধানে ওদিকে উঁকি দিল। আড়ষ্ট হয়ে গেল ওর চেহারা। 'হায় যিশু...'

'কী হয়েছে?' জিজ্ঞেস করল দবির।

আর কিছু জানতে হলো না তাকে। নিজেই বুঝে গেল। ঠক্-ঠকাস্ আওয়াজ তুলে বাঁক পেরিয়ে এসেছে দ্বিতীয় গ্রেনেড। ওদের দু'জনের মাঝে পাঁচ ফুট দূরে এসে থেমেছে!

ওরা দু'জন খোলা টানেলে। কোথাও যাওয়ার নেই। পালাবে কোথায়? ঝেড়ে দৌড় দিলেও করিডোর পেরুতে পারবে না। তার অনেক আগেই ফাটবে গ্রেনেড।

ওটা দেখেই দু'হাতের জোরে সরসর করে পিছলে এগিয়েছে দবির। দেখলে কেউ বলবে পাকা ডিফেণ্ডার, স্লাইডিং ট্যাকল করে শত্রুর পা থেকে সরিয়ে দিতে চাইছে ফুটবল। কিন্তু আওতার ভিতর গ্রেনেড পেয়ে যেতেই স্লাইডিং ট্যাকল করল না সে, জীবনের সেরা কিক দিল বাম পায়ে, খট্-খটাং আওয়াজ তুলে উত্তর টানেলে ফিরল গ্রেনেড, ছুটে চলেছে সেণ্ট্রাল শাফট লক্ষ্য করে। পিছলে বাঁক পেরিয়ে গেল দবিরও।

সামনে বেড়ে খপ্ করে তার কাঁধ ধরল কেলগ, বাঁকের এপাশে টেনে এনে দাঁড় করিয়ে দিল। আধ সেকেণ্ড পর বিকট আওয়াজে ফাটল গ্রেনেড। দ্বিতীয়বারের মত সামনের দেয়ালে লাগল অসংখ্য ধাতুর ধারালো টুকরো।

'শালার ফ্রেঞ্চ চুতিয়ারা...' ঢোক গিলল কেলগ। 'আমরা এবার ফেঁসে গেছি!'

'বাছা, ছুটতে শুরু করো, ভাগতে হবে,' পরামর্শ দিল দবির। চট্ করে চাইল উত্তর টানেলের দিকে। ওখানে দেখতে পেল ক্যাপ্টেন নিশাত সুলতানাকে। এইমাত্র বাঁক ঘুরেছে সে। তার

সঙ্গে দুই কর্পোরাল নাজমুল ও হলিডে স্যাম্পসন। বি-ডেকের পশ্চিম দিক দিয়ে ঘুরে এসেছে তারা।

সামনে দলের দু'জনকে দেখে থমকে গেছে নিশাত, পরক্ষণে চড়া কণ্ঠে বলল, 'সবাই শুনে নাও, চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে হবে। নইলে একসঙ্গে মোরব্বা হব। কর্পোরাল নাজমুল, কর্পোরাল হলিডে আর আমি আবারও পশ্চিমে ফিরব, ঘুরে চলে যাব বাইরের দিকের টানেলে। কেলগ আর আপনি সার্জেন্ট দবির যাবেন পুবে। আমরা যখন নিশ্চিত হবো ভাল পজিশনে পৌঁছেছি, তখন ভাবতে শুরু করব কীভাবে সবার সঙ্গে যোগ দেয়া যায়। এরপর হারামজাদার দলকে কোণঠাসা করব। সবাই আমার কথা বুঝতে পেরেছে?'

কেউ কোনও কথা বলল না, আপত্তি নেই যোগ্য ক্যাপ্টেনের কথা মেনে নিতে। নিশাতের সঙ্গে উল্টো দিকের বরফ টানেলে ঢুকে পড়ল দুই কর্পোরাল।

বাইরের দিকের টানেল ক্রমেই বেঁকে গেছে, পুব দিকে ছুটে চলেছে দবির ও কেলগ। দৌড়ের ফাঁকে বলল দবির, 'ঠিক আছে... এটা কী? বি-ডেক, তাই না? এখানে কী আছে?'

'আমি জানি না...' আরও কিছু বলতে গিয়ে থেমে গেল কেলগ, টানেলের বাঁকে পৌঁছে গেছে।

দু'জনই থমকে দাঁড়িয়েছে ওরা, পরস্পরের দিকে চাইল। আরও কালো হয়ে গেছে কেলগের মুখ।

উইলকক্স আইস স্টেশনের মাঝের শাফট লক্ষ্য করে গুলি পাঠাল মাসুদ রানা।

লেফটেন্যান্ট তিশা করিম এবং ও আছে সি-ডেকে, একটা ঘরের ভিতর। খোলা দরজার ওপাশে মাঝের ক্যাটওয়াক। চৌকাঠে এসে দাঁড়িয়েছে রানা, হাতে উদ্যত পিস্তল, মূল শাফট

দিয়ে দেখা যায় উপরের এ-ডেক।

রানার পিছনে ঘরের ভিতর হাঁটু গেড়ে বসেছে তিশা, ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে সচেতন হয়ে উঠতে চাইছে। হেলমেট খুলে ফেলেছে, পিঠে এলিয়ে পড়েছে কালো চুলের দীর্ঘ দুটো বেণী। কৌতূহল নিয়ে হেলমেট ও তীর দেখল তিশা। আস্তে করে মাথা নাড়ল। হেলমেট থেকে তীর খুলল না, আবার পরে নিল। কপালে ও গালে রয়ে গেল শুকনো রক্তের দাগ। গম্ভীর চেহারায় শক্ত করে ধরল এমপি-৫, উঠে দাঁড়িয়ে চলে গেল রানার পাশে।

'ঠিক আছ?' কাঁধের উপর দিয়ে জানতে চাইল রানা। পিস্তল তাক করেছে এ-ডেকের দিকে।

'আমি কিছু মিস করেছি, স্যর?'

'তোমার কি মনে আছে একদল ফ্রেঞ্চ ভাব করছে তারা বিজ্ঞানী, তারপর আমাদের উপর গুলি শুরু করল?' এ-ডেকের দিকে এক রাউণ্ড গুলি পাঠাল রানা।

'তা মনে আছে।'

'আমরা তখন জানলাম, হোভারক্রাফট নিয়ে স্টেশনে ঢুকেছে ওদের আরও ছয়জন কমাণ্ডো।'

'এটা জানতাম না।'

'আর কিছু বলার...' আরেকটা গুলি পাঠাল রানা, 'নেই।'

পাশ থেকে রানার চোখের দিকে চাইল তিশা।

ওই দুই মায়াবী কালো চোখে নিজের উপর বিরক্তি। নিজেকে দোষ দিয়ে চলেছে। ফ্রেঞ্চ কমাণ্ডোরা সত্যিকারের রূপ দেখিয়েছে, কিন্তু সেজন্য তাদের উপর রাগ নেই। রাগ ওর নিজের উপর। আগেই বোঝা উচিত ছিল এরা বিজ্ঞানী নয়, খুনে সৈনিক।

আনমনে মাথা দোলাল তিশা।

রানা মানতে পারছে না, এরা উইলকক্স আইস স্টেশনে আগে এসেছে, সঙ্গে এনেছে সত্যিকারের দু'জন বিজ্ঞানীকে, কাউকে

সন্দেহ করবার কোনও সুযোগই দেয়নি।

মানুষটা নিজের উপর আরও খেপেছে, কারণ লড়াইয়ের শুরুতে কোনও পরিকল্পনা করতে পারেনি। ওদেরকে প্রথম থেকেই বোকা বানিয়েছে ফ্রেঞ্চরা, বেকায়দা অবস্থায় ফেলেছে। আর এখন তো লড়াই কীভাবে চলবে সেটা তারাই ঠিক করছে।

কিন্তু আসলে কিছুই করবার ছিল না মাসুদ রানার।

তিশার মন চাইল ওকে সান্ত্বনা দিতে। কিন্তু চুপ রইল।

এদিকে নিজেকে দোষ দেয়া বন্ধ করেছে রানা, পরিষ্কার টের পেয়েছে মগজে ক্রোধ জমলে একের পর এক ভুল করবে। ওর মনে পড়ছে তিন বছর আগে লণ্ডনে ছিল, বিসিআইয়ের চিফ ওকে যোগ দিতে বলেন একটা সেমিনারে। উনি বলে দেন, ওখানে অনেক কিছু শিখতে পারবে। ওই সেমিনারে বক্তৃতা দেন লিজেণ্ডারি ব্রিটিশ কমাণ্ডার, মেজর জেনারেল জুলিয়াস বি. গুণ্ডারসন।

শক্তিশালী দেহের লোক, বাদামি দুই চোখে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, গোটা মাথা কামানো, থুতনির নীচে কুচকুচে কালো ছোরার মত দাড়ি। জুলিয়াস বি. গুণ্ডারসন দু' হাজার সাল থেকে এখনও এসএএস-র প্রধান। ধারণা করা হয় তিনি বর্তমান বিশ্বে সবচেয়ে প্রতিভাবান ফ্রন্ট-লাইন মিলিটারি ট্যাকটিশিয়ান। ওই সেমিনার শেষে রানা মেনে নিয়েছে, ছোট দল নিয়ে শত্রু এলাকায় ঢুকে বিজয়ী হওয়ার স্ট্র্যাটেজি সত্যিই তাঁর তুলনাহীন। অবশ্য সঙ্গে থাকতে হবে এসএএস-র মত এলিট যোদ্ধা ইউনিট। গুণ্ডারসন কালে কালে হয়ে উঠেছেন ব্রিটিশ মিলিটারির গর্ব। শোনা যায় তাঁর অধীনে আজ পর্যন্ত এসএএস কোনও মিশনে ব্যর্থ হয়নি।

দু'বছর আগে আবারও লণ্ডনে ওকে দু' দিনের একটি সেমিনারে যোগ দিতে বলেন বিসিআই চিফ মেজর জেনারেল (অব.) রাহাত খান। কমন ওয়েল্‌থ্ দেশগুলোর সেনাবাহিনী থেকে

সেরা অফিসারদের পাঠানো হয় ওই সেমিনারে। তবে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য নয়, কভার্ট ওয়ারফেয়ার সম্বন্ধে জ্ঞান নিতে।

ওই সেমিনারে শেষ বক্তা ছিলেন এসএএস-এর চিফ মেজর জেনারেল গুণ্ডারসন। তাঁর গভীর জ্ঞান ও সন্দেহাতীত যোগ্যতার পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হয় রানা। অনেকেই তাঁকে একের পর এক প্রশ্ন করে কাবু করতে চেয়েছে, কিন্তু খুব সহজ ভঙ্গিতে উত্তর দেন তিনি। প্রতিটা কথার ভিতর ছিল তীক্ষ্ণ সব যুক্তি।

রানার এখনও মনে পড়ে, তিনি বলেছিলেন, 'লড়াই শুরু হলে আপনার মনে প্রথম প্রশ্ন জেগে ওঠা উচিত: শত্রু আসলে কী চায়? যদি এই প্রশ্নের জবাব মেলে, মনকে দ্বিতীয় প্রশ্ন করুন: শত্রু কীভাবে পেতে চাইছে জিনিসটা?

'নিজেই বুঝবেন, প্রথম প্রশ্নের চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ দ্বিতীয় প্রশ্ন। বলতে পারেন, তা কীভাবে? ধরুন, জিনিসটা যদি তার কাছে গুরুত্বপূর্ণ না-ই হয়, তো কী কারণে চাইছে? আপনাকে বুঝতে হবে, কারণ যাই হোক, ওটা পাবার জন্য জান বাজি ধরেছে সে। এটা বোঝা খুব জরুরি। এ থেকেই বুঝবেন, শুরু হয়ে গেছে লড়াই। আর সে লড়াই আপনার শেষ করতে হবে।

'একবার দ্বিতীয় প্রশ্নের জবাব মিললে তৃতীয় প্রশ্ন আসে: কীভাবে এদেরকে ঠেকাবেন?'

এরপর নেতৃত্বের উপর বক্তৃতা দেন গুণ্ডারসন, বারবার বলেন মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হবে, যৌক্তিক পথে ভাবতে হবে। রাগী নেতা মানেই বোকা নেতা, সে একের পর এক ভুল করে খতম করবে তার দলকে।

'আপনারা সামরিক নেতা,' বলেছেন গুণ্ডারসন, 'আপনাদের পক্ষে রেগে ওঠা বা বোকা বনার সুযোগ নেই।'

কোনও নেতা রাগ বা ভুল থেকে মুক্ত নয়, কাজেই এরপর গুণ্ডারসন তাঁর তিন ধাপের ট্যাকটিক্যাল অ্যানালিসিস পেশ

করেন।

'আপনি যখন রেগে গেলেন, এই তিন ধাপের অ্যানালিসিস ব্যবহার করুন। রাগের বিষয়টি থেকে নিজের মন সরিয়ে নিন, শেষ করুন হাতের কাজ। তা হলে ভুলতে পারবেন কী রাগিয়ে দিয়েছিল। এরপর যে কাজে আপনাকে বেতন দেয়া হয়, সেটা শুরু করুন।'

ওই সেমিনার শেষে মেজর জেনারেল গুণ্ডারসনের অধীনে ট্রেইনিং নেয় কয়েকজন সেরা অফিসার, তাদের ভিতর রানাও ছিল। অনেক কিছুই শিখতে পেরেছে তাঁর কাছ থেকে।

এখন বরফ-ঠাণ্ডা উইলকক্স আইস স্টেশনের সি-ডেকে একটা দরজার চৌকাঠে দাঁড়িয়ে ভাবছে রানা, মনের ভিতর কথা বলে চলেছেন মেজর জেনারেল জুলিয়াস বি. গুণ্ডারসন।

বড় করে শ্বাস ফেলল রানা।

এরা কী চায়?

একটা স্পেসশিপ।

ওটা পাবে কীভাবে?

ওদের সবাইকে খুন করবে, তারপর তুলে আনবে স্পেসশিপ, কোনও দেশ বুঝবার আগেই ওটাকে সরিয়ে ফেলবে এই মহাদেশ থেকেই।

কিন্তু এই অ্যানালিসিসে একটা সমস্যা আছে। খুঁতটা ধরতে পেরেছে রানা।

বড় দ্রুত এখানে হাজির হয়েছে ফ্রেঞ্চরা।

এবং এতই দ্রুত, ইউনাইটেড স্টেট্স্ কোনও দল পাঠাবার আগেই পৌঁছে গেছে তারা। এ থেকে বোঝা যায় উইলকক্স আইস স্টেশন থেকে ডিসট্রেস সিগনাল ছড়িয়ে পড়বার সময় কাছেই ছিল তারা। অর্থাৎ, রাফায়লা ম্যাকানটায়ার যখন সিগনাল পাঠাল, তার আগেই ডুমো ডি'খ-ঈলেখে ছিল ফ্রেঞ্চ কমাণ্ডোরা।

আগে থেকে কারও বুঝবার উপায় ছিল না ওই সিগনাল পাঠানো হবে। কাজেই, ওটা হঠাৎ করেই ঘটে।

আর এই অ্যানালিসিসের সমস্যা এখানেই।

ফ্রেঞ্চরা সামনে মস্ত একটা সুযোগ দেখতে পেয়েছে, এবং সুযোগটা নেয়ার জন্য মুহূর্তের নোটিসেই হামলে পড়েছে।

ডুমো ডি'খ-ঈলেখে নিশ্চয়ই আর্কটিক ওয়ারফেয়ার বা এ ধরনের কোনও এক্সারসাইজে ব্যস্ত ছিল ফ্রেঞ্চ কমাণ্ডোরা।

তারপর উইলকক্স আইস স্টেশন থেকে ডিসট্রেস সিগনাল ধরল ডুমো ডি'খ-ঈলেখ স্টেশন। খবর পাওয়ামাত্র ফ্রেঞ্চ সরকার বুঝে নিল, উইলকক্স আইস স্টেশনে রয়েছে এক্সট্রা-টেরেস্ট্রিয়াল স্পেসশিপ, এবং তাদের এলিট মিলিটারি ইউনিট আছে মাত্র ছয় শ' মাইল দূরে।

এ সুযোগ ছাড়া যায়?

ফ্রান্স মুঠোর মধ্যে পেয়ে যাবে অকল্পনীয় প্রকৌশলগত উন্নতির সম্ভাবনা। এক পলকে পাল্টে যেতে পারে তাদের প্রপালশান সিস্টেম, হয়তো বদলে যাবে বিমানের আকৃতিও। তারা পেয়ে যেতে পারে অত্যন্ত আধুনিক, ঈর্ষণীয় অস্ত্র সম্ভার।

আসলে এর আগে কোনও জাতির সামনে এমন মোক্ষম সুযোগ আর আসেনি।

আরও ভাল দিক: ফ্রেঞ্চরা যদি উইলকক্স আইস স্টেশন থেকে স্পেসশিপ সরিয়ে ফেলতে পারে, চাইলেও আমেরিকান সরকার ইউএন বা ফ্রেঞ্চ সরকারের কাছে কেঁদে পড়তে পারবে না, কাউকে বলতে পারবে না আমেরিকার হাতে স্পেসশিপ ছিল। যা কখনও তাদের কাছে ছিলই না, তা চুরি হয়েছে, এমন কথা কী করে বলবে!

দুটো সমস্যা তৈরি হয়েছে ফ্রেঞ্চ কমাণ্ডোদের সামনে।

প্রথম সমস্যা: উইলকক্স আইস স্টেশনের বাঙালি ও

আমেরিকান বিজ্ঞানী, তাদেরকে মেরে ফেলতে হবে। কোনও সাক্ষী রাখা চলবে না।

দ্বিতীয় সমস্যা গুরুতর: সন্দেহ নেই ইউনাইটেড স্টেট্স্ উইলকক্স স্টেশনে রিকনিস্যান্স ইউনিট পাঠাবে। এদিকে টিকটিক করে এগিয়ে চলেছে সেকেণ্ডের কাঁটা। ফ্রেঞ্চরা বুঝতে পেরেছে, যত দ্রুত সম্ভব ইউএস ট্রুপ হাজির হবে, এবং তা ঘটবে স্পেসশিপ সরিয়ে নেয়ার আগেই।

তার মানেই: তুমুল গোলাগুলি।

কপালের জোরে ঠিক সময়ে নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছেছে ফ্রেঞ্চ কমাণ্ডো দল। কিন্তু তাদের পক্ষে উইলকক্স আইস স্টেশনে ফুল-স্ট্রেংথ অ্যাসল্ট চালানো সম্ভব নয়। হতে পারে, তারা স্পেসশিপ সরিয়ে নেয়ার আগেই তাদের ট্রুপ হয়ে উঠবে অসহায়, অনেক বড় কোনও দল পাঠাবে ইউএসএ।

কাজেই তাদেরকে অন্য পরিকল্পনা করতে হয়েছে।

কমাণ্ডোরা ভান করেছে, তারা বিজ্ঞানী, প্রতিবেশীদের সাহায্য করতে এসেছে। তারা ধারণা করেছে, ছোট কোনও দল এলে বোকা বানাতে পারবে, এবং প্রথম সুযোগেই সবাইকে খুন করতে পারবে। অপেক্ষাকৃত দুর্বল ও ছোট দলের জন্য এটা মন্দ পরিকল্পনা নয়।

সেক্ষেত্রে মাত্র একটি প্রশ্ন থাকে: অ্যাণ্টার্কটিকা থেকে কীভাবে স্পেসশিপ সরাবে?

আপাতত ওই প্রশ্নের জবাব না পেলেও চলবে, ভাবল রানা। এখন লড়াইয়ে মন দেয়া উচিত। আবারও প্রথম প্রশ্ন ফিরল মনে: ওরা কী চাইছে?

বিজ্ঞানী এবং ওদেরকে খুন করতে চাইছে, যত দ্রুত সম্ভব।

তা কীভাবে করবে?

মন থেকে কোনও জবাব পেল না রানা। নিজেকে জিজ্ঞেস

করল, আমি হলে কী করতাম?

মুহূর্ত পর ওর মন বলে দিল: তুমি সবাইকে তাড়িয়ে এক জায়গায় নেবার চেষ্টা করতে। সেক্ষেত্রে গোটা স্টেশন খুঁজে সবাইকে খুন করতে হতো না।

'গ্রেনেড!' চেঁচিয়ে উঠল তিশা।

কাঁধে মৃদু ঝাঁকি খেয়ে বাস্তবে ফিরল রানা। এ-ডেক থেকে উড়ে নামছে কালো গ্রেনেড, আসছে ঠিক ওদের দিকেই। উপর থেকে পড়ছে আরও ছয়টা গ্রেনেড। ওগুলো ঢুকে গেল বি-ডেকের তিন টানেলের ভিতর।

'সরে আসুন, স্যর!'

তিশার ডাক শুনে পিছিয়ে ঘরে ঢুকে পড়ল রানা, চট্ করে বন্ধ করে দিল কবাট। কয়েক লাফে পৌঁছে গেল ওরা ঘরের আরেক প্রান্তে। পুরু কাঠের দরজার উপর ঠকাস্ আওয়াজ তুলল গ্রেনেড।

একমুহূর্ত পর বোমা বিস্ফোরিত হলো বিকট আওয়াজে। দরজার ভিতর অংশ থেকে নানা দিকে ছুটল সাদা কাঠের চল্টা। সে জায়গায় দেখা গেল কয়েক শ' তীক্ষ্ণধার ধাতুর টুকরো, একেকটা পেরেকের ডগার মত।

চমকিত রানা দেখল দরজার একেবারে নীচ থেকে শুরু করে উপর অংশ ঝাঁঝরা হয়েছে। একটু আগে কাঠের কবাট ছিল মসৃণ, এখন মনে হচ্ছে ওটা ভয়ঙ্কর কোনও মেডিইভেল টর্চার ডিভাইস। গোটা দরজা জুড়ে খুদে বর্শার ফলা, প্রায় বেরিয়ে এসেছে পুরু কবাট ভেদ করে।

উপরে বি-ডেকে বিস্ফোরণের আওয়াজ। বি-ডেক, ভাবল রানা, ওখানে সবাইকে জড় করতে চাইছে ফ্রেঞ্চরা।

ওর শুকনো মুখ দেখে জানতে চাইল তিশা, 'কী ভাবছেন, স্যর?'

কোনও জবাব দিল না রানা, সামনে এগিয়ে খুলে ফেলল দরজা, উঁকি দিল আইস স্টেশনের সেণ্ট্রাল শাফটে। মুহূর্ত পর মাথার পাশে, খট্-খট্ আওয়াজে দরজার চৌকাঠে লাগল দুটো বুলেট। পাত্তা দিল না রানা, সামান্য আড়াল নিয়ে উপরের এ-ডেকের দিকে চাইল।

ক্যাটওয়াকের উপর দফায় দফায় গুলি ছুঁড়ছে পাঁচ ফ্রেঞ্চ কমাণ্ডো, উদ্দেশ্য কাভার ফায়ার দেয়া।

সেই সুযোগে নেমে আসছে বাকি পাঁচ কমাণ্ডো। মাত্র কয়েক সেকেণ্ডে মই বেয়ে নেমে এল তারা, বি-ডেকের ক্যাটওয়াকে পৌঁছে গেল। হাতে উদ্যত অস্ত্র নিয়ে ঢুকে পড়ল টানেলগুলোর ভিতর।

ওদিকে চেয়ে অস্বস্তি বোধ করল রানা। উপর থেকে ফ্রেঞ্চ কমাণ্ডোরা তাড়া দেয়ায় ওর দলের প্রায় সবাই আছে ওই বি-ডেকে।

এ ছাড়া আরেকটা বিষয় খুব জরুরি।

উইলকক্স আইস স্টেশনে প্রধান লিভিং এরিয়া বি-ডেক, ওখানে যার যার কোয়ার্টারে আমেরিকান বিজ্ঞানীদেরকে পাঠিয়ে দিয়েছে ও। এরপর ওরা দেখতে গেছে ফ্রেঞ্চ হোভারক্রাফট নিয়ে কারা এল।

চিন্তিত রানা চেয়ে আছে বি-ডেকের দিকে। ওদেরকে ওইখানে জড়ো করতে চাইবে ফ্রেঞ্চ কমাণ্ডোরা!

হঠাৎ করেই বদলে যেতে শুরু করেছে বি-ডেকের পরিস্থিতি।

বরফের টানেলের বাঁকে পৌঁছেই চমকে গেছে হোসেন আরাফাত দবির ও টনি কেলগ। ওদিক থেকে আসছে উইলকক্স আইস স্টেশনের বাসিন্দারা।

চট্ করে হোসেন আরাফাত দবিরের মনে পড়ল বি-ডেক

হচ্ছে এদের লিভিং এরিয়া।

পিছনে সাবমেশিন-গানের গর্জন শুরু হয়েছে।

হেলমেট ইন্টারকমে মাসুদ রানার কণ্ঠ শুনল দবির: 'প্রত্যেক ইউনিট, আমি মেজর মাসুদ রানা। এইমাত্র পাঁচ ফ্রেঞ্চ কমাণ্ডো নেমেছে ক্যাটওয়াকে। আবার বলছি, ওরা পাঁচজন। তোমরা বি-ডেকে সতর্ক হও।'

দ্রুত ভাবতে শুরু করেছে দবির, কী যেন বি-ডেকের ফ্লোর প্ল্যান! ওর মনে পড়ল, অন্য লেভেলের সঙ্গে সামান্য তফাৎ আছে বি-ডেকের। অন্য সব ফ্লোরে সেন্ট্রাল শাফট থেকে এসেছে চারটে টানেল, তারপর রয়েছে বাইরের গোলাকার টানেল, কিন্তু বি-ডেক তা নয়। পাথরের মস্ত একটি স্তরের কারণে দক্ষিণে কোনও সুড়ঙ্গ খোঁড়া যায়নি বি-ডেকে।

অন্য সব লেভেলের মত নয়, বি-ডেকে প্রধান শাফট থেকে এসেছে মাত্র তিনটি টানেল, বাইরের দিকের টানেল কোনও বৃত্ত তৈরি করেনি। এর ফলে দক্ষিণ টানেল হঠাৎ করেই বুজে গেছে। দবিরের মনে পড়ল, আগেও ওদিকটা দেখেছে: টানেলের শেষে একটি ঘর, আর ওখানেই আটকে রাখা হয়েছে বাঙালি বিজ্ঞানী রাশেদ হাবিবকে।

আপাতত বাইরের দিকের টানেলে রয়েছে দবির ও কেলগ, পুব টানেলের বাঁক পেরুলে পা রাখবে উত্তর টানেলে। গোলাগুলির বিকট আওয়াজ শুনে বেরিয়ে এসেছে বিজ্ঞানীরা, অবশ্য বেশি দূর যাওয়ার সাহস হয়নি। ফ্যাকাসে হয়ে গেছে সবার মুখ, তাদের ভিতর ছোট্ট এক মেয়েকে দেখতে পেল দবির।

'হায় আল্লা,' বিড়বিড় করে বলল সে। পরক্ষণে কেলগকে বলল, 'পিছনে টানেল কাভার দাও।' বোঝাতে চেয়েছে কেউ যেন বাইরের এই টানেল থেকে উত্তর টানেলে ঢুকতে না পারে।

নিজে বিজ্ঞানীদের পেরিয়ে গেল দবির, নজর রাখল পুব টানেলে। পিছন না ফিরেই বলল, 'লেডিজ অ্যাণ্ড জেণ্টলম্যান, আপনারা যার যার ঘরে ফিরে যান! জলদি!'

'এখানে কী হচ্ছে?' রাগত কণ্ঠে জানতে চাইল একজন বিজ্ঞানী।

'আপনাদের বন্ধুরা মোটেই বন্ধু ছিল না,' বলল সার্জেন্ট দবির। 'আপনাদের স্টেশনের ভিতর একদল ফ্রেঞ্চ প্যারাট্রুপার নিয়ে ঢুকেছে ওরা। সামনে পেলে খুন করবে আপনাদেরকে। এবার নিজের ঘরে ফিরে যান।'

'সার্জেন্ট, গ্রেনেড!' করিডোরের দূর-প্রান্তে চেঁচাল কেলগ।

চোখের কোণে দবির দেখল এইমাত্র বাঁক পেরুল কেলগ, তীরের মত আসছে ওর দিকেই। আরও চোখে পড়ল বিশ ফুট পিছনে ড্রপ খেয়েছে ফ্র্যাগমেন্টেশন গ্রেনেড।

'শালার কপাল!' চরকির মত ঘুরল দবির, পুব টানেলের বাঁক কমপক্ষে দশ গজ দূরে!

ঠিক তখনই পুব টানেল থেকে এল আরও দুটো গ্রেনেড। বাইরের দিকের টানেলের দুই মুখে পড়েছে সব মিলে তিনটে গ্রেনেড!

'ফ্রেঞ্চ কুত্তার-বাচ্চারা!' বিস্ফারিত হলো দবিরের দুই চোখ। কাছের দরজার কবাট খুলতে শুরু করেছে ও, ধমকে উঠল বিজ্ঞানীদেরকে, 'শালারপো শালারা, ঘরে ঢোক্! এক্ষুনি! যে যার ঘরে!'

এক সেকেণ্ড পর বিজ্ঞানীরা বুঝল সে কী বলছে, পরক্ষণে যে যার দরজার দিকে ঝেড়ে দৌড় দিল।

সামনের দরজা দিয়ে ঢুকে পড়ল দবির, পরক্ষণে উঁকি দিল কেলগ কী করছে দেখতে। বাঁকা টানেল ধরে সিক্স মিলিয়ন ডলার ম্যানের গতি তুলে ছুটে আসছে তরুণ কর্পোরাল।

তারপর পা পিছলে গেল তার।

বেকায়দা ভাবে হুমড়ি খেয়ে পড়ে সর-সর করে পিছলে চলেছে বরফের মেঝেতে।

অসহায় চোখে কেলগের দিকে চেয়ে রইল দবির। লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াতে গেল কালো ছেলেটা, তারই ফাঁকে চাইল পিছনের ফ্র্যাগমেন্টেশন গ্রেনেডের দিকে।

আর বড়জোর দুই সেকেণ্ড বাকি।

দুশ্চিন্তা করতে গিয়ে দবিরের পেটের পেশি জট্ পাকিয়ে গেল।

বাঁচবে না টনি কেলগ। ছেলেটাকে ভাল লেগেছিল ওর।

সবচেয়ে কাছের দরজা দিয়ে ঢুকতে চাইছে দুই বিজ্ঞানী। পিছনের জন গুঁতো দিচ্ছে সঙ্গীর পিঠে। যেভাবে হোক ঘরে ঢুকতে হবে।

মহা আতঙ্ক নিয়ে কেলগের দিকে চেয়ে আছে দবির। দুই বিজ্ঞানীকে ঠেলাঠেলি করতে দেখেছে কেলগ, বুঝে গেছে ওই ঘরে আর ঢুকতে পারবে না। বাইন মাছের মত গা মুচড়ে ঘুরে চাইল, তিরিশ ফুট দূরে টানেলের বাঁকে ফ্র্যাগমেন্টেশন গ্রেনেড!

উন্মাদ হয়ে উঠল কেলগ, ঘুরেই চাইল দবিরের চোখে। দু'জনের চোখ আটকে গেছে পরস্পরের উপর। ভীষণ ভয় কেলগের চোখে, বুঝে গেছে মরতে যাচ্ছে ও এখুনি।

কোথাও যাওয়ার নেই। কোথাও না!

তারপর বিকট আওয়াজে ফাটল তিন গ্রেনেড— উত্তর টানেলে একটা, পুব টানেলে দুটো— পেটের সব বিষ ঝাড়ল। চৌকাঠ ছেড়ে পিছিয়ে গেল দবির, চোখের সামনে দেখল দু'দিকে ছুটছে চকচকে ধাতুর টুকরো!

এগারো

পুরু কাঠের ওপাশে থরথর করে কেঁপে উঠল মেঝে, আবারও দরজায় বিঁধল শ্র্যাপনেল। সি-ডেকে সামনের দিকের একটা ঘরে অ্যালুমিনিয়ামের টেবিল কাত করে তার পিছনে আড়াল নিয়েছে রানা ও তিশা।

'দলের সবাই, তোমরা কোথায়?' ইণ্টারকমে জানতে চাইল রানা।

শুনতে পেল কয়েকটি কণ্ঠ, ওপাশে গুলির আওয়াজ।

'ক্যাপ্টেন নিশাত সুলতানা বলছি, আমার সঙ্গে কর্পোরাল নাজমুল ও হলিডে সিম্পসন, বি-ডেকের উত্তর-পশ্চিম থেকে তুমুল গুলির মুখে পড়েছি!'

জোরালো স্ট্যাটিক শুরু হলো রানার ইয়ারপিসে।

'... দবির... কেলগ পড়ে গেছে। পুব টানেলে...' হঠাৎ বন্ধ হলো হোসেন আরাফাত দবিরের কণ্ঠ, পরক্ষণে হারিয়ে গেল সিগনাল।

'ওয়াকার বলছি... সঙ্গে লেফটেন্যাণ্ট গোলাম মোরশেদ, এখনও এ-ডেকে। কিন্তু গুলির মুখে বেরুতে পারছি না।'

সার্জেণ্ট পল সিংগার জানাল, 'ভাইপার... আমি বাইরে, মেইন এণ্ট্র্যান্সের দিকে আসছি।'

কেলগের কাছ থেকে কোনও সাড়া নেই। এরই ভিতর মারা পড়েছে জর্জ মারফি ও কেভিন হাক্সলে। মনে মনে হিসাব কষছে

রানা, ওরা তিনজন মারা গেছে, তার মানে ওকে নিয়ে দলে আছে মাত্র নয়জন। এদিকে ফ্রেঞ্চরা ছিল বারোজন, সঙ্গে হেলপার দুই বিজ্ঞানী। পল সিংগার আগেই বলেছে, বাইরে একজনকে মেরেছে সে। রানা নিজে ডাইনিংরুমে একজনকে শেষ করেছে। তার মানে ফ্রেঞ্চ কমাণ্ডোরা এখন দশজন। সঙ্গে দুই বিজ্ঞানী, তারা কোথায় কে জানে!

বর্তমানে ফিরল ওর মন। চোখ পড়ল কাঠের প্রকাণ্ড দরজার উপর। কবাটে গেঁথে আছে অসংখ্য চকচকে রুপালি খুদে বর্শার ফলা। তিশার দিকে চাইল রানা। 'আমরা এখানে থাকতে পারব না।'

'আমারও তাই মনে হয়, স্যর,' শুকনো গলায় বলল তিশা।

দ্বিতীয়বার তিশার দিকে চাইল রানা। মেয়েটা আসলে কী বোঝাতে চাইছে? আর কোনও কথাও বলছে না। তারপর ওর কাঁধের উপর দিয়ে ওদিকটা দেখিয়ে দিল।

প্রথমবারের মত ঘরে চোখ বোলাল রানা। এর আগে খেয়াল করবার সময় ছিল না।

মনে হলো এটা কোনও বয়লার রুম। ছাত জুড়ে অসংখ্য কালো পাইপ। ঘরের ডানপাশ জুড়ে একটার উপর আরেকটা সাদা রঙের বিশাল দুটো সিলিণ্ডার। ওই দুই সিলিণ্ডার দৈর্ঘ্যে কমপক্ষে বারো ফুট, উচ্চতা হবে ছয় ফুট।

দুই সিলিণ্ডারের মাঝে বড় হীরক আকৃতির লাল স্টিকার। বোঝানো হয়েছে সিলিণ্ডারের ভিতর দাহ্য পদার্থ। নীচে বড় বড় অক্ষরে লেখা:

ডেনজার
ফ্ল্যামেবল প্রপেল্যান্ট
এল-৫
হাইলি ফ্ল্যামেবল

প্রকাণ্ড দুই সাদা সিলিণ্ডারের দিকে চেয়ে রইল রানা। ওগুলোর সঙ্গে সংযুক্ত একটা কমপিউটার। ওটা আছে ঘরের পিছনে। কমপিউটার চলছে, কিন্তু স্ক্রিন-সেভারে দেখা গেল বিশালবক্ষা এক নির্লজ্জ মেয়ে সৈকতে শুয়ে নানান ইঙ্গিত করছে।

ঘরের পিছনে চলে গেল রানা, থামল কমপিউটারের সামনে। ওর দিকে চেয়ে ঠোঁট গোল করে ইশারা করল মেয়েটি।

'পরে, ডারলিং,' স্ক্রিনের দিকে চাইল রানা, কি-বোর্ডে টোকা দিল। সঙ্গে সঙ্গে উধাও হলো মেয়েটি।

সেখানে উদয় হয়েছে নানা রঙের উইলকক্স আইস স্টেশনের পাঁচতলা ডায়াগ্রাম। স্ক্রিনে পাঁচটা বৃত্ত। বামে তিনটে, ডানদিকে দুটো— মাঝে মস্ত শাফট, ওটাকে ঘিরেছে প্রতিটি সার্কেল। এই সার্কেলের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে চারটে সোজা টানেল।

বাইরের টানেল ও ভিতরের কূপের মাঝে বেশ কিছু ঘর। প্রতিটি রুমকে আলাদা রঙে দেখানো হয়েছে। স্ক্রিনের এক পাশে কালার চার্ট দিয়ে বুঝিয়েছে তাপমাত্রা। হিমাঙ্কের −৫.৪ ডিগ্রি থেকে শুরু করে হিমাঙ্কের−১.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত দেখিয়েছে।

দরজার কাছ থেকে মন্তব্য করল তিশা, 'এয়ার কণ্ডিশনিং সিস্টেম, স্যর?'

'হ্যাঁ। এল-৫, মানে প্রপেল্যাণ্ট হিসাবে ক্লোরোফ্লিউরোকার্বন ব্যবহার করে। অনেক পুরনো আমলের।'

'আছে তাই তো বেশি,' মন্তব্য করল তিশা।

ওর পাশে পৌঁছে গেল রানা, হ্যাণ্ডেল ধরে সামান্য ফাঁক করল দরজা। পরক্ষণে চমকে গেল। বেসবল আকৃতির কালো কী যেন ছুটে আসছে ওরই দিকে!

পিছনে বেরুচ্ছে সাদা ঘন ধোঁয়া! জ্যাকুস ফিউভিলকে এ-ডেকের ক্যাটওয়াকে দেখা গেল, হাতে ফ্যাম্যাস অ্যাসল্ট

রাইফেল। মাযলের নীচে ৪০এমএম গ্রেনেড লঞ্চার।

ঝট্ করে উবু হয়ে গেল রানা, চৌকাঠ এবং ওর মাথার উপরের ফাঁক দিয়ে ভিতরে ঢুকল গ্যাস-প্রপেল্ড গ্রেনেড, তখনও একটু একটু করে উপরে উঠছে, আধ সেকেণ্ড পর ঘরের পিছনে গিয়ে লাগল ওটা।

'বেরোও! এক্ষুণি!' চেঁচিয়ে উঠল রানা।

তিশাকে দ্বিতীয়বার বলতে হলো না, তীরের মত দরজা দিয়ে বেরুল ও। হাতের এমপি-৫, গুলি ছুঁড়ছে এ-ডেকের দিকে।

ডাইভ দিয়ে চৌকাঠ পেরুল রানা, এবং ঠিক তখনই ওর পিছনে এয়ার-কণ্ডিশনিং রুমে বিস্ফোরিত হলো গ্রেনেড। প্রায় উড়ে গেল দরজা, মজবুত কব্জা না থাকলে শলার মত ছিটকে পড়ত। বাইরের দিকে পুরো এক শ' আশি ডিগ্রি খুলে গেছে দরজা, দড়াম করে লাগল ক্যাটওয়াকের বরফ-দেয়ালে। খোলা চৌকাঠ দিয়ে বেরুল আগুনের বিশাল এক গোলক, রানাকে স্পর্শ করেই চলে গেল স্টেশনের মাঝে।

'স্যর, আসুন!' ডাকছে তিশা, ক্যাটওয়াক থেকে এ-ডেক লক্ষ্য করে গুলি করছে।

মেঝেতে পড়েই এক গড়ান দিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে রানা, ঘুরেই এমপি-৫ থেকে এক পশলা গুলি পাঠাল। এইমাত্র উপরের ক্যাটওয়াকে ছিল জ্যাকুস ফিউভিল, কিন্তু ওখান থেকে সরে গেছে সে।

ছুটতে শুরু করেছে তিশা, দীর্ঘ পায়ে ওর পাশে চলে গেল রানা। সি-ডেকের ক্যাটওয়াক ধরে এগিয়ে চলেছে ওরা, বেরিয়ে এসেছে খোলা জায়গায়। বামদিক কাভার করছে রানা, ডানদিক দেখছে তিশা। ওদের এমপি-৫-এর মাযল থেকে ছিটকে বেরুচ্ছে উজ্জ্বল হলুদ ঝলকানি। ফ্রেঞ্চদের পাল্টা গুলি ওদের আশপাশের বরফ-দেয়ালে এসে লাগছে।

দশ গজ দূরের দেয়ালে ছোট অ্যালকোভ দেখতে পেয়েছে রানা।

'তিশা! ওদিকে!'

'জী!'

কয়েক মুহূর্ত পর খুদে অ্যালকোভে ঝাঁপিয়ে ঢুকল রানা ও তিশা। এক পলক পর এয়ার-কণ্ডিশনিং রুমের ভিতর বিকট আওয়াজে বিস্ফোরণ ঘটল।

রানা বুঝে গেছে, এই বিস্ফোরণ অন্যগুলোর মত নয়, একেবারেই ভিন্ন ধাঁচের। এটা গ্রেনেড ফাটবার শব্দ নয়, অনেক গুরুগম্ভীর গর্জন। অনেক বড় কিছু ফেটে পড়ছে।

এয়ার-কণ্ডিশনিং সিলিণ্ডার!

ওই ঘরের চার-দেয়াল চুরচুর হলো ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণে। ঠিক যেন তাসের প্রাসাদ, মুহূর্তে ছিটকে গেল চারপাশে। কেউ শ্যাম্পেনের বোতলের কর্ক খুলেছে, এমন ভাবে প্রচণ্ড গতি তুলে ছিটকে বেরুল কালো পাইপগুলো, স্টেশনের শাফটের মাঝের এক শ' ফুট পেরিয়ে গাঁথল গিয়ে ওদিকের দেয়ালে।

পাশের দেয়ালে গুলি লাগতেই অ্যালকোভের দেয়ালে সেঁটে গেল রানা, চট্ করে চারপাশ দেখে নিল।

দেয়ালের গভীরে জায়গাটা ক্লজিটের মত, ব্যবহার করা হয় ডাইভিং বেল উপরে তোলা ও নামাবার বিশাল উইঞ্চের কন্ট্রোল কন্সোল রুম হিসাবে। কন্সোল বলতে ছোট কিছু লিভার, ডায়াল ও প্যানেল ভরা বোতাম।

কন্সোলের সামনে স্টিল-প্লেটেড বিশাল এক চেয়ার। চট্ করে ওটা চিনল রানা। এফ-১৪ ফাইটার বিমানের পাইলট ইজেকশন সিট। নীচে বুস্টারের কালো পোড়া দাগ, উপরে গভীর ট্যাপ খাওয়া স্টিলের মস্ত হেডরেস্ট। বুঝতে দেরি হলো না, বিগত জীবনে নিজ দায়িত্ব ভাল ভাবেই পালন করেছে এই জিনিস।

উইলকক্স আইস স্টেশনের কেউ বুদ্ধি করে বিরাট চেয়ার বসিয়ে নিয়েছে রোটেটিং এক স্ট্যাণ্ডে, তারপর গোটা জিনিসটা মেঝের সঙ্গে বল্টু মেরে আটকে দিয়েছে। চার শ' পাউণ্ড ওজনের মিলিটারি জঞ্জাল এখন হয়ে উঠেছে হেভি ডিউটি ফার্নিচার।

হঠাৎ করেই তুমুল গুলি শুরু হলো এ-ডেকের উত্তর-পশ্চিম কোনা থেকে। চমকে গিয়ে ইজেকশন সিটের উপর উঠে পড়ল তিশা, পরক্ষণে সরে গেল হেডসেটের ওপাশে। গুটিসুটি মেরে বসেছে। বিশাল সিটের ইস্পাতের পাত ওকে ভাল ভাবেই আড়াল দিয়েছে।

পুরো দশ সেকেণ্ড গুলিবর্ষণ চলল ইজেকশন সিটের উপর। হেডসেটে মাথা রেখে বসে রইল তিশা, চোখ বন্ধ। ইস্পাতের পাতে লেগে চারপাশে ছিটকে পড়ছে গুলি। কয়েক মুহূর্ত পর আবারও চোখ খুলে এদিক-ওদিক চাইল।

এক পাশে কী যেন নড়ছে।

ওর বামদিকে, নীচে।

ওদিকে স্টেশনের পুল।

ওখানে পানির নীচে ওটা কী? কালো-সাদা, বিশাল আকারের, ধীর ভঙ্গিতে চলছে, যেন হুমকি দিচ্ছে কাউকে। পানির বেশ কিছুটা নীচে রয়েছে ওটা, উঁচু ডরসাল ফিন সারফেস ভেদ করে উপরে উঠছে না।

প্রথমটার সঙ্গে যোগ দিল দ্বিতীয়, তারপর তৃতীয়, শেষে চতুর্থ কিলার ওয়েইল। দলের নেতা বিশাল আকারের, দৈর্ঘ্যে কমপক্ষে চল্লিশ ফুট। অন্যগুলো একটু ছোট।

ওগুলো মেয়ে, ভাবল তিশা। বইয়ে পড়েছে, একটা পুরুষের সঙ্গে থাকে কমবেশি আট-নয়টা মেয়ে।

অস্থির হয়ে উঠেছে পুলের পানি, ভাঙাচোরা দৃশ্য— এ কারণে কালো-সাদা দানবগুলোকে আরও ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে। পুরুষটা কাত

হতেই দেখা গেল ওটার সাদা পেট আর বিকট খোলা মুখ। তিশার ভয় লেগে গেল দুই সারি ক্ষুরধার দাঁত দেখে।

নেতার পিছনে সেই দুই তরুণ খুনি। ফ্রেঞ্চ কমাণ্ডো দলের হামলা শুরু হওয়ার আগে এদেরকে পুলে দেখেছে তিশা, তখন সিলমাছ লিলিকে খুঁজছিল তারা।

আবারও ফিরেছে... সঙ্গে এনেছে গোটা দলের সবাইকে।

পুলের কিনারা ধরে ঘুরতে শুরু করেছে গোটা পাল, ওদিকে চেয়ে শিরশির করছে তিশার বুক। মনে পড়ছে বইয়ে পড়া ভয়ঙ্কর সব বর্ণনা। বহু লোক মরেছে কিলার ওয়েইলের কবলে পড়ে!

বিন্দুমাত্র সুযোগ ছিল না কর্পোরাল টনি কেলগের।

তিন ফ্র্যাগমেণ্টেশন গ্রেনেডের তীব্র গতির শ্র্যাপনেল দু'পাশ থেকে ঝাঁঝরা করেছে তাকে। অসহায় চোখে তরুণ সৈনিকের দিকে চেয়েছিল আরাফাত দবির। বিস্ফোরণের আগে মেঝেতে হাঁটু গেড়ে বসে দু'হাতে মুখ ঢেকে ফেলেছিল কেলগ, তারপর পেরেকের ডগার মত অসংখ্য শ্র্যাপনেল বিঁধল ওর সারা দেহে।

কাছের দরজা দিয়ে সামনের বিজ্ঞানীকে ঠেলে ভিতরে ঢুকতে চেষ্টা করছিল তার সঙ্গী, কিন্তু যথেষ্ট সময় পায়নি বেচারা। কেলগের মতই, চাওয়া যায় না তার দিকে। যেখানে দাঁড়িয়েছিল, ওখানেই ধপ্ করে পড়েছে লাশ। কেলগের বুক ও কাঁধের বডি আর্মার বহু শ্র্যাপনেল ঠেকিয়েছে, কিন্তু বিজ্ঞানী ছিল একেবারেই অনাবৃত ও অসহায়। এখনও তার গোটা দেহ থেকে দরদর করে রক্ত ঝরছে। দেখতে ভয়ঙ্কর হয়েছে লাশটা।

এ ধরনের বিস্ফোরণ হলে কোনও পেশি রক্ষা পায় না। এখানেও তাই হয়েছে। দেহে এক ইঞ্চি ত্বক নেই যা অক্ষত।

পুরু ভুরুজোড়া কুঁচকে মৃত সঙ্গীর দিকে চেয়ে রইল সার্জেন্ট আরাফাত দবির, জানে না কী করবে।

বি-ডেকের আরেক পাশে বাইরের বাঁকা টানেল ধরে ছুটে চলেছে নিশাত সুলতানা। পিছনে কর্পোরাল নাজমুল ও হলিডে সিম্পসন, মাঝে মাঝে থমকে দাঁড়িয়ে গুলি করছে। টানেল ধরে ধেয়ে আসছে তিনটে কালো ছায়া।

কর্পোরাল হলিডে সিম্পসনের বয়স একত্রিশ বছর, ব্রোঞ্জের মত চকচকে ত্বক, চৌকো চোয়াল, আসলে তার পরিবার এসেছে ইতালি থেকে। মন যেমনই থাক, সবার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করে।

এই উপদলের নেত্রী ক্যাপ্টেন নিশাত সুলতানা, রানার গোটা দলে সে সেকেণ্ড ইন কমাণ্ড। তিশা করিমের সঙ্গে ওর অনেক তফাৎ। দলের এই দুই মহিলা একজন দক্ষিণ মেরু হলে অপরজন উত্তর মেরু।

তিশার বয়স মাত্র তেইশ, দেখতে রাণী পুতুলের মত সুন্দর, মিষ্টি করে কথা বলে, অবশ্য সবার সঙ্গে একটু দূরত্ব বজায় রেখে চলে। এদিকে নিশাতের বয়স একত্রিশ, ঝাড়া ছয় ফুট উঁচু, ওজন প্রায় দুই শ' পাউণ্ড। সবার দেখাদেখি রানাও ওকে আপা বলেই ডাকে। বদলে সবাই ওর কাছ থেকে পায় বড়বোনের আদর। দলের কেউ আহত হলে বা অসুস্থ হলে তার ভাবতে হয় না, সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত নার্সিঙের কাজ নিজেই নেয় সে।

হেলমেট মাইকে বলল নিশাত, 'স্যর, নিশাত বলছি। বি-ডেকে গোলাগুলি চলছে। আবারও বলছি, বি-ডেকে তুমুল গুলি চলছে। পিছন থেকে শত্রুরা আসছে। তাদের সঙ্গে ফ্র্যাগমেণ্টেশন গ্রেনেড। চারপাশে এসে পড়ছে। পশ্চিম টানেলের দিকে যাচ্ছি, ওখানে বাঁক নিলে সামনে পড়বে মাঝের কূপ। আপনি বা আপনার কেউ শাফট দেখে থাকলে, আমাদের জানান ওখানে কী ঘটছে।'

সবার হেলমেট ইণ্টারকমে ভেসে এল রানার কণ্ঠ: 'রানা বলছি। মাঝের শাফট দেখছি। ক্যাটওয়াকে কেউ নেই। আপনার

লেভেলে রয়েছে পাঁচজন শত্রু। সবাই এখন টানেলের ভিতর।

'এ-ডেকে আরও পাঁচজন শত্রু। তাদের অন্তত একজনের কাছে ৪০এমএম গ্রেনেড লঞ্চার। আপনারা যদি ক্যাটওয়াকে বেরিয়ে আসেন, নীচ থেকে আমরা কাভার দিতে পারব। ...সার্জেন্ট জনি ওয়াকার, লেফটেন্যান্ট গোলাম মোরশেদ? আপনারা কোথায়?'

'আমরা এখনও এখানে,' জবাব দিল জনি ওয়াকার।

'এ-ডেকে?'

'জী,' এবার বলল গোলাম মোরশেদ।

'এখনও আটকে রেখেছে?'

'সরে আসবার চেষ্টা করছি, মাসুদ ভাই।'

'আপাতত সে-চেষ্টা বাদ থাকুক, কাজে মন দাও, তোমাদের দিকে যেন বেশি মনোযোগ দেয়। দশ সেকেণ্ড পর বি-ডেকে খোলা জায়গায় বেরিয়ে আসবে আমাদের তিনজন।'

'ঠিক আছে, মাসুদ ভাই।'

নিশাত বলল, 'আমরা এখন পশ্চিম টানেল ধরে আসছি, স্যর। যে-কোনও সময়ে পৌঁছে যাব সেণ্ট্রাল শাফটে।'

এদিকে সি-ডেকের অ্যালকোভে হেলমেট মাইকে আবারও বলল রানা, 'সার্জেন্ট আরাফাত দবির! সাড়া দিন!'

ওপাশ থেকে কোনও জবাব নেই।

'সার্জেন্ট দবির, আপনি কোথায়?'

বি-ডেকে মেয়েদের শাওয়ার রুমে চমকে গেছে নিনা ভিসার। এইমাত্র লাথি মেরে দড়াম করে দরজা খোলা হয়েছে। এক পলকের জন্য ভীষণ ভয় পেল সে। মেয়েদের শাওয়ার রুমে ঢুকেছে ফ্রেঞ্চ সৈনিকরা? না বোধহয়। তা হলে পাশের রুমে কে? ওটা পুরুষদের শাওয়ার রুম।

ধড়াস্ ধড়াস্ করছে নিনার হৃৎপিণ্ড। মহিলা শাওয়ার ব্লকের ভিতর আছে সে, তার মেয়ে মেরি, রাফায়লা ম্যাকানটায়ার ও জিয়োলজিস্ট ম্যাক্স জে. রলিন্স। সার্জেন্ট দবির সবাইকে ঘরে ফিরতে বললে এখানে এসে ঢুকেছে মেয়েরা। এর এক সেকেণ্ড পর দরজা খুলে মেঝের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে রলিন্স লোকটা। এরপর দরজা বন্ধ হতে না হাতেই বাইরের টানেলে ফাটল ফ্র্যাগমেন্টেশন গ্রেনেড।

সেণ্ট্রাল শাফট ও বাইরের টানেলের মাঝে মেয়েদের শাওয়ার ব্লক। জায়গাটা বি-ডেকের উত্তর-পুব কোণে। এখান থেকে বেরুতে হলে তিনটে দরজা: একটা গেছে উত্তর টানেলে, একটা বাইরের টানেলে, এবং অন্যটা সোজা গেছে পুরুষদের শাওয়ার রুমের পাশে।

এখন পুরুষদের শাওয়ার রুমে ধুপধাপ আওয়াজ হচ্ছে।

কিউবিকল দরজাগুলো লাথি মেরে খুলছে। তার মানেই ফ্রেঞ্চ কমাণ্ডোরা!

কেউ লুকিয়ে থাকলে মরবে।

মেরিকে দরজার দিকে ঠেলে নিয়ে গেল নিনা, ওদিক দিয়ে বেরুনো যায় উত্তর টানেলে। 'চলো, মেরি, এখান থেকে বেরুতে হবে।'

একবার কাঁধের উপর দিয়ে পিছনে চাইল নিনা ভিসার।

ছয়টা শাওয়ারের ওপাশে পুরুষ শাওয়ার রুমের দরজা।

ওটা এখনও বন্ধ।

কিন্তু যে-কোনও সময়ে দরজা খুলবে কমাণ্ডোরা।

উত্তর টানেলের দরজার সামনে পৌঁছল নিনা, শক্ত করে ধরল হ্যাণ্ডেল। দ্বিধা করছে। জানার উপায় নেই ওদিকে কী অপেক্ষা করছে।

'নিনা! কী করছ! চলে এসো!' সাপের মত ফোঁস করে উঠল

ম্যাক্স জে. রলিন্স। লম্বা ও চিকন লোক সে, কোনও কারণ ছাড়াই সারাক্ষণ ভীষণ নার্ভাস থাকে। এখন খুবই আতঙ্কিত।

'ঠিক আছে, ভয় পাবেন না,' বলল নিনা। হ্যাণ্ডেল মুচড়ে দরজা খুলতে শুরু করেছে।

হঠাৎ পুরুষদের শাওয়ার রুমের দরজায় ধুম করে কী যেন লাগল। পরক্ষণে সবার পিছনে খুলে গেল ওই দরজা।

'পালাও!' চিকন স্বরে চেঁচিয়ে উঠল রলিন্স।

ঝট্ করে দরজা খুলল নিনা, মেরিকে নিয়ে বেরিয়ে এল উত্তর টানেলে।

কিন্তু তিন পা যেতে না যেতেই থামতে হলো। হাঁ হয়ে গেল ওর মুখ। সামনে ভয়ঙ্কর চেহারার এক লোক, ভুরু কুঁচকে ওর মাথার উপর তাক করেছে অস্ত্র!

তারপর মাথা নাড়ল লোকটা, অস্ত্র নামিয়ে বলল, 'দুঃখিত।'

নিনা ও মেরির সামনে এসে দাঁড়াল সার্জেন্ট দবির। 'আমি নিজেই ঘাবড়ে গেছি। ভয় পাবেন না।'

টানেলে বেরিয়ে এসেছে রাফায়লা ও রলিন্স, পিছনে দড়াম করে বন্ধ করে দিল দরজা। পাঠাগার ডট নেটের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

মেয়েদের শাওয়ার রুমের দিকে ইঙ্গিত করল দবির, 'ওরা ওখানে?'

'হ্যাঁ,' বলল নিনা।

'অন্যরা ঠিক আছে?' বোকার মত জানতে চাইল রলিন্স।

'এখন আর চট্ করে ঘর থেকে বেরুবে না,' পিছনের টানেল দেখে নিল দবির। বাইরের টানেল থেকে গুলির আওয়াজ আসছে। ওর ডান কান বেয়ে রক্ত পড়ছে, খেয়াল করেছে নিনা। বেশ বড় জখম। মনে হলো না লোকটা কিছু টের পেয়েছে। তার ইয়ারপিসে রুপালি ধাতুর টুকরো গেঁথে আছে।

'আমরা সমস্যার ভিতর পড়ে গেলাম,' চারপাশের টানেল

দেখছে দবির। 'সবার সঙ্গে কন্ট্যাক্ট হারিয়ে গেছে। শ্র্যাপনেলের টুকরো লেগে বিকল হয়েছে রেডিয়ো। চাইলেও যোগাযোগ করতে পারব না। অন্যদের কথাও শুনছি না।'

ঘুরে দাঁড়াল দবির, নিনার উপর দিয়ে টানেলের শেষমাথা দেখল। ওদিকে গেলে স্টেশনের বিশাল শাফট ও ক্যাটওয়াক।

'আমার সঙ্গে আসুন,' নিনার পাশ ঘেঁষে রওনা হয়ে গেল দবির, চলেছে উইলকক্স আইস স্টেশনের মাঝের কূপ লক্ষ্য করে।

বারো

'সার্জেন্ট দবির!' হেলমেট মাইকে নিচু স্বরে বলল রানা। ওর চোখ বি-ডেকের পশ্চিম টানেলের উপর। 'দবির! আপনি কোথায়, সাড়া দিন!'

'সার্জেন্ট নেই?' জানতে চাইল তিশা।

'যোগাযোগ বন্ধ,' বলল রানা।

ওরা স্টেশনের পুবে, সি-ডেকে অ্যালকোভের ভিতর, অপেক্ষা করছে নিশাত, কর্পোরাল নাজুমল ও হলিডের জন্য, যে-কোনও সময়ে বি-ডেকের পশ্চিম টানেল থেকে বেরিয়ে আসবে ওরা।

প্রথমে বেরুল নিশাত সুলতানা। দ্রুত পিছনে হাঁটছে, হাতে উদ্যত অস্ত্র। এক শ' আশি ডিগ্রি ঘুরছে ওটা। শত্রু দেখলেই গুলি করবে।

নিশাতকে দেখেই এ-ডেকের দিকে গুলি পাঠাতে শুরু করেছে রানা। কেউ ওখানে কাভার নিলে তাকে পিছাতে হবে। পাঁচ

সেকেণ্ড পর গুলি শুরু করল তিশা, একই দিকে ওর চোখ।

অ্যালকোভের পিছন-দেয়ালের পাশে সরে এল রানা, অস্ত্র রিলোড করতে লাগল। তিন রাউণ্ড করে গুলি ছুঁড়ছে তিশা।

হঠাৎ খুব অস্বাভাবিক একটা ঘটনা দেখল রানা।

তিশার অস্ত্রের মাযল থেকে ছিটকে বেরুচ্ছে ছয় ফুটি হলুদ আগুন। মাত্র এক সেকেণ্ড পর আর শিখা দেখা গেল না। কিন্তু ওই আগুন থাকবার কথা নয়। রানার এক পলকের জন্য মনে হয়েছে তিশার এমপি-৫ মেশিন পিস্তল যেন ফ্লেম-থ্রোয়ার!

আসলে কী ঘটছে? পরক্ষণে বুঝে গেল রানা। ঝট্ করে ঘুরে চাইল এয়ার-কণ্ডিশনিং রুমের দিকে।

হঠাৎ করেই বলল তিশা, 'আমার গুলি শেষ!'

ঘুরেই এ-ডেকে গুলি পাঠাল রানা। এই সুযোগে রিলোড করতে পারবে তিশা।

এ-ডেকের ক্যাটওয়াকের উপর দিয়ে ছুটছে রানার গুলি। এদিকে বি-ডেকে নিশাতের পিছু নিয়ে ক্যাটওয়াকে বেরিয়ে এসেছে নাজমুল ও হলিডে। দ্রুত পিছু হটছে ওরা। যে টানেল থেকে বেরিয়েছে, সেদিকে গুলি পাঠাচ্ছে।

হলিডের অস্ত্রের গুলি শেষ। রানা দেখল, চট্ করে ম্যাগাযিন খুলেছে সে, ওটা ফেলে দিল ক্যাটওয়াকের উপর। নতুন ম্যাগাযিন রিলোড করে নিল অস্ত্রের রিসিভারে। আর ঠিক তখনই পশ্চিম টানেল থেকে এল গুলি, গলার চামড়া ও সামান্য মাংস চেঁছে নিয়ে বেরিয়ে গেল ওটা।

ছিটকে পিছিয়ে গেছে হলিডে, ভারসাম্য হারিয়েছে পুরোপুরি। কয়েক মুহূর্ত পর অস্ত্র ঘুরিয়ে নিতে পারল, অজানা শত্রু লক্ষ্য করে খালি করল ম্যাগাযিন। ওই আওয়াজে মৃত লোকও জেগে উঠবে। দুই দশমিক দুই সেকেণ্ডে বেরিয়েছে তিরিশটা গুলি। আবারও খালি হয়ে গেছে ম্যাগাযিন। খপ্ করে হলিডের হাত ধরল নিশাত,

টানেলের দিক থেকে ঘুরিয়ে নিয়ে তাড়া দিল, 'ক্যাটওয়াক ধরে ছুটতে শুরু করুন!'

নতুন ম্যাগাযিন হাতড়াতে গিয়ে দেরি করছে আহত হলিডে, গলা বেয়ে দরদর করে পড়ছে রক্ত। ম্যাগাযিন সে পেল, কিন্তু রক্তে ভেজা হাত থেকে পড়ে গেল ওটা। রেলিঙের পাশ দিয়ে পঞ্চাশ ফুট নীচের পুলে নামল। ছলাৎ আওয়াজ তুলে হারিয়ে গেল পানির ভিতর। হলিডের কাছে বাড়তি ম্যাগাযিন নেই। হাত থেকে এমপি-৫ ছেড়ে দিল সে, হোলস্টার থেকে বের করে নিল কোল্ট .৪৫ সিঙ্গল শট রিভলভার।

থেমে থেমে এ-ডেকের উপর গুলি পাঠাচ্ছে তিশা ও রানা। হলিডের ম্যাগাযিন পুলের ভিতর পড়তে দেখেছে তিশা। ওখানে উঠে এসেছিল কিলার ওয়েইলের পালের একটা, জিনিসটা খাবার কিছু নয় দেখে আবারও ডুব দিয়েছে।

নিশাত সুলতানার অস্ত্রের গুলি শেষ। খালি ম্যাগাযিন ফেলে দ্রুত হাতে ভরে নিল নতুন ক্লিপ।

দুশ্চিন্তা নিয়ে তাদের দিকে চেয়ে রইল রানা। বি-ডেকে আপা, নাজমুল ও হলিডে ক্যাটওয়াক ধরে পশ্চিম থেকে উত্তর সুড়ঙ্গের দিকে ছুটছে।

ওরা প্রায় পৌঁছে গেছে, এমন সময় উত্তর সুড়ঙ্গ থেকে ছিটকে বেরুল সার্জেন্ট দবির, পিছনে কয়েকজন সিভিলিয়ান।

মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পড়েছে নিশাত-নাজমুল-হলিডে ও দবির।

দৃশ্যটা দেখে শ্বাস আটকে ফেলল রানা।

খোলা জায়গায় মস্ত বিপদে পড়েছে ওরা চার যোদ্ধা। সঙ্গে চার সিভিলিয়ান! যে-কোনও সময়ে হাজির হবে ফ্রেঞ্চ কমাণ্ডো দল, ঝাঁঝরা করে দেবে ওদেরকে!

'সার্জেন্ট দবির!' হেলমেট মাইকে চেঁচাল রানা। 'ওখান থেকে সরে যান! ক্যাটওয়াক থেকে...'

চোখের সামনে প্রলয় দেখতে শুরু করেছে রানা।

একইসঙ্গে বি-ডেকের ক্যাটওয়াকে ছিটকে বেরিয়েছে পাঁচজন ফ্রেঞ্চ কমাণ্ডো!

পশ্চিম টানেল থেকে এসেছে তিনজন। দু'জন পুব টানেল থেকে। বিন্দুমাত্র দ্বিধা করল না তারা, গুলি শুরু করেছে!

এবার যা ঘটল, তাড়াহুড়ার ভিতর ঠিক বুঝল না রানা।

বি-ডেকে পিনসার ম্যানুভার করেছে পাঁচ কমাণ্ডো, নিশাত-নাজমুল ও হলিডেকে ক্যাটওয়াকে তাড়িয়ে এনেছে— এবার দু' পাশ থেকে গুলি করে ঝাঁঝরা করবে।

সার্জেন্ট দবির ও চার সিভিলিয়ান বাড়তি বোনাস। এদেরকে আশা করেনি ফ্রেঞ্চরা। সবাই ক্যাটওয়াকে উঠতেই ওদের উপর অস্ত্র তাক করেছে।

কিন্তু দ্বিতীয় দফা গুলি করবার কোনও সুযোগ পেল না তারা।

পশ্চিম টানেল থেকে যে তিন ফ্রেঞ্চ এসেছে, তারাই আগে গুলি করেছে। তাদের অস্ত্রের মাযল থেকে ছিটকে বেরুল অতি উত্তপ্ত সাদা আগুন।

পয়েন্ট-ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জে গুলি খেল নিশাত, নাজমুল ও হলিডে। নিশাত পায়ে, নাজমুল কাঁধে, দুর্ভাগ্য যে পরপর দুটো গুলি খেল হলিডে মাথায়, চারটে বুকে— বুক-মাথা থেকে ফোয়ারার মত ছিটকে বেরুল রক্ত। মেঝের উপর পড়বার আগেই মারা গেছে সে।

আর বিশেষ কিছু বুঝবার সুযোগ পেল না বিস্মিত রানা।

কারণ ঠিক তখনই ব্যাপারটা ঘটল।

হতবাক হয়ে রানা দেখল, স্টেশনের পশ্চিমে ফ্রেঞ্চদের রাইফেলের মাযল ও বাঁটের পিছন থেকে বেরিয়েছে দ্বি-মুখী বিশাল দুই আগুনের চাবুক। যেন ভয়ঙ্কর দুই উল্কা, সাত ফুট উঁচু আগুনের গোলকের ভিতর আটকা পড়ল তিন ফ্রেঞ্চ। ক্যাটওয়াক

ধরে নানা দিকে নাচতে নাচতে চলেছে সাদা আগুনের গোলক, সামনে-পিছনে যা পড়ছে হজম করে ফেলছে।

বি-ডেকের ক্যাটওয়াক অদৃশ্য হলো আগুনের ভিতর, চার পাশে শুধু সাদা শিখা। কাউকে আর দেখা গেল না।

পুরো পাঁচ সেকেণ্ড চেয়ে রইল রানা, জানে না কী করবে। সব এত দ্রুত ঘটছে, যেন বি-ডেকের ক্যাটওয়াকে প্রচুর গ্যাসোলিন ঢেলে ম্যাচ দিয়ে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে কেউ।

দ্বিতীয়বার ওদিকে না চেয়ে চরকির মত ঘুরল রানা। ওই এয়ার-কণ্ডিশনিং রুম... বুঝতে দেরি হয়নি ওর।

রকেট-গ্রেনেড ক্ষতিগ্রস্ত করেছে এয়ার-কণ্ডিশনিং সিলিণ্ডারকে, ওই দুটো ফুটো হওয়ায় বেরুচ্ছে হাইলি ফ্ল্যামেবল ক্লোরো-ফ্লিউরোকার্বন!

এই কারণেই তখন তিশার অস্ত্রের নল থেকে বেরিয়েছে ছয় ফুটি আগুন। ওটা মস্ত সতর্কবাণী, অনেক আগেই খেয়াল দেয়া উচিত ছিল। অবশ্য তখনও স্টেশনে ছড়িয়ে পড়েনি সিএফসি।

কিন্তু এখন... বদ্ধ স্টেশনে ছড়িয়ে পড়ছে গ্যাস। ফ্রেঞ্চরা গুলি করতেই সাদা আগুন গিলে ফেলেছে বি-ডেক।

আস্তে করে শ্বাস ফেলল রানা।

এয়ার-কণ্ডিশনিং সিলিণ্ডার থেকে এখনও সিএফসি বেরুচ্ছে। ছড়িয়ে পড়বে গোটা স্টেশনে। সামান্য আগুন পেলেই...

গ্যাসের আভেন হয়ে উঠছে উইলকক্স আইস স্টেশন!

এখন শুধু সামান্য ফুলকি... বা একটা গুলি— পরক্ষণে বিশাল বোমার মত ফাটবে গোটা স্টেশন!

বি-ডেকের সকেট থেকে ফট-ফটাস্ আওয়াজ তুলে খুলছে রিভেট। ক্যাটওয়াকের উপর এখানে-ওখানে আগুন। ফোস্কা পড়া মানুষগুলো প্রাণপণে চেঁচিয়ে চলেছে। যোদ্ধা হোক বা সিভিলিয়ান, ক্যাটওয়াকে পড়ে ছটফট করছে সবাই। পোশাকে আগুন, পুড়তে

শুরু করেছে চামড়া, মাংস।

যেন নরকের দৃশ্য!

স্টেশনের পশ্চিমের ফ্রেঞ্চ কমাণ্ডোরা গুলি চালিয়েছে নিশাত-নাজমুল-হলিডের উপর, তাদের অস্ত্রের মাযলের ফুলকি থেকেই ধরেছে গ্যাসের নারকীয় সাদা আগুন, এখন তাদেরকেই আগে পোড়াতে শুরু করেছে।

প্রতিটি মাযল তৈরি করেছে দুটো করে আগুনের গোলক। একটা গেছে সামনে, অন্যটা পিছনে। অস্ত্রের মালিকের মুখ পুড়িয়ে দিতে চেয়েছে।

এখন ডেকের উপর পড়ে আছে দুই ফ্রেঞ্চ কমাণ্ডো, ছাড়ছে বিকট চিৎকার। তৃতীয়জন বারবার আছড়ে পড়ছে বরফের মেঝের উপর, নেভাতে চাইছে ফেটিগের আগুন।

ক্যাপ্টেন নিশাত ও কর্পোরাল নাজমুলের পোশাক পুড়ছে। ওদের পাশে লাশ হয়ে পড়ে আছে হলিডে। ক্যাটওয়াকের উপর চড়-চড়-ছ্যাঁৎ আওয়াজ তুলে নিথর শরীরটাকে ঝলসাচ্ছে হলুদ আগুন।

উত্তর টানেলের কাছে রাফায়লা ম্যাকানটায়ারের প্যান্ট থেকে কমলা শিখা চাপড়ে নেভাতে চাইছে দবির, ধাতুর ক্যাটওয়াকের উপর দাপাদাপি করছে মেয়েটি। দবিরের পাশে একই কাজ করছে নিনা ভিসার, পিচ্চি মেরির পারকা থেকে নেভাতে চাইছে আগুন। চিকন স্বরে চেঁচিয়ে চলেছে রলিন্স, ফস্‌ফস্‌ করে পুড়ছে তার মাথার সব চুল।

তারপর অসুস্থকর মড়-মড় আওয়াজ শুরু হলো। মুচড়ে যেতে শুরু করেছে ইস্পাত।

মেয়েটার পোশাকের আগুন নেভানো বাদ দিয়ে মুখ তুলে চাইল দবির। বিড়বিড় করে বলল, 'হায় আল্লা!'

অস্বস্তিকর আওয়াজটা চমকে দিয়েছে রানাকে।

কয়েক সেকেণ্ড পর বুঝল কী ঘটছে। ক্যাটওয়াকের স্টিলের ত্রিকোণ সাপোর্ট গেছে সরাসরি বরফের দেয়ালের ভিতর। এখন দেয়াল থেকে পিছলে বেরিয়ে আসছে সব।

বি-ডেকের আগুন উত্তপ্ত করে তুলেছে সব রিভেট, ফলে গরম হয়ে উঠছে সাপোর্ট। গলিয়ে দিচ্ছে চারপাশের বরফ। বরফের দেয়াল থেকে খুলে আসছে বি-ডেকের গোটা কাঠামো!

ঠক্-ঠক্-ঠকাস্ আওয়াজ তুলে খুলছে একের পর এক রিভেট। বরফ-দেয়ালে বড় গর্ত তৈরি করে বেরুচ্ছে ইস্পাতের আড়া, ধাতব ঠং আওয়াজ তুলে সি-ডেকের ক্যাটওয়াকে পড়ল একটা রিভেট।

কয়েক সেকেণ্ড পর পড়ল দ্বিতীয় রিভেট।

নামল তৃতীয়টা।

এরপর প্রায় একই সঙ্গে পনেরোটা রিভেট খসল।

সি-ডেকের ক্যাটওয়াকে শুরু হয়েছে ধাতব বৃষ্টি। কয়েক মুহূর্ত পর হঠাৎ করেই আবারও শুরু হলো উইলকক্স আইস স্টেশনে গা শিউরানো আওয়াজ।

ভেঙেচুরে পড়ছে স্টিলের পাত।

'বি-ডেক পড়বে,' বিড়বিড় করে বলল রানা।

পর মুহূর্তে হঠাৎ করেই নামতে শুরু করল সব।

গোটা ক্যাটওয়াক, গোলাকার জ্বলন্ত ফ্লোর... সবই পড়ছে সি-ডেকের দিকে! চারপাশে শুধু মড়মড় আওয়াজ!

বরফ-দেয়ালে ছিঁড়ে রইল ক্যাটওয়াকের ইস্পাতের সামান্য অংশ। অন্য সমস্ত কিছু হঠাৎ করেই আছাড় খেল। সি-ডেকের একটু উপরে স্থির হলো বি-ডেক। আপাতত পতন থেমেছে, কিন্তু পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি ঢালু হয়ে গেছে মেঝে।

এবার বরফ-দেয়াল থেকে পিছলে বেরুল ওই ফ্লোরের বেশির

ভাগ সাপোর্ট, সোজা নেমে গেল স্টেশনের শাফট ধরে।

বি-ডেকে যারা উঠে দাঁড়িয়েছিল, ক্যাটওয়াক নিয়ে নামল সি-ডেকের দিকে।

তারা এগারোজন!

সাধারণ নাগরিক ও যোদ্ধারা ভাঙা ক্যাটওয়াক নিয়ে সরাসরি পড়ল উইলকক্স আইস স্টেশনের মূল শাফটে।

সোজা পঞ্চাশ ফুট নীচে নীল পানিতে ঝপাস্ করে নামল তারা!

তেরো

পানিতে পড়েই তলিয়ে গেল নিনা ভিসার। মুখের সামনে অজস্র বুদ্বুদ। এক পলকে নীরব হয়েছে চারপাশ।

শিউরে উঠল নিনা। উহ্, কী ঠাণ্ডা! থরথর করে কাঁপতে শুরু করেছে সারাশরীর।

তারপর হঠাৎ করেই আওয়াজগুলো শুনল।

ভুতুড়ে পানির ভিতর চাপা ধুপ্ ধুপ্। তারপর থেমেও গেল আওয়াজ। উপর থেকে পড়েছে অন্যরা।

অলস ভঙ্গিতে উপরে উঠছে বুদ্বুদ, সেগুলোর ভিতর দিয়ে দেখল একটু দূরে প্রকাণ্ড আকারের জিনিসটা।

মসৃণ ভঙ্গিতে চলেছে, ওগুলো কী?

বিশাল, কালো রঙের।

বরফ-ঠাণ্ডা পানির ভিতর নিঃশব্দে চলছে, ঠিক ওভাবে ভাসে

আকাশের চিল। প্রস্থে গাড়ির চেয়ে চওড়া কালো দেহগুলো। হঠাৎ বড় একটা ঢেউ দুলিয়ে দিল নিনাকে। প্রথমে কিছুই বুঝল না, তারপর হঠাৎ করেই দেখল সামনে হাঁ করা বিশাল এক মুখ। অসংখ্য গিজগিজে দাঁত, সব ক্ষুরের মত ধারালো।

ভীষণ ভাবে চমকে গেল নিনা।

কিলার ওয়েইল!

দ্রুত হাত-পা নাড়তে শুরু করেছে সে, কয়েক সেকেণ্ড পর হঠাৎ করেই উঠে এল পানি-সমতলে, বড় করে দম নিল। এখন আর বরফ-ঠাণ্ডা পানি নিয়ে ভাবছে না। পুলের ভিতর একের পর এক কালো ডরসাল ফিন উঠে আসছে!

পুলের কোথায় আছে বুঝবার আগেই নিনার পাশে ভেসে উঠল কী যেন। চমকে গিয়ে চরকির মত ঘুরল ও।

না, কোনও খুনি তিমি নয়।

রাফায়লা ম্যাকানটায়ার।

নিনা টের পেল, নতুন করে চালু হয়েছে ওর হৃৎপিণ্ড। এক সেকেণ্ড পর আরেক পাশে ভেসে উঠল জিয়োলজিস্ট ম্যাক্স জে. রলিন্স।

আবার ঘুরে চাইল নিনা। বিধ্বস্ত বি-ডেক থেকে পুলের নানা দিকে পড়েছে পাঁচ ফ্রেঞ্চ কমাণ্ডো। খেয়াল করল, তাদের একজন পানির উপর উপুড় হয়ে ভাসছে।

শাফটের উপর থেকে এল তীক্ষ্ণ চিৎকার।

ছোট্ট কোনও মেয়ে চেঁচিয়ে চলেছে।

উপরে চাইল নিনা ভিসার।

ওই যে অনেক উপরে মেরি, বি-ডেকে ক্যাটওয়াকের উল্টে যাওয়া রেলিং থেকে ঝুলছে। যে বাঙালি সার্জেন্ট ওদেরকে এদিকে এনেছে, ভাঙা ক্যাটওয়াকে উপুড় হয়ে সামনে বাড়ছে সে, বোধহয় মেরির হাত ধরতে চায়।

মেরির দিকে চেয়ে আছে নিনা, এক মুহূর্ত পর টের পেল, ওর এবং রলিন্সের মাঝ দিয়ে গেল বিশাল এক কিলার ওয়েইল। ওর পায়ে গা ঘষে গেছে জন্তুটা।

এক সেকেণ্ড পর চিৎকার শুনল নিনা।

লোকটা পুলের আরেক দিকে। দ্রুত ঘুরেছে নিনা, দেখল এক ফ্রেঞ্চ কমাণ্ডোকে— সাদা আগুনে অসংখ্য ফোস্কা মুখে, পুড়ে গেছে কপাল-গাল— পাগলের মত পুলের কিনারায় পৌঁছুতে চাইছে সে। চোখে বেদম ভয়, ফোঁপাচ্ছে বাচ্চার মত, ফোঁস-ফোঁস করে শ্বাস ফেলছে।

এ ছাড়া কোথাও কোনও নড়াচড়া নেই।

ভয়ে জমে গেছে সবাই।

মুহূর্ত পর দেখা গেল ব্যস্ত সাঁতারুর পাশে হাজির হয়েছে কালো, বিশাল এক ডরসাল ফিন। হঠাৎ গতি কমাল তিমি, আক্রমণাত্মক ভঙ্গি নিয়ে লোকটার পিছনে ডুব দিল।

এর ফলে ভয়ঙ্কর পরিণতি হলো লোকটার।

হঠাৎ করেই জোরালো কড়াৎ আওয়াজ তুলল তার মেরুদণ্ড, পিছনে বেঁকে গেল পিঠ। ধাক্কা খেয়ে ঘুরে গেছে সে, চিৎকার করতে মস্ত হাঁ করেছে, কিন্তু গলা থেকে কোনও শব্দ বেরুল না। বিস্ফারিত হলো দুই চোখের তারা। সে বোধহয় দেখেছে খুনি তিমি কেটে নিয়েছে তার কোমর থেকে নীচের অংশ! ওই অংশ এখন তিমির প্রকাণ্ড চোয়ালের ভিতর!

পরের কামড় আরও অনেক ভয়ঙ্কর। প্রচণ্ড হ্যাঁচকা টান খেল কমাণ্ডো, পানির উপর ঠাস্ করে পড়ল মাথা, পরক্ষণে চিরদিনের জন্য হারিয়ে গেল সে।

'যিশু!' চোয়াল ঝুলে পড়েছে নিনার। 'হায় যিশু...'

•

সার্জেন্ট আরাফাত দবির ক্যাটওয়াকের যে অংশে, সেটা বরফের

দেয়ালের ভিতর গেঁথে থাকা। আপাতত পড়বার কথা নয়। বেশ খাড়া ভাবে ঢালু হয়ে নেমেছে ক্যাটওয়াক, নীচে সেণ্ট্রাল শাফট বা গভীর কূপ।

দবির তিন বিজ্ঞানীর নাম জানে না, অবশ্য এটা জানে, ওরা ক্যাটওয়াকে অনেক শ্লথ ছিল। চট্ করে কিছু ধরতে পারেনি। সবাই পড়ে গেছে কূপের ভিতর।

কিন্তু ওর রিফ্লেক্স ছিল বিদ্যুতের ঝিলিকের মত। নীচ থেকে ক্যাটওয়াক সরতেই ডেকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে, একহাতে খপ্ করে ধরেছে ক্যাটওয়াকের গ্রিল।

পিচ্চি মেয়েটাও দারুণ চালু।

পায়ের নীচে মেঝে সরে যেতেই ক্যাটওয়াকের উপর আছাড় খেয়েছে সে, ঢালু মেঝেতে গড়িয়ে চলে গেছে শেষ প্রান্তে। এরপর খাদের ভিতর পা-কোমর-বুক পড়তেই রেলিং পেরুল মাথাটাও। আর ঠিক তখনই শেষ চেষ্টা করেছে— ওর কপাল ভাল, একহাতে ধরে ফেলেছে হ্যাণ্ড রেলিং।

গ্যাস বিস্ফোরণে দুর্বল রেলিং এক পলক স্থির থেকেছে, পরক্ষণে লচকে গেছে। এখন ঝুলছে ভাঙা ক্যাটওয়াকের শেষে। উপর অংশ উল্টে নীচে নেমে এসেছে।

ওখানে ঝুলছে ছোট্ট মেয়েটি। ক্যাটওয়াকের মুচড়ে যাওয়া উল্টো রেলিং মাত্র একহাতে ধরতে পেরেছে। পঞ্চাশ ফুট নীচে পুলের ভিতর অপেক্ষা করছে বুভুক্ষু খুনে তিমির পাল!

'ভুলেও নীচে তাকাবে না!' গম্ভীর স্বরে বলল দবির। মেয়েটির হাত ধরবার জন্য উপুড় হয়ে পিছলে সামনে বাড়ছে সে। এরই ভিতর নীল পানির পুলে দেখেছে কিলার ওয়েইল। এ-ও দেখেছে, এক কমাণ্ডোকে নিয়ে গেছে একটা দানব। সে-কারণেই চাইছে না বাচ্চা মেয়েটা ওদিকটা দেখুক।

মেয়েটা অঝোরে কাঁদছে, বারবার ফুঁপিয়ে বলছে, 'আমাকে

পড়ে যেতে দেবেন না, স্যর, প্লিয!'

'কক্ষনো দেব না,' পেটের উপর ভর করে হাত বাড়িয়ে দিল দবির। একবার মেয়েটার কবজি ধরতে পারলেই...

এখনও দবিরের আশপাশে বেশ কিছু ছোট আগুন জ্বলছে ক্যাটওয়াকে। মেয়েটার কবজি থেকে কমপক্ষে একফুট দূরে ওর হাত। দবির দেখল চারপাশ দেখতে শুরু করেছে মেয়েটি।

'তোমার নাম কী?' হঠাৎ করেই বলল দবির। সরিয়ে নিতে চাইছে মেয়েটার মনোযোগ।

'আমার হাত পুড়ে যাচ্ছে,' ফুঁপিয়ে উঠল মেরি।

রেলিঙের ওদিকটা দেখে নিল দবির। বামে পনেরো ফুট দূরে প্ল্যাটফর্মের এক অংশে জ্বলছে খুদে আগুন। রেলিং যেখানে মচকে গেছে, জায়গাটা ওখানে।

'হ্যাঁ, সোনা-পাখি, জানি হাতে গরম লাগছে। এই এখনই তোমাকে সরিয়ে নেব। শুধু একটু অপেক্ষা করো। কী যেন বললে তোমার নাম?'

'মেরি।'

'বাহ্, খুব সুন্দর নাম। আমার নাম দবির। কিন্তু আমার বন্ধুদের মত তুমিও আমাকে লেখক বলতে পারো।'

'ওঁরা আপনাকে ওই নামে কেন ডাকেন?'

মাথা কাত করে চাইল দবির। ওখানে রেলিং চাটছে আগুন।

অবস্থা ভাল না।

বিস্ফোরণের ফলে তাপ তৈরি হয়েছে, রেলিঙের কালো রং শুকিয়ে চড়চড় করছে, যেন শুকনো কাগজ। এখন যদি ওখানে আগুন লাগে, জ্বলতে শুরু করবে গোটা রেলিং।

পিছলে সামনে বাড়ছে দবির। মেয়েটার হাত ধরতে চাইছে। কিন্তু তা করতে হলে এখনও ছয় ইঞ্চি এগুতে হবে। প্রায় পৌঁছেই গেছে।

'তুমি কি সবসময় এত কথা জানতে চাও?' প্রাণ খুলে হাসার ভঙ্গি নিতে চাইল দবির, গলা দিয়ে বেরুল দুর্বল হাসি। শরীর টানটান করতে গিয়ে কুঁচকে গেল গাল। 'আসলে জানো...' খুব সাবধানে এক ইঞ্চি এক ইঞ্চি করে নীচে নামছে। বড় করে শ্বাস ফেলল। 'হয়েছে কী, একবার...' শ্বাস নিল। 'আমার এক বন্ধু একবার ধরে ফেলল একটা বই লিখছি...'

'বুঝতে পেরেছি...' আবারও নীচে চলে গেছে মেরির চোখ।

'মেরি, সোনা-পাখি, এবার শোনো। ...হ্যাঁ, তুমি শুধু আমার দিকে তাকিয়ে থাকো। ঠিক আমার দিকে। কারও দিকে না।'

'ঠিক আছে,' সায় দিল মেরি। পরক্ষণে নীচে চাইল। মনে হলো এক্ষুনি হাত ছেড়ে দেবে।

'শালার কপাল আমার...' বিড়বিড় করল দবির।

ফ্রেঞ্চ কমাণ্ডোকে যেখান থেকে নিয়ে গেছে, তার মাত্র তিন ফুট দূরে কর্পোরাল নাজমুল। লোকটাকে ওভাবে মরতে দেখে আত্মা খাঁচা ছাড়া হয়ে গেছে ওর।

এখন থমথম করছে গোটা পুল।

কেউ কোনও আওয়াজ করছে না।

প্রায় নাড়াচাড়া না করেই ভেসে থাকতে চাইছে নাজমুল। চারপাশে নজর রেখেছে। নোনা পানি বরফের মত ঠাণ্ডা। ভীষণ জ্বলছে কাঁধের ক্ষতটা। ওটার কথা ভুলে থাকতে চাইছে।

ওর পাশে ভাসছে নিশাত সুলতানা, অপেক্ষা করছে কখন কী ঘটে। পাশে উপুড় হয়ে ভাসছে মৃত হলিডে। মাথা থেকে সরু রেখায় রক্ত বেরুচ্ছে, মিশে যাচ্ছে নীল পানিতে।

পুলের ভিতর স্থির হয়ে আছে অবশিষ্ট চার ফ্রেঞ্চ কমাণ্ডো। নাজমুল বা নিশাতের দিকে ঘুরেও চাইছে না। আপাতত দুই পক্ষ ভুলে গেছে লড়াই।

চোখ সরিয়ে বিজ্ঞানীদেরকে দেখল নাজমুল।

পানিতে পাথরের মূর্তি হয়ে গেছে দুই মহিলা আর ওই ছিঁচ-কাঁদুনে লোকটা।

পুলের ভিতর ওরা দশজন।

বাধ্য না হলে নড়ছে না।

কারও সাহস নেই যে সাঁতার কাটবে।

কয়েক সেকেণ্ড আগে দেখেছে কীভাবে তলিয়ে গেছে ফ্রেঞ্চ কমাণ্ডো।

এ থেকে শিক্ষা নিয়েছে সবাই: *যদি না নড়ো, তোমাকে না-ও দেখতে পারে।*

শ্বাস আটকে ফেলল নাজমুল। নীচে মসৃণ ভাবে সরছে বিশাল সব আকারের তিমি।

'ক্লিক' আওয়াজ পেয়ে ঘুরল নাজমুল। পানির উপর এমপি-৫ তুলে ধরেছেন আপা।

'উনি খেপা মানুষ,' ভাবল নাজমুল। 'এটা সম্ভব শুধু ওঁর পক্ষেই। পিস্তল দিয়ে লড়বেন খুনে তিমির বিরুদ্ধে!'

থমথম করছে চারপাশ।

কেউ নড়লেই...

হঠাৎ পানি-সমতলের একটু নীচে নিশাতের ডানে বিকট গর্জন ছাড়ল এক তিমি। পরক্ষণে তুলে ফেলল শরীরের উপর অংশ, বাতাসে ভেসে কাত হয়ে গেল, গুঁতো দিল গিয়ে নিথর হলিডের দেহে। বিশাল চোয়ালে নিল লাশ, ক্ষুরধার দাঁতগুলো গা গুলানো খচখচ আওয়াজ তুলে মাংস কাটছে। মুড়মুড় করে ভাঙছে বেশির ভাগ হাড়। লাশ নিয়ে ডুবে গেল তিমির মাথা, পরক্ষণে তলিয়ে গেল লেজটাও। ওখানে রইল শুধু ঘোলাটে লালচে ফেনা।

হলিডে এক ফোঁটা নড়ছিল না।

পুলের সবাই একইসঙ্গে জ্ঞান অর্জন করল।

ওরা নড়ছে কি নড়ছে না, তা নিয়ে কিলার ওয়েইলের কোনও মাথা-ব্যথা নেই!

এবার একইসঙ্গে নড়ে উঠল নয়জন। পুলের কিনারায় যেতে পাগল হয়ে উঠেছে সবাই। সবার পিছনে ভেসে উঠেছে-খুনে তিমিগুলো, তারাও ব্যস্ত হয়ে উঠেছে পেট-পূর্তি-করতে।

বি-ডেকের ভাঙা ক্যাটওয়াকে কাকে যেন অভিশাপ দিচ্ছে সার্জেন্ট হোসেন আরাফাত দবির।

মেরি যখন পুলের দিকে চেয়েছে, ও দেখতে পেয়েছে বিশাল কালো-সাদা কী যেন। নীচে ওসব কী তা বুঝতে পেরেই থিরথির করে কাঁপতে শুরু করেছে ওর নীচের চোয়াল। তারপর যখন দেখেছে পানির নীচ থেকে লাফ দিয়ে উঠেছে একটা, কচমচ করে চিবিয়ে খাচ্ছে হলিডের শরীর, কেঁপে উঠল ওর সারা শরীর।

'হায় খোদা, হায় যিশু!' ফুঁপিয়ে চলেছে এখন।

বাধ্য হয়ে তাড়াহুড়া করতে হচ্ছে দবিরকে। ক্যাটওয়াকের শেষপ্রান্তে পৌঁছে বুক পর্যন্ত নামিয়ে দিয়েছে খাতে। কোমর থেকে পা ক্যাটওয়াকের উপরে, মাথা তাক করেছে অনেক নীচের পুলের দিকে। একবার নীচে খসে পড়লে...

মুক্ত ডানহাত মেরির দিকে বাড়িয়ে দিয়েছে দবির।

দু'জনের হাত মাত্র দুই ইঞ্চি দূরে।

বলতে গেলে কবজি প্রায় পেয়েই গেছে দবির।

এমন সময় হঠাৎ করেই বামদিকে নরম একটা ফস্ আওয়াজ শুনল। ঝট্ করে ঘুরে চাইল। 'শালার কপাল...'

রেলিঙে ধরেছে ছোট্ট কমলা আগুন, দ্রুত পোড়াতে শুরু করেছে শুকনো কালো রং। তার ভিতর দিয়ে খুব সরু রেখার একটা শিখা আসছে।

বিস্ফারিত হলো দবিরের দুই চোখ।

রেলিং বেয়ে রকেটের মত আসছে শিখা!

ঠিক মেরির হাতের দিকেই!

এখনও পুলে খুনি তিমির দিকে চেয়ে আছে মেরি। মাথা তুলে দবিরের দিকে চাইল। দু'জনের চোখ মিলিত হতেই দবির বুঝল, আতঙ্কে জড়পদার্থ হয়ে গেছে মেয়েটা।

ওর পক্ষে যতটা নামা সম্ভব, নেমে গেছে দবির। টানটান হয়ে উঠেছে সমস্ত পেশি, ক্যাটওয়াক থেকে নীচে ঝুলছে দেহের উপরের অংশ। শেষ চেষ্টা হিসাবে খপ্ করে মেরির কবজি ধরতে চাইল।

কালো হ্যাণ্ড রেলিঙের উপর দিয়ে ছুটে আসছে কমলা শিখা, পিছনে লম্বা লেজ।

মেরির কবজি থেকে মাত্র এক ইঞ্চি দূরে দবিরের হাত।

আরও একটু নামতে চাইল সে। ওর আঙুলের ডগা স্পর্শ করল মেয়েটার হাতের উপর অংশ।

আর এক ইঞ্চি। মাত্র এক ইঞ্চি...

ঠিক তখনই উজ্জ্বল কমলা শিখা চোখের কাছে দেখল দবির। প্রচণ্ড হতাশা নিয়ে চেঁচিয়ে উঠল ও: 'না!'

চোখের সামনে দিয়ে তরতর করে চলে গেল শিখা, গিয়ে ঢুকল মেরির হাতের নীচে।

অসহায় আতঙ্ক নিয়ে চেয়ে রইল দবির, তীব্র যন্ত্রণায় চেঁচিয়ে উঠেছে মেরি। শরীরে আগুন লাগলে কারও পক্ষেই নিয়ন্ত্রণ রাখা অসম্ভব।

রেলিং ছেড়ে দিল মেরি।

এমনই হবে, বুঝেছে দবির, আর সেজন্যই ক্যাটওয়াকের উপর অংশ থেকে বামহাত সরিয়ে নিয়েছে— হোঁচট খেয়ে নেমে এসেছে সে মেয়েটির দিকে। সরাসরি তিন ফুট পতন হলো তার। একটা হাত নীচের দিকে, অন্য হাত উপরের দিকে তাক করা।

নীচের হাত খপ্ করে ধরল মেরির পিঙ্ক পারকার উলের হুড। বাম হাতে ধরে ফেলেছে জ্বলন্ত রেলিং।

জোর ঝাঁকি খেয়ে থামল দু'জন। চরকির মত এক শ' আশি ডিগ্রি ঘুরে গেল দবির। আরেকটু হলে সকেট থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল কাঁধের হাড়। এখন ওর মাথা উপরের দিকে, ঝুলছে জ্বলন্ত রেলিং ধরে। ঠিক করেছে, কিছুতেই রেলিং ছাড়বে না।

ওর হাতে পুরু চামড়ার গ্লাভস্, কিন্তু মনে হলো মাথার ভিতর আগুন ধরে গেছে। ব্যথাটা সামলে নিয়ে এক সেকেণ্ড পর মেরির দিকে চেয়ে স্বস্তির হাসি হাসল।

'সোনা-পাখি, তোমাকে ধরেছি,' বড় করে দম নিল দবির, 'পাখিটা ঠিকই খপ্ করে ধরেছি!'

নীচে ঝুলছে মেরি, বেকায়দা ভাবে দু'দিকে প্রসারিত দুই হাত। দবিরের শক্তিশালী পাঞ্জা ধরে রেখেছে উলের হুড।

'ঠিক আছে,' খুশি হয়ে বলল দবির। 'এবার দেখা যাক কীভাবে উঠে যাওয়া...'

হঠাৎ পুট করে একটা আওয়াজ হলো। আর সঙ্গে সঙ্গে একটু নীচে নামল মেরি। দবির প্রথমে বুঝল না কী ঘটেছে। তারপর দেখতে পেল। চোখ পড়েছে মেরির পারকা এবং ওটার উলের হুডের উপর।

চোখ বিস্ফারিত হলো দবিরের।

আসলে পারকার অংশ না ওই হুড!

আজকাল এসব পারকা ও হুড বিক্রি হয়। দরকার হলে একটা থেকে আরেকটাকে খুলে নেয়া যায়। মেরির পারকার সঙ্গে হুড়ে রয়েছে সব মিলে ছয়টা বোতাম।

তারই একটা খুলে যাওয়ার আওয়াজ পেয়েছে দবির। অসুস্থ বোধ করল ও। মনে মনে বলল, 'এটা ঠিক না! আল্লা, এত কষ্ট করার পরে...'

পুট!

আরেকটা বোতাম খুলেছে।

কার উপর যেন ভীষণ অভিমান হলো দবিরের। বুঝতে পারছে না কী করবে। আসলে কিছু করবারও নেই। রেলিঙের সবচেয়ে নীচের অংশে ঝুলছে। নিজেকে আর নামাতে পারবে না। অন্য হাতে ধরেছে মেরির হুড।

'পুট! পুট!'

খুলে গেল আরও দুটো বোতাম। ভীষণ ভয়ে চেঁচিয়ে উঠল মেরি। ছোট ছোট ঝাঁকি খেয়ে নীচে নামছে। তারপর হঠাৎ করেই আবারও স্থির হচ্ছে।

টানটান হয়ে উঠেছে হুড। পারকার কলারে এখন মাত্র দুটো বোতাম বাকি!

মেরিকে দুলিয়ে সি-ডেকের ক্যাটওয়াকে ফেলবে, ভাবতে শুরু করেছে দবির। ওটা আছে বারো ফুট দূরে। চিন্তাটা বাতিল করে দিল। উলের হুড ফট করে খুলে যাবে। মাত্র ওই দুটো বোতাম ধরে রেখেছে মেরির ওজন।

'দুশ্শালার কপাল!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল দবির। 'কোনও শালা সাহায্য করবে না!'

'নিশ্চয়ই করবে, অপেক্ষা করো,' কাছ থেকেই বলে উঠল কে যেন। 'আমি আসছি!'

মাথা কাত করে চাইল দবির, মুখ চুন হয়ে গেল। সি-ডেকের ক্যাটওয়াকের কাছে মাসুদ স্যর, বেরিয়ে আসছেন এক অ্যালকোভ থেকে। ওঁর পাশে তিশা করিম। তাকে কী যেন বলছেন স্যর। দেখিয়ে দিলেন কাছের রাং-ল্যাডার। মেয়েটা নামছে পুল ডেকের দিকে। এদিকে সাহায্য করতে আসবেন স্যর।

'পুট!'

অবশিষ্ট দুই বোতামের একটা খুলে গেছে। বিকৃত চেহারা

করে মেরির দিকে চাইল দবির। ভয়ঙ্কর ভয় পেয়েছে বাচ্চা মেয়েটা, তারচেয়ে দ্বিগুণ ভয় পেয়েছে ও নিজে। কাঁদতে গিয়ে লালচে হয়ে উঠেছে মেয়েটির দুই চোখ। টপটপ করে গাল বেয়ে পড়ছে অশ্রু। দবিরের চোখে চোখ রাখল। ফোঁপাতে শুরু করেছে আবার, বলল, 'আমি মরতে চাই না! ঈশ্বর, আমি মরতে চাই না!'

আর মাত্র একটা বোতাম বাকি।

মেরির ওজন নিতে গিয়ে ভীষণ টানটান হয়ে উঠেছে হুড।

বোতাম টিকবে না।

দবির বুঝে গেছে, কিছুই করতে পারবে না। ফ্যাসফ্যাসে স্বরে বলল ও, 'পারলাম না, সোনা-পাখি!'

এর এক সেকেণ্ড পর পুট আওয়াজ তুলল বোতাম। খুলে গেল হুড। অসহায় দবির চেয়ে রইল। ওর মনে হলো খুব ধীরে নীচে রওনা হলো মেরি। বিস্ফারিত দৃষ্টিতে চেয়ে রইল ওর চোখে, মুখে ভীষণ কষ্টের ছাপ। মিষ্টি মেয়েটা নীচে গিয়ে পড়ছে, মুচড়ে উঠল দবিরের বুকের ভিতরটা।

পঞ্চাশ ফুট নীচে বরফ-ঠাণ্ডা পানিতে ঝপাস্ করে পড়ল ছোট্ট মেরি!

চোদ্দ

কসাইখানা হয়ে উঠেছে উইলকক্স আইস স্টেশনের পুল। সি-ডেকের অ্যালকোভে হতবাক হয়ে গেছে মাসুদ রানা।

বরফ-ঠাণ্ডা পানিতে ধোঁয়া বা মেঘের মত ছড়িয়ে পড়ছে তাজা রক্ত। কোথাও কোথাও অনেক বেশি পরিমাণে, ওদিকটায় কিলার

ওয়েইলগুলোকেও স্পষ্ট দেখা গেল না।

পুলের একদিকে ফ্রেঞ্চ কমাণ্ডোরা, বেশির ভাগ হামলা হচ্ছে তাদেরই উপর। এরই ভিতর দু'জন লোক হারিয়েছে তারা। পুলের কিনারে ধাতব ডেকে উঠবার জন্যে উন্মাদের মত সাঁতরে চলেছে নাজমুল, নিশাত ও তিন বিজ্ঞানী।

পুরো পথ তীক্ষ্ণ চিৎকার ছেড়েছে পিঙ্ক পারকা পরা মেরি, ঝপাস্ করে চিত হয়ে নেমেছে পুলে, এবং সঙ্গে সঙ্গেই টুপ করে ডুবে গেছে।

ঝট্ করে দবিরের দিকে চাইল রানা, বি-ডেকের উল্টো রেলিং থেকে ঝুলছে সার্জেন্ট।

পলকের জন্য চোখে চোখ পড়ল দু'জনের। একদম হেরে যাওয়া চেহারা দবিরের, ভীষণ বিরক্ত ও ক্লান্ত, লালচে দুই চোখ বলে দিল পরাজয় মেনে নিয়েছে। আর কিছুই করবার নেই ওর।

কিন্তু রানার কিছু করবার আছে। ঠোঁটে ঠোঁট চেপে বসেছে ওর, বর্তমান পরিস্থিতি বুঝে নিয়েছে।

পুলের আরেক দিকে ডাইভিং বেলের ওপাশে পড়েছে মেরি, ওদিকের পানি এখনও ফাঁকা। অন্যরা পৌঁছে গেছে পুলের কিনারায়, মহাব্যস্ত হয়ে পানি ছেড়ে উঠতে চাইছে। কেউ খেয়াল করেনি ছোট্ট মেয়েটা পুলের ভিতর পড়েছে।

পুলের দিকে চেয়ে আছে রানা, শুনতে পেল সার্জেন্ট জনি ওয়াকারের কণ্ঠ। সার্জেন্ট ভাইপার ওরফে পল সিংগার ও বাংলাদেশ আর্মির লেফটেন্যান্ট গোলাম মোরশেদের সঙ্গে দ্রুত কথা বলছে সে। ফ্রেঞ্চ কমাণ্ডোদের বিরুদ্ধে এ-ডেকে তুমুল গোলাগুলি চলছে ওয়াকার ও মোরশেদের।

'... ওদের নিয়ে যাও দক্ষিণে...'

'ওরাও অস্ত্র ব্যবহার করতে পারবে না...'

ঘুরে দাঁড়াল রানা, কাজে লাগবে এমন জরুরি কিছু খুঁজছে দুই

চোখ।

একটু দূরে নির্জন অ্যালকোভ। কয়েক মুহূর্ত হলো তিশাকে পুল ডেকে পাঠিয়েছে। ভেবেছিল নিজে দবিরকে সাহায্য করতে যাবে। কিন্তু তার আগেই পড়ে গেল মেয়েটা। বেচারি আছে এখন পুলের ভিতর কিলার ওয়েইলদের সঙ্গে।

পিছনে কন্সোলের বোতামগুলো দেখল রানা, ওখানে একটা লিভারের নীচে লেখা: ডাইভিং বেল উইঞ্চ।

ওটা দিয়ে কিছু হবে না।

ওর চোখ আটকে গেল বড় চৌকো এক বোতামের উপর। তার নীচে লেখা: ব্রিজ।

নীচের পুলের দিকে আবারও চাইল রানা, ওর মনে পড়েছে নিনা ভিসারের কথা: এখান থেকেই স্টেশনের মাঝে বাড়িয়ে দেয়া যায় রিট্র্যাক্টেবল ব্রিজ।

এক লাফে অ্যালকোভে পৌঁছে গেল রানা, বড় চৌকো বোতামটা টিপে দিল, সঙ্গে সঙ্গে শুনল পায়ের নীচে জোরালো গুঞ্জন।

কী যেন পাশের দেয়ালের ওদিক থেকে গুনগুন করছে। মেঝের তলা থেকে বেরিয়ে পুলের উপর যাচ্ছে সরু এক প্ল্যাটফর্ম। ওদিক থেকেও একটা আসছে। দুটো মিলিত হবে ক্যাটওয়াকের নীচে।

এবার আর এক সেকেণ্ডও নষ্ট করল না রানা, ব্রিজের উপর দিয়ে দৌড়াতে শুরু করল। ওর চেয়ে অনেক দ্রুত সামনে বাড়ছে সেতু। ওটা বেশি চওড়া নয়, বড়জোর দুই ফুট, দু'দিকে কোনও রেলিংও নেই। ওদিক থেকে আসছে অন্য অংশ, মাঝে মিলিত হবে; বড় করে শ্বাস নিল রানা, দৌড়ের গতি আরও বাড়িয়েছে, হঠাৎ করেই কোনাকুণি ভাবে লাফ দিল সেতুর উপর থেকে।

ওদিকে অবাক হয়ে চেয়ে আছে সার্জেণ্ট হোসেন আরাফাত

দবির। বিশাল কূপের মাঝে তীরের মত ছুটছে মাসুদ স্যর, ডাইভিং বেলের উপর দিয়ে পেরিয়ে গেল, তারপর পড়তে লাগল বরফ-ঠাণ্ডা পুলের ভিতর।

ভারী ইঁটের মত পড়ছে রানা, তবে অদ্ভুত একটা কাজ করল। ঝট্ করে ডানহাত উপরে তুলল, কী যেন নিল কাঁধের পিছন থেকে।

যতটা পারে ছড়িয়ে দিয়েছে দুই পা, এখন আর পানির গভীরে তলিয়ে যাবে না। দুই হাতে শক্ত করে ধরেছে কাঁধের পিছন থেকে নেয়া জিনিসটা।

ভয় পেয়ে পুলের ভিতর ঘুরে দাঁড়িয়েছে মেরি ভিসার। ওর পাশে বিস্ফোরিত হয়েছে পানি।

মেরি ভেবেছিল ওটা কোনও কিলার ওয়েইল, কূপের অনেক গভীর থেকে উঠে এসেছে। কিন্তু মাথা ও মুখে লেগেছে কয়েক বালতি পানি। চোখ পরিষ্কার হতেই আবারও দেখল, ওর পাশেই পানির ভিতর নেমেছে এক লোক।

যোদ্ধাদেরই কেউ। এক মুহূর্ত পর টের পেল, এই লোককে আগেও দেখেছে, কথাও বলেছে। এই লোকটা বেশ ভাল। নামটা মনে করবার চেষ্টা করল মেরি। মাশুক, ভাবল। বা মাটুশ। ওই রকমই নাম।

'ঠিক আছ তো, মেরি?' জানতে চাইল লোকটা।

বোকা-বোকা চেহারায় উপর-নীচ মাথা দোলাল মেরি।

উপর থেকে পানিতে পড়েছে লোকটা, কান থেকে খুলে গেছে ইয়ারপিস। ওটা ঠিক করে নিল সে। লোকটার দুই চোখের মণি কুচকুচে কালো। অন্য কারণে হঠাৎ করেই চমকে গেল মেরি, কী যেন হুশ্ করে পাশ কাটিয়ে গেছে। পরক্ষণে বুঝল ওটা একটা কিলার ওয়েইল।

দু'জনের মুখের পাশ দিয়ে চলে গেল ওটার কালো, উঁচু ডরসাল ফিন। তারপর খুব ধীরে তলিয়ে গেল।

তীব্র আতঙ্কে হাঁপাতে শুরু করেছে মেরি।

ওর পাশে পানির গভীরে চোখ রেখেছে লোকটা। ওরা পুলের যেখানে আছে, সেখানে রক্ত ছড়িয়ে পড়েনি। নীচে শুধু স্ফটিকের মত স্বচ্ছ নীল পানি।

লোকটার চোখ লক্ষ্য করে পানির নীচে চাইল মেরি। এক সেকেণ্ড পর ভীষণ চমকে উঠল। মস্ত হাঁ করে ওর পায়ের দিকে ছুটে আসছে এক কিলার ওয়েইল!

টানা চিৎকার শুরু করেছে মেরি, কিন্তু ওর পাশের লোকটা চুপ করে আছে। ভঙ্গি দেখে মনে হলো ভয়ডর বলে কিচ্ছু নেই, সম্পূর্ণ নির্বিকার। এক সেকেণ্ড পর পানির দিকে দুই হাতে তাক করল সাবমেশিন-গানের মত জিনিসটা। পেরিয়ে গেল একটা সেকেণ্ড, তারপর খুনি তিমির দিকে চেয়ে টিপে দিল ট্রিগার।

কিন্তু গুলির আওয়াজ হলো না।

জোরালো ঘটাং আওয়াজ করে কী যেন বের হয়েছে।

রানার লঞ্চারের মাযল থেকে ছিটকে বেরিয়েছে গেল ম্যাগনেটিক গ্র্যাপলিং হুক। পানির ভিতর সোজা গিয়ে গেঁথেছে তিমির নাকে। প্রচণ্ড ব্যথা পেয়ে চমকে উঠেছে তিমি, থমকে গেছে স্থানুর মত।

মেরিনদের এই লঞ্চার প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে চার হাজার পাউণ্ড ধাক্কা তৈরি করে, গন্তব্যে পৌছে দেয় গ্র্যাপলিং হুককে। রানা নিশ্চিত ছিল না এই জিনিস থামাবে সাত টনি কিলার ওয়েইলকে। জন্তুটাও চমকে গেছে তার সঙ্গে কেউ লড়তে এসেছে দেখে।

পর পর দু'বার লঞ্চারের ট্রিগারে চাপ দিল রানা, সঙ্গে সঙ্গে ফিরতে লাগল গ্র্যাপলিং হুক।

'পুরো আস্ত আছ তো?' মেরির দিকে চাইল রানা। 'হাত-

পায়ের সব আঙুল আছে?'

হাসি-হাসি দুই চোখের দিকে চাইল মেরি, বোকার মত মাথা দোলাল।

'তা হলে চলো লেজ তুলে পালাই,' মেরির হাত ধরে সাঁতরাতে শুরু করল রানা।

পুলের ধারে পৌঁছেছে নিনা ভিসার, হাঁকুপাঁকু করে উঠে গেল ইস্পাতের ডেকে, ঘুরে চাইল। একটু দূরে প্রাণপণে সাঁতরাচ্ছে রলিন্স ও রাফায়লা।

'তাড়াতাড়ি!' চেঁচিয়ে উঠল নিনা। 'তাড়াতাড়ি!'

আগে পৌঁছুল রাফায়লা, দুই হাতে তার হাত ধরল নিনা, টান দিয়ে তুলে নিল ডেকে।

হাঁপাতে হাঁপাতে আসছে রলিন্স, এখনও দুই গজ দূরে।

'আরও জলদি, রলিন্স!'

আর মাত্র এক গজ পেরুতে পারলেই...

রলিন্স ক্লান্ত ও হতাশ চোখে চাইল, ডেকের কিনারে হাঁটু গেড়ে অপেক্ষা করছে নিনা ভিসার।

তারপর পৌঁছে গেল রলিন্স, অলিম্পিকের চ্যাম্পিয়ন সাঁতারুর মত বুক দিয়ে ধপ করে বাড়ি দিল ডেকের পাশে। বিজয়ীর মত হাত বাড়িয়ে দিয়েছে, সামনে ঝুঁকে খপ্ করে তার হাত ধরল নিনা। ডেকের উপর টেনে তুলছে, এমন সময় লোকটার পিছনের পানি চিরে দেখা দিল খুনি তিমি। মস্ত হাঁ করেছে ওটা, মুহূর্তে রলিন্সের পা থেকে শুরু করে বুক পর্যন্ত চোয়ালের ভিতর পুরে নিল।

ক্ষুরের মত দাঁতগুলো পাঁজরে বসতেই জিওলজিস্টের দুই চোখ বিস্ফারিত হলো। এখনও তার দুই হাত ধরে প্রাণপণে টানছে নিনা। কিন্তু ওদিক থেকে এল অনেক বেশি জোরালো টান। এক

সেকেণ্ড পর পানির নীচে নামল কিলার ওয়েইলের বিশাল মাথা, সরিয়ে নিতে শুরু করেছে শিকারকে। নিনা টের পেল, আতঙ্কিত বিজ্ঞানীর দুই হাতের নখ চিরে দিচ্ছে ওর হাতের চামড়া, বেরিয়ে আসছে রক্ত। এক মুহূর্ত পর ওর হাত থেকে ছুটে গেল লোকটা। ডেকের উপর ধপ্ করে পড়ে গেল ও। ভীত দৃষ্টিতে দেখল, মুহূর্তে তলিয়ে গেল রলিন্স।

এখনও ডেকের কয়েক গজ দূরে নিশাত ও নাজমুল। গায়ের সমস্ত শক্তি ব্যবহার করে আসছে ওরা। কোনওদিকে চাওয়ার সময় নেই নাজমুলের, কিন্তু এমপি-৫-র নল পানির নীচে ডুবিয়ে গুলি করছে নিশাত। বাংলাদেশ আর্মি কলেজে শিখেছে: পানির নীচে গুলি ভাল কোনও ফলাফল এনে দেয় না। পানিতে মাত্র ছয় গজ গেলেই সাধারণ বুলেটের ভেলোসিটি প্রায় ফুরিয়ে যায়। এরপর একটু গিয়েই টুপ করে ডুবে যায়।

এই কঠিন বাস্তব যেন মানতে চাইছে না নিশাত। ও অপেক্ষা করছে, তারপর খুনি তিমি কাছে আসতেই গুলি শুরু করছে। বুঝতে পারছে, ওই দানবগুলোর পুরু চামড়া ভেদ করছে বুলেট। অবশ্য তাতে বড় কোনও ক্ষতি হচ্ছে না। নিশাতের গুলির তোড়ে বাঁক নিয়ে অন্য দিকে সরছে কিলার ওয়েইল, কিন্তু তা কয়েক মুহূর্তের জন্য, তারপর আবারও ফিরছে, যেন এরকম সামান্য চিমটিতে কিছুই যায় আসে না তাদের।

ডেকের পাশে পৌঁছেছে নাজমুল, এবার উঠে পড়বে, চট্ করে কাঁধের উপর দিয়ে চাইল। একটু পিছনে আসছে নিশাত আপা।

বামদিকে চেয়ে আছে নিশাত; পানির নীচে গুলি পাঠাতে শুরু করেছে। তারপর হঠাৎ করেই হাতের ঝাঁকুনি থেমে গেল। মনে হলো খুব দ্বিধান্বিত হয়ে উঠেছে সে।

অস্ত্রটা আর গুলি ছুঁড়ছে না।

চেম্বারে ফেঁসে গেছে একটা বুলেট।

হতবাক নাজমুল দেখল, মহা-বিরক্তি নিয়ে এমপি-৫ ঝাঁকাতে শুরু করেছে আপা, মনে হলো ঝাঁকি দিয়েই অস্ত্র চালু করবে।

আর ঠিক তখনই নাজমুল টের পেল, পানির নীচ দিয়ে কালো কী যেন উঠে আসছে নিশাতের ডানদিকে।

'আপা!' গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠল নাজমুল, 'ডানদিকে!'

শুনতে পেয়েছে নিশাত, ঝট করে ঘুরে গেছে ওদিকে। এবং দেখেও ফেলেছে, পিছনে উঠে আসছে খুনি তিমি। এখন আর কোনও কাজে আসবে না অস্ত্র। পানির ভিতর সরে যেতে চাইল নিশাত, দুই পা ভাঁজ করে তুলে নিল বুকের কাছে। এক সেকেণ্ড পর কয়েক ইঞ্চির ব্যবধানে ওর পিছন দিয়ে চলে গেল কিলার ওয়েইল।

নাজমুল মাত্র ভাবতে শুরু করেছে, নিশাতকে পাশ কাটিয়ে চলে গেছে খুনি, কিন্তু ঠিক তখনই টের পেল, গতিপথ পাল্টে নিয়েছে ওটা, ভেসে উঠেছে পানির উপর, চোয়ালের ভিতর খপ্ করে পুরে নিয়েছে অস্ত্র সহ নিশাতের হাত।

তীব্র ব্যথা পেয়ে এমপি-৫ ছেড়ে হ্যাঁচকা টান দিয়ে ছাড়িয়ে নিল সে হাতটা। অস্ত্রের উপর কামড় পড়তেই চিবাতে শুরু করেছে তিমি।

কবজি থেকে রক্ত বেরুচ্ছে নিশাতের। আশপাশের পানি লাল হয়ে উঠছে।

পাত্তা দিল না নিশাত, হাত যে আছে এই তো বেশি! অস্ত্রটা অবশ্য হারিয়েছে। ডেকের কাছে পৌঁছতে ব্যস্ত হয়ে উঠল।

নাজমুলের মনে হলো, খোদ শয়তানের তাড়া খেয়েছে আপা। নিজে দুই হাতে ভর দিয়ে উঠে এল প্ল্যাটফর্মে, তাড়া দিল: 'জলদি আপা! আরও জলদি!'

টর্পেডোর মত আসছে নিশাত সুলতানা।

প্ল্যাটফর্মের কিনারায় হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল নাজমুল।

নিশাতের পিছনে আবার দেখা দিয়েছে কালো ছায়া।

ওরকম কালো ছায়া পুলের চারপাশে। অনেক।

তারপর হঠাৎ করেই বুঝল নাজমুল, *কোনওভাবেই ডেকে পৌঁছবে না আপা!*

যেন ওর ভাবনা বাস্তব করতেই হঠাৎ নিশাতের ছুটন্ত দুই পায়ের পিছনে হাজির হলো বিশাল এক কালো দানব।

হতবাক নাজমুল দেখল, ওখানে মৃদু কাঁপছে সুবোধ-শান্ত পানি, তার ভিতর দিয়ে খুব ধীরে এল ওটা, বিশাল সাদা-কালো চোয়ালের ভিতর দেখা দিল লালচে কী যেন।

চওড়া মুখ খুলছে খুনি তিমি!

করাতের মত দাঁতগুলো বেরিয়ে আসতেই রক্ত হিম হয়ে এল নাজমুলের। স্বচ্ছ পানির ভিতর দেখল, নিশাতের পিছনে বিশাল কালো ডরসাল ফিন খুব ধীরে উঠছে আর উঠছে, তারপর বেচারি আপার পাদুটো ঢুকে গেল তিমির চোয়ালের ভিতর।

তখনও পা ছুঁড়ছে নিশাত।

এক মুহূর্ত পর তিমি নিশ্চিত হলো শিকার ধরা পড়েছে, আস্তে করে চোয়াল বন্ধ করল নিশাতের হাঁটুর একটু উপরে।

মানসিক ও শারীরিক প্রচণ্ড ঝাঁকি খেয়েছে নিশাত, ওর জানা ছিল না কোনও হামলা এমন ভয়ঙ্কর হতে পারে।

হতচকিত নাজমুল দেখল, নিশাতকে অনায়াসে নীচে নিয়ে যাচ্ছে তিমি। চারপাশের পানি ভরে উঠছে ফেনা ও বুদ্বুদে, তার ভিতর ফিনকি দিয়ে পড়ছে রক্ত। উন্মাদিনীর মত ছটফট করছে নিশাত, চোয়ালের কারাগার থেকে বেরুতে চাইছে।

হঠাৎ ভেসে উঠল নিশাত, একইসঙ্গে উঠে এসেছে তিমিটাও। পানির নীচে ঝটকা-ঝটকি করতে গিয়ে কীভাবে যেন চোয়ালের

ভিতর থেকে এক পা ছুটিয়ে নিতে পেরেছে নিশাত, তিমির নাকের সামনে আবারও সাঁতরাতে শুরু করেছে।

'শুয়োরের বাচ্চা!' চিৎকার করে গালি দিল।

কিন্তু ওর অন্য পা কোনওভাবেই ছাড়ছে না তিমি।

হোঁচট খেয়ে সামনে বাড়ল নিশাত, মুখের কাছে দেখা দিল সাদা স্রোত। ওকে ঠেলে নিচ্ছে তিমি। একটু সামনে নাজমুল ও প্ল্যাটফর্ম!

তারপর দড়াম করে ডেকের সঙ্গে বাড়ি খেল নিশাত। কী করে যেন শক্ত করে ধরে ফেলেছে ধাতব প্ল্যাটফর্মের গ্রিল।

'খুন করে ফেলব, হারামজাদা!' দাঁতে দাঁত চিপে চিৎকার ছাড়ল নিশাত। 'শালা, শুয়োরের বাচ্চা!'

দুই হাতে শক্ত করে প্ল্যাটফর্ম ধরেছে নিশাত। ঝটকা দিয়ে সামনে বাড়ল নাজমুল, খপ্ করে ধরে ফেলল নিশাতের দুই হাত, প্রাণপণে টানছে পিছন দিকে। এবার শুরু হলো তিমির সঙ্গে টাগ-অভ-ওয়ার। মাঝে বেকায়দা ভাবে আটকা পড়েছে নিশাত।

তারপর নাজমুল দেখল হোলস্টার থেকে কোল্ট অটোমেটিক রিভলভার বের করল নিশাত, কিলার ওয়েইলের মাথা তাক করেই গুলি ছুঁড়ল।

'মর্ শালা!' বলল নাজমুল।

'কী? খাবি?' তিমির উদ্দেশ্যে চিৎকার করল নিশাত, 'এটা খেয়ে দ্যাখ!'

ওর অস্ত্রের মাযলের মুখ থেকে ঝলকে উঠল হলুদ আগুন, সঙ্গে সঙ্গে জ্বলে উঠল চারপাশের গ্যাসীয় বাতাস। বিকট বিস্ফোরণটা নিশাত ও নাজমুলকে কমপক্ষে পাঁচ গজ পিছনে ছিটকে ফেলল ডেকের উপর।

তিমির কপাল এত ভাল নয়। ঠিক মগজে ঢুকেছে বুলেট। সঙ্গে সঙ্গে একের পর এক ঝাঁকি খেতে শুরু করেছে ওটা। পিছিয়ে

চলেছে, আরও উপরের দিকে উঠছে মাথা। তারপর নিজের তৈরি রক্তের ধোঁয়ার ভিতর আস্তে করে নেমে গেল পানিতে। মুখে রয়ে গেল তার পুরস্কার— মারা যাওয়ার মাত্র পাঁচ সেকেণ্ড আগে নিশাতের বাম পায়ের হাঁটু কেটে নিয়েছে।

পুলের ঠিক মাঝে আছে মেরি ও রানা, একদিকে ডাইভিং বেল, ওদিকে পঁচিশ ফুট দূরে প্ল্যাটফর্ম। পরস্পরের দিকে পিঠ রেখে চারপাশ দেখছে। হতবাক হয়ে গেছে। চারপাশে কিছুই নড়ছে না। বড় বেশি শান্ত পানি, কোথাও কোনও আওয়াজও নেই।

'স্যর,' প্রায় ফিসফিস করে বলল মেরি। তিরতির করে কাঁপছে চোয়াল। ভয় এবং ঠাণ্ডায়।

'কী, মেরি?' চারপাশের পানিতে চোখ রেখেছে রানা।

'আমার খুব ভয় লাগছে।'

'ভয়? কীসের জন্য?' রানার নিজের কণ্ঠ একটু কেঁপে গেল। 'আজকাল তো বাচ্চারা কিছুই ভয় পায় না। এসব অনেক দেখে সি ওয়ার্ল্ডে।'

কথাটা মাত্র বলেছে রানা, দুই চোখ বিস্ফারিত হলো, দেখল ঠিক সামনেই একটা কিলার ওয়েইল। পানির উপর নাক উঁচু করে তেড়ে আসছে মেরি এবং ওর দিকে!

'মেরি, ডুব দাও!' চেঁচিয়ে উঠল রানা। তেড়ে আসা তিমির চওড়া মুখ খুলে যেতেই দেখা দিয়েছে ছুরির মত দুই সারি সাদা দাঁত।

বড় করে দম নিয়েই ডুব দিল রানা, সঙ্গে হ্যাঁচকা টান দিয়েছে মেরিকে।

পানির ভিতর হঠাৎ করেই চারপাশ হয়ে উঠল নীরব, নিঃশব্দ। ওদের উপর দিয়ে তীব্র গতি তুলে পেরুল বিশাল সাদা পেট, খ্যাস্ আওয়াজ তুলে ঘষা দিল্ রানার হেলমেটের উপর অংশে। আবারও

জোর ঝপাস্ আওয়াজ তুলে পানির উপর পড়ল তিমির মাথা, এখনও এগিয়ে যাওয়ার গতি কমেনি।

এই সুযোগে মাথা তুলল রানা ও মেরি, হাঁ করে দম নিতে চাইছে।

চট্ করে বামদিকে চাইল রানা, ওদিকে প্ল্যাটফর্মের উপর নাজমুল ও নিশাত। ডানদিক দেখল, নিরাপদেই ওই ডেকে উঠেছে নিনা ভিসার ও রাফায়লা ম্যাকানটায়ার। দ্রুত সরছে কিনারা থেকে।

চরকির মত ঘুরল রানা, জোরালো টান খেয়ে এইমাত্র তলিয়ে গেল আরেক ফ্রেঞ্চ কমাণ্ডো! লোকটা প্রায় পৌঁছে গিয়েছিল ডেকের কাছে। চাপা শ্বাস ফেলল রানা, অন্যদের চেয়ে অনেক বেশি দূর পেরুতে হবে ওদেরকে। উপর থেকে ওরা পড়েছে পুলের ঠিক মাঝে।

মরুক শালার ফ্রেঞ্চগুলো, ভাবল। উপরের দিকে চাইতেই দেখল সি-ডেকের মাঝে কূপের উপর রিট্র্যাক্টেবল ব্রিজ। পরক্ষণে কান ফাটানো আওয়াজে চমকে গেল। সি-ডেকের অ্যালকোভের ভিতর বিকট বিস্ফোরণ হয়েছে। সাদা আগুনের বিশাল লকলকে জিভ চেটে দিল সেণ্ট্রাল শাফটের বাতাসকে।

রানা বুঝে গেছে কী হয়েছে। এ-ডেকের ফ্রেঞ্চরা ভাল করেই জানে গোলাগুলি অসম্ভব, কাজেই শাফটের ভিতর গ্রেনেড ফেলছে। বুদ্ধি আছে কুকুরগুলোর! গ্যাস মিশ্রিত বাতাসে গ্রেনেড ফাটলে ক্ষতি হবে দ্বিগুণ। লোকগুলোর প্রথম টার্গেট ছিল উপরের ওই অ্যালকোভ। একটু আগে তিশা আর রানা ওখান থেকে গুলি করছিল।

হঠাৎ আগুনের গোলকের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল কী যেন।

ওটা বেশ বড় ও ধূসর, চৌকো আকৃতির, গড়িয়ে পড়ে গেল মাঝের কূপে। বড় দ্রুত পড়ছে পুলের দিকে। শোঁ-শোঁ আওয়াজ

তুলে বাতাস কেটে নামছে বিপুল ওজন নিয়ে। এক সেকেণ্ড পর বজ্রের মত জোর আওয়াজ তুলে নীচের প্ল্যাটফর্মে নামল চার শ' পাউণ্ডের ইজেকশন সিট। একটু আগে সি-ডেকের অ্যালকোভে, কন্সোলের সামনে ছিল। ধাতুর ডেকের বুকে গভীর ট্যাপ ফেলল ওটার নিখাদ ইস্পাতের শরীর।

চারপাশে নানা হৈ-চৈ ও আওয়াজ, কিন্তু রানার চোখ আটকে গেছে তিনতলা উপরের রিট্র্যাক্টেবল ব্রিজের উপর। দূরত্বটা মেপে নিচ্ছে।

তিরিশ ফুট। বড়জোর পঁয়ত্রিশ ফুট?

সময় নষ্ট করল না রানা, তুলে ধরল ম্যাগহুক, বুড়ো আঙুলে 'এম' লেখা বোতাম টিপে দিল। জ্বলে উঠেছে লাল বাতি, গ্র্যাপলিং হুক অ্যাকটিভেট হয়েছে। এবার কাজ করবে ম্যাগনেট।

ট্রিগার টিপতেই ম্যাগহুক থেকে ছিটকে বেরুল ম্যাগনেটিক হেড, খটাং শব্দে আটকে গেল রিট্র্যাক্টেবল ব্রিজের নীচে।

মনে মনে অংক কষল রানা: হিসাব শেষে বিড়বিড় করে বলল, 'ধূর!'

মেরির হাতে ম্যাগহুক ধরিয়ে দিল, দ্রুত স্বরে বলল, 'মিষ্টি মেয়ে, একটা কথাই বলব: ভুলেও এটা ছাড়বে না!'

দুই হাতে লঞ্চার ধরেছে মেরি, অবাক হয়ে রানার দিকে চাইল।

আশ্বাস দেয়ার ভঙ্গিতে হাসল রানা, বলল, 'শুধু শক্ত করে ধরো।'

এবার ম্যাগহুকের গ্রিপে কালো বোতাম চাপ দিল রানা। হঠাৎ পানি ছেড়ে আকাশে উড়াল দিল মেরি, উঠছে ম্যাগহুকের টানে। ওটা যেন অদ্ভুত কোনও ছিপ, উল্টো টেনে নিচ্ছে শিকারিকে।

মেরির ওজন কম, কোনও সমস্যা হচ্ছে না ম্যাগহুকের, যেন পাখির বাচ্চা তুলছে ব্রিজের দিকে। রানা জানত, ও নিজে

ম্যাগহুকে ওজন চাপালে অনেক ধীরে উঠবে।

মেরিকে নাগালে পাওয়ার জন্য পানি থেকে লাফিয়ে উঠল এক কিলার ওয়েইল।

চমকে গেল রানা, বিশাল ওই তিমি পানি থেকে তুলে ফেলেছে গোটা দেহ, তীরের মত উঠছে শূন্যে।

ম্যাগহুকের টানে এখনও উপরে উঠছে মেরি, নীচে চেয়ে দেখল পানি থেকে ছিটকে উঠে আসছে তিমি। যেন স্রেফ নরক থেকেই উঠে আসছে ওটা, মুখ থেকে বেরুচ্ছে বিকট গর্জন!

ঠিক তখন উপরে ঠক্ আওয়াজ হলো।

ওর দিকে উঠে আসছে তিমি।

বিস্মিত হয়ে ফুঁপিয়ে উঠল মেরি, উপরে চাইল।

ও আটকে গেছে ব্রিজের নীচে।

আর উঠতে পারবে না!

বিশাল চওড়া হাঁ খুলেছে তিমি, পৌঁছে গেছে লাফের শেষে...

প্রাণপণে ম্যাগহুক আঁকড়ে ধরেছে মেরি, বুকের কাছে তুলে ফেলল দুই পা। ঠিক তখনই ওর নিতম্ব থেকে ছয় ইঞ্চি নীচে বিশ্রী খটাৎ আওয়াজ তুলল তিমির দাঁতগুলো, বন্ধ হয়ে গেছে চোয়াল।

চেয়ে রইল মেরি, কালো-সাদায় মেশানো তিমি আবারও নীচে পড়ছে। খুব দ্রুত ছোট হচ্ছে ওটা, তারপর ঝপাস্ করে নামল পুলে, তলিয়ে গেল। দানবটা কমপক্ষে তিরিশ ফুট লম্বা ছিল, পানির গভীর থেকে সোজা উঠে এসেছিল ওপরে।

হঠাৎ মেরির মুখের সামনে হাজির হয়েছে একটা হাত, ভয়ের চোটে আরেকটু হলে হার্ট অ্যাটাক করত, ছেড়েই দিত ম্যাগহুক।

'ভয় নেই, সোনা-পাখি,' বলে উঠল একটি কণ্ঠ, 'আমি।'

মুখ তুলে হাসি-হাসি মুখটা দেখল মেরি। এই মানুষটাকে খুব বিশ্বাস করি, ভাবল। নাম তো মনে নেই, কিন্তু ইনিই বই লিখতে গিয়ে লেখক নাম পেয়েছেন বন্ধুদের কাছ থেকে।

সার্জেন্ট হোসেন আরাফাত দবিরের হাতটা ধরল মেরি।

তিন সেকেণ্ড পর ওকে রিট্র্যাক্টেবল ব্রিজে নামিয়ে দিল মানুষটা। প্রথম কিছুক্ষণ হাঁপাল মেরি, তারপর খুশিতে কেঁদে ফেলল। ওর কাঁধে আস্তে করে হাত রাখল দবির, অবাক হয়েছে। এক সেকেণ্ড পর পারকার পকেটে হাত ভরল মেরি, বের করল হাঁপানি রোগের প্লাস্টিকের পাফার।

ওটা ব্যবহার করে বড় দুটো দম নিল মেরি, তারপর দবিরের চোখে চোখ রেখে বলল, 'সি ওয়ার্ল্ডে ওই জিনিস নেই!'

পুলের মাঝে রানা খেয়াল করছে, ওকে ঘিরে অনবরত চক্কর কাটছে দুটো কিলার ওয়েইল। প্বালের সবচেয়ে ছোট এই দুটো। বোধহয় তরুণ বয়সী।

উপরের দিকে মুখ তুলে চেঁচিয়ে উঠল রানা, 'দবির, আমার ম্যাগহুক ফেলুন!'

দেরি না করে সেতুর উপর শুয়ে পড়ল সার্জেন্ট, সরু প্ল্যাটফর্মের নীচে হাত বাড়িয়ে ডি-অ্যাকটিভেট করতে চাইছে গ্র্যাপলিং হুকের ম্যাগনেট।

'জলদি, দবির!' পুলের ভিতর থেকে এল রানার ব্যস্ত কণ্ঠ।

'চেষ্টা করছি, স্যর!' বলল সার্জেন্ট, 'এক মিনিট!'

'সেই সময় আমার কই!'

সেতুর নীচে পুরো কাঁধ ঢুকিয়ে দিয়েছে দবির, গ্রিপের 'এম' লেখা সুইচ পেতে চাইছে। ওটাই শক্তিশালী ম্যাগনেটকে অ্যাক্টিভেট ও ডি-অ্যাক্টিভেট করে।

এ কাজ করতে গিয়ে হঠাৎ চমকে গেল দবির। আবছা শুনল, সেতুর উপর কার সঙ্গে যেন কথা বলছে মেরি!

ফ্রেঞ্চ কোনও কমাণ্ডো?

এবার যেন স্পষ্ট শুনল, 'লিলি, সাহায্য কর্! ডাইভারকে

সাহায্য কর্!'

পিটপিট করে চাইল দবির। ভাবতে শুরু করেছে, কাজের চাপে শেষে খারাপ হয়েই গেল মাথা।

পুলের ভিতর রানা বুঝে গেছে, মৃত্যু এবার অনিবার্য। চক্কর কাটছে দুই তিমি। একটা সামনে, অন্যটা পিছনে। এই ফাঁদ থেকে বেরুনোর কোনও উপায়ও নেই।

হঠাৎ করেই চক্কর থামিয়ে আরেক দিকে রওনা হলো একটা তিমি। অজান্তে ঢোক গিলল রানা।

এবার খেলা খতম করতে আসবে ওটা।

খুব ধীরে ঘুরল, মাথা তাক করেছে রানার দিকে, পানির মাত্র একফুট নীচে আছে। ডরসাল ফিন আরও উপরে উঠল খুনি তিমির, তারপর হঠাৎ করেই মিসাইলের তীব্র গতি পেল। কালো-সাদা মাথার ধাক্কা খেয়ে উপরে তৈরি হলো বড় ঢেউ। সরাসরি রানার দিকে আসছে খুনি তিমি।

চট্ করে ঘুরে চাইল রানা। না, কোথাও যাওয়ার নেই। এমন কোনও অস্ত্রও নেই যেটা ওটাকে ঠেকাবে।

তাই বলে হার মেনে নেব? ভাবল রানা। হ্যাঁচকা টানে হোলস্টার থেকে বের করে নিল ডেযার্ট পিস্তল, তুলে ধরেছে পানির উপর।

মনে মনে বলল, *এভাবে যদি মরতে হয়, তো লড়েই মরব!*

তীব্র বেগে আসছে তরুণ তিমি।

কিন্তু হঠাৎ করেই কালো কী যেন ঝপাৎ করে পড়ল রানার মুখের সামনে। ওর এবং তিমির মাঝে আছে ওটা।

এতই পিছলা, পানির ভিতর কোনও আওয়াজই করেনি, স্যাৎ করে সরে গেল রানার সামনে থেকে, প্রচণ্ড গতি তুলে আরেক দিকে রওনা হয়েছে।

ভাল করেই ওটা দেখেছে দুই তিমি, মুহূর্তে মনোযোগ হারিয়ে ফেলেছে রানার উপর থেকে। যে তিমিটা ছুটে আসছিল, সেটা রানার একফুট আগে বাঁক নিল, নতুন উদ্যমে ছুটল নতুন শিকার ধরতে।

হতভম্ব হয়ে গেছে রানা। ওটা আসলে কী? এক পলকের জন্য মনে হয়েছে, কোনও ধরনের সিল!

ঠিক তখনই সামনে পড়ল ম্যাগহুক। ওটা ডুবে যাওয়ার আগেই খপ্ করে ধরল রানা, উপরের দিকে চাইল। সেতুর উপর উপুড় হয়ে শুয়ে আছে সার্জেন্ট দবির, এক হাত সেতুর নীচে।

একবার ম্যাগহুক দেখে নিল রানা, বুঝল নতুন করে জীবন পেতে চলেছে।

আধ সেকেণ্ড পর হঠাৎ করেই ওর মুখের কাছে দেখা দিল ছোট্ট কালো একটা সুঁচালো মাথা। ভীষণ চমকে পানিতে চিত হয়ে পড়ল রানা। তবে বুঝেছে, ওটা মেরির লিলি— অ্যান্টার্কটিক গেযেলা সিল।

ভিজে যাওয়ায় ছোট্ট লাল কলার চকচক করছে, জন্তুটা কোমল চাহনি ফেলল রানার চোখে। তারপর রওনা হয়ে গেল আরেক দিকে। রানা শপথ করে বলতে পারবে, নিঃশব্দে হাসছিল ছোট্ট সিল। পুলের ভিতর অনায়াসে দুই তিমিকে ফাঁকি দিয়ে নানা দিকে ছুটছে।

হঠাৎ করেই বামদিকে মাথা ঘোরালো। বোধহয় শুনতে পেয়েছে অস্বাভাবিক কোনও শব্দ, হয়তো দেখেছে অন্য কিছু। একবার খুশি-খুশি ভঙ্গি করে রানার দিকে চাইল, তারপর পানির নীচ দিয়ে রওনা হয়ে গেল পুলের আরেক দিকে।

পানির সামান্য নীচ দিয়ে তীব্র গতি তুলে ছুটছে, যেন সত্যিকারের কোনও টর্পেডো। তিমিগুলোকে বোকা বানাতে মুহূর্তে মুহূর্তে সরছে বামে বা ডানে, তারপর হঠাৎ করেই খাড়া ডাইভ

দিয়ে নেমে গেল গভীর পানির ভিতর। এক সেকেণ্ড পর তিমিগুলো টের পেল, পালাতে শুরু করেছে তাদের শিকার। ঝট্ করে বাঁক নিল তিনটে কালো ডরসাল ফিন, ব্যস্ত হয়ে ধাওয়া শুরু করল।

সুযোগটা আগেই নিয়েছে রানা, চলে এসেছে তীরের কাছে। আর মাত্র তিন ফুট পেরুলেই...

এমন সময় বড় ঢেউ ভীষণ দুলিয়ে দিল ওকে, পুরো এক পাক ঘুরে গেল ও— এইমাত্র প্রচণ্ড গতি তুলে ওকে পাশ কাটাল বিশাল এক তিমি। এইবার কামড়ে ধরবে, ভাবল রানা। কিন্তু তা নয়, ওটা পিছু নিয়েছে মায়াবী ফার সিলের।

ফোঁস করে শ্বাস ফেলল রানা, সামনে বেড়ে ধরে ফেলল ডেকের গ্রিল। দেরি না করে উঠে এল পানি থেকে, চোখ পড়ল তুবড়ে যাওয়া ইজেকশন সিটের উপর। একটু সামনে কাত হয়ে পড়ে আছে ওটা। ঘুরে চাইল রানা, চারপাশে হৈ-চৈ চলছে।

অনেক আগেই পানি থেকে উঠেছে নিনা ভিসার ও রাফায়লা ম্যাকানটায়ার, এখন দ্রুত চলেছে ই-ডেকের টানেল লক্ষ্য করে। একটু দূরে ক্যাপ্টেন নিশাত ও কর্পোরাল নাজমুল। নিশাতের উপর ঝুঁকে পড়েছে ছেলেটা, মনে হলো আপার পায়ের কোনও ক্ষত থেকে রক্ত থামাতে চাইছে।

পুলের উল্টো দিকে অবশিষ্ট দুই ফ্রেঞ্চ কমাণ্ডোকে দেখল রানা, তারাও নিরাপদ। চুপচুপে ভেজা, এইমাত্র ডেকে উঠেছে। তাদের একজন ওকে দেখেছে, দেখামাত্র হাত বাড়িয়ে দিয়েছে ক্রসবো বের করতে।

ঠিক তখনই চোখের কোণে নড়াচড়া দেখে ঘুরে দাঁড়াল রানা। পানির নীচ দিয়ে আসছে পরিচিতি কালো ছায়া।

মিষ্টি মেয়ে লিলি।

তার পিছনে তেড়ে আসছে বিশাল কালো-সাদা তিনটি দেহ।

মনে হলো, কখনও হাল ছাড়বে না।

পানির সামান্য নীচে প্রচণ্ড গতি তুলছে লিলি। কয়েক মুহূর্ত পর পর পিছনে ঝটকা দিচ্ছে ফ্লিপারগুলোতে। হঠাৎ করেই কাত হয়ে গেল লিলি, পরক্ষণে বুলেটের মত এল পানির ভিতর দিয়ে। রক্ত ভরা পানিতে কখনও দেখা যাচ্ছে, আবার পরক্ষণে দেখা যাচ্ছে না ওকে।

ওদিকের ডেকে দুই ফ্রেঞ্চ কমাণ্ডো, মোটেই কমল না লিলির গতি। রানার মনে হলো রকেট হয়ে গেছে ওটা, পিছনে তেড়ে আসছে তিনটে কালো-সাদা শয়তান দানব।

অবাক হয়ে দেখছে রানা, ডেক থেকে তিন ফুট দূরে থাকতে হঠাৎ করেই ঝাঁপ দিল লিলি। পানি থেকে উঠে এল দেহ, সাবলীল ভঙ্গিতে পেট দিয়ে নামল ডেকের উপর, দুই হতবাক ফ্রেঞ্চকে পিছনে ফেলে সরসর করে চলে গেল নয় ফুট দূরে। ওখানেই থামল না, পিছলে যাওয়া থামতেই কাজে লাগাল চার ফ্লিপার, পানির ধার থেকে আরও দূরে সরে যেতে ছুটতে লাগল।

এক সেকেণ্ড রানা ভাবল, লিলি অমন করছে কেন? দ্বিতীয় সেকেণ্ডে অতীত মনে পড়ল। পানির ধার থেকে সরে না গেলে কিলার ওয়েইল থেকে কেউ নিরাপদ নয়!

তবু চেয়ে আছে রানা।

পুলের ওদিকে হাজির হয়েছে বিশাল এক কালো-সাদা দানব, ভয়ঙ্কর গর্জন ছাড়তে ছাড়তে গভীর পানি থেকে উঠে এসেছে, প্রকাণ্ড শরীর নিয়ে আছড়ে পড়ল পুরু ধাতব প্ল্যাটফর্মে। তখনও পিছলে চলেছে নিজ বিপুল ওজনে। মসৃণ ভাবে কাত হলো, খুলে গেল মস্ত চোয়ালের হাঁ, মনে হলো কোনও কষ্ট ছাড়াই ধরে ফেলল এক ফ্রেঞ্চ কমাণ্ডোকে। পরক্ষণে নরম দেহ পেয়ে বসাল জোরালো কামড়। টানা চিৎকার শুরু করেছে কমাণ্ডো। এদিকে বেকায়দা ভঙ্গিতে বিশাল শরীর নিয়ে ডেকে পিছাতে শুরু করেছে কিলার

ওয়েইল, কয়েক সেকেণ্ড পর ঝপাস্ করে নেমে পড়ল পুলে। হারিয়ে গেল হতভাগ্য লোকটাকে নিয়ে।

ডেকের সবাই এবার বুঝল: কিনারা থেকে সরতে হবে!

তিশাকে দেখতে পেল রানা, নাজমুলের সঙ্গে যোগ দিয়েছে সে। দু'জন মিলে কাঁধে তুলে নিয়েছে নিশাতকে, পুলের কিনারা থেকে সরছে। তারই ফাঁকে নিশাতের কোমর থেকে নীচের অংশ দেখতে পেল রানা। ওখানে হাঁটু থেকে কাটা পড়েছে একটা পা।

ঠিক তখন পিছনে ঝপাৎ জোরালো আওয়াজ পেল রানা। থরথর করে কেঁপে উঠেছে প্ল্যাটফর্ম! চরকির মত ঘুরল ও, দেখল, উঠে এসেছে আরেক দানব। ওখান থেকে হাসি-হাসি মুখ করে গড়িয়ে আসছে ওর দিকে!

যেন সাপের মত পিছলে চলছে!

এখনও হাঁটুর উপর ভর করে বসে আছে রানা।

একপাশে কাত হয়ে গেল তিমি, বিরাট হাঁ মেলেছে!

বিশাল দানবের উল্টো দিকে প্রাণ হাতে নিয়ে ডাইভ দিল রানা, ঝাঁপ দিয়ে মনে মনে বলছে: রানা রে, পালা এবার!

ওর চোখ পড়েছে তুবড়ে যাওয়া ইজেকশন সিটের উপর। চার ফুট দূরে কাত হয়ে পড়ে আছে ওটা। হয়তো ওই পর্যন্ত পৌঁছুতে পারবে। যদি লাফ দিয়ে ওটা টপকে যেতে পারে, আর কোনও বিপদ নেই। ডাইভ শেষে ডেকে পড়ে ধড়মড় করে উঠে বসল রানা, দেরি না করে হামাগুড়ি দিয়ে রওনা হয়ে গেল ইজেকশন সিট লক্ষ্য করে।

কিন্তু অনেক দ্রুত আসছে খুনি তিমি!

পিচ্ছিল ডেকের উপর থ্যাপ-থ্যাপ করে থাবা পড়ছে রানার, কিন্তু তা যথেষ্ট নয়। ঠিক সময়ে ইজেকশন সিটের ওপাশে যেতে পারবে না। চারপাশে ঝরঝর করে পড়ছে পানি। পিছলে আসা কিলার ওয়েইলের তৈরি বৃষ্টি!

রানার ঠিক পিছনে পৌঁছে গেছে ওটা!

রক্তে প্রচুর অ্যাড্রেনালিন নিয়ে আবার সামনে ঝাঁপিয়ে পড়ল রানা। স্পষ্ট বুঝে গেছে, চেয়ারের ওপাশে যেতে পারবে না, কাজেই ঝাঁপ দিয়েই পিঠ ঘুরিয়ে নিয়েছে।

এক সেকেণ্ড পর টের পেল, আছে ইজেকশন সিটের ভিতর!

কাত হওয়া সিটে আসীন হয়েছে, বা বলা উচিত শুয়ে আছে। পুলের দিকে ওর মুখ, চট্ করে চোখ তুলে চাইল। কিন্তু কিছুই দেখবার নেই, সামনে শুধু বিশাল কিলার ওয়েইল।

বুকের উপর হাজির হয়েছে ওটা! এখনও গর্জাতে গর্জাতে আসছে!

আর মাত্র তিন ফুট!

মোটেও কমছে না গতি!

এখন আর থামবে না!

একবার শ্বাস ফেলেই চোখ বুজে ফেলল রানা। ঠিক তখনই ওর মাথার চারপাশে বন্ধ হলো খুনি তিমির বিরাট চোয়াল!

ভয়ঙ্কর জোরালো 'ঘঠাং!' আওয়াজ পেল রানা। আগে কখনও এমন বিকট আওয়াজ জীবনেও শোনেনি। ভেবেছিল তীব্র, টনটনে ব্যথা লাগবে, ওর মাথা চিবাতে শুরু করেছে কিলার ওয়েইল!

কিন্তু কই, কোথাও কোনও ব্যথা নেই যে!

অবাক হয়ে চোখ মেলল, পরক্ষণে চমকে গেল— সামনে ছোরার মত গিজগিজে এসব কী! এক সেকেণ্ড পর টের পেল, এদিক-ওদিকে, উপরে-নীচে শুধু দাঁত আর দাঁত! তার ওদিকটা প্রায়ান্ধকার। দুই সারি দাঁতের মাঝে লালচে থলথলে জিভ!

আরও এক সেকেণ্ড পর কাজ শুরু করল রানার মগজ।

ওর মাথা আছে খুনি তিমির মুখের ভিতর!

অজানা কোনও কারণে, যে ভাবেই হোক, যদিও বোঝা যাচ্ছে না বিষয়টা কী... তবে এখনও আস্ত আছে ও।

এটা কোনও ভাবেই হওয়ার কথা নয়। উপরের দিকে মুখ তুলে চাইল রানা। তুবড়ে যাওয়া ইজেকশন সিটের স্টিলের হেডসেট ওর মাথার তিন দিকে।

রানার মাথার দু'পাশে হেডরেস্টে প্রচণ্ড কামড় বসিয়েছে কিলার ওয়েইল। কিন্তু খুব পোক্ত জিনিস এই স্টিলের হেডরেস্ট, ঠেকিয়ে দিয়েছে ভয়ঙ্কর কামড়। রানার কান থেকে মাত্র এক মিলিমিটার দূরে তিমির দাঁত। দু'পাশে ডেবে গেছে হেডরেস্টের ইস্পাত। একদিকের ইস্পাত এবড়োখেবড়ো, সামান্য খোঁচা দিয়ে এক ফোঁটা রক্ত বের করেছে রানার বাম কান থেকে।

রানার বুক ও মাথার দিক আছে তিমির বিশাল মুখের ভিতর।

হঠাৎ করেই ওর নীচে ঝাঁকি খেল ইজেকশন সিট।

ধাতব প্ল্যাটফর্মে শুরু হলো ঘষ্টে যাওয়ার আওয়াজ। সিটের ভিতর অংশে সরে গেল রানা। মনে হলো লেংচে লেংচে সামনে বাড়ছে সিট!

হঠাৎ করে থেমে গেছে নড়াচড়া। ঝাঁকি খেয়ে সামনে বেড়েছে রানা, আবার থমকে গেছে সিট। হঠাৎ করেই ও বুঝে গেল কী ঘটছে।

চেয়ার সহ ওকে পুলের দিকে টেনে নিয়ে চলেছে তিমি!

আবারও জোরালো ঝাঁকি খেল ইজেকশন সিট। রানা বুঝল, ডেকের উপর কমপক্ষে তিন ফুট টেনে নেয়া হয়েছে ওটাকে।

মনের চোখে বিশাল তিমির নড়াচড়া দেখছে রানা। পিছলে পিছিয়ে চলেছে। আগের তিমি এভাবেই ফ্রেঞ্চ কমাণ্ডোকে নিয়ে উধাও হয়েছে পুলের ভিতর। আর এটা টেনে নিয়ে চলেছে চার শ' পাউণ্ড ওজনের ইজেকশন সিট।

আবারও হোঁচট খেয়ে সামনে বাড়ল প্রকাণ্ড সিট। গরম বাতাসের হলকা লাগল রানার মুখের উপর। ওই বাতাস এসেছে তিমির পেট থেকে।

তিক্ত হাসল রানা। খুব হাঁসফাঁস লাগছে ওটার, রূপকথার বইয়ের দুষ্ট নেকড়ের মত বড় করে শ্বাস ফেলছে। কে জানে, মনে মনে হয়তো বলছে: 'এইবার হাঁপ দেব, কাঁপ দেব, তারপর উড়িয়ে দেব তোর ছোট্ট বাড়ি!'

সিট চোয়ালে নিয়ে ছেঁচড়ে পিছাচ্ছে তিমি। একবার পানিতে নামতে পারলেই...

গরম হাওয়া মুখে লাগতেই সিটের ভিতর গা মুচড়ে সরে যেতে চাইল রানা। আবারও হোঁচট খেয়ে সামনে বাড়ছে সিট। পানিতে গিয়ে পড়বার আগেই তিমির কাছ থেকে ভাগতে হবে।

ইজেকশন সিটের নীচ অংশ দিয়ে বেরিয়ে আছে রানার পা, পাশেই হাস্যরত তিমির খোলা ঠোঁট। রানা ভাবছে, ওই পথে যদি নামি, পিছলে বেরুতে পারব সিট থেকে, তারপর তিমির মুখের পাশ থেকে উঠেই দে ভোঁ দৌড়!

খুব তিক্ত মনে ধীরে ধীরে সিট থেকে নীচের দিকে নামতে শুরু করেছে রানা। খুব সতর্ক, ব্যাটা তিমি যদি টের পায় ও ভাগতে চায়, তো...

হঠাৎ করেই একপাশে আরও কাত হয়ে গেল ইজেকশন সিট, ধাতব ডেকের উপর ভয়ানক ঘষটে যাওয়ার আওয়াজ শুরু হয়েছে। দাঁতগুলো থেকে আসছে বিশ্রী বাজে দুর্গন্ধ। দুই হাতে খপ করে আর্মরেস্ট ধরল রানা, কোনওভাবেই দানবটার মুখের ভিতর গিয়ে ঢুকতে চায় না।

নিজেকে একটু সামলে নিয়ে আবারও নীচের দিকে নামতে লাগল রানা। চেয়ারের হাঁটুর কাছে নেমে এল। ওর দুই চোখ চেয়ে আছে খোঁচা-খোঁচা দাঁতগুলোর উপর। আবারও নড়ে উঠল চেয়ার, ভীষণ ভারী জিনিস বইতে গিয়ে ঘড়ঘড় শব্দ করছে তিমি।

খুব সাবধানে আরও এক ইঞ্চি নামল রানা।

সমস্যার মুখে পড়ে ওখানেই থামতে হলো।

সিটের যেখানে নেমেছে, আর ধরতে পারবে না দুই দিকের আর্মরেস্ট। কিন্তু ধরবার মত কিছু লাগবেই, নইলে নিজেকে সিট থেকে বের করবে কী করে? ব্যস্ত হয়ে সামনের পাশ দেখল রানা।

না, কিছুই তো নেই!

তারপর ওর চোখ পড়ল কিলার ওয়েইলের দাঁতের উপর।

দুই হাতে খুনি তিমির মস্ত দুটো সাদা দাঁত খপ্ করে ধরল রানা। আর তখনই আচমকা ঝাঁকি খেয়ে আবারও সামনে বাড়ল ইজেকশন সিট। রানা টের পেল, এবার ডেক থেকে সামান্য উঁচু হয়ে উঠেছে ওটা!

ভয়ে পেয়ে গেল ও। চেয়ার পৌঁছে গেছে ডেকের কিনারে!

এবার উল্টে পড়বে পুলে। তারপর...

আরও শক্ত ভাবে দুই দাঁত ধরল রানা, তারপর জোর ঠেলা দিল। সরসর করে নীচে নামল ওর শরীর, পরক্ষণে ইজেকশন সিট থেকে বেরিয়ে এল। বিশাল তিমির মুখের পাশেই ডেকে পড়েছে। চোখের সামনে দেখতে পেল, পুলের ভিতর নেমে গেছে দানবের লেজ। পানিতে ঝাপটা দিতেই উপরে উঠল মাথা। ডেক থেকে তুলে ফেলেছে গোটা ইজেকশন সিট। পিছলে পানিতে নেমে গেল কালো-সাদা শরীর, সঙ্গে নিয়ে চলেছে ভারী পুরস্কার।

এক সেকেণ্ড দেরি করেনি রানা, লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়েই ঝেড়ে দৌড় দিয়েছে নাজমুল, তিশা ও নিশাতকে লক্ষ্য করে। দৌড়ের ফাঁকে হেলমেট মাইকে বলল, 'সার্জেণ্ট জনি ওয়াকার, রিপোর্ট পাঠান!'

'এখনও এ-ডেকে, মেজর। ভাইপার আর লেফটেন্যাণ্ট মোরশেদ আমার সঙ্গেই।'

'উপরে ওরা ক'জন?' জানতে চাইল রানা।

'মাসুদ ভাই, পাঁচজন মিলিটারি, দু'জন সিভিলিয়ান,' জবাব দিল মোরশেদ। 'কিন্তু এইমাত্র দু'জন কমাণ্ডো মই বেয়ে নীচের

লেভেলে যাচ্ছে। ...কী বললেন? আরেশ্‌শালা...'

কানেশন কেটে গেছে। খস্‌-মস্‌ আওয়াজ শুনতে পেল রানা।

'মোরশেদ...'

কিন্তু হঠাৎ করেই রানার একটু সামনে হাজির হয়েছে এক ফ্রেঞ্চ কমাণ্ডো!

পুলের ভিতর পড়া পাঁচ ফ্রেঞ্চ কমাণ্ডোর শেষজন। শুধু এই লোকই বেঁচে আছে। বরফ-ঠাণ্ডা পানিতে ভিজে চুপচুপে, কিন্তু আগুন হয়ে আছে রাগে, ভয়ঙ্কর ভাবে ভুরু কুঁচকে রানাকে দেখল। যেন নরক থেকে এসেছে, শত্রুর বুকে তাক করল ক্রসবো।

দৌড় থামাল না রানা, ঝট্‌ করে হাঁটুর পাশের খাপ থেকে বের করে নিল থ্রোয়িং নাইফ, এবং দৌড়ের উপরই হাতের ঝটকায় ছুঁড়ে মারল পিছন দিকে। ফলাটা বাতাসে শিস তুলে গাঁথল ফ্রেঞ্চ শত্রুর বুকে। ধুপ্‌ করে পড়ল লোকটা। বড় জোর দুই সেকেণ্ড ব্যয় হলো এতে। লাশের পাশে ফিরে এল রানা, এক টানে বের করে নিল ছোরা, বাদ পড়ল না ক্রসবোও, দেরি না করে হাঁটতে শুরু করেছে। হেলমেট মাইকে বলল, 'মোরশেদ, তোমাদের কী খবর? ঠিক আছ?'

'জী, মাসুদ ভাই। সরি। আমার আগের হিসাব ভুল ছিল। একটা কমেছে। এখন আছে চারজন আর দুই বিজ্ঞানী।'

'নীচের পাঁচটা শেষ,' বলল রানা। দক্ষিণ টানেলের মুখে পৌঁছে গেছে ও। ওখানেই নিশাতকে নিয়ে টানেল ধরে চলেছে তিশা ও নাজমুল।

নিশাতের উপর চোখ পড়ল রানার। বাম হাঁটু রক্তাক্ত। এবড়োখেবড়ো হাড় বেরিয়ে আছে, পায়ের নীচের অংশ নেই।

'ওঁকে নিরাপদ কোথাও নিয়ে চলো,' বলল রানা। 'রক্ত পড়া বন্ধ করতে হবে। মেথাডন লাগবে।'

'জী,' বলল তিশা।

নিশাতকে বয়ে নিতে সাহায্য করছে রানা। নরম স্বরে বলল, 'কেমন বোধ করছেন, আপা?'

'আপার গালে একটা চুমু দিলে... দেখবে ঠিক হয়ে গেছি,' দাঁত দাঁত চেপে বলল নিশাত। নীরবে সহ্য করছে ভয়ঙ্কর ব্যথা।

'তাই দেব আমরা, আগে কাজ শেষ করি,' সামনের টানেলে দরজা দেখেছে রানা। তিশা ও নাজমুলকে বলল, 'ওখানে নিয়ে চলো।'

সামনে বেড়ে দরজা খুলল রানা, আহত নিশাতকে সাবধানে ঘরে ঢোকাল ওরা। পোশাক থেকে টপটপ করে পড়ছে পানি। এটা কোনও গুদাম-ঘর। নিশাতকে মেঝের উপর শুইয়ে দিতেই জখম পা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠল নাজমুল।

হেলমেট মাইকে বলল রানা, 'সবাই তোমরা কোথায়?'

ইণ্টারকমে এল একের পর এক নাম ও তাদের পরিস্থিতি।

সার্জেণ্ট ভাইপার, সার্জেণ্ট জনি ওয়াকার ও লেফটেন্যাণ্ট গোলাম মোরশেদ এ-ডেকে।

লেফটেন্যাণ্ট তিশা করিম ও কর্পোরাল নাজমুল ই-ডেকে। রানার সামনেই, তবুও হেলমেট ইণ্টারকমে নাম ও অবস্থান জানাল ওরা সবাই। এমন কী বাদ পড়ল না ক্যাপ্টেন নিশাতও, নিজের নাম জানাল।

টনি কেলগ, হলিডে স্যাম্পসন, জর্জ মারফি মারা গেছে, কোনও সাড়া এল না সার্জেণ্ট হোসেন আরাফাত দবিরের তরফ থেকেও।

'ঠিক আছে, সবাই মন দিয়ে শোনো,' বলল রানা। 'আমার ভুল না হলে ফ্রেঞ্চ কমাণ্ডোরা এখন চারজন। এ ছাড়া আছে দুই বিজ্ঞানী। তারা যে নিরীহ এমন কথা বলছি না। ...এবার শোনো, শেষ করতে হবে এই লড়াই। সংখ্যার দিক থেকে এখন আমরা বেশি। আমি চাই গোটা ফ্যাসিলিটির উপর থেকে শুরু করে নীচ

পর্যন্ত তল্লাসী করা হোক। ওদেরকে কোণঠাসা করব আমরা। সতর্ক থাকতে হবে, যেন আমাদের আর কাউকে হারাতে না হয়। ...ঠিক আছে, এবার শোনো আমরা কী করব। প্রথমে...'

হঠাৎ থেমে গেল রানা, ওদের মাথার উপরের ছাতে ধপ্ ধপ্ আওয়াজ শুরু হয়েছে। মুখ তুলে ছাতের দিকে চাইল ওরা।

আর কোনও আওয়াজ নেই।

ডানদিকের সুড়ঙ্গের ছাতে নির্দিষ্ট বিরতি দিয়ে দুটো করে ফ্লুরোসেন্ট বাতি জ্বলছে।

কিন্তু হঠাৎ করেই নিভে গেল সব বাতি।

পনেরো

জ্বলজ্বলে সবুজ আলোয় ভরে উঠেছে চারপাশ। নাইট-ভিশন গগল্‌স্ পরে ই-ডেক ও ডি-ডেকের মাঝের রাং-ল্যাডার বেয়ে খুব ধীরে, সাবধানে উঠছে মাসুদ রানা। প্রশিক্ষকের কথা মনে পড়ছে ওর। ভদ্রলোক বলেছিলেন: 'মনে রাখবেন, চোখে নাইট-ভিশন গগল্‌স্ মানেই কম পাওয়ারের বিনকিউলার ব্যবহার করা। আপনি হয়তো দূরের কিছু ছুঁতে চান, কিন্তু একটু এগুলেই টের পাবেন, ওটা আছে আসলে অনেক কাছে।'

গোটা স্টেশন ডুবে আছে ঘুটঘুটে অন্ধকারে।

থমথম করছে চারপাশ।

বড় ঠাণ্ডা পরিবেশ। কোথাও কোনও আওয়াজও নেই।

স্টেশনে দাহ্য গ্যাস ছড়িয়ে পড়তে থেমে গেছে সব

গোলাগুলি। পা টিপে টিপে চলেছে সবাই। ফিসফিস করে কথা হচ্ছে হেলমেটের মাইক্রোফোনে। নিস্তব্ধ আঁধারে একটু আওয়াজও কানে আসছে।

উজ্জ্বল সবুজ রঙের স্টেশনে চারপাশে চোখ রাখছে রানা।

নতুন জটিল এক পর্যায়ে পৌঁছেছে এই লড়াই।

যেভাবেই হোক, স্টেশনের ফিউজ-বক্স পেয়েছে ফ্রেঞ্চ কমাণ্ডোরা, এবং নিভিয়েও দিয়েছে সব বাতি। সন্দেহ নেই, আর কোনও উপায় না পেয়ে এই ঝুঁকি নিয়েছে। বড় কোনও ভুলও করেনি।

ছোট দলের বন্ধু গাঢ় অন্ধকার। যতই আবিষ্কার করা হোক অ্যাম্বিয়েন্ট লাইট টেকনোলজি, নাইট-ভিশন গগলস বা গানসাইট যতই কাজের হোক, সাধারণ মিলিটারি ট্যাকটিশিয়ানরা মনে করেন: ছোট কোনও দল নিয়ে হামলা করলে, সবচেয়ে ভাল কাজ হয় অন্ধকারের সুযোগ নিলে। নেভি-এয়ারফোর্স-আর্মি, এই তিন সংগঠনের কোনও যোদ্ধা লড়তে চায় না অন্ধকারে।

'সবাই সতর্ক থেকো,' ফিসফিস করল রানা। 'ফ্ল্যাশার ফেলতে পারে।' নাইট-ভিশন লড়াইয়ে মস্ত ঝুঁকি স্টান গ্রেনেড। ওটার আরেকটা নাম ফ্ল্যাশার। ওই গ্রেনেড হঠাৎ করেই তৈরি করে চোখ ধাঁধানো আলো। এর উদ্দেশ্য কিছুক্ষণের জন্য শত্রুকে হতচকিত করে দেয়া। নাইট-ভিশন গগলস সামান্য আলো অনেক উজ্জ্বল করে, ফলে ফ্ল্যাশার জ্বলে উঠলে নাইট-ভিশন গগলস পরা যোদ্ধার চোখ শুধু ধাঁধিয়ে যাবে তা নয়, চিরকালের জন্য অন্ধও হয়ে যেতে পারে সে।

স্টেশনের সেন্ট্রাল শাফটে উঁকি দিল রানা। উপরের ফ্রস্টেড গ্লাস গম্বুজ দিয়ে বাইরের কোনও আলো আসছে না। জুলাই চলছে, বেশি দিন হয়নি শুরু হয়েছে অ্যান্টার্কটিকার শীতকাল। আরও দুই মাস রাতের মত অন্ধকার থাকবে।

পিছনে তিশা আসছে, টের পেল রানা। চট্ করে দেখে নিল। ওরা ঠিক করেছিল শাফটের দিকে যাবে।

বাতি নিভে যেতেই দলের সবাইকে নির্দেশ দিয়েছে রানা: 'নাইট ভিশন চালু করো।' এর পর খুলে বলেছে ওর পরিকল্পনা।

অন্ধকারে আত্মরক্ষা-মূলক পরিকল্পনা করলে চলবে না। হামলা ওদেরই করতে হবে। এ ছাড়া কোনও উপায় নেই। দুই দলের ভিতর সেই দল জিতবে, যারা অন্ধকারকে নিজেদের কাজে ভালভাবে লাগাতে পারবে। মূল কথা: রানার দলকে আক্রমণাত্মক হতে হবে।

আসলে তাড়িয়ে নিয়ে যেতে হবে ফ্রেঞ্চদেরকে। কোথায়? যেখানে কোণঠাসা হয় তারা!

সংখ্যায় তারা কম। বারোজনের ভিতর আছে মাত্র চারজন। একটু আগে মোরশেদ বলেছে, তাদের দু'জন এ-ডেক ছেড়ে গেছে। ধারণা করা যায়, দুই দলে ভাগ হয়ে গেছে তারা।

এরচেয়ে বড় কথা, ধাওয়া খেয়ে পিছাতে শুরু করেছে তারা।

রানার নির্দেশে ওর দলও ভাগ হয়ে গেছে। এ থেকে অনেক সুবিধা পাবে ওরা।

এ-ডেকে আছে গানারি সার্জেন্ট ভাইপার, সার্জেন্ট জনি ওয়াকার ও লেফটেন্যান্ট মোরশেদ। এদিকে ই-ডেকে তিশা, নাজমুল ও নিজে রানা।

এখন মোরশেদরা যদি এ-ডেক থেকে ফ্রেঞ্চ কমাণ্ডোদেরকে নীচে তাড়িয়ে আনতে পারে, ওই চারজন ফাঁদে পড়বে। উপরে শত্রু, নীচেও তাই। ওরা সহজেই কোণঠাসা করবে ফ্রেঞ্চদেরকে।

বাড়তি কোনও কৌশল করতে যায়নি বা বেশি ভাবতে যায়নি রানা। অবস্থা বুঝে এগুতে হবে। এটা সাধারণ কোনও লড়াই নয়। এক পক্ষে দুনিয়া-সেরা মিলিটারি ইউনিট। ফ্রেঞ্চদের ছোট করবার কোনও সুযোগ নেই। অন্যদিকে দু'জন আমেরিকান মেরিন এবং

ওরা বাংলাদেশ আর্মির ক'জন।

এই লড়াই হবে ভয়ঙ্কর।

দাহ্য গ্যাসের কারণে কোনও দল আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করবে না। পুরনো আমলের লড়াইয়ের মত হাতাহাতি করতে হবে।

এবং সেটা হবে নিকষ অন্ধকারে।

তার মানেই লড়াই চলবে ছোরা দিয়ে।

হঠাৎ ওর পরিকল্পনায় বড় একটা খুঁত টের পেল রানা।

ফ্রেঞ্চদের সঙ্গে রয়েছে ক্রসবো।

মৃত ফ্রেঞ্চ কমাণ্ডোর কাছ থেকে সংগ্রহ করা ক্রসবোটা দেখল রানা। ওই জিনিস আগ্নেয়াস্ত্রের মত আগুনের ফুলকি তৈরি করবে না। নিরাপদে দূর থেকে ব্যবহার করবে ফ্রেঞ্চরা। স্যাণ্ডহার্স্টে ক্রসবো সম্বন্ধে কী শিখেছিল, ভাবতে চাইল রানা। ছোট ক্রসবোর রেঞ্জ বেশি নয়। বড়জোর রিভলভারের মত। একটু দূরের টার্গেটে লাগানো প্রায় অসম্ভব।

রেঞ্জ বড়জোর বিশ ফুট।

নিঃশব্দে কপালকে দোষ দিল রানা। ওরা ছোরা দিয়ে কিছুই করতে পারবে না। বিশ ফুট দূর থেকে পাখির মত ওদেরকে ফেলবে ফ্রেঞ্চরা। গ্যাসীয় পরিবেশে ওদের কাছে এমন কোনও অস্ত্র নেই, যেটা দূর থেকে ছুঁড়তে পারবে।

এক সেকেণ্ড পর ভাবল রানা, ওদের সঙ্গে রয়েছে...

নিচু স্বরে হেলমেট মাইকে নির্দেশ দিতে শুরু করল ও। দু' মিনিট পর তিশাকে নিয়ে উঠে এল ডি-ডেকে।

কাঁধের উচ্চতায় ম্যাগহুক রেখে সামনে বাড়ছে রানা, মুহূর্তে ছুঁড়তে পারবে অস্ত্রটা। অন্য হাতে মৃত ফ্রেঞ্চের ক্রসবো।

যদিও নিখুঁত লক্ষ্য-ভেদের জন্য তৈরি হয়নি আর্মালাইট এমএইচ-১২ ম্যাগহুক লঞ্চার, কিন্তু ওটার ম্যাগনেটিক গ্র্যাপলিং হুক ছিটকে যায় কমপক্ষে এক শ' ফুট। প্রথমে এমএইচ-১২

ম্যাগহুক তৈরি করা হয় আর্বান ওয়ারফেয়ার ও অ্যান্টি-টেরোরিস্ট অপারেশনের জন্য— আশা করা হয়েছে, ওটার দড়ি ও গ্র্যাপলিং হুক ব্যবহার করে বাড়ি বা ওয়্যারহাউসের দেয়াল অনায়াসে পেরুবে অ্যান্টি-টেরোরিস্ট ইউনিট, ঝট্ করে ঢুকে পড়বে শত্রু এলাকায়।

এসব মাথায় রেখেই ছোট করা হয়েছে ম্যাগহুক। হাতের লঞ্চার কমপক্ষে এক শ' ফুট দড়ি ও হুক ছুঁড়বে। জিনিসটা স্টেট অভ আর্ট। ওটার হাইড্রলিক লঞ্চিং সিস্টেম আকাশের দিকে ছুঁড়লে প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে চার হাজার পাউণ্ড চাপ তৈরি করে। আর সে-কারণে রানার বুঝতে দেরি হয়নি, বিশ ফুট দূরের শত্রুর দিকে ম্যাগহুক ছুঁড়লে, ওটা ঠিকভাবে বুকে-পেটে লাগলে, ওই লোককে কষ্ট করে আর লড়তে হবে না।

পুলের পানিতে রানা নিজেই দেখেছে, কাছ থেকে সাত টনি কিলার ওয়েইলকে থামিয়ে দিয়েছে ম্যাগহুক। কাছ থেকে হুক ব্যবহার করলে এক শ' আশি পাউণ্ডের যে-কারও করোটি ফাটিয়ে দিতে পারবে।

রানার কারণে আবারও আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠেছে ওর দলের সবাই। থাকুক ফ্রেঞ্চদের হাতে ক্রসবো, ওদের আছে ম্যাগহুক, ওটা দিয়ে দূর থেকে হামলা করবে।

আপাতত লেফটেন্যান্ট মোরশেদ, গানারি সার্জেন্ট ভাইপার ও সার্জেন্ট জনি ওয়াকার স্টেশনের এ-ডেক থেকে তাড়িয়ে নীচে আনছে ফ্রেঞ্চদেরকে। এদিকে ই-ডেক থেকে উপরের দিকে রওনা হবে লেফটেন্যান্ট তিশা করিম ও কর্পোরাল নাজমুল। এই দুই দল মিলিত হবে সি-ডেকে। তারপর দেখা যাক কী ঘটে।

আপাতত রানার সঙ্গে রয়েছে তিশা করিম। নিশাত সুলতানার পা থেকে রক্ত পড়া থামলে, একটু পর ওদের সঙ্গে যোগ দেবে নাজমুল। একটু আগে নিশাতের ধমণীতে মেথাডন দিয়েছে ওরা।

এ-ডেকে পাল্টা হামলা শুরু করেছে দুই মেরিন ও বাংলাদেশ আর্মির লেফটেন্যান্ট গোলাম মোরশেদ। দ্রুত সামনে বাড়ছে ওরা। টেক্সট্ বুক থ্রি-ফ্রগিং ফ্লাশিং ফর্মেশন ব্যবহার করছে। লিপ ফ্রগিং করে সামনে বাড়ছে একজন, ছুঁড়ছে ম্যাগহুক। দড়ি ও হুক গুটিয়ে নিয়ে সে রিলোড করবার আগেই দ্বিতীয়জন তাকে ছাড়িয়ে সামনে বাড়ছে। তার ম্যাগহুক শত্রুদের দিকে ছুঁড়বার পর পিছনের তৃতীয়জন আবার তাকে ছাড়িয়ে সামনে বাড়ছে। ব্যবহার করছে ম্যাগহুক, ততক্ষণে তৈরি হয়ে যাচ্ছে প্রথমজন।

এ-ডেকে ওরা যা ভেবেছে, তাই করছে দুই ফ্রেঞ্চ কমাণ্ডো। ম্যাগহুকের হামলার মুখে পিছাতে শুরু করেছে। মই বেয়ে নেমে যাচ্ছে নীচের তলায়।

অবশ্য, গোলাম মোরশেদের রিপোর্ট পাওয়ার পর চিন্তিত হয়ে পড়েছে রানা। অন্য একটা বিষয় খেয়াল করেছে। ফ্রেঞ্চরা বড় জলদি সরছে। বিধ্বস্ত বি-ডেক এড়িয়ে গেছে তারা। সোজা নামছে সি-ডেকে।

এরা দক্ষতার সঙ্গে টু বাই টু কাভার ফর্মেশন ব্যবহার করছে। সামনের দু'জন চারপাশ কাভার করছে, এদিকে পিছনের দু'জন কাভার করছে পিছন দিক। দুই দলের মাঝে থাকছে দশ গজ দূরত্ব।

মোরশেদ আগেই জানিয়েছে, নাইট-ভিশন গগলস ব্যবহার করছে ফ্রেঞ্চরা। প্রস্তুতি নিয়েই এসেছে। এখন তাড়াহুড়া করে নামছে শাফট দিয়ে।

রানা ভেবেছিল লোকগুলো টানেলে সময় নষ্ট করবে, কিন্তু অন্য কোনও পরিকল্পনা আছে তাদের। সি-ডেকের টানেলে অল্প সময় ছিল। যেন অপেক্ষা করেছে, উপর থেকে নেমে আসবে শত্রুরা। তারপর হঠাৎ করেই আবারও ক্যাটওয়াকে বেরিয়ে

এসেছে, রাং-ল্যাডার বেয়ে নেমে আসছে ডি-ডেকে।

হঠাৎ স্ট্র্যাটেজির বিষয়ে জুলিয়াস বি. গুণ্ডারসনের একটা কথা মনে পড়ল রানার। উনি বলেছিলেন, 'ভাল স্ট্র্যাটেজি একটা জাদুর মত। শত্রুকে একটা হাত দেখতে দিন, কিন্তু অন্য হাতে কী করছেন তা যেন বুঝতে না পারে।'

'মাসুদ ভাই, ওরা দক্ষিণ-পশ্চিমের মই বেয়ে নামছে,' ইয়ারপিসে মোরশেদের কণ্ঠ শুনল রানা। 'আপনি কি নীচে?'

ডি-ডেকের ক্যাটওয়াকে বেরিয়ে এসেছে রানা। চারপাশ সবুজ। 'কাজ শুরু করেছি।'

ডি-ডেকের দক্ষিণ-পশ্চিম কোনা কাভার করছে রানা ও তিশা। রাং-ল্যাডার দেখতে পেল, ওটা গেছে সি-ডেকের দিকে। মাইকে বলল রানা, 'নাজমুল, তুমি কোথায়?'

'কাজ প্রায় শেষ,' ই-ডেকের গুদাম থেকে জানাল নাজমুল।

'পশ্চিম দিক কাভার করুন, সার্জেন্ট,' ইন্টারকমে শোনা গেল মোরশেদের কণ্ঠ।

জনি ওয়াকার বলল, 'ওদের আসতে দিন, লেফটেন্যান্ট। তারপর পাঠিয়ে দেয়া যাবে মেজর রানার দিকে।'

ডি-ডেকে রাং-ল্যাডারের সামনে পৌঁছে গেছে রানা ও তিশা। কুঁজো হয়ে দাঁড়িয়েছে, ফাঁকা মইয়ের দিকে তাক করেছে ম্যাগহুক। ধাতব ক্যাটওয়াকে বুটের ধুপধাপ আওয়াজ শুরু হয়েছে। তারপর শুনতে পেল তুঙ্ক্ আওয়াজ। ক্রসবো ব্যবহার করা হয়েছে।

'মইয়ের দিকেই আসছে,' মোরশেদের কণ্ঠ।

ক্যাটওয়াকের গ্রিলে আরও পায়ের শব্দ।

এখন যে-কোনও সময়ে হাজির হবে লোকগুলো।

কিন্তু হঠাৎ করেই ঠং-ঠঙাৎ আওয়াজ তুলে কী যেন পড়ল।

মোরশেদের বিকট চিৎকার এল, 'সাবধান! চোখ বন্ধ! ফ্ল্যাশার

গ্রেনেড ফেলেছে!'

চট্ করে চোখ বুজে ফেলেছে রানা। উপরের ডেকে পড়েছে গ্রেনেড। এক সেকেণ্ড পর ফাটল ওটা। এক পলকের জন্য উজ্জ্বল সাদা হয়ে উঠল উইলকক্স আইস স্টেশন।

রানা চোখ খুলবে, এমন সময় অন্য আওয়াজ পেল ডানদিক থেকে। মনে হলো কেউ খুব দ্রুত খুলছে প্যান্টের চেইন।

চোখ মেলেই চরকির মত ঘুরল রানা, সামনে সবুজ আলো। কোথাও কেউ নেই। কোনও নড়াচড়াও নেই।

'কপাল!' বলে উঠল মোরশেদ, 'মাসুদ ভাই, একজন রেলিং থেকে নেমে পড়েছে।'

এইমাত্র চেইন খুলবার যে আওয়াজ পেয়েছে, এখন এক পলকে বুঝল রানা। মূল শাফট দিয়ে দড়ি বেয়ে নামছে কেউ! ওর বুঝতে দেরি হয়নি, ওটা কোনও ডিভেন্সিভ মুভ নয়।

কোঅর্ডিনেটেড মুভ। পরিকল্পনা নিয়েই করেছে। এবং হামলা করবার জন্যই।

আসলে পালাতে শুরু করেনি ফ্রেঞ্চ কমাণ্ডোরা।

ওদের পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করছে!

জুলিয়াস বি. গুণ্ডারসন বলেছিলেন, 'ভাল স্ট্র্যাটেজি একটা জাদুর মত। শত্রুকে এক হাত দেখতে দিন, কিন্তু অন্য হাতে কী করছেন তা যেন বুঝতে না পারে।'

রাজাকে চেক দিলে যেভাবে পাল্টা হামলা করতে চায় দাবাড়ু, এই মুহূর্তে তেমনি করেই ভাবতে শুরু করেছে রানা।

ওরা কী করতে চায়?

এখন কী ভাবছে?

ভাবলে অনেক কিছুই বেরুতে পারে, কিন্তু এখন ওর হাতে একদম সময় নেই। এক সেকেণ্ড পর ওর পাশের বরফ-দেয়ালে এসে লাগল অন্তত চারটে তীর।

মস্ত কুঁজওয়ালা হদ্দ বুড়োর মত উবু হয়ে গেল রানা, অবশ্য ঘুরল চালু চরকির মত, দেখতে পেল ওর পিছনের মেঝেতে ঝাঁপিয়ে পড়েছে তিশা। পরক্ষণে আবারও ঘুরল রানা, কী ঘটছে বুঝবার আগেই রাং-ল্যাডার বেয়ে সরসর করে নেমে এল এক লোক। মুখোমুখি হয়ে গেছে রানা ও লোকটা। তাকে চিনল রানা, ফ্রেঞ্চ কমাণ্ডোদের নেতা: জ্যাকুস ফিউভিল!

ই-ডেকে গুদাম-ঘরে নিশাত সুলতানার পাশে বসে আছে নাজমুল। নিশাতের হাতের শিরা শক্ত রাবারের মত, ফলে সুঁই গাঁথা কঠিন। নাইট-ভিশন গগল্‌স্‌ পরে পরিষ্কার দেখছেও না। চারবার সুঁই বিঁধিয়েছে, প্রতিবার আইভি লাইন থেকে ফ্লুইড গড়িয়ে পড়েছে নিশাতের হাতে।

ঠিক ভাবে আইভি দেয়ার পর উঠে দাঁড়াল নাজমুল, দরজার দিকে রওনা হবে, এমন সময় শুনল অদ্ভুত কিছু আওয়াজ। আঁধার গুদামের বাইরে সুড়ঙ্গে আলতো পায়ে হাঁটছে কেউ!

ঘুরেই বরফের মূর্তি হয়ে গেল নাজমুল।

কান পেতে অপেক্ষা করছে।

বাইরে দক্ষিণ টানেল ধরে হালকা পায়ে গেল সে বা তারা।

সামনে বেড়ে দরজার নব ধরল নাজমুল, খুব ধীরে নিঃশব্দে খুলল কবাট, উঁকি দিল সাবধানে। নাইট-ভিশন গগলসের কারণে সবুজ লাগছে টানেল। বামে চাইতেই দেখল পুল। মৃদু সব ঢেউ এসে লাগছে ডেকের পাশে।

ডানে চাইতেই দেখল, দীর্ঘ টানেল গেছে দূরের অন্ধকারে। নাজমুলের মনে পড়ল, স্টেশনের ওদিকেই ই-ডেকে ড্রিলিং রুম।

উইলকক্স আইস স্টেশনের এই অংশ সবচেয়ে নিচু, সে কারণেই এদিকে রাখা হয়েছে ড্রিলিং রুম। ওখান থেকেই বরফের কোরে বিজ্ঞানীরা নামিয়ে দেন ড্রিল। স্টেশন থেকে বেশ দূরে ওই

রুম, মাঝে চল্লিশ গজ দীর্ঘ সরু টানেল।

ডানদিকের টানেল ধরেই গেছে সে বা তারা। এক মুহূর্ত দ্বিধা করল নাজমুল, তারপর ম্যাগহুক হাতে রওনা হলো পিছনে।

জ্যাকুস ফিউভিলকে লক্ষ্য করে ম্যাগহুক ফায়ার করেছে রানা। কিন্তু বিদ্যুদ্বেগে দু' ভাঁজ হয়ে গেছে লোকটা। তার মাথার উপর দিয়ে রাং-ল্যাডারে ঝটাং করে লাগল হুক, পেঁচিয়ে গেল মইয়ের ধাপে।

হাত থেকে ম্যাগহুক ছেড়ে দিল রানা, তাক করল ক্রসবো। ওই একই সময়ে রানার বুকে ক্রসবো তাক করেছে ফিউভিল।

একইসঙ্গে অস্ত্রদুটো ব্যবহার করল ওরা। শিস তুলে পরস্পরকে পাশ কাটাল দুই তীর।

রানার আর্মার্ড শোল্ডারপ্লেটে লাগল ফিউভিলের তীর। ওদিকে রানার তীর গিয়ে লেগেছে লোকটার বাহুতে। হাত তুলে মুখ ঢেকেছে বিশালদেহী কমাণ্ডো। ব্যথা পেয়ে গর্জন ছাড়ল সে, সুস্থ হাতে তাড়াহুড়া করে ক্রসবো রিলোড করতে চাইছে। ওখানে বৃত্তাকার পাঁচটি রাবার স্লট থাকে, দ্রুত রিলোড করবার জন্য ওখান থেকে তীর নেয়া হয়। কিন্তু এখন রানার ক্রসবোর স্লটে কোনও তীর নেই!

যে কমাণ্ডোকে শেষ করে ক্রসবো পেয়েছে রানা, সে আগেই শেষ করে ফেলেছে সব তীর! ছিল শুধু শেষ তীরটা!

দেরি করল না রানা, ওই তীরের মতই ছুটে সামনে বাড়ল। পরক্ষণে ঝাঁপিয়ে পড়ল ফ্রেঞ্চ কমাণ্ডোর উপর। একইসঙ্গে ধড়াস্ করে পড়ল ওরা মইয়ের পিছনের ক্যাটওয়াকে।

পাঁচ গজ দূরে ক্যাটওয়াকে মুখ ঢেকে পড়ে আছে তিশা, দেখতে পেয়েছে ফ্রেঞ্চ কমাণ্ডোর উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে রানা। লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল তিশা, রানাকে সাহায্য করতে ছুটতে শুরু

করবে, এমন সময় রাং-ল্যাডার বেয়ে নেমে এল আরেক ফ্রেঞ্চ কমাণ্ডো!

কালো নাইট-ভিশন গগলসের ভিতর দিয়ে ওর দিকে চাইল লোকটা!

ধীর পায়ে সরু টানেল বেয়ে চলেছে নাজমুল। শেষমাথায় একটা দরজা। ওদিক দিয়েই ঢুকতে হয় ড্রিলিং রুমে। দরজা এখন আধ খোলা।

পা টিপে টিপে সামনে বাড়ছে নাজমুল, খাড়া করে রেখেছে কান। ঘরের ভিতর খসখস আওয়াজ। নড়াচড়া করছে কেউ। গুদাম পাশ কাটিয়ে এখানে এসে হাজির হয়েছে লোকটা!

কী যেন করছে!

নিচু স্বরে মাইক্রোফোনে কী যেন বলল। ইংরেজি না।

'লে পেইজ এস্ত তেন্দু।'

পাথরের মূর্তি হয়ে গেল নাজমুল। লোকটা ফ্রেঞ্চ কমাণ্ডো!

দরজার পাশে পৌঁছে দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়াল ও, চোখে এখনও নাইট-ভিশন গগলস— আধ খোলা দরজা দিয়ে উঁকি দিল।

ওর মনে হলো ভিডিয়ো ক্যামেরার ভিতর দিয়ে চেয়ে আছে। প্রথমে চোখে পড়ল দরজার চৌকাঠ, ওটা ওর সবুজ ভিউস্ক্রিনের ডানে। তারপর দেখা গেল ঘরের ভিতর অংশ।

এক সেকেণ্ড পর দেখল লোকটাকে। তার চোখেও নাইট-ভিশন গগলস, একেবারে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। হাতের ক্রসবো তাক করেছে ওর মুখ লক্ষ্য করে!

সামনে নাইট-ভিশন গগলস পরা ফ্রেঞ্চ কমাণ্ডো, কিন্তু এক পলকে তিশা চিনল এই লোক ভিঁভাদিয়েখ।

গ্যাসোঁয়া ভিঁভাদিয়েখ। এই লোকই হামলার শুরুতে ক্রসবো

দিয়ে ওর কপালে তীর মেরেছিল। হেলমেটের সামনের দিকে এখনও সেই তীর ঝুলছে। হারামজাদা হাসছে আবার!

বুঝতে পেরেছে, আগে এই মেয়েকেই তীর মেরেছিল।

সবজেটে আলোর ভিতর ক্রসবো উপরে তুলল সে, পরক্ষণে ছুঁড়ল তীর।

তিশা আছে বিশ ফুট দূরে, এক সেকেণ্ডের বিশ ভাগ সময়ে হঠাৎ করেই দেখল তীরের ডগা আসছে ওর দিকেই। ঝট করে সরে গেল তিশা, ডান হাত তখনও পিছনে রয়ে গেছে। হঠাৎ খটাং আওয়াজ শুনল। ভীষণ ঝাঁকি খেল ওর হাত। তীর গিয়ে লেগেছে ওর ম্যাগহুকের উপর, ঝটকা দিয়ে দূরে গিয়ে পড়ল অস্ত্রটা।

একটু সামলে নেয়ার আগেই তিশা দেখল, ছুটে আসছে ভিঁভাদিয়েখ, হাতে বেরিয়ে এসেছে বাউয়ি ছোরা। মনে হলো মুহূর্তে হাজির হয়েছে লোকটা, তিশার গলা লক্ষ্য করে নামিয়ে আনল হান্টিং নাইফ।

হঠাৎ জোরালো ঠং আওয়াজ তুলল বাউয়ি, প্রচণ্ড ঝাঁকি খেয়ে থেমে গেছে চওড়া ফলা।

নিজের ছোরা দিয়ে হামলা ঠেকিয়ে দিয়েছে তিশা।

পিছিয়ে গেল দুই যোদ্ধা, বৃত্তাকারে ঘুরতে শুরু করেছে, হামলা করবে পরস্পরের উপর। ভিঁভাদিয়েখ উল্টো করে ধরেছে ছোরা, একই কাজ করছে তিশাও। এখনও দু'জনের চোখে নাইট-ভিশন গগলস।

হঠাৎ করেই লাফিয়ে সামনে বাড়ল ভিঁভাদিয়েখ, কিন্তু নিজেরটা দিয়ে তার ছোরা সরিয়ে দিল তিশা। কিন্তু ফ্রেঞ্চ কমাণ্ডোর হাত ওর চেয়ে দীর্ঘ, তিশা সরে গেলেও সুইপ করল। চোখ থেকে আলগা হয়ে গেল তিশার গগলস।

এক মুহূর্ত কিছুই দেখল না তিশা। চারপাশ শুধু ঘুটঘুটে অন্ধকার!

মুহূর্তে বুঝল, গগলস না থাকলে ও সম্পূর্ণ অন্ধ!

পিছনের ক্যাটওয়াকে কম্পন টের পেল তিশা। লাফিয়ে সামনে বেড়েছে ভিঁভাদিয়েখ।

পুরোপুরি অন্ধ তিশা, কিন্তু ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের নির্দেশে ঝট্ করে বসে পড়ল। ঠিক করছে কি না এখনও জানে না।

এক সেকেণ্ড পর টের পেল, ঠিকই করেছে। ওর হেলমেটের উপর দিয়ে শ্-শ্ আওয়াজ তুলে বেরিয়ে গেল ছোরার ফলা।

অন্ধকারে সামনের ক্যাটওয়াকে ডিগবাজি শুরু করল তিশা, সরে যাচ্ছে ভিঁভাদিয়েখের কাছ থেকে। তিনবার ডিগবাজি দিয়ে উঠে দাঁড়াল, চাপড় দিল হেলমেটের পাশের বাটনে। সঙ্গে সঙ্গে চোখের সামনে বসে গেল ইনফ্রারেড ভাইজার।

ওটা নাইট-ভিশন নয়, কিন্তু প্রায় সমানই কাজ করে।

চারপাশের ক্যাটওয়াক ধরা পড়ছে ইলেকট্রনিক নীল-কালো ইমেজে। ক্যাটওয়াক ও রাং-ল্যাডার নীল রঙের। মইয়ের কাছে নানা রঙের দুটো আকৃতি দেখল তিশা। তারা ক্যাটওয়াকে জাপ্টা-জাপ্টি করে গড়িয়ে সরছে। মাসুদ রানা ও জ্যাকুস ফিউভিল, বোধহয় কুস্তি চলছে তাদের ভিতর।

চট্ করে ঘুরল তিশা, ওর দিকে ছুটে আসছে লাল-সবুজ-হলুদ আরেকটা আকৃতি।

ওটা গ্যাসোঁয়া ভিঁভাদিয়েখ।

অথবা, লোকটার শরীরের ভিতরের হিট প্যাটার্ন।

পাশ থেকে ছোরা চালাল গ্যাসোঁয়া ভিঁভাদিয়েখ। আবারও নিজের ছোরা দিয়ে হামলা ঠেকিয়ে দিল তিশা। পরক্ষণে জোরালো সাইড কিক করল ফ্রেঞ্চের সোলার প্লেক্সাস লক্ষ্য করে। লাথিটা জায়গামতই লেগেছে, হুমড়ি খেয়ে পড়ল ভিঁভাদিয়েখ। কিন্তু পড়বার আগে খপ্ করে ধরেছে তিশার ছোরা ধরা ডান কবজি। জোর টান খেয়ে পড়ে গেল তিশাও।

একই সঙ্গে ক্যাটওয়াকে পড়েছে ওরা। নীচে ভিঁভাদিয়েখ, উপরে তিশা। গড়িয়ে সরল ও, পিঠ দিয়ে পড়ল ক্যাটওয়াকের পাশের বরফ-দেয়ালে। মেঝেতে উঠে বসতে গিয়ে হাতে কী যেন ঠেকল। মুহূর্তে বুঝে গেল ওটা কী।

ম্যাগহুক!

আর ঠিক তখনই চোখের সামনে হাজির হলো রঙিন ঝলমলে আকৃতি... ওর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে গ্যাসোঁয়া ভিঁভাদিয়েখ! হাত বাড়িয়ে রেখেছে, এবার কচ্ করে কেটে দেবে তিশার কণ্ঠনালী!

হাত থেকে ছোরা ছেড়ে দিল তিশা, দুই হাতে লোকটাকে ঠেকাতে চাইল। দুই হাতে শক্ত করে ধরে ফেলল লোকটার ছোরা ধরা কবজি। ওর গলা থেকে মাত্র এক ইঞ্চি দূরে তীক্ষ্ণধার ফলা, কিন্তু ওখানেই থামাতে পারল।

অবশ্য, তা মাত্র কয়েক সেকেণ্ডের জন্য।

লোকটা অনেক বেশি শক্তিশালী।

তিশার কণ্ঠনালী থেকে আধ ইঞ্চি দূরে থামল ছোরা।

চোখের সামনে গ্যাসোঁয়া ভিঁভাদিয়েখের মুখ দেখল তিশা। ইনফ্রারেড ভাইজারে লোকটার করোটি ও দাঁতগুলো পরিষ্কার দেখছে। থরথর করে কাঁপছে রং। মাংস ও রক্ত ওগুলো। তিশার মনে হলো নরক থেকে উঠে এসেছে ভয়ঙ্কর পৈশাচিক কঙ্কাল।

লোকটা এত কাছে, তার নাইট-ভিশন গগলস ঘষা লাগছে ওর হেলমেটে।

গগলস্, চট্ করে ভাবল তিশা।

পর মুহূর্তে সামান্য দ্বিধা করে গ্যাসোঁয়ার ছোরা ধরা হাত থেকে বাম হাত সরিয়ে নিল, খামচি দিয়ে খুলে দিল লোকটার নাইট-ভিশন গগলস।

ঘোঁৎ করে উঠল গ্যাসোঁয়া ভিঁভাদিয়েখ। ক্যাটওয়াকের পাশ থেকে গগল্স্টা নীচে ফেলে দিল তিশা। ভাবছে, অন্ধ হয়ে গেছে

হারামজাদা!

কিন্তু গলার উপর ছোরা নামিয়ে আনছে ভিঁভাদিয়েখ। হঠাৎ করেই গ্যাসোঁয়ার নীচে পিছলে সরল তিশা, এখন ওর হেলমেট লোকটার চোখের সামনে।

'মনে পড়ে? এটা দিয়েছিলে,' নিচু স্বরে বলল তিশা, চোখের সামনে দেখছে হেলমেটে গাঁথা তীর। ওটা নীল রঙের। 'এবার ফিরিয়ে নাও!'

পরক্ষণে ঝটকা দিয়ে সামনে মাথা বাড়াল তিশা। হেলমেটের তীর খচ্ করে বিঁধল গ্যাসোঁয়া ভিঁভাদিয়েখের ডান চোখে। বিকট চিৎকার ছাড়ল লোকটা, মনে হলো ভয়ঙ্কর কোনও হিংস্র প্রাণী গর্জে উঠেছে। তিশা টের পেল, ছলাৎ করে ওর চোখেমুখে এসে পড়েছে একগাদা উষ্ণ রক্ত।

নীচ থেকে লাথি মেরে লোকটাকে ছিটকে ফেলে দিল তিশা। ইনফ্রারেড ভাইজারে দেখল, লোকটার ডান চোখ থেকে বেরুচ্ছে তরল হলুদ-লাল কী যেন।

চিত হয়ে ক্যাটওয়াকে আছড়ে পড়েছে ভিঁভাদিয়েখ, একের পর এক চিৎকার ছাড়ছে। একহাতে ঢেকে ফেলেছে শূন্য কোটর। তিশার খোঁচা খেয়ে বেরিয়ে এসেছে তার চোখ। এরপরও মেঝের উপর বসে দু' দিকে থাবা ছুঁড়ল সে, তিশাকে নাগালে পেলে হামলা করবে।

ক্যাটওয়াকে পড়ে থাকা ম্যাগহুক তুলে নিল তিশা, ফ্রেঞ্চ কমাণ্ডোর রক্তাক্ত করোটি তাক করল। দাপাদাপি করছে লোকটা, কিন্তু তিশার হাতে সময় আছে। সাবধানে ম্যাকহুকের ট্রিগার টিপে দিল ও।

ভিঁভাদিয়েখের মুখের উপর আঘাত হানল হুক। আধ সেকেণ্ড পর ধপ্ করে ক্যাটওয়াকের উপর পড়ল লোকটা। দু' টুকরো হয়ে গেছে তার করোটি।

গোটা ক্যাটওয়াক জুড়ে গড়াগড়ি করছে রানা ও ফিউভিল। নানান আওয়াজ শুনছে রানা হেলমেট ইন্টারকমে।

'... ওরা আরেক দিকে যাচ্ছে!'

'অন্য মই বেয়ে...'

উপরের ক্যাটওয়াকে ধপ-ধপ আওয়াজ।

খুব কাছেই কোথাও ব্যবহার করা হলো ক্রসবো। 'স্ন্যাপ্' আওয়াজ। ক্রসবোর বোল্টে আরেকটা তীর বসিয়ে নিয়েছে ফিউভিল। বিশালদেহী ফ্রেঞ্চের নাইট-ভিশনের নীচে, মুখের উপর কনুই নামিয়ে আনল রানা। ভচ্ করে বসে গেল লোকটার নাকের হাড়। রানার হাতের চারপাশে ছিটকে লাগল রক্ত। ঝাপসা হলো ফ্রেঞ্চ কমাণ্ডোর গগলস।

রাগে গরগর করছে ফিউভিল, গায়ের জোরে ধাক্কা দিয়ে রানাকে ক্যাটওয়াকের কিনারায় পাঠিয়ে দিল সে। দু'জনের মাঝে দেড় ফুট দূরত্ব। এখনও ক্যাটওয়াকে পড়ে আছে সে, গগলসের উপর রক্ত পড়ায় প্রায় অন্ধ হয়ে উঠেছে। গনগনে রাগ নিয়ে ঘুরল সে, ক্রসবো তাক করল রানার মাথা লক্ষ্য করে।

ক্যাটওয়াকের কিনারায় রেলিঙের পাশে পড়েছে রানা, বিদ্যুদ্বেগে চলছে মগজ। ঝটকা খেয়ে ফিউভিলের হাত ঘুরতেই খপ্ করে ক্রসবো ধরল ও, আধ সেকেণ্ড পর শরীর গড়িয়ে দিয়ে নেমে গেল ক্যাটওয়াক থেকে!

শত্রু এমন করবে ভাবতেও পারেনি ফিউভিল।

ক্রসবো ছাড়ছে না রানা, নিজে পড়তে শুরু করেছে গভীর শাফটে। মুহূর্ত পর থেমে গেল পতন, এখনও ঝুলছে লোকটার ক্রসবো ধরে। একবার শরীর দুলিয়ে নেমে পড়ল নীচের ডেকে, সঙ্গে এনেছে লোকটার ক্রসবো। এখনও দুই পায়ে দাঁড়িয়ে আছে, এবার ডি-ডেকের ক্যাটওয়াকের দিকে তাক করল ক্রসবো,

পরক্ষণে টিপে দিল ট্রিগার।

এখনও ক্যাটওয়াকে মুখ দিয়ে পড়ে আছে ফিউভিল, বেকায়দা ভাবে ডান হাত ঝুলছে বাইরে। ক্রসবো ডিসচার্জ হতেই পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জে ইস্পাতের গ্রিলের ভিতর দিয়ে ঢুকল তীর— ফিউভিলের নাইট-ভিশন গগলসের ভিতর কাত হয়ে ঢুকল, গাঁথল গিয়ে ফরাসি সৈনিকের কপালের পাশে।

ড্রিলিং রুমে ফ্রেঞ্চ কমাণ্ডোর ক্রসবোর মুখে থমকে গেছে নাজমুল।

ফ্রেঞ্চ লোকটা ভাবছে সে সুবিধাজনক অবস্থানে আছে। বলতে গেলে মরেই গেছে শত্রু। কিন্তু একটা কথা একদম ভুলে গেছে সে।

নাইট-ভিশন ব্যবহার করলে খুব খারাপ হয় পেরিফেরাল ভিশন।

লোকটা অনেক বেশি কাছে। এবং সে-কারণে দেখতেই পায়নি কোমরের কাছে ম্যাকহুক ধরে আছে শত্রু।

বিন্দুমাত্র দেরি না করে ফায়ার করল নাজমুল। লঞ্চার থেকে ছিটকে বেরুল ম্যাগহুক, মাত্র তিন ফুট পেরিয়ে বিঁধল ফরাসি সৈনিকের বুকে। বিশ্রী মটমট আওয়াজ উঠল। ভিতর দিকে ডেবে গেল কমাণ্ডোর পাঁজরের খাঁচা, ভাঙা কয়েকটা হাড় ঢুকে গেল হৃৎপিণ্ডে। মেঝেতে পড়বার আগেই মারা গেল লোকটা।

বড় করে শ্বাস নিল নাজমুল, আস্তে করে দম ফেলল। যাক্, বাঁচা গেছে! ড্রিলিং রুমের ভিতর অংশে চোখ গেল। ফ্রেঞ্চ কমাণ্ডো কী করছিল দেখে হাঁ হয়ে গেল ওর মুখ। মনে পড়ল, একটু আগে কী বলছিল লোকটা— 'লে পেইজ এস্ত তেন্দু।'

দ্বিতীয়বার ঘরে চোখ বোলাল নাজমুল, তারপর হেসে ফেলল।

'দক্ষিণ টানেল, মাসুদ ভাই,' রানার হেলমেট ইণ্টারকমে এল

মোরশেদের কণ্ঠ।

ফিউভিলের হাত বেয়ে আবারও ই-ডেকে নেমে এসেছে রানা। তখনই কালো পোশাক পরা এক লোককে পুলের ওপাশে দক্ষিণ টানেলে ঢুকতে দেখেছে। ওই লোক শেষ ফ্রেঞ্চ কমাণ্ডো। দড়ি দিয়ে শাফট বেয়ে নেমেছে সে।

'আমি ওকে দেখেছি,' ছুটতে শুরু করেছে রানা।

'স্যর, আমি নাজমুল,' হঠাৎ শোনা গেল কর্পোরাল নাজমুলের কণ্ঠ। 'আপনি কি এইমাত্র দক্ষিণ সুড়ঙ্গের কথা বললেন?'

'হ্যাঁ।'

'তাকে আসতে দিন, স্যর।' দৃঢ় শোনাল নাজমুলের কণ্ঠ। 'তার পিছনে আসেন।'

'ব্যাপার কী, নাজমুল?' মৃদু কুঁচকে গেল রানার ভুরু।

'তার পিছনে আসেন, স্যর,' এবার ফিসফিস করে বলল নাজমুল। 'সে চায় আপনি ওর পিছন পিছন আসেন।'

এক পলক থামল রানা, তারপর জিজ্ঞেস করল, 'নাজমুল, তুমি বোধহয় এমন কিছু জানো, সেটা আমি জানি না?'

'জী, স্যর।'

সার্জেন্ট জনি ওয়াকার, গানারি সার্জেন্ট ভাইপার ও তিশা ই-ডেকে রানার পাশে দক্ষিণ সুড়ঙ্গের মুখে পৌঁছেছে। সবাই হেলমেট ইন্টারকমে নাজমুলের বক্তব্য শুনতে পেয়েছে।

এদের সবাইকে দেখে নিল রানা, তারপর হেলমেট মাইকে বলল, 'ঠিক আছে, নাজমুল, দেখা যাক কী করো।'

ই-ডেকের দক্ষিণ টানেলে ঢুকে পড়ল ওরা। বেশ কিছুক্ষণ হেঁটে যাওয়ার পর সুড়ঙ্গের শেষমাথায় দেখল একটা দরজা। এইমাত্র সবজেটে আলোয় দরজা পেরিয়ে ঘরে ঢুকে পড়েছে কালো এক মূর্তি।

নাজমুল ঠিকই বলেছে। লোকটা খুব ধীরে হাঁটছিল। যেন

বোঝাতে চেয়েছে, সে ড্রিলিং রুমে ঢুকবে।

এগিয়ে চলেছে রানা ও অন্যান্যরা। ড্রিলিং রুমের দরজার দশ গজ দূরে পৌঁছে গেছে, এমন সময় হঠাৎ করেই অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এল একটি হাত, টান দিল রানার বাহু ধরে। চরকির মত ঘুরল রানা, ঘুষি মারবার আগেই দেখল দেয়ালে বসানো কাবার্ড থেকে উদয় হয়েছে নাজমুল। ওর পিছনে কাবার্ডের ভিতর আরেকটা দেহ। নিজের ঠোঁটের উপর আঙুল রাখল নাজমুল, তারপর সবাইকে এগুতে ইশারা করে রওনা হলো ড্রিলিং রুমের দরজার দিকে।

'ফাঁদ পেতে বসে আছি,' দরজার কাছে গিয়ে নিচু স্বরে বলল নাজমুল। টান দিয়ে দরজা খুলল। জোরালো কটকট আওয়াজ তুলে বাইরের দিকে খুলে গেছে দরজা।

ঘরের দূর-দেয়ালের কাছে ফ্রেঞ্চ কমাণ্ডোকে দেখল ওরা। লোকটা ফ্রেঞ্চ দলের নেতা জ্যাকুস ফিউভিল। লোকটা বুঝে গেছে ফাঁদে পড়েছে।

'আমি... আমি... সারেণ্ডার করছি,' দুর্বল স্বরে বলল সে।

লোকটার দিকে চেয়ে আছে রানা। পাশ ফিরে নাজমুল ও অন্যদের দিকে চাইল। পরামর্শ আশা করছে। এক সেকেণ্ড পর পা রাখল ড্রিলিং রুমের ভিতর।

মনে হলো স্বস্তির হাসি হাসল ফিউভিল।

ঠিক তখন পিছন থেকে হাত বাড়িয়ে রানার বাহু ধরল নাজমুল। থেমে গেছে রানা, ঘুরে চাইল। ফিউভিলের দিকে চেয়ে আছে নাজমুল।

ভুরু কুঁচকে ফেলল ফিউভিল।

এক সেকেণ্ড পর নাজমুল বলল, '...লে পেইজ এস্ত তেন্দু।'

মাথা কাত করে চাইল ফিউভিল।

'তাই বলেছে?' বলল রানা। 'তার মানে, ফাঁদ পাতা হয়েছে।'

হঠাৎ করেই অন্য কীসের দিকে যেন চোখ চলে গেল ফিউভিলের। জিনিসটা তার সামনে, মেঝের উপর। হঠাৎ করেই লোকটার হাসি ম্লান হয়ে গেল। আতঙ্কিত চোখে চাইল নাজমুলের দিকে।

নাজমুল জানে, কী দেখেছে জ্যাকুস ফিউভিল।

পাঁচটা ফ্রেঞ্চ শব্দ পড়তে পারল ফিউভিল, বুঝে গেল মস্ত ভুল করেছে— মৃত্যু এবার অনিবার্য!

ওই পাঁচ শব্দ হচ্ছেঃ ব্যাখায়েখ সে কোসে সুখ লেনেমি।

অর্থাৎ, শত্রুর এপাশে চলে আসুন!

হাসি-হাসি চেহারা করে সামনে বাড়ল নাজমুল, একই সময়ে 'না!' বলে উঠল ফিউভিল। কিন্তু দেরি করে ফেলেছে। দরজার সামনে ট্রিপ-ওয়ায়ারে পা ফেলল নাজমুল।

ড্রিলিং রুমের ভিতর প্রচণ্ড শব্দে বিস্ফোরিত হলো দুটো কংকেভ মাইন!

ষোলো

ইউনাইটেড স্টেট্‌স্ অভ আমেরিকা।

নিউ মেক্সিকো।

রুক্ষ মরুভূমির বুক চিরে এঁকেবেঁকে গেছে সুদীর্ঘ এক হাইওয়ে। চারপাশে সোনালী-বাদামি বালির বিস্তৃতি। তারই মাঝে কালো একটি স্তর। নীচে এই কালো মাটি-পাথর, মাথার উপর মেঘহীন সুনীল আকাশ। দুপুর। দাউ-দাউ আগুন ঢালছে সূর্য।

মরুভূমির হাইওয়েতে তীর বেগে ছুটছে একটিমাত্র গাড়ি। দরদর করে ঘামছে চালক অ্যাডোনিস ক্যাসেডিন। তার ভাড়া নেয়া উনিশ শ' আশি সালের টয়োটা গাড়ির এসি বহু আগেই মহাপ্রয়াণে গেছেন। এখন গাড়ির ভিতরের অংশ হয়ে উঠেছে উত্তপ্ত আভেন। অ্যাডোনিসের ধারণা: বাইরের চেয়ে কমপক্ষে দশ ডিগ্রি বেশি গরম ভিতরে।

দ্য ওয়াশিংটন পোস্টের রিপোর্টার অ্যাডোনিস ক্যাসেডিন এই পত্রিকার সঙ্গে রয়েছে বিগত তিনবছর। আগে ইনভেস্টিগেটিভ রিপোর্টিং জার্নাল গ্র্যাণ্ডমাদার মিশেল-এ ফিচার লিখত। তখনই নাম ফাটতে শুরু করে। আসতে শুরু করে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা।

গ্র্যাণ্ডমাদার মিশেল পত্রিকার সঙ্গে বেশ খাপ খাইয়ে নিয়েছিল ক্যাসেডিন। ওই পত্রিকার মূল উদ্দেশ্য: সরকারের ভুল বক্তব্য বা রিপোর্ট সাধারণ মানুষের চোখের সামনে তুলে ধরা। জটিল সব বিষয়কে খুব সহজভাবে লেখা হয় পত্রিকাটিতে। খুশি মনেই কাজ করছিল অ্যাডোনিস, ওর একটা আর্টিকেল উঁচু পর্যায়ের দুটো পুরস্কার পেল। সে আর্টিকালে তুলে ধরেছিল, কীভাবে আটলাণ্টিক মহাসাগরে হারিয়ে গেছে ক্র্যাশ করা বি-২ স্টেলথ বম্বারের পাঁচটি নিউক্লিয়ার বোমা। ওই বিমান পড়ে ব্রাজিলের উপকূলে। আমেরিকান সরকার প্রেস রিলিজে বলে: প্রতিটা ওয়ারহেড খুঁজে বের করে নিরাপদে সরিয়ে আনা হয়েছে।

এরপর তদন্ত শুরু করল ক্যাসেডিন, বের করে আনল আসল সত্য— কীভাবে ওসব বোমা খোঁজা হয়েছে।

কয়েক দিনের ভিতর উন্মোচিত হলো কঠিন সত্য। আসলে রেসকিউ মিশনে জোর দিয়ে খোঁজাই হয়নি ওয়ারহেড। অফিশিয়ালদের ওপর নির্দেশ ছিল, বম্বারের সব প্রমাণ নষ্ট করে ফেলতে হবে। এরপর সম্ভব হলে খুঁজতে হবে ওয়ারহেড। জানা গেল, আদতে ওই ওয়ারহেডগুলো খুঁজেই পাওয়া যায়নি।

পুরস্কার-প্রাপ্ত ওই আর্টিকেল প্রকাশের পর বিপুল সাড়া পড়ে যাওয়ায় ক্যাসেডিনকে প্রথমবারের মত চিনলেন দ্য ওয়াশিংটন পোস্টের সম্পাদক। উনি ওকে চাকরি দিতে চাইলেন। এরপর দেরি করেনি ক্যাসেডিন, গ্র্যাণ্ডমাদার মিশেল পত্রিকাটির অনুমতি নিয়েই যোগ দিয়েছে দ্য ওয়াশিংটন পোস্টে।

অ্যাডোনিস ক্যাসেডিনের বয়স তিরিশ, লম্বা লোক সে, উচ্চতা ঝাড়া সাড়ে ছয় ফুট। বালির মত বাদামি রঙের চুল, এলোমেলো। চোখে ওয়্যায়ার-ফ্রেম চশমা। এখন তার ভাড়া নেয়া গাড়ির মেঝে দেখলে মনে হবে, ওখানে বোমা পড়েছে। ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে খালি কোকের ক্যান, মুচড়ে যাওয়া চিযবার্গারের র‍্যাপার। প্রতিটি কমপার্টমেন্টে গুঁজে রাখা হয়েছে প্যাড ও কলম। অ্যাশট্রের ভিতর ছেঁড়া খাম।

মরুভূমির মাঝ দিয়ে চলেছে অ্যাডোনিস ক্যাসেডিন।

বেজে উঠল তার সেলুলার ফোন। কল করেছে ক্যাসেডিনের স্ত্রী সান্থা।

ওয়াশিংটনের সাংবাদিক সমাজে বেশ জনপ্রিয় এই আন্তরিক দম্পতি। দু'জনই দ্য ওয়াশিংটন পোস্টে চাকরি করে। ওদের কাছে কেউ সাহায্য চাইলে তাকে খালি হাতে ফিরতে হয় না। তিনবছর আগে ক্যাসেডিন গ্র্যাণ্ডমাদার মিশেল ছেড়ে পোস্টে চাকরি নেয়ার পর ওকে তরুণী এক রিপোর্টার সান্থা জোন্সের সঙ্গে কাজ করতে বলা হয়। এর মাত্র এক সপ্তাহের ভিতর ওদের দু'জনের মনের মধ্যে কী যেন হয়ে গেল। তার দুই সপ্তাহ পর ওরা বিয়ে করল। প্রায় তিনবছর হলো ওরা আনন্দে আছে। অবশ্য, এখনও ওদের সন্তান আসেনি। একই বিষয়ের উপর কাজ করে ওরা।

'পৌঁছে গেছ?' স্পিকার ফোনে বলল সান্থা। ওর বয়স মাত্র পঁচিশ, কাঁধে লুটিয়ে পড়েছে লালচে-বাদামি চুল, বড় বড়

চোখদুটো আকাশের মতই নীল, হাসলে ঝলমল করে ওঠে মুখ। খুব সুন্দরী নয় ও, কিন্তু ওই হাসি দেখলে তৃতীয়বার ফিরে চাইতে হয়। আপাতত সান্থা আছে ওয়াশিংটন ডি.সি.তে, জরুরি কিছু কাগজপত্র খুঁজছে।

'প্রায় চলে এলাম,' জবাব দিল অ্যাডোনিস।

নিউ মেক্সিকোর মরুভূমির মাঝে একটা অভযারভেটরির দিকে চলেছে। আজ (SETI) সেটি ইন্সটিটিউটের এক টেকনিশিয়ান ফোন করেছে পত্রিকা অফিসে, জানিয়েছে, পুরনো এক স্পাই স্যাটালাইট নেটওয়ার্কে বেশ কিছু জরুরি কথা শুনতে পেয়েছে। তদন্ত করতে পাঠানো হয়েছে অ্যাডোনিস ক্যাসেডিনকে।

প্রায়ই এমন হয়, সার্চ ফর এক্সট্রাটেরেস্ট্রিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইন্সটিটিউট বা সেটি নানা শব্দ খুঁজে পায়। তাদের রেডিয়ো স্যাটালাইট অ্যারে খুবই শক্তিশালী ও অস্বাভাবিক সেনসিটিভ। সেটির টেকটিশিয়ানরা এক্সট্রাটেরেস্ট্রিয়াল ইন্টেলিজেন্স ট্র্যান্সমিশন খুঁজতে গিয়ে কখনও মিলিটারি ট্র্যান্সমিশনও শুনতে পায়। নানা দিকে ছড়িয়ে থাকা গুপ্তচর স্যাটালাইটের টুকটাক আওয়াজ বা শব্দ ধরে ফেলা খুব অস্বাভাবিক নয়।

ওগুলো দ্য ওয়াশিংটন পোস্টের কলামে লেখা হয়: 'সেটি সাইটিং' শিরোনামে। বেশিরভাগ সময় দেখা যায়, ওগুলো সাধারণ, গুরুত্বহীন সব শব্দ, কোনও আগামাথা নেই। আসলে ধরে নেয়া হয়েছে: সত্যিই একদিন এসব ফালতু শব্দের মধ্যেই মিলবে ভাল কোনও কাহিনি। হয়তো সেদিন ওই কাহিনি লেখা হলে মিলে যেতে পারে পুলিৎযার!

'ইন্সটিটিউটে তোমার কাজ শেষে আমার সঙ্গে যোগাযোগ কোরো,' বলল সান্থা। সেক্সি ভঙ্গিতে এবার বলল, 'আমার কাছে একটা জিনিস আছে, ওটা সেটি সাইটিঙের চেয়ে খারাপ হবে না।'

মুচকি হাসল অ্যাডোনিস। 'লোভ লাগিয়ে দিচ্ছ?'

'হুঁ।'

'কাজ শেষে সোজা বাড়ি ফিরছি,' বলল অ্যাডোনিস।

'আমি অপেক্ষায় থাকলাম।' ওপাশে ফোন রেখে দিল সান্থা।

একঘণ্টা পর সেটি ইন্সটিটিউটের ধুলো ভরা পার্কিং লটে গাড়ি রাখল অ্যাডোনিস। লটে আরও তিনটে গাড়ি দেখল। লাফ দিয়ে গাড়ি থেকে বেরিয়ে দরজায় তালা না মেরেই রওনা হয়ে গেল দোতলা বাড়িটার দিকে। তিন শ' ফুট উঁচু রেডিয়ো টেলিস্কোপের নীচে ছায়ার ভিতর বাড়িটা। চারপাশের মরুভূমিতে আরও সাতাশটা রেডিয়ো টেলিস্কোপ, দেখলে মনে হয় বিশাল সব স্যাটালাইট ডিশ।

বাড়ির ভিতর ঢুকতেই ছোটখাটো এক লোকের সঙ্গে দেখা হলো অ্যাডোনিসের। লোকটার পরনে সাদা ল্যাব কোট, নিজের নাম বলল বার্নি ওলসন। জানাল, ওই সিগনাল ধরেছে সে-ই।

বেশ কয়েক ধাপ নেমে অ্যাডোনিসকে একটা পাতাল-ঘরে নিয়ে এল সে। নীরবে লোকটার পিছনে চলেছে অ্যাডোনিস। চারপাশের দেয়ালে একের পর এক ইলেকট্রনিক রেডিয়ো ইকুইপমেন্ট।

হাঁটতে হাঁটতে বলল ওলসন, 'দুপুর আড়াইটার সময় শুনতে পেলাম। বুঝতে দেরি হলো না, ইংলিশ বলছে। তখনই বুঝলাম, এরা এলিয়েন হতে পারে না।'

'ভাগ্যিস বুঝেছেন,' চেহারা ভীষণ গম্ভীর রাখল অ্যাডোনিস।

'উচ্চারণ থেকে বুঝলাম, এরা আমেরিকান। তখনই পেন্টাগনে যোগাযোগ করলাম।' হাঁটতে হাঁটতে অ্যাডোনিসের দিকে চাইল সে। 'ওখানে আমাদের একটা ডিরেক্ট লাইন আছে।'

মনে হলো এজন্যে খুব গর্বিত সে। যেন নীরবে বুঝিয়ে দিল: সরকার মনে করে আমাদের কাজ খুব গুরুত্বপূর্ণ।

অ্যাডোনিস আন্দাজ করল, ওলসন যোগাযোগ করেছে কোনও

রিসেপশনিস্টের দপ্তরে। ডিপার্টমেন্ট অভ ডিফেন্সের ফোন-বুকে যে-কেউ পাবে ওই নম্বর। অ্যাডোনিসের মোবাইল ফোনের স্পিড-ডায়ালেও ওই নম্বর আছে।

'তা যাই হোক, তারা যখন বলল, ওই ট্র্যান্সমিশন ওদের না, তখন ভাবলাম, খবরের কাগজের সঙ্গে যোগাযোগ করা যেতে পারে,' বলল ওলসন।

'খবরটা দিয়েছেন বলে অনেক ধন্যবাদ,' বলল অ্যাডোনিস।

প্রকাণ্ড ঘরের কোণে একটা কন্সোলের সামনে পৌঁছে গেছে ওরা। ডেস্কের উপর দুটো স্ক্রিন, নীচে একটা কি-বোর্ড। স্ক্রিনের পাশে ব্রডকাস্ট কোয়ালিটি রিল-টু-রিল রেকর্ডিং মেশিন।

'শুনতে চান ওই বার্তা?' বলল ওলসন, রিল-টু-রিল রেকর্ডিং মেশিনের প্লে বাটনে বুড়ো আঙুল রেখেছে।

'নিশ্চয়ই।'

সুইচ টিপে দিল ওলসন, ঘুরতে শুরু করল রিল।

প্রথমে কিছুই শুনল না অ্যাডোনিস, চলছে শুধু স্ট্যাটিক। দুই মিনিট পর ওলসনের দিকে চাইল। গাধাটা ভুল রিল চালু করল?

'আসবে আসবে, ধৈর্য ধরুন,' বলল ওলসন।

আরও কিছুক্ষণ স্ট্যাটিক হওয়ার পর হঠাৎ শুরু হলো কথা:

'...কপি, ওয়ান-টু-ফাইভ-সিক্স-ওয়ান-সিক্স...'

'...আয়োনোস্ফেরিক সমস্যায় যোগাযোগ হারিয়ে...'

'...সামনের দল...'

'...মাসুদ রানা...'

'...মাইনাস সিক্সটি-সিক্স পয়েন্ট ফাইভ...'

'...সোলার ফ্লেয়ার বারোটা বাজাচ্ছে রেডিয়োর...'

'...ওয়ান-ফিফটিন, টোয়েন্টি মিনিট্স্, টুয়েলভ সেকেণ্ড ইস্ট...'

'...কী করে...' কড়কড় করছে। '...চলে যাও, যাতে...'

'...রওনা হয়েছে দ্বিতীয় টিম...'

বিরক্তির চোটে চোখ বুজে ফেলল অ্যাডোনিস ক্যাসেডিন। খামোকা ওকে ডেকেছে গাধাটা। মিলিটারিদের অসম্পূর্ণ কিছু বার্তা দিয়ে ও কী করবে?

বার্তা থেমে গেছে। চোখ খুলল অ্যাডোনিস, দেখল ওর মুখের দিকে আগ্রহ নিয়ে চেয়ে আছে লোকটা। আশা করছে, তার আবিষ্কার থেকে দারুণ কিছু বেরিয়ে আসবে। লোকটা আছে মরা মরুভূমির ভিতর, মানুষ হিসাবে আসলে তেমন কেউ নয়। এমন অনেক মানুষ আছে, এদের কারও কোনও দাম নেই। সে বোধহয় আশা করছে, দ্য ওয়াশিংটন পোস্টে তার নাম ছাপা হবে। মানুষটার জন্য খারাপই লাগল অ্যাডোনিসের। আস্তে করে শ্বাস ফেলল সে। অনিচ্ছাসত্ত্বেও শার্ট পকেট থেকে কাগজ-কলম বের করল।

'আরেকবার শোনাতে পারেন রিলটা?'

প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ে রিওয়াইণ্ড বাটন টিপল ওলসন। একটু পর রিল প্লে করল।

চুপচাপ নোট নিতে শুরু করল অ্যাডোনিস।

রানা ভাবছে, কপাল খুবই মন্দ জ্যাকুস ফিউভিলের। নিজেদের আনা বোমার আঘাতে মরেছে লোকটা। ফ্রেঞ্চরা ওই বোমা পেয়েছিল ইউনাইটেড স্টেট্স্ থেকেই। দু' দেশের গভীর বন্ধুত্বের প্রমাণ হিসাবে ন্যাটো থেকে ফ্রান্সকে দেয়া হয় ওই মাইন।

এম১৮এ১ মাইনকে সাধারণত দুনিয়াজুড়ে বলা হয় ক্লেমোর। ফুলে থাকা পোর্সেলিন বাসনের ভিতর থাকে এক শ'র বেশি বল-বেয়ারিং। সঙ্গে থাকে ছয় শ' গ্রাম সি-৪ এক্সপ্লোসিভ। ক্লেমোর আসলে ডিটেকটেবল ফ্র্যাগমেন্টেশন গ্রেনেড। যতই বিস্ফোরণ হোক, ওটার পিছনে থাকলে কোনও ভয় নেই। কিন্তু সামনে

থাকলে... কয়েক শ' টুকরো ঢুকবে শরীরে।

ক্লেমোরের বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, মাইনের সামনের দিকে লেখা থাকে: এদিকটা শত্রুর দিকে দিন।

ফ্রেঞ্চ ভাষায় লেখা ছিল: 'BRAQUEZ CE CÔTÉ SUR L'ENNEMI.' অর্থাৎ: ব্যাখায়েখ সে কোতে সুখ লেনেমি।

ইংরেজিতে ওই কথা দেখলে বুঝে নিতে হবে, আপনি আছেন ক্লেমোর মাইনের ভীষণ খারাপ দিকে।

শেষ কৌশল হিসাবে ড্রিলিং রুমে দুটো ক্লেমোর মাইন পেতেছে ফ্রেঞ্চ কমাণ্ডোরা। তাদের আশা ছিল, রানার দলের সবাই অক্কা পাবে। লোকগুলো মরবার পর তাদের পরিকল্পনার টুকরোগুলো একে একে মিলিয়েছে রানা।

ফ্রেঞ্চ কমাণ্ডো দলের নেতা নীচে এক লোককে আগেই পাঠিয়েছে। সেই লোক দরজার সামনে পেতেছে দুটো ক্লেমোর মাইন। ওই দুটোর ভিতর ট্রিপ-ওয়ায়ার সংযোগ করা ছিল। এরপর বাধ্য হয়ে পিছাতে শুরু করেছে, এমন এক ভঙ্গি নিয়ে ড্রিলিং রুমে ঢুকে পড়ত কমাণ্ডো দল। রানার দল আগেই জানে, ড্রিলিং রুম থেকে বেরুতে পারবে না তারা। কোণঠাসা হয়ে গেছে শত্রুরা। চেঁচিয়ে সারেণ্ডার করবে।

তাদের পিছনে ছুটে যাবে রানার দলের সবাই।

আর ট্রিপ-ওয়ায়ারে পা পড়তেই— ব্যস, ভিঢ়িম!

খুব সহজ ফাঁদ পেতেছে ফ্রেঞ্চরা। ওই এক চালেই সব গুটি উল্টে যেত। চতুরতার সঙ্গে কাজটা করেছে তারা, পিছাতে শুরু করেছে। যে-কেউ বুঝবে, তাদেরকে হার মানতেই হবে। কারও মনে হবে না, আসলে ফ্রেঞ্চরা দুর্দান্ত কাউন্টার-অ্যাটাক করছে।

কিন্তু একটা কথা জ্যাকুস ফিউভিল বোঝেনি, কংকেভ মাইনের ফাঁদ পাতার সময় রানার দলের কেউ ঢুকে পড়তে পারে ঘরে। সে যদি ফ্রেঞ্চ কমাণ্ডোকে ঠেকিয়ে দেয়, সেক্ষেত্রে তাদের আর কোনও

ভরসা থাকে না।

নাজমুলের কাজ দেখে খুশি হয়ে সবাই মিলে ওর পিঠ চাপড়ে লাল করে দিয়েছে।

কর্পোরাল কোনও হাতাহাতির ভিতর যায়নি, এক ঢিলে দুটো পাখি ঝোলার ভিতর পুরেছে। ফ্রেঞ্চ কমাণ্ডো মারা যাওয়ার পর মাত্র একটা জিনিস পাল্টে দিয়েছে নাজমুল।

ক্লেমোর মাইনের মুখ ঘুরিয়ে দিয়েছে।

জ্যাকুস ফিউভিল যখন ড্রিল রুমের ভিতর থেকে নাজমুলকে দেখল, এরপর তার চোখ পড়ল ভয়ঙ্কর এক দৃশ্যের উপর। ক্লেমোর মাইন চেয়ে আছে তার দিকেই!

আর ঠিক তখন ট্রিপ-ওয়ায়ারে পা রাখল নাজমুল। এরপর কী হয়েছে জ্যাকুস ফিউভিল জানে না।

এর ফলে শেষ হয়েছে দীর্ঘ একটা লড়াই।

একঘণ্টার ভিতর বেশিরভাগ মৃতদেহ খুঁজে বের করা হলো।

জ্যাকুস ফিউভিল শেষ। এ ছাড়া তিমির হামলায় মরেছে চার ফ্রেঞ্চ কমাণ্ডো। আমেরিকান মেরিনের কর্পোরাল টনি কেলগ ও জর্জ মারফি মারা গেছে। হলিডের লাশ পাওয়া গেল না, ওটা নিয়ে গেছে তিমি। সব মিলে আট ফ্রেঞ্চ কমাণ্ডোর লাশ পড়ে ছিল আইস স্টেশনের নানান জায়গায়।

আমেরিকান মেরিন ও বাংলাদেশ আর্মির সব মিলে দু'জন গুরুতর ভাবে আহত। নিশাত সুলতানার এক হাঁটু কেটে নিয়ে গেছে খুনি তিমি। সবাই ভেবেছিল লড়াই শুরু হওয়ার সময় মরেছে কেভিন হাক্সলে, পরে দেখা গেল এখনও বেঁচে আছে সে।

কেভিন হাক্সলের চেয়ে অনেক সুস্থ নিশাত, এখনও জ্ঞান আছে ওর। অন্য হাত-পা ঠিকভাবেই নাড়ছে। থেমে গেছে রক্ত পড়া, ব্যথাও নেই মেথাডনের গুণে। এখন ওর শেষ শত্রু হয়ে

উঠতে পারে শক। ঠিক করা হয়েছে, আপাতত পর্যবেক্ষণের জন্য ই-ডেকে, গুদাম-ঘরেই রাখা হবে নিশাতকে। এখন সরাতে গেলে জ্ঞান হারাতে পারে।

এদিকে কমবয়সী মেরিন ডুবে গেছে ট্রমার ভিতর, কোনও জ্ঞান নেই। রানা এবং ওর দল যখন কেভিনকে সরাতে চাইল, তখন বুঝেছে, এখনও বেঁচে আছে বেচারা। আসলে অমন গুরুতর আহত হলে মানুষের মগজ সমস্ত নিয়ন্ত্রণ নিজ হাতে তুলে নেয়। যতই মেথাডন বা মর্ফিন দেয়া হোক, এত বুলেট শরীরে নিয়ে সে-ব্যথা কেউ সহ্য করতে পারবে না। সেরা কাজটা করেছে মগজ, হাক্সলের সেনসারি অ্যাপারেটাস অফ করে দিয়েছে, আশা করছে, বাইরে থেকে কেউ সাহায্য করবে।

এখন জরুরি হয়ে উঠেছে একজন ডাক্তার পাওয়া।

নার্সের কাজ জানে নিশাত, কিন্তু নিজেই তো পা হারিয়ে পঙ্গু হতে বসেছে। মেরিনদের সঙ্গে মেডিক হিসাবে ছিল হলিডে সিম্পসন, সে-ও চলে গেছে সবার ধরাছোঁয়ার বাইরে।

এইমাত্র ই-ডেকে নিশাতকে দেখে এসেছে রানা, এখন হাঁটছে এ-ডেকের ক্যাটওয়াকে। ডাইনিং রুমের দরজায় থামল, জিজ্ঞেস করল, 'কী করছ, নাজমুল?'

ঘরের ভিতর কেভিন হাক্সলের উপর ঝুঁকে পড়েছে নাজমুল। টেবিলের উপর চিত হয়ে পড়ে আছে আমেরিকান ছেলেটা। মেঝের উপর গড়িয়ে পড়ছে রক্ত, দেখতে না দেখতে জমাট বরফ হয়ে উঠছে।

কাজ থেকে চোখ তুলে চাইল নাজমুল। হতাশ হয়ে মাথা নাড়ল। বড় করে শ্বাস ফেলে বলল, 'রক্ত পড়া থামাতে পারছি না। শরীরের ভিতর অনেক জখম। গোটা পেট ছিঁড়েখুঁড়ে গেছে।' কপাল থেকে ঘাম মুছল ও। চোখের উপর দেখা দিল রক্তের সরু রেখা। আস্তে করে বলল, 'আমি আর কিছু করতে পারব না, স্যর।

এখনই ওর ডাক্তার দরকার।'

নিথর ছেলেটির দিকে চাইল রানা। কয়েক মুহূর্ত পর বলল, 'যতটা পারো করো।' ঘর থেকে বেরিয়ে এল ও।

'ঠিক আছে, এবার মন দিয়ে শোনো সবাই,' বলল রানা। 'আমাদের হাতে খুব বেশি সময় নেই। কাজেই সংক্ষেপে বলছি।'

ই-ডেকে পুলের পাশে রানাসহ হাজির হয়েছে সুস্থ ছয়জন যোদ্ধা। ফাঁকা উইলকক্স আইস স্টেশনের ভিতর গমগম করে উঠল রানার কণ্ঠ, 'মনে রেখো, ফ্রেঞ্চরা যখন হামলা করেছে, ধরে নিতে পারো, অন্যরাও আসবে। তারা এতক্ষণে যথেষ্ট সময় পেয়েছে। এবার আসতে পারে ফুল স্কেল অ্যাটাক। এখন যে দলই আসুক, তারা ফ্রেঞ্চদের চেয়ে অনেক বেশি প্রস্তুতি নিয়ে আসবে। আরও অনেক অস্ত্র থাকবে তাদের কাছে। ...কারও কিছু বলার আছে?'

'আমার কিছু বলার নেই, স্যর,' বলল সার্জেন্ট হোসেন আরাফাত দবির।

'একই কথা আমার,' বলল গানারি সার্জেন্ট ভাইপার।

বাংলাদেশ আর্মির সার্জেন্ট দবির এবং মেরিনদের গানারি সার্জেন্ট পল সিংগার দলে সবচেয়ে বয়স্ক। ওরা বুঝেছে, ঠিকই বলছে মেজর মাসুদ রানা।

আর কেউ কিছু বলছে না। রানা বলল, 'ঠিক আছে, এবার শুনুন, সার্জেন্ট জনি ওয়াকার...'

'জী, মেজর।'

'আপনি গিয়ে হোভারক্রাফট দুটোর রেঞ্জফাইণ্ডার ঘুরিয়ে দিন স্টেশনের বাইরের দিকে। দুটোর মধ্যে যেন গ্যাপ না পড়ে। শুধু ট্রিপ-ওয়ায়ার দিয়ে কিছুই হবে না। এখন থেকে রেঞ্জফাইণ্ডার কাজে লাগবে। স্টেশনের পঞ্চাশ মাইলের ভিতর কেউ এলেই

জানতে চাই।'

'বুঝতে পেরেছি,' বলল সার্জেন্ট ওয়াকার।

'আপনি যখন উপরে থাকবেন, চেষ্টা করবেন রেডিয়ো দিয়ে ম্যাকমার্ডোর সঙ্গে যোগাযোগ করতে,' বলল রানা। 'জানতে হবে কখন আসবে রিইনফোর্সমেন্ট। এতক্ষণে ম্যাকমার্ডোয় পৌঁছে যাওয়ার কথা আমেরিকান সৈনিকদের।'

'বুঝেছি,' রওনা হয়ে গেল ওয়াকার।

'মোরশেদ...' বলল রানা।

'বলুন, মাসুদ ভাই।'

'তোমার কাজ ইরেজার বা ডিলে সুইচ খুঁজে বের করা। এই স্টেশনের উপর থেকে শুরু করে নীচ পর্যন্ত সবখানে খুঁজবে। ওটার ভিতর কোনও সুইচ থাকবে। ফ্রেঞ্চদের কোনও না কোনও চালাকি থাকতেই পারে, খুঁজে বের করো সেটা।'

'জী, মাসুদ ভাই,' কাছের রাং-ল্যাডারের দিকে চলল লেফটেন্যান্ট গোলাম মোরশেদ।

'গানারি সার্জেন্ট ভাইপার...'

'স্যর।'

'ডাইভিং বেল উঁচু করা বা নামানোর উইঞ্চের কাছে চলে যান। ওটার কন্ট্রোল প্যানেল সি-ডেকের অ্যালকোভে। লড়াইয়ের সময় গ্রেনেডের আঘাতে কন্ট্রোল প্যানেল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। যত দ্রুত সম্ভব উইঞ্চ চালু করতে হবে। ...আপনি ওটা মেরামত করতে পারবেন?'

'আশা তো করি পারব, স্যর।' বিদায় নিল গানারি সার্জেন্ট ভাইপার।

রানার সামনে রয়ে গেল মাত্র দু'জন— সার্জেন্ট হোসেন আরাফাত দবির ও লেফটেন্যান্ট তিশা করিম।

'দবির, তিশা, আপনারা ডাইভ গিয়ার তৈরি রাখুন। তিনজন

ডাইভার নামবে পুলে। কাজেই চার ঘণ্টা ডাইভ কমপ্রেশন চাই। লো-অডিবিলিটি গিয়ার ব্যবহার করবেন। পরে লাগতে পারে, সেজন্য অগযিলারি রাখবেন।'

'এয়ার মিক্স?' জানতে চাইল সার্জেন্ট দবির।

'স্যাচিউরেটেড হিলিয়াম-অক্সিজেন, নাইনটি-এইট টু টু,' বলল রানা।

কয়েক মুহূর্ত চুপ রইল হোসেন আরাফাত দবির ও তিশা করিম। ৯৮%.হিলিয়াম ও ২% অক্সিজেনের মিশ্রণ খুব কমই করা হয়। অক্সিজেনের এত কম ব্যবহার থেকে বোঝা যায়, অনেক গভীরে ডাইভ দেয়া হবে।

তিশা ও দবিরের হাতে এক মুঠো নীল ক্যাপসুল দিল রানা। জিনিসটা এন-৬৭ডি অ্যান্টি-নাইট্রোজেন ব্লাড-প্রেশার ক্যাপসুল। আমেরিকান নেভি ওটা ব্যবহার করে ডিপ-ডাইভ মিশনে। রওনা হওয়ার আগে ম্যাকমার্ডো স্টেশন চিফের কাছ থেকে পেয়েছে রানা এ-জিনিস। মিলিটারি ডাইভাররা আদর করে এই ক্যাপসুলের নাম দিয়েছে 'পিল'।

গভীর পানিতে নামবার সময় রক্তের বাড়তি নাইট্রোজেন দূর করে, ঠেকিয়ে দেয় ডুবুরিদের ডিকমপ্রেশন সিকনেস বা বেণ্ড। রক্তের ভিতর নাইট্রোজেন দূর করে বলে নেভি এবং মেরিন কর্পস ডুবুরিরা অনেক সহজে নেমে যেতে পারে, তাদের নাইট্রোজেন নারকোসিসের ভয় থাকে না। আবার উঠতে গিয়ে ডিকমপ্রেশন স্টপ বা বাড়তি সময়ও দিতে হয় না। আমেরিকা ও অন্যান্য উন্নত দেশ এই বিপ্লবী পিল মিলিটারি ডিপ-ডাইভে ব্যবহার করে।

'ডিপ ডাইভিং?' নীল ক্যাপসুল থেকে চোখ তুলে রানার দিকে চাইল তিশা।

আস্তে করে মাথা দোলাল রানা। 'আমাদের জানতে হবে ওই গুহার ভেতর কী আছে।'

সতেরো

বি-ডেকের বাইরের সুড়ঙ্গ ধরে হাঁটছে মাসুদ রানা, ডুবে আছে গভীর ভাবনায়। ওর মনে হচ্ছে, খুব দ্রুত সব ঘটতে শুরু করেছে।

উইলকক্স আইস স্টেশনে ফ্রেঞ্চ হামলা জোর ঝাঁকি দিয়েছে ওকে। ভাল করেই বুঝেছে, এই স্টেশনের নীচে কী আছে, ওর জানতেই হবে। কী লুকিয়ে আছে এই স্টেশনের নীচে? যাই থাক, সেজন্য নিরপরাধ মানুষ মারতে একটুও দ্বিধা করেনি ফরাসি সরকার।

ফ্রেঞ্চ কমাণ্ডোরা জিনিসটা কেড়ে নিতে এসেছে এবং হেরে গেছে। কিন্তু সেজন্য নিশ্চিন্ত হওয়ার কোনও কারণ নেই। এবার অন্য কোনও দেশ তাদের কমাণ্ডো পাঠাতে পারে। তা যদি হয়, ফুল স্ট্রেংথ ইউএস ফোর্স পৌঁছবার আগেই উইলকক্স আইস স্টেশনের ওপর আবারও হামলা আসবে।

আগামী কয়েকটা ঘণ্টা খুবই বিপজ্জনক সময়।

ওর ভুল না হয়ে থাকলে, একাধিক দেশের মিলিটারি আসছে উইলকক্স আইস স্টেশনের দিকে।

এখন প্রশ্ন: আমেরিকান রিইনফোর্সমেন্ট আগে আসবে, না তার আগেই হাজির হবে অন্য কোনও দেশের সশস্ত্র বাহিনী?

সেক্ষেত্রে মাত্র এই কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে কী করতে পারবে মাসুদ রানা?

এ নিয়ে বেশি ভাবতে চাইছে না। এমনিতেই অনেক কাজ পড়ে আছে। অবশ্য অন্যসব কাজের ভিতর এখন খুব দ্রুত একটা কাজ সারতে হবে।

ফ্রেঞ্চদের সঙ্গে লড়াইয়ের পর উইলকক্স আইস স্টেশনে রয়ে গেছে পাঁচ বিজ্ঞানী। তাদের তিনজন পুরুষ, দু'জন মহিলা— এরা সবাই আশ্রয় নিয়েছে বি-ডেকের লিভিং কোয়ার্টারে। এখন ওদিকেই চলেছে রানা, মনে আশা: ওই পাঁচজনের ভিতর হয়তো ডাক্তার থাকতে পারে। সে চিকিৎসা ও শুশ্রূষা দিতে পারবে কেভিন হাক্সলেকে।

বাঁকা টানেলে হেঁটে চলেছে রানা, এখনও পোশাক থেকে টপটপ করে পানি পড়ছে। ভীষণ শীত লাগছে, কিন্তু পাত্তা দিচ্ছে না। মেরিনদের সঙ্গে এসেছে বলে ওদের সবাইকে ফেটিগের নীচে থারমাল ওয়েটসুট দেয়া হয়েছে। আর্কটিক পরিবেশে প্রতিটি দেশের রিকন ইউনিটের সদস্যরা ওই পোশাক ব্যবহার করে। লং-জনের চেয়ে অনেক গরম ওয়েটসুট, তা ছাড়া, ভিজে গেলেও ভারী হয়ে ওঠে না। কম ওজন বহন করা রিকন ইউনিটের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, ওয়েটসুট বয়ে নেয়ার চেয়ে পরে থাকাই অনেক সোজা।

হঠাৎ রানার ডানদিকে খুলে গেল একটা দরজা, ওদিক থেকে ভাসতে ভাসতে আসছে বাষ্প। পিচ্ছিল কালো কী যেন বেরিয়ে এল করিডোরে, থামল রানার সামনে।

লিলি।

পানিতে ভিজে চুপচুপ করছে ওটা। হাসি-হাসি ভঙ্গি করে রানার দিকে চাইল। ওদিকটা শাওয়ার রুম, বাষ্পের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল মেরি ভিসারও। রানাকে দেখেই মিষ্টি করে হাসল।

'হাই,' বলল। এখন ওর পরনে শুকনো পোশাক। একটু এলোমেলো মাথার চুলগুলো। রানা আঁচ করল, গরম শাওয়ার

নিয়েছে মেরি।

'হাই,' মৃদু হাসল রানা।

'শাওয়ার রুম খুব ভালবাসে লিলি,' সিলটার দিকে ইশারা করল মেরি। 'বাষ্পের ভিতর পিছলে গেলে খুব ফুর্তি ওর।'

কুচকুচে কালো, ছোট্ট গেযেলা সিলের দিকে চাইল রানা, ওটা থেমেছে ওর পায়ের সামনে। দেখতেই মনে হলো একটু আদর করে দেয়া উচিত। তা ছাড়া, এই সিল ওর প্রাণ বাঁচিয়েছে। নরম চাহনির বাদামি চোখে বুদ্ধির পরিষ্কার ছাপ।

মেরির দিকে চাইল রানা। 'এখন সুস্থ বোধ করছ?'

'শুকনো পোশাক পরার পর এখন আর খারাপ লাগছে না,' বলল মেরি।

আস্তে করে মাথা দোলাল রানা। পুলের ভিতর ভীষণ ভয় পেয়েছিল মেয়েটা, সেই ভয় কাটিয়ে খুব দ্রুতই সামলে নিয়েছে। বাচ্চারা এমনই হয়, দ্রুত শিখতে যেমন পারে, ভুলতেও পারে। অত উপর থেকে পুলের ভিতর পড়েছে! ওর মত করে তিমির তাড়া খেলে মানসিক রোগী হয়ে উঠত বয়স্ক কেউ।

মেরি যে হাসি-খুশি আছে সেজন্য মনে মনে সার্জেন্ট দবিরের প্রশংসা করল রানা। ও নিজে যখন পুলের ভিতর মেরির হাতে ম্যাগহুক ধরিয়ে দিল, আর মেয়েটি উঠে গেল উপরের দিকে, তারপর থেকে বাকি লড়াইয়ের সময় সর্বক্ষণ ওকে নিজের পাশে রেখেছে দবির। মেরির কোনও ক্ষতি হতে দেয়নি।

'গুড,' বলল রানা। 'তুমি আসলে কিছুই ভয় পাও না, তাই না? বড় হলে মেরিন হতে পারো।'

'আপনি কি মেরিন?' জানতে চাইল মেরি, চিকচিক করছে চোখদুটো।

'না।' মাথা নাড়ল রানা। 'আমি অন্য দেশের সৈনিক।'

'কিন্তু সোলজার।'

'তা ঠিক।'

'আমি ঠিক আপনার মত মানুষ হতে চাই।'

'তুমি ওদিকে যাবে?' সামনের দিক ইশারা করল রানা।

'হ্যাঁ, যাব,' রানার পাশে হাঁটতে শুরু করল মেরি। টানেলের মেঝেতে থপথপ করে পিছু নিয়েছে লিলি।

'আপনি কোথায় চলেছেন?' জানতে চাইল মেরি।

'তোমার মাকে খুঁজছি।'

'ওহ্,' একটু মিইয়ে যাওয়া স্বরে বলল মেরি।

পরিবর্তনটা খেয়াল করেছে রানা, ওর পাশে মেঝের দিকে চেয়ে হাঁটছে মেরি। হঠাৎ করে মেয়েটার মন খারাপ হলো কেন?

অস্বস্তিকর নীরবতা নেমেছে দু'জনের মাঝে। রানা ভাবতে শুরু করেছে কী বলা যায়। কয়েক সেকেণ্ড পর বলর, 'হ্যাঁ, কত যেন বলেছিলে তোমার বয়স? বারো?'

'হ্যাঁ।'

'তা হলে সেভেনে পড়ো?'

'হ্যাঁ।'

'আচ্ছা, সেভেন,' আর কিছুই মাথায় আসছে না, নিজের উপর রেগেই গেল রানা। এক মুহূর্ত পর বলল, 'তা হলে তো ক্যারিয়ার নিয়ে ভাবার সময় হয়ে গেছে।'

রানার কথা শুনে গভীর ভাবে ভাবতে শুরু করেছে মেরি, হাঁটতে হাঁটতে রানার দিকে চাইল। 'হ্যাঁ,' বলল গম্ভীর সুরে। যেন সত্যি ওর বারো বছর বয়সী মনে এ নিয়ে অনেক চিন্তা জড় হয়েছে। 'আমি ঠিক করেছি শিক্ষক হব,' বলল। 'আমার বাবার মত। আবার আপনার মত ভাল মানুষও হতে চাই।'

'তোমার বাবা কী পড়ান?'

'বস্টনের বড় একটা কলেজে জিয়োলজি,' বলল মেরি। এবার গম্ভীর ভাবে বলল, 'কলেজের নাম হার্ভার্ড।'

'তুমি নিজে কি পড়াতে চাও?' জানতে চাইল রানা।

'অঙ্ক।'

'অঙ্ক?'

'আমি অঙ্কে ভাল,' বলল মেরি। শ্রাগ করল, একইসঙ্গে বিব্রত ও গর্বিতা।

'আমার বাবা হোমওয়র্কের সময় সাহায্য করতেন,' বলল মেরি। 'উনি বলতেন, বয়সের তুলনায় অনেক বেশি অঙ্ক বুঝি আমি। তাই আমাকে অঙ্ক পড়াতেন, সমবয়সীরা এখনও ওসব অঙ্ক চোখেও দেখেনি। দারুণ ইন্টারেস্টিং সব অঙ্ক। আরও কয়েক বছর পর ওগুলো শেখার কথা। বাবা এমন সব অঙ্ক শিখিয়েছেন, যেগুলো কোনও স্কুলে পড়ানোই হয় না।'

'তাই?' আগ্রহী হয়ে বলল রানা, 'কী ধরনের অঙ্ক সেগুলো?'

'আপনি মনে হয় জানেন— পলিনোমিয়াল, নাম্বার সিকিউয়েন্স, কিছু ক্যালকুলাস।'

'ক্যালকুলাস... নাম্বার সিকিউয়েন্স...' অবাক হয়ে গেল রানা।

'যেমন ধরুন ট্রায়াঙ্গুলার নাম্বার ও ফিবোনাচি নাম্বার, এইসব আর কী।'

অবাক বিস্ময় নিয়ে মাথা নাড়ল রানা, বাব্বা, অনেক শিখেছে পিচ্চি মেয়ে। ওর বয়স মাত্র বারো, অন্যদের তুলনায় একটু খাটো, কিন্তু দারুণ চালু ওর মগজ। আবারও মেরির দিকে চাইল রানা, পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে প্রায় নাচতে নাচতে চলেছে ও। মনেই হয় না সাধারণ কোনও বাচ্চা মেয়ে নয়।

'আমরা দুজন একসঙ্গে অনেক অঙ্ক করতাম,' বলল মেরি। 'আরও কত কিছু। সফটবল, হাইকিং, এমন কী একবার আমাকে স্কুবা ডাইভিঙে নিয়ে গিয়েছিল বাবা। অথচ, তখনও ওই কোর্স আমি করিইনি।'

'তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে, তোমার বাবা এখন আর এসব

করেন না,' বলল রানা।

জবাব দিচ্ছে না মেরি, নীরব হয়ে গেছে। কিছুক্ষণ পর বলল, 'না আর করেন না।'

'কেন করেন না?' আস্তে করে জানতে চাইল রানা। ভাবছে, এবার শুনতে পাবে মেরির বাবা-মা সর্বক্ষণ ঝগড়া করতেন, শেষে ডিভোর্সই হয়ে গেল। আজকাল এসব খুব চলে। এমন কী বাংলাদেশেও।

'গতবছর গাড়ি দুর্ঘটনায় মারা গেছেন বাবা,' মৃদু স্বরে বলল মেরি।

কথাটা শুনে হঠাৎ করেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল রানা। চাইল মেরির দিকে। বাচ্চা মেয়েটির চোখ জুতোর ফিতার উপর।

'আমি সত্যিই দুঃখিত, মেরি,' নরম স্বরে বলল রানা।

মাথা কাত করল মেরি। 'না, ঠিক আছে।' আবার হাঁটতে শুরু করেছে।

বাইরের দিকের টানেলে দেয়ালের ভিতর অংশে একটা দরজা বসানো, ওখানে পৌঁছে গেছে রানা ও মেরি।

'আমি এখানেই থামব,' বলল রানা।

'আমিও,' বলল মেরি।

নব মুচড়ে দরজা খুলে ফেলল রানা, আগে ঢুকতে দিল মেরিকে। ওর পর লিলি। ওদের পিছনে ঘরে ঢুকল রানা।

যে ঘরে ঢুকেছে, সেটা কোনও কমন-রুম। বিশ্রী কটকটে কমলা রঙের কয়েকটা সোফা, একপাশে স্টেরিয়ো, টেলিভিশন ও ডিভিডি। রানা বুঝতে পারছে, এরা নিয়মিত টিভি সিগনাল পায় না। বাধ্য হয়ে টিভিতে ডিভিডির সিনেমা বা অন্য অনুষ্ঠান দেখে।

কমলা এক কাউচে বসেছে নিনা ভিসার ও রাফায়লা ম্যাকানটায়ার। দু'জনের পরনে এখন শুকনো পোশাক। অন্যদিকের কাউচে তিনজন লোক। এরা সবাই উইলকক্স আইস

স্টেশনের বিজ্ঞানী। আগেই লোকগুলোর নাম জেনে নিয়েছে রানা। তারা: হ্যাভেনপোর্ট, টমসন ও হ্যারি। ফ্র্যাগমেন্টেশন গ্রেনেডের আঘাতে কর্পোরাল টনি কেলগের কী হয়েছে, তা দেখবার পর কেউ ঘর থেকে বেরুবার সাহস করেনি। সবাইকে ক্লান্ত ও হতাশ মনে হলো।

কাউচের কাছে গিয়ে নিনা ভিসারের পাশে বসল মেরি। নীরব হয়ে গেছে, মাকে কিছুই বলল না। রানার মনে পড়ল, ফ্রেঞ্চ হামলা শুরু হওয়ার আগে প্রথমবার এই মা-মেয়েকে একসঙ্গে দেখেছিল। তখনও তেমন কোনও কথা বলেনি মেরি। দু'জনের ভিতর কোনও রাগারাগি ছিল, তাও মনে হয়নি। কিন্তু এখন টের পেল, আড়ষ্ট হয়ে উঠেছে তারা। মন থেকে চিন্তাটা দূর করতে চাইল রানা, নিনা ভিসারের সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

'আপনাদের ভিতর কোনও চিকিৎসক আছেন?' জানতে চাইল রানা।

মাথা নাড়ল নিনা ভিসার। 'না। বব থর্নিক্রাফট ছিল স্টেশনের একমাত্র ডাক্তার। কিন্তু সে তো...' চুপ হয়ে গেল সে।

'কী?'

বড় করে শ্বাস ফেলল নিনা। 'সে ছিল হোভারক্রাফটে। কথা ছিল ওই গাড়ি যাবে ডুমো ডি'খ-ঈলেখে।'

ধীরে মাথা দোলাল রানা। টের পেল, আবারও রেগে গেছে। পাঁচ বিজ্ঞানীকে উদ্ধারের নাম করে নিয়ে গিয়ে মেরে ফেলেছে ফ্রেঞ্চ কমাণ্ডোরা।

ওর হেলমেট ইন্টারকমে কণ্ঠ শুনল: 'মেজর রানা, সার্জেন্ট জনি ওয়াকার বলছি।'

'বলুন।'

'আপনার কথামত স্টেশনের বাইরের দিকে রেঞ্জফাইণ্ডার তাক করেছি। আপনি কি এসে দেখবেন?'

'হ্যাঁ, আসব,' বলল রানা। 'কয়েক মিনিট পর। আপনি কোথায়?'

'দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে।'

'ওখানেই অপেক্ষা করুন। ম্যাকমার্ডোয় রেডিয়ো করতে পেরেছেন?'

'এখনও চেষ্টা চালাচ্ছি। কিন্তু প্রতিটা ফ্রিকোয়েন্সির ভিতর জট্ পাকিয়ে গেছে। যোগাযোগ করতে পারছি না।'

'চেষ্টা করতে থাকুন,' বলল রানা। 'একটু পর আসছি।'

কমন রুম থেকে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য ঘুরে দাঁড়াল রানা, দরজার কাছে চলে গেছে, এমন সময় কে যেন ওর কাঁধে টোকা দিল। ঘুরে দাঁড়াল রানা। নিনা ভিসার। হাসছে মহিলা।

'এইমাত্র মনে পড়ল,' বলল। 'স্টেশনে মেডিকেল ডাক্তার আছে।'

লড়াই শেষ হওয়ার পর দুই ফ্রেঞ্চ বিজ্ঞানী ম্যাথিউ ফ্যেনুয়্যা ও স্যাঁ ডেনি পেঁয়েযিকে পাওয়া গেছে ডাইনিংরুমের এক কাবার্ডে। প্রাণের ভয়ে লুকিয়ে ছিল লোকদুটো। তারা কোনও বাধা দেয়ারও চেষ্টা করেনি। অনানুষ্ঠানিক ভাবে ঘাড় ধরে কাবার্ড থেকে বের করা হয়েছে, ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়া হয়েছে মেঝের উপর। লোকদুটোর মুখে ফুটে উঠেছিল ভীষণ ভয়। ভুল দলের হয়ে কাজ করেছে তারা। যাদেরকে মেরে ফেলতে চেয়েছে, তারাই এখন বন্দি করেছে ওদেরকে। কাজেই ধরে নিয়েছে, এবার যে-কোনও সময়ে বিশ্বাসঘাতকার জন্য চরম শাস্তি পাবে। মেরে ফেলা হবে তাদেরকে।

তারপর যখন দেখল, তাদের দুই হাতে হ্যাণ্ডকাফ আটকে দেয়া হয়েছে, তাতে একটু স্বস্তি পেয়েছে। ঘাড় ধরে আবারও দাঁড় করানো হয়েছে, ধাক্কা দিয়ে বের করা হয়েছে ডাইনিংরুম থেকে।

এরপর তাদেরকে নামিয়ে আনা হয়েছে ই-ডেকে। একটা খুঁটির সঙ্গে তাদের হ্যাণ্ডকাফ আটকে দেয়া হয়েছে। অনেক কাজ পড়ে আছে, কাজেই রানা চায়নি ওর কোনও লোক এদেরকে পাহারা দিতে বাধ্য হোক। সময় নেই ওদের হাতে। ফ্রেঞ্চ বিজ্ঞানীদের প্ল্যাটফর্মে যেখানে দাঁড় করিয়ে দেয়া হয়েছে, সেটা চারপাশ থেকে দেখা যায়। কাজের ফাঁকে তাদের উপর চোখ রাখতে পারবে সবাই।

বি-ডেকের ভাঙা ক্যাটওয়াকে বেরিয়ে এসেছে রানা, হেলমেট মাইকে কিছু বলবে, এমন সময় ক্যাটওয়াকে ওর পিছনে এসে দাঁড়াল নিনা ভিসার। একটু ইতস্তত করে বলল, 'একটা কথা বলতে চাই আপনাকে। কমন রুমে জিজ্ঞেস করতে পারিনি।'

হাতের ইশারায় একটু অপেক্ষা করতে বলে হেলমেট মাইকে বলল রানা, 'নাজমুল। রানা। হাক্সলে কেমন আছে?'

ইয়ারপিসে ভেসে এল নাজমুলের কণ্ঠ: 'আপাতত রক্ত থামাতে পেরেছি। কিন্তু স্যর, আর কিছুই করতে পারব না। যে-কোনও সময়ে মরবে।'

'এখন কি স্টেবল?'

'মনে তো হয়, স্যর।'

'ঠিক আছে, শোনো। তুমি ই-ডেকে নামবে, ওখানে আটকে রাখা হয়েছে দুই ফ্রেঞ্চ বিজ্ঞানীকে। তাদের একজন ম্যাথিউ ফ্যেনুয়্যা, তাকে ছুটিয়ে আনবে।' কথার ফাঁকে নিনা ভিসারের দিকে চাইল রানা। 'জানতে পারলাম, মোঁসিউ ফ্যেনুয়্যা আসলে দক্ষ সার্জেন।'

'ঠিক আছে, স্যর,' তাড়াতাড়ি করে বলল নাজমুল। হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছে। এবার সত্যিকারের কোনও ডাক্তার চিকিৎসা করতে পারবে হাক্সলের। এক মুহূর্ত চুপ করে থাকল সে, তারপর বলল, 'কিন্তু... স্যর...'

'কী, নাজমুল?'

'আমরা কি ওই লোককে বিশ্বাস করতে পারি?'

'না, পারি না,' দৃঢ় ভাবেই বলল রানা। রাং-ল্যাডারের দিকে চলেছে। উঠবে এ-ডেকে। নিনা ভিসারকে আসতে ইশারা করল। 'ফুটো পয়সা দিয়েও বিশ্বাস করবে না। নাজমুল, ওই লোককে বলবে, কেভিন হাক্সলে মরলে তাকেও মেরে ফেলা হবে।'

'ঠিক আছে, স্যর।'

রাং-ল্যাডারের উপরের ধাপে গিয়ে থামল রানা, পা রাখল এ-ডেকের ক্যাটওয়াকে। ঘুরে দাঁড়িয়ে দু' হাত ধরে নিনা ভিসারকে তুলে নিল। তখনই দেখতে পেল ডাইনিংরুম থেকে বেরিয়ে এসেছে নাজমুল, উল্টো দিকের রাং-ল্যাডারের দিকে ছুটতে শুরু করেছে। ই-ডেকে নেমে তুলে আনবে ফ্যেনুয়্যাকে।

স্টেশনের প্রধান প্রবেশ পথের দিকে চলেছে রানা ও নিনা। একবার ঘাড় ফিরিয়ে স্টেশনের ভিতর অংশ দেখে নিল রানা। চারপাশে ছড়িয়ে পড়েছে ওর দলের আর সবাই।

সার্জেন্ট জনি ওয়াকার আছে বাইরে ঝড়ের ভিতর। ই-ডেকে সার্জেন্ট দবির ও লেফটেন্যান্ট তিশা, ওরা ডাইভিঙের জন্য স্কুবা গিয়ার প্রস্তুত করছে। গানারি সার্জেন্ট আছে মাঝের সি-ডেকে, অ্যালকোভে। উইঞ্চ কন্ট্রোল ঠিক করছে। লেফটেন্যান্ট গোলাম মোরশেদকে কোথাও দেখা গেল না। সে স্টেশন ঘুরে ইরেজার খুঁজছে।

সবাই যে যার কাজে ব্যস্ত।

রানার হেলমেট ইন্টারকম খড়মড় করে উঠল। এক মুহূর্ত পর বলে উঠল গোলাম মোরশেদ।

'কিছু পেলে, মোরশেদ?'

'না, মাসুদ ভাই। স্টেশনে কোনও ইরেজার ডিভাইস নেই।'

'নেই?' ভুরু কুঁচকে গেল রানার। 'তা হয় কী করে?'

'কিচ্ছু নেই। ফ্রেঞ্চরা বোধহয় বুঝতে পারেনি এত তাড়াতাড়ি লড়তে হবে। তাই ইরেজার বসাতে পারেনি।'

রানা ভাবল, বোধহয় ঠিকই বলেছে মোরশেদ। সার্জেন্ট আরাফাত দবির খুব দ্রুত ফিরে আসতেই জানা গেল ফ্রেঞ্চরা গুলি করে মেরে ফেলেছে বিজ্ঞানীদেরকে। বিধ্বস্ত হয়েছে তাদের হোভারক্রাফট। ফ্রেঞ্চ কমাণ্ডোরা চেয়েছিল ওদের সবার বিশ্বাস অর্জন করবে, তারপর পিঠে গুলি করে মারবে। যখন তাদের সে পরিকল্পনা বিফল হলো, চট্ করে আর ইরেজার বসাতে পারেনি।

'কিন্তু একটা জিনিস পেয়েছি, মাসুদ ভাই,' বলল মোরশেদ।

'সেটা কী?'

'একটা রেডিয়ো।'

'রেডিয়ো?' শুকনো স্বরে বলল রানা। 'ওই জিনিস দিয়ে কী করত লোকগুলো?'

'সাধারণ কোনও রেডিয়ো নয়, মাসুদ ভাই। এটা ভিএলএফ। পোর্টেবল ভিএলএফ ট্র্যান্সমিটার।'

মোরশেদের কথায় পুরো মনোযোগ দিল রানা। ভিএলএফ খুবই লো ফ্রিকোয়েন্সি ট্র্যান্সমিটার। ওটার দীর্ঘ তরঙ্গ হয় তিন কিলো হার্টয থেকে তিরিশ কিলো হার্টয। ওয়েভলেংথ অনেক টানা হয়। এতই দীর্ঘ, ওই রেডিয়োর সিগনালকে বলা হয়— খুব ভারী রেডিয়ো সিগনাল। মাটি ছুঁয়ে চলে ওই তরঙ্গ। খুব শক্তিশালী ট্র্যান্সমিটার থেকে পাঠানো হয় ওই সিগনাল। সাধারণত এসব ট্র্যান্সমিটার হয় বিশাল এবং তাতে নানা ঝামেলা পোহাতে হয়। এসব কারণে আর্মি এই রেডিয়ো ব্যবহার করে না। অবশ্য, নতুন এক টেকনোলজির কারণে ছোট ভিএলএফ তৈরি করা যায়। কিন্তু ওটা হয় অনেক ভারী। শক্তিশালী লোক পিঠে নিতে পারে ওই রেডিয়ো।

এখন, উইলকক্স আইস স্টেশনে ফ্রেঞ্চরা এনেছে অমন একটা

ট্র্যান্সমিটার।

কিন্তু কেন?

ভিএলএফ রেডিয়ো সিগনাল পাঠানো হয় শুধু...

তাই বা কীভাবে হয়, ভাবল রানা। ফ্রেঞ্চরা আসলে কী চেয়েছে!

'আচ্ছা, মোরশেদ, ওটা কোথায় পেয়েছ?'

'ড্রিলিং রুমে।'

'তুমি কি এখন ওখানে?'

'জী, মাসুদ ভাই।'

'ওটা নিয়ে এসো পুল ডেকে,' বলল রানা। 'সার্জেন্ট ওয়াকারের কাজ দেখে এসে নীচে নেমে দেখব ওটা।'

'ঠিক আছে।'

ইন্টারকম অফ করে দিল রানা। ওর সঙ্গে এণ্ট্র্যান্স টানেলে ঢুকে পড়েছে নিনা ভিসার। জানতে চাইল, 'আপনি বললেন ইরেজার, ওটা কী?'

আস্তে করে শ্বাস ফেলল রানা। 'ইরেজার বলতে এক ধরনের বোমা বোঝানো হয়। ছোট কভার্ট ফোর্স লড়াইয়ে হেরে গেলে ওটা ব্যবহার করে। সঙ্গে থাকে ডিলে সুইচ। ওটা সাধারণ টাইমারের মতই কাজ করে।'

'দাঁড়ান-দাঁড়ান, আমি তো কিছুই বুঝছি না,' বলল নিনা।

বুঝিয়ে বলতে শুরু করল রানা: 'ওই ফ্রেঞ্চদের মত ছোট ক্র্যাক ইউনিট গোপনে কোনও মিশনে যেতেই পারে। কিন্তু যদি ধরা পড়ে, তাদের কারণে আন্তর্জাতিক জটিলতা তৈরি হবে। ধরুন, যদি ফ্রেঞ্চরা ইউএস রিসার্চ স্টেশনে এসে সবাইকে খুন করতে গিয়ে ধরা পড়ে যেত, তখন?'

'আমি বোধহয় বুঝতে শুরু করেছি।' রানার দিকে চেয়ে আছে মহিলা।

'কেউ নিশ্চিত হয়ে বলতে পারে না, ক্র্যাক ইউনিট সফল হবে। হয়তো তাদের চেয়ে অনেক দক্ষ একদল সৈনিক তাদেরকে মেরে ফেলল।' দেয়ালের হুক থেকে একটা পারকা নিয়ে পরতে শুরু করেছে রানা। 'আজকাল প্রায় প্রতিটি এলিট টিম— ধরুন ফ্রেঞ্চ প্যারাশুট রেজিমেন্ট, ব্রিটেনের এসএএস, ইউএসের নেভি সিল— এরা কন্টিনজেন্সি প্ল্যানে ইরেজার রাখে। ওই জিনিসের কাজ তাদের দলের সবাইকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়া। এর ফলে মনে হবে, কখনও ওদিকে যায়নি ওই দল। কোনও দল ব্যবহার করে সায়ানাইড পিল, আবার অন্যরা অন্যকিছু— কিন্তু মূল কাজ আত্মহত্যা করা।'

'তো আপনি বলছিলেন এক্সপ্লোসিভের কথা,' বলল নিনা।

'বিশেষ বিস্ফোরকের কথা,' বলল রানা। 'বেশির ভাগ সময় ইরেজার হয় ক্লোরিন-বেজড এক্সপ্লোসিভ। বা হাই-টেম্পারেচার লিকুইড ডেটোনেটার। ওগুলোর কাজ হয় সৈনিকের মুখ উড়িয়ে দেয়া, বাষ্প করে দেয়া শরীর, নষ্ট করে ফেলা ইউনিফর্ম ও ডগট্যাগ। মোট কথা, ইরেজারের মূল কাজ শত্রুপক্ষকে বুঝিয়ে দেয়া যে ওখানে কেউ ছিল না।'

'কবে থেকে এসব শুরু হয়েছে?' জানতে চাইল নিনা।

'এই তো কিছু দিন ধরে। মণ্ট্যানার পাতাল মিসাইল সাইলো স্যাবোটাজ করতে গিয়েছিল একদল জার্মান সৈনিক। তার পর থেকে।'

'ওরা কী করতে গিয়েছিল?'

'ব্যালাস্টিক নিউক্লিয়ার মিসাইলগুলো— যেগুলোর অস্তিত্ব তারস্বরে অস্বীকার করছিল আমেরিকা— সেগুলো ধ্বংস করতে। যখন বুঝল ধরা পড়তে যাচ্ছে, তিনটা লিকুইড-ক্লোরিন গ্রেনেডের পিন খুলে ফেলল। ওগুলো যখন বিস্ফোরিত হলো, ওদের কিছুই থাকল না। ওখানে কোনও জার্মান সৈনিক যায়নি, দোষও পড়ল না

কোনও দেশের উপর।'

'জার্মান স্যাবোটাজ ইউনিট, মন্ট্যানা,' অবিশ্বাস নিয়ে বলল নিনা। 'আমার যদি কোনও ভুল হয়ে থাকে, তো ধরিয়ে দেবেন— জার্মানরা না এখন আমেরিকার মিত্রপক্ষ?'

'ফ্রেঞ্চরাও তো আপনাদের বন্ধু রাষ্ট্র,' ভুরু নাচাল রানা, 'ওরা কি দোস্তি করতে এসেছিল? আসলে বেশিরভাগ সময় দেখা যায় শত্রুর চেয়ে মিত্র দেশই বেশি ক্ষতি করে। শুনেছি পেন্টাগন এর নাম দিয়েছে ক্যাসিয়াস অপারেশন্স। জুলিয়াস সিজারের খুনি ক্যাসিয়াসের নামে।'

'নামও দিয়েছে আবার?'

পারকা পরা শেষ, সদর দরজার দিকে রওনা হয়ে গেল রানা, 'আগে আমেরিকা ছিল দুই মহাপরাশক্তির একটা। তখন দুই সুপারপাওয়ারের ভিতর একটা ভারসাম্য ছিল। একে অপরকে সমঝে চলত। একদল খারাপ কিছু করতে গেলে, অন্যদল সেটা ঠেকাত। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়ন শেষ হয়ে গেল, থাকল শুধু আমেরিকা— পৃথিবীর সত্যিকারের একমাত্র সুপারপাওয়ার। আপনাদের হাতে আছে অন্য সবার চেয়ে অনেক বেশি অস্ত্র। আপনারা অস্ত্রের জন্য বিপুল অঙ্কের ডলার খরচ করছেন। অন্য কোনও দেশ এভাবে খরচ করলে ফতুর হয়ে যেত। সোভিয়েতরা প্রতিযোগিতা করতে গিয়ে নিজেদেরকে ফকির করেছে। এরপর হালুয়া-রুটির আশায় আমেরিকার অনেক বন্ধু রাষ্ট্র জুটে গেছে। কিন্তু তারা জানে, আমেরিকা অনেক বেশি শক্তিশালী, নিষ্ঠুর এবং নৃশংস। একের পর এক দেশে হামলা করছে সে। কাজেই প্রায়-সবাই চায় আমেরিকার মস্ত পতন হোক। মহাচিন তো চায়ই, পরম মিত্র ফ্রান্স, জার্মানি, এমন কী গ্রেট ব্রিটেনও চায় আমেরিকাকে হঠিয়ে ক্ষমতার স্বাদ পেতে।'

'আমি কখনও এসব ভাবিনি,' বলল নিনা।

'আসলে ভাবার প্রয়োজন পড়েনি আপনার,' বলল রানা। 'আমাকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে এই স্টেশনের বিজ্ঞানীদেরকে ম্যাকমার্ডোয় নিরাপদে পৌঁছে দেয়া। ওখান থেকে রওনা হওয়ার আগে ওই স্টেশনের চিফ অনুরোধ করেন, তাঁদের সেনাবাহিনী পৌঁছে যাওয়া পর্যন্ত যেন আমি উইলকক্স আইস স্টেশন পাহারা দিই। আমি তাঁকে কোনও কথা দিইনি। এটা আমার কর্তব্যও নয়। আমি এখানে যুদ্ধ করতে বা প্রাণ দিতে আসিনি। কিন্তু এখন যদি ফ্রেঞ্চ কমাণ্ডোদের মত করে অন্য দেশের আর্মি হাজির হয়, হয়তো বাধ্য হয়ে লড়তে হবে আমাকে।'

সদর দরজার সামনে পৌঁছে গেছে রানা, হাত রাখল হ্যাণ্ডেলের উপর। পাশ ফিরে চাইল। 'আপনি কী যেন জানতে চেয়েছিলেন। হাঁটতে হাঁটতে বললে অসুবিধে হবে?'

দরজার পাশের হুক থেকে পারকা নিল নিনা, তারপর পরতে শুরু করল। 'কোনও সমস্যা নেই।'

মহিলা গরম কাপড় পরে নিতেই দরজা খুলে বেরিয়ে এল রানা। 'আসুন।'

ই-ডেকে ডেপথ্ গজ ভালভাবে দেখে নিচ্ছে তিশা করিম। হোসেন আরাফাত দবিরও সঙ্গে রয়েছে, ওরা আছে পুল থেকে দূরে প্ল্যাটফর্মের উপর। শেম কিলার ওয়েইল চলে যাওয়ার পর পৌনে একঘণ্টা পেরিয়ে গেছে। কিন্তু যখন-তখন আবার আসতে পারে। কাজেই ওরা সতর্ক।

ইউনিটের স্কুবা গিয়ারগুলো পরীক্ষা করছে ওরা। ঠিক হয়েছে ডাইভিং বেল নিয়ে নামবে ডুবুরিরা। আপাতত ই-ডেকে ওরা দু'জন ছাড়া কেউ নেই। মাঝে মাঝে বিদায় নিচ্ছে দবির ও তিশা, চলে যাচ্ছে দক্ষিণের টানেলে, গুদাম-ঘরে। ওখানেই রাখা হয়েছে ক্যাপ্টেন নিশাত সুলতানাকে।

হাতের ডেপথ গজ নামিয়ে রাখল তিশা, আরেকটা তুলে নিল। 'কী সুন্দর কালো চোখ মানুষটার!' খুব নিচু স্বরে বলল; কাজ থেকে চোখ তুলল না।

নিজের কাজ বন্ধ করে তিশার দিকে চাইল দবির। ও যখন কোনও কথা বলল না, চোখ তুলল তিশা।

ওর মনে হলো সার্জেণ্ট লোকটা লেফটেন্যাণ্টের ওজন বুঝতে চাইছে। তারপর হঠাৎ করেই অন্য দিকে চোখ সরিয়ে নিল।

'শুনেছি আগেও সুন্দর ছিল ওঁর চোখ, কিন্তু পরে আরও সুন্দর হয়েছে,' বলল দবির। 'অনেকেই জানে না কী হয়েছিল।'

নীরবতা নেমে এসেছে দু'জনের মাঝে। পাকা একমিনিট পর জানতে চাইল তিশা, 'কী হয়েছিল?'

জবাব দিল না দবির, তারপর আস্তে করে মাথা দোলাল।

'কী হয়েছিল?'

বড় করে শ্বাস ফেলল দবির। হিলিয়াম কমপ্রেসার নামিয়ে রাখল, চাইল তিশার দিকে। 'উনি ফাইটার বিমানের খুব ভাল পাইলট।' অনুচ্চ স্বরে বলতে শুরু করল দবির: 'মেজর মাসুদ রানা একটা মিশনে গিয়েছিলেন, বসনিয়ায়। তখন সার্বদের সঙ্গে মহা যুদ্ধ চলছিল। চলছে গণ হারে মুসলিম নিধন। এই মিশনে আমাদের কাছে সাহায্য চেয়েছেন যিনি, সেই নুমার চিফ অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন অনেক আগে ছিলেন মেরিন কর্পসের চিফ। তাঁকে অনুরোধ করে মেরিন কর্পসের একটা এভি–৮বি হ্যারিয়ার বিমান চেয়ে নেন মেজর রানা। আলাপ করে ঠিক হয়, মেরিনদের সঙ্গে বসনিয়ায় বিপজ্জনক মিশনে যোগ দেবেন তিনি।

'এখানে বলে রাখি, ওই হ্যারিয়ার যুদ্ধ বিমানকে এক কথায় অনেকে চেনে জাম্পজেট বলে। ওটা একমাত্র অ্যাটাক বিমান যেটা সরাসরি আকাশে উঠে যেতে পারে। অন্য পাইলটদের সঙ্গে মেজর রানার দায়িত্ব ছিল নো-ফ্লাইং-যোন পাহারা দেয়া। কিন্তু তার চেয়ে

অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ কাজে মন দিলেন তিনি।'

চুপ করে দবিরের দিকে চেয়ে আছে তিশা। লোকটা যেন হারিয়ে গেছে বহু দূরে।

'একদিন সার্বিয়ানদের মিসাইল ব্যাটারি তাঁর বিমান ফেলে দিল। অনেক পরে জানা গেছে, সার্বিয়ানদের কাছে আমেরিকার তৈরি স্টিংগার মিসাইল ছিল।

'তা যাই হোক, বিমানটাকে স্টিংগার মিসাইল ফেলে দেয়ার আগেই ইজেক্ট করেন মেজর রানা। বিধ্বস্ত হয়েছিল বিমান। উনি নেমে এলেন সার্বদের এলাকায়, চারপাশে ঘন জঙ্গল।'

তিশার দিকে চাইল দবির।

'মেজর রানা এরপর ঊনিশ দিন লুকিয়ে ছিলেন সার্বদের জঙ্গলে। একা। কোনও অস্ত্র নেই। কয়েক শ' সার্বিয়ান সৈনিক গোটা জঙ্গলে খুঁজছে তাঁকে। তারপর যখন ধরে ফেলল, তখন আট দিন ধরে উনি অভুক্ত।

'একটা পোড়ো ফার্মহাউসে নিয়ে গেল তাঁকে। একটা চেয়ারে বসিয়ে বেঁধে রাখল। নিয়মিত অত্যাচার শুরু হলো। পেরেক গাঁথা তক্তা দিয়ে সারাদেহে আঘাত করা হতো। সঙ্গে একের পর এক প্রশ্ন। মাসুদ রানা কেন ওই এলাকার উপর দিয়ে বিমান চালিয়েছে? তার ওটা কি গুপ্তচর বিমান ছিল? সে কি তাদের বর্তমানের অবস্থান জানে? আমেরিকান সেনাবাহিনী সার্ব এলাকায় ঢুকে পড়েছে?'

'সত্যিই কি সার্বিয়ান এলাকায় ঢুকে পড়ে আমেরিকান সেনাবাহিনী?' জানতে চাইল তিশা।

আস্তে করে মাথা নাড়ল দবির। 'অনেক পরে দুটো সিল টিম গিয়েছিল। কিন্তু তার আগে বাংলাদেশের কয়েকজন ঢুকে পড়ে সার্বিয়ান এলাকায়। শুনেছি বিসিআই নামের একটা বাংলাদেশি সংগঠনের সদস্য তারা। তাদের কারণে স্থানীয় সার্বরা বলতে শুরু

করল, গভীর জঙ্গলে ভয়ঙ্কর সব ভূত হাজির হয়েছে। ওরা নিজেরা যদি নিরীহ মুসলিমদের উপর এভাবে গণহত্যা না চালাত, তা হলে হয়তো এভাবে মরতে হতো না তাদেরকেও।'

'মেজর কি জানতেন বাংলাদেশি সৈনিক বা গুপ্তচররা সার্বদের এলাকায় ঢুকে পড়েছে?' বলল তিশা।

আস্তে করে মাথা দোলাল দবির। 'হ্যাঁ। অফিশিয়ালি মেজরের কাজ ছিল নো-ফ্লাইং-যোন পাহারা দেয়া। কিন্তু আসলে সার্বদের নেতাদের ফার্মহাউসে হামলা করার জন্য তথ্য জোগাড় করতেন। পরে সে-তথ্য অনুযায়ী হামলা করত বাংলাদেশি সংগঠনের ইউনিট। তা যাই হোক, মেজর রানার মুখ থেকে একটা কথাও বের করতে পারল না সার্বরা।'

মনোযোগ দিয়ে দবিরকে দেখছে তিশা। কী যেন বলবার আগে একটু ইতস্তত করছে সার্জেন্ট।

'যাই হোক, সার্বরা ধরে নিল অদ্ভুত যে দল হামলা করছে, তাদের সঙ্গে মেজর রানার যোগাযোগ আছে। সার্বদের স্ট্র্যাটেজিক টার্গেটগুলো একের পর এক বিধ্বস্ত হচ্ছিল। এটা সম্ভব শুধু আকাশ থেকে কো-অর্ডিনেটস জানিয়ে দিলে। সার্বরা ঠিক করল, এই লোককে চরম শাস্তি দিতে হবে। তারা মেজর রানার চোখ দুটো উপড়ে নিল।'

'কী করল?' চমকে গেছে তিশা।

'ছয়জন মিলে মেঝের উপর ফেলে গেঁথে রাখল মেজরকে, আরেকজন সার্ব খুব ধীরে কেটে বের করে নিল ওঁর দুই চোখ। কাজটা করার সময় লোকটা বাইবেল থেকে উদ্ধৃতি দিল: তোমার হাত যদি পাপ করে, ওটা কেটে ফেলো! যদি পাপ করে চোখ, উপড়ে ফেলো!'

অসুস্থ বোধ করছে তিশা। অন্তরের গভীরে বুঝতে পারছে, অসহায় অন্ধ মাসুদ রানার কেমন লেগেছিল। 'তারপর কী করল

তারা?' জানতে চাইল।

'কোটর থেকে বেরিয়ে রগের শেষে ঝুলতে থাকল দুটো চোখ। এরপর একটা কাবার্ডের ভিতর আটকে রাখল ওঁকে। দুই চোখ থেকে দরদর করে পড়ছে রক্ত।'

'তারপর?' ঢোক গিলল তিশা। 'মেজর বেরুলেন কীভাবে?'

'উনি যে সংগঠনের সঙ্গে জড়িত, শুনেছি সেটার চিফ কয়েকজন লোক পাঠিয়ে দিয়েছিলেন আগেই। জুনের এক তারিখে মেজরকে খুঁজে পেল তারা। আমেরিকান বেসে আগেই অপেক্ষা করছিল একটা চার্টার বিমান। ওটাতে তুলে গোপনে লণ্ডনে নিয়ে যাওয়া হলো তাঁকে। কুইন এলিজাবেথ হসপিটালে ভর্তি করা হলো। কোনও পত্রিকার সাংবাদিক বা টিভি রিপোর্টার কিছুই জানল না।

'মেজরকে উদ্ধার করতে গিয়ে ফার্মহাউসে প্রচণ্ড লড়াই হয় সার্বদের সঙ্গে বাংলাদেশি ওই দলের। পশুগুলোকে শেষ করে আমাদের দেশের যুবকরা, কিন্তু তাদেরও দু'জন গুরুতর আহত হয়। এরা যখন লণ্ডনে হাসপাতালে ভর্তি হলো, তখনও মেজর রানার চোখ থেকে টপটপ করে রক্ত বেরুচ্ছে।'

'তারপর কী হলো?' চোখ বড় বড় করে দবিরের দিকে চেয়ে আছে তিশা।

'বাংলাদেশ সরকার-প্রধান কৈফিয়ত চাইলেন মেজরের সংগঠনের চিফের কাছে। তাঁদের লোক সার্বিয়ায় থাকবার কথা নয়। জবাবে উনি শুধু জানিয়ে দেন, আপনারা চাইলে আমি পদত্যাগ করতে পারি। শেষপর্যন্ত পিছিয়ে যান সরকার-প্রধান। উনি অন্যান্য সংগঠন থেকে জানতে পারেন, ওই ভদ্রলোককে সরিয়ে দিলে তাঁর হাতে তৈরি সোনার টুকরো ছেলেরা সব কজন তাঁর সাথেই পদত্যাগ করবে।'

'আর মেজর রানার কী হলো?'

'অন্ধ হয়ে গেলেন মেজর। চোখ যদি কাজই না করে, দেখবেন কী করে?' বিরতি নিল দবির। একটু পর বলল, 'কিন্তু তাঁর চিফ মেজর জেনারেল (অব.) রাহাত খান আর মেরিন কর্পসের প্রাক্তন চিফ, বর্তমানের নুমা চিফ অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন ম্যারিল্যাণ্ডের জন্স হপকিন্স ইউনিভার্সিটি হাসপাতালে নিয়ে গেলেন মেজরকে। ওখানেই আছেন দুনিয়ার সবচেয়ে দক্ষ চোখের সার্জারি ইউনিট।'

'তারপর?'

'চোখ ঠিক করল তারা। ...আর কিছু জানি না, জানবই বা কী করে, আমি তো চিকিৎসার কিছুই বুঝি না। তবে মেজরের চোখ দুটো আরও সুন্দর হয়ে উঠল। কী করে যেন রেটিনা নষ্ট হয়নি তাঁর। ডাক্তাররা বললেন, যা ক্ষতি হয়েছে সেটা চোখের বাইরের দিকে। আসল অংশ ঠিক ছিল।' সামান্য বিরতি নিয়ে দবির বলল, 'আমরা আবার মার্ভেলে ফিরলে মেজর রানার বন্ধু ব্রিগেডিয়ার সোহেল আহমেদের কাছে জিজ্ঞেস করতে পারেন। তিনি আমার চেয়ে অনেক ভাল ভাবে বুঝিয়ে বলতে পারবেন।'

আস্তে করে মাথা দোলাল তিশা। বুঝতে পারছে, কেন হোসেন আরাফাত দবির মাসুদ রানাকে এত ভক্তি করে। কেন কোনও কথা বললেই সেটা পালন করতে ব্যস্ত হয়ে ওঠে। আসলে মানুষটাকে পুরো বিশ্বাস করে সে। মাসুদ রানা বললে বোধহয় নরকে যেতেও রাজি হবে এই লোক।

আমারও তো একই অবস্থা, মনে মনে বলল তিশা। শ্রদ্ধা করে ও মাসুদ রানাকে। মানুষটা সত্যিকারের নেতা। নিজের জন্য কিছুই চান না উনি। কাজ করেন দলের সবার ভালর জন্যে।

'আপনি ওঁকে খুব পছন্দ করেন, তাই না?' চাপা স্বরে জা চাইল দবির।

'আমি ওঁকে বিশ্বাস করি।'

তারা?' জানতে চাইল।

'কোটর থেকে বেরিয়ে রগের শেষে ঝুলতে থাকল দুটো চোখ। এরপর একটা কাবার্ডের ভিতর আটকে রাখল ওঁকে। দুই চোখ থেকে দরদর করে পড়ছে রক্ত।'

'তারপর?' ঢোক গিলল তিশা। 'মেজর বেরুলেন কীভাবে?'

'উনি যে সংগঠনের সঙ্গে জড়িত, শুনেছি সেটার চিফ কয়েকজন লোক পাঠিয়ে দিয়েছিলেন আগেই। জুনের এক তারিখে মেজরকে খুঁজে পেল তারা। আমেরিকান বেসে আগেই অপেক্ষা করছিল একটা চার্টার বিমান। ওটাতে তুলে গোপনে লণ্ডনে নিয়ে যাওয়া হলো তাঁকে। কুইন এলিজাবেথ হসপিটালে ভর্তি করা হলো। কোনও পত্রিকার সাংবাদিক বা টিভি রিপোর্টার কিছুই জানল না।

'মেজরকে উদ্ধার করতে গিয়ে ফার্মহাউসে প্রচণ্ড লড়াই হয় সার্বদের সঙ্গে বাংলাদেশি ওই দলের। পশুগুলোকে শেষ করে আমাদের দেশের যুবকরা, কিন্তু তাদেরও দু'জন গুরুতর আহত হয়। এরা যখন লণ্ডনে হাসপাতালে ভর্তি হলো, তখনও মেজর রানার চোখ থেকে টপটপ করে রক্ত বেরুচ্ছে।'

'তারপর কী হলো?' চোখ বড় বড় করে দবিরের দিকে চেয়ে আছে তিশা।

'বাংলাদেশ সরকার-প্রধান কৈফিয়ত চাইলেন মেজরের সংগঠনের চিফের কাছে। তাঁদের লোক সার্বিয়ায় থাকবার কথা নয়। জবাবে উনি শুধু জানিয়ে দেন, আপনারা চাইলে আমি পদত্যাগ করতে পারি। শেষপর্যন্ত পিছিয়ে যান সরকার-প্রধান। উনি অন্যান্য সংগঠন থেকে জানতে পারেন, ওই ভদ্রলোককে সরিয়ে দিলে তাঁর হাতে তৈরি সোনার টুকরো ছেলেরা সব কজন তাঁর সাথেই পদত্যাগ করবে।'

'আর মেজর রানার কী হলো?'

'অন্ধ হয়ে গেলেন মেজর। চোখ যদি কাজই না করে, দেখবেন কী করে?' বিরতি নিল দবির। একটু পর বলল, 'কিন্তু তাঁর চিফ মেজর জেনারেল (অব.) রাহাত খান আর মেরিন কর্পসের প্রাক্তন চিফ, বর্তমানের নুমা চিফ অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন ম্যারিল্যাণ্ডের জন্স হপকিন্স ইউনিভার্সিটি হাসপাতালে নিয়ে গেলেন মেজরকে। ওখানেই আছেন দুনিয়ার সবচেয়ে দক্ষ চোখের সার্জারি ইউনিট।'

'তারপর?'

'চোখ ঠিক করল তারা। ...আর কিছু জানি না, জানবই বা কী করে, আমি তো চিকিৎসার কিছুই বুঝি না। তবে মেজরের চোখ দুটো আরও সুন্দর হয়ে উঠল। কী করে যেন রেটিনা নষ্ট হয়নি তাঁর। ডাক্তাররা বললেন, যা ক্ষতি হয়েছে সেটা চোখের বাইরের দিকে। আসল অংশ ঠিক ছিল।' সামান্য বিরতি নিয়ে দবির বলল, 'আমরা আবার মার্ভেলে ফিরলে মেজর রানার বন্ধু ব্রিগেডিয়ার সোহেল আহমেদের কাছে জিজ্ঞেস করতে পারেন। তিনি আমার চেয়ে অনেক ভাল ভাবে বুঝিয়ে বলতে পারবেন।'

আস্তে করে মাথা দোলাল তিশা। বুঝতে পারছে, কেন হোসেন আরাফাত দবির মাসুদ রানাকে এত ভক্তি করে। কেন কোনও কথা বললেই সেটা পালন করতে ব্যস্ত হয়ে ওঠে। আসলে মানুষটাকে পুরো বিশ্বাস করে সে। মাসুদ রানা বললে বোধহয় নরকে যেতেও রাজি হবে এই লোক।

আমারও তো একই অবস্থা, মনে মনে বলল তিশা। শ্রদ্ধা করে ও মাসুদ রানাকে। মানুষটা সত্যিকারের নেতা। নিজের জন্য কিছুই চান না উনি। কাজ করেন দলের সবার ভালর জন্যে।

'আপনি ওঁকে খুব পছন্দ করেন, তাই না?' চাপা স্বরে জানতে চাইল দবির।

'আমি ওঁকে বিশ্বাস করি।'

নীরবতা নেমে এসেছে দু'জনের মাঝে।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল তিশা। 'আমার বয়স কম হয়নি, দবির।'

চুপ করে আছে সার্জেন্ট।

'আপনি কি জানেন, একবার আমার বিয়ে হয়েছিল?'

'না, লেফটেন্যান্ট জানতাম না।'

'ঊনিশ বছর বয়সে প্রেম করে বিয়ে করি। সে ছিল দুনিয়ার সেরা মিষ্টি মানুষ। সরকারী এক স্কুলের টিচার ছিল। আর আমি তখন অনার্সে পড়ছি। কী সুন্দর করেই না ইংরেজি কবিতা বলত। কী ভদ্র, শান্ত, হাসিখুশি। ঊনিশ পেরুনোর আগেই প্রেগনেন্ট হলাম।'

চুপ করে ওর দিকে চেয়ে আছে দবির।

'তারপর একদিন,' ছলছল করে উঠল তিশার চোখ। 'তখন আমার পেটে বাচ্চাটা আড়াই মাসের। সেদিন কলেজ থেকে আগেই চলে এসেছি। বাড়িতে ফিরেই দেখলাম সোফার উপর শুয়ে সতেরো বছরের এক ছাত্রীর সঙ্গে... সেই মেয়ে এসেছিল ইংরেজি পড়তে।'

মুখ কুঁচকে অন্য দিকে চাইল দবির।

'এরপর তিন সপ্তাহ পর মিসক্যারেজ হয়ে গেল। জানি না কেন হলো। মনের চাপ, রাগ, ঘৃণা— জানি না কেন। এরপর থেকে সব পুরুষকে ঘৃণা করতে লাগলাম। পশুটাকে তালাক দিয়ে যোগ দিলাম বাংলাদেশ আর্মিতে। ঘৃণা হয়তো মানুষকে ভাল যোদ্ধা করে। অন্তর থেকে প্রতিটা গুলি করি, যেন শত্রুর মগজ বা বুকে বেঁধে। এরপর থেকে কখনও কাউকে বিশ্বাস করিনি। ...তারপর ট্রেইনিঙে এসে দেখা হলো মেজর মাসুদ রানার সঙ্গে।'

বহু দূরে চেয়ে আছে তিশা করিম। চোখ থেকে টপটপ করে পড়ছে অশ্রু। 'আমি খেয়াল করতে শুরু করলাম ওঁকে। জাহাজের সবাই কত কথা বলে, কিন্তু মনে হলো ওই মানুষটা যেন অনেক

একা। এতই একা, যেন নীরবে চলে গেছে বহু দূরের কোনও নিঝুম দ্বীপে। আমি জানি না আমার কী হলো, নতুন করে বিশ্বাস ফিরল মনে। অন্তরটা বলল, এই মানুষটা কখনও তোকে ঠকাবে না।

'সার্জেন্ট, আমার অন্তর বলল, সর্বক্ষণ কী যেন খুঁজছে তার মন। সে যদি হয় কোনও মেয়ে... আমি যদি হতাম সেই মেয়ে, আমি প্রতিদিন ফুলের মালা গেঁথে ওর পায়ে নামিয়ে রাখতাম। ...আসলে ওর ভিতর কী যেন আছে। আগে কোনও পুরুষের ভিতর এমন কিছু দেখিনি।'

কিছুই বলছে না দবির, শুধু চেয়ে আছে তিশার দিকে।

তিশা বুঝতে পেরেছে লোকটা অবাক হয়ে ওকে দেখছে, চট্ করে চোখ মুছে ফেলল ও।

'দুঃখিত, আসলে আপনাকে এসব বলতে চাইনি। কাকেই বা বলব? কেন বলব?'

'আপনি মেজর রানাকে বলতে পারেন আপনার মনের কথা,' খুব নরম স্বরে বলল দবির।

'হ্যাঁ, তাই বলি আর কী,' কান্নার মত শোনাল তিশার হাসি। 'সহকারীরা পিছনে হাসতে শুরু করবে। এমনিতেই কোনও মেয়ে আর্মির ফ্রন্ট লাইন ইউনিটে যোগ দিলে সবাই হাসে। দবির, তার চেয়ে অনেক ভাল, যতদিন পারি আমি ওর কাছাকাছি থাকব, কখনও ওকে ছুঁয়েও দেখতে চাইব না। এটা অনেক দূরে চলে যাওয়ার চেয়ে তো ভাল?'

বড় করে শ্বাস ফেলল সার্জেন্ট দবির। মনে মনে মেয়েটির প্রশংসা না করে পারছে না। 'আপনি ঠিকই বলেছেন,' একটু পর বলল।

'আপনি বুঝেছেন, সেজন্য ধন্যবাদ,' হঠাৎ আরও বিমর্ষ হয়ে উঠল তিশার মুখ। সার্জেন্টের চোখে চোখ রাখল। 'আর মাত্র

একটা প্রশ্ন।'

'সেটা কী, আপা?'

মাথা কাত করল তিশা। 'আপনি বললেন ব্রিগেডিয়ার সোহেল আহমেদ সবই জানেন। আপনি তাঁর কাছ থেকে এসব শুনেছেন তা মনে করি না। বসনিয়ার সব ঘটনা কোথা থেকে জানলেন?'

মৃদু হাসল হোসেন আরাফাত দবির। কয়েক মুহূর্ত পর নিচু গলায় বলল, 'আমি ওই উদ্ধার টিমে ছিলাম।'

'যে-কোনও ধরনের প্যালিয়োণ্টোলজি মানেই ধৈর্যের খেলা,' বলল নিনা ভিসার, তুষারের মাঝে হাঁটছে রানার পাশে। 'কিন্তু এখন নতুন টেকনোলজি এসেছে, আপনি চাইলে কমপিউটারকে কাজে লাগাতে পারেন। হয়তো কোনও কাজে চলে গেলেন, ফিরে এসে দেখলেন দারুণ কিছু আবিষ্কার করে বসেছে কমপিউটার।'

যে নতুন টেকনোলজির কথা বলছে নিনা, আসলে তা অতি দীর্ঘ সনিক তরঙ্গের স্পন্দন। উইলকক্স আইস স্টেশনের প্যালিয়োণ্টোলজিস্টরা ওটার কারণেই বরফের তলায় খুঁজে পান ফসিল হওয়া হাড়। এখন আর বরফ খুঁড়ে বের করতে হয় না, ফলে ক্ষতিও হয় না ফসিলের।

'সেক্ষেত্রে পরের ফসিল পাওয়া পর্যন্ত কী করেন আপনারা?' জানতে চাইল রানা।

'মেজর, আপনি হয়তো জানেন না, আমি সাধারণ কোনও প্যালিয়োণ্টোলজিস্ট নই,' ভুরু কুঁচকে আবার মৃদু হেসে ফেলল নিনা। 'প্যালিয়োণ্টোলজিস্ট হওয়ার আগে মেরিন বায়োলজিস্ট ছিলাম। আর এসব ঘটার আগে স্টেশনের কর্তা জন প্রাইসের সঙ্গে ছিলাম বায়ো ল্যাবে, বি-ডেকে। উনি এনহাইড্রিনা সিসেস্টোসা থেকে নতুন অ্যাণ্টিভেনম তৈরি করছিলেন।'

মৃদু মাথা দোলাল রানা। 'সাগরের সাপ।'

অবাক হয়ে রানাকে দেখল নিনা। 'আপনি তো অনেক কিছু জানেন, মেজর!'

'এখানে আসার আগে আমিও আলাদা পেশায় ছিলাম;' মৃদু হাসল রানা।

স্টেশনের সীমানার কাছে চলে এসেছে ওরা। একটু দূরে সার্জেন্ট জনি ওয়াকার, দাঁড়িয়ে আছে মেরিনদের একটি হোভারক্রাফটের পাশে। স্টেশনের দিক থেকে বাইরের দিকে তাক করা হয়েছে হোভারক্রাফট।

চারপাশ প্রায় অন্ধকার। টানা বইছে তুমুল তুষার-ঝড়। বহু দূরে চাইলে শুধু মাইলের পর মাইল বরফ-মোড়া জমি। দিগন্তে গাঢ় কমলা প্রভা। ওয়াকারের পিছনে হোভারক্রাফটের ছাতে নীরবে ঘুরছে রেঞ্জফাইণ্ডার। দেখলে মনে হয় রিভলভিং টারেট থেকে তাক করেছে বিশাল কামানের নাক। ধীরে ধীরে পুরো এক শ' আশি ডিগ্রি ঘুরছে। আধ মিনিট পর পর একপাশ থেকে শুরু করে আরেক পাশে গিয়ে থামছে, তারপর আবার ফিরছে।

'আপনার কথা মত সেট করেছি,' রানার সামনে থামল ওয়াকার। 'অন্য এলসিএসি দক্ষিণ-পুব কোণে।' মেরিনদের হোভারক্রাফটের নাম এলসিএসি। অর্থাৎ, ল্যাণ্ডিং ক্রাফট-এয়ার কুশণ্ড।

'গুড,' বলল রানা।

যেভাবে উইলকক্স স্টেশনের বাইরের দিকে চেয়ে আছে হোভারক্রাফটের রেঞ্জফাইণ্ডার, সামনের বিস্তৃত এলাকা পাহারা দিতে পারবে। ওই দুই রেঞ্জফাইণ্ডার কমপক্ষে পঞ্চাশ মাইল কাভার করবে। ওদের দিকে কেউ এলে অনেক আগেই জানবে ওরা।

'আপনার সঙ্গের পোর্টেবল স্ক্রিন?' ওয়াকারের কাছে জানতে চাইল রানা।

'এই যে,' পোর্টেবল ভিউস্ক্রিন বাড়িয়ে দিল ওয়াকার। পর্দায় দেখা গেল তথ্য পাঠিয়ে চলেছে দুই রেঞ্জফাইণ্ডার।

পোর্টেবল স্ক্রিন খুদে টেলিভিশনের মত, বামদিকে একটা হাতল। পর্দায় দুটো সরু সবুজ রেখা খুব ধীরে সরছে। ঠিক যেন গাড়ির উইণ্ডস্ক্রিনের ওয়াইপার। রেঞ্জফাইণ্ডার সামনে কিছু পেলে এই স্ক্রিনে জ্বলে উঠবে দপদপে লাল বিন্দু। সঙ্গে নীচে ফুটে উঠবে ভাইটাল স্ট্যাটিস্টিক্স।

'বেশ চলুন, এবার দেখা যাক স্টেশনের নীচে গুহার ভিতরে কী,' বলল রানা।

পাঁচ মিনিট পেরুবার আগেই প্রধান দালানের কাছে ফিরে এল ওরা। ঝরঝর করে কালো আকাশ থেকে পড়ছে সাদা তুষার, তার ভিতর দিয়ে দ্রুত হাঁটছে। রানা জানাল, কীভাবে পাতাল-গুহার ভিতর নামবে ওরা।

প্রথমে নিশ্চিত হতে হবে ওখানে স্পেসশিপ আছে কি না। সত্যিই ওই ধরনের কিছু আছে, এর কোনও প্রমাণ এখনও পাওয়া যায়নি। শুধু জানা গেছে, উইলকক্স আইস স্টেশনের এক বিজ্ঞানী জানিয়েছে, গুহার ভিতর স্পেসশিপ দেখেছে। এবং সে-লোক সম্ভবত মারা গেছে। কেউ জানে না সে কী দেখেছে। ঠিক তখনই তার উপর হামলা হয়। জানা যায়নি শত্রু কারা। এটা জানাও খুব জরুরি।

ছোট কোনও দলকে পাতাল-গুহায় পাঠাবার আরেকটা তৃতীয় কারণ আছে রানার। অবশ্য, নিনা বা ওয়াকার তা জানে না।

নতুন করে কোনও কমাণ্ডো দলের হামলা হলে, এবং ওরা নিজেরা পরাজিত হলে, তবুও পাতাল-গুহার ভিতর নিজেদের লোক থাকলে তারা পাল্টা হামলা করতে পারবে।

ওই গুহার ভিতর ঢুকতে হলে যেতে হবে পানির নীচের এক সুড়ঙ্গ দিয়ে। কিন্তু কভার্ট ইনকার্শানারি ফোর্স কখনোই পানির নীচ

দিয়ে হামলা করতে চায় না। এর বড় কারণ: কেউ জানে না ভেসে উঠবার পর তাদের জন্য কী অপেক্ষা করছে। এখন, আগেই যদি রানার কোনও ছোট দল ঢুকে পড়ে ওই গুহার ভিতর, শত্রুরা ভেসে উঠতেই অনায়াসে তাদেরকে শেষ করতে পারবে ওরা।

রানা, জনি ওয়াকার ও নিনা পৌঁছে গেছে স্টেশনের মেইন এণ্ট্র্যান্সে। র‍্যাম্প বেয়ে নেমে ঢুকে পড়ল সুড়ঙ্গের ভিতর। পিছনে বন্ধ করে দেয়া হলো দরজা। দু'মিনিট পেরুবার আগেই এ-ডেকের ক্যাটওয়াকে বেরিয়ে এল ওরা। ওখানে অন্য দু'জনের কাছ থেকে বিদায় নিল রানা, দ্রুত চলেছে ডাইনিংরুম লক্ষ্য করে।

এতক্ষণে ফিরবার কথা নাজমুলের, সঙ্গে থাকবে ফ্যেনুয়্যা। লোকটা বলতে পারবে এখন কী অবস্থায় আছে হাক্সলে।

ডাইনিংরুমের দরজা পেরিয়ে ঢুকে পড়ল রানা, একটু দূরে দেখল নাজমুল ও ফ্যেনুয়্যাকে। তারা দাঁড়িয়ে আছে একটা টেবিলের পাশে। ওখানে চিত হয়ে পড়ে আছে কেভিন হাক্সলে।

রানা ভিতরে ঢুকতেই চট্ করে ওর দিকে চেয়েছে নাজমুল ও ফ্যেনুয়্যা, বিস্ফারিত হয়ে গেছে চোখ। কেন যেন রানার মনে হলো, হাতে-নাতে ধরা পড়েছে দুই চোর।

অস্বস্তিকর কয়েকটা মুহূর্ত পেরুল, তারপর বলে উঠল নাজমুল, 'স্যর, হাক্সলে মারা গেছে।'

ভুরু কুঁচকে গেল রানার। জানত, কেভিন হাক্সলে গুরুতর আহত, যে-কোনও সময়ে মরতে পারে, কিন্তু নাজমুল যেভাবে বলল...

এক পা সামনে বাড়ল নাজমুল, গম্ভীর গলায় বলল, 'স্যর, আমরা যখন ফিরলাম, তার আগেই মরেছে। ডাক্তার বলছে জখমের কারণে নয়।'

আঠারো

সেটি অভযারভেটরির পার্কিং লটে ভাড়া করা গাড়িতে বসে আছে অ্যাডোনিস ক্যাসেডিন, দম আটকে আসতে চাইছে গরমে। দরদর করে ঘামছে সে। পকেট থেকে সেলুলার ফোন বের করে কল দিল স্ত্রী সান্থাকে। সে আছে ওয়াশিংটন ডি.সি.তে।

'কী বুঝলে?' ওদিক থেকে জানতে চাইল সান্থা।

'মহাবিরক্তিকর,' সেটি রেকর্ডিং থেকে নোট নিয়েছে, এখন দেখছে।

'কিছুই পেলে না?'

'নাহ্, কিচ্ছু না। কোনও স্পাই স্যাটালাইট থেকে কয়েকটা বিচ্ছিন্ন শব্দ, আর কিছুই না।'

'যা বলেছে সেটা লিখে নিয়েছ?'

নোট বুকের উপর চোখ বোলাল ক্যাসেডিন।

'হ্যাঁ, তা করেছি। কিন্তু এ থেকে কিছুই পাব না।'

'তা-ও বলো দেখি,' বলল সান্থা।

'ঠিক আছে,' দীর্ঘশ্বাস ফেলল ক্যাসেডিন। এবার গড়গড় করে বলে গেল সে:

'...কপি, ওয়ান-টু-ফাইভ-সিক্স-ওয়ান-সিক্স...'

'...আয়োনোস্ফেরিক সমস্যায় যোগাযোগ হারিয়ে...'

'...সামনের দল...'

'...মাসুদ রানা...'

'...মাইনাস সিক্সটি-সিক্স পয়েন্ট ফাইভ...'

'...সোলার ফ্লেয়ার বারোটা বাজাচ্ছে রেডিয়োর...'

'...ওয়ান-ফিফটিন, টোয়েন্টি মিনিট্স্, টুয়েলভ সেকেণ্ড ইস্ট...'

'...কী করে...' কড়কড় করছে। '...চলে যাও, যাতে...'

'...রওনা হয়েছে দ্বিতীয় টিম...'

ওদিক থেকে শ্বাস ফেলল সান্থা। 'ব্যস? আর কিছুই নেই?'

ফাঁপা হাসল ক্যাসেডিন। 'আবার কী চাও? এবার তো বুঝলে কী বলেছে?'

'এসবের নিশ্চয়ই কোনও মানে আছে।'

'আমারও মনে হয়েছিল, নইলে এই নরকে আসি?'

'ওই কাজ আমার উপর ছেড়ে দাও, তোমাকে ওখানে পৌঁছে দেব।' হাসতে শুরু করেছে সান্থা। কয়েক মুহূর্ত পর বলল, 'এবার কোথায় যাবে?'

ড্যাশবোর্ড থেকে ছোট সাদা একটা কার্ড নিল ক্যাসেডিন। ওটা ভিজিটিং কার্ড। ঝকঝকে ছাপা:

রবিন এন কার্বি

গানস্মিথ

১৬ *নিউম্যান স্ট্রিট, লেক আর্থার, এনএম*

'ভাবছি এই টাম্বলউইড ভরা নরকে যখন চলেই এলাম, তো একবার ওই রহস্যময় রবিন এন কার্বির সঙ্গে দেখা করেই যাই,' বলল ক্যাসেডিন।

'যে লোক মেইল-বক্সে ভিজিটিং কার্ড রেখে গেছে?' জানতে চাইল সান্থা।

'হ্যাঁ, সে-ই।'

দুই সপ্তাহ আগে ওই কার্ড পাওয়া যায় ক্যাসেডিনের মেইল-

বক্সে। সঙ্গে কোনও চিঠিও ছিল না। কিছুই লেখা হয়নি কার্ডে। ক্যাসেডিন প্রথমে ভেবেছিল ফেলে দেবে কার্ড, পরে কী মনে করে রেখে দিয়েছে।

পরদিন এল টেলিফোন। ভারী পুরুষালী কণ্ঠ। জানতে চাইল ক্যাসেডিন কার্ড পেয়েছে কি না।

ক্যাসেডিন জানাল, সে কার্ড পেয়েছে।

এবার লোকটা বলল, তার কাছে জরুরি কিছু তথ্য আছে, আগ্রহী হয়ে উঠতে পারে ক্যাসেডিন।

ক্যাসেডিন জানতে চাইল, সে কি ওয়াশিংটনে এসে ওর সঙ্গে কথা বলতে পারবে?

লোকটা জানিয়ে দিল, তার পক্ষে কোথাও যাওয়া সম্ভব নয়। যদি আসতে হয় তো আসতে হবে ক্যাসেডিনকেই। লোকটাকে ভীত বলে মনে হয়েছে ক্যাসেডিনের। ও নাকি আগে নেভিতে ছিল।

'আমাদের কোনও ফ্যান না তো?' জানতে চাইল সান্থা।

গ্র্যাণ্ডমাদার মিশেল জার্নালে কাজ করবার সময় বেশ কিছু ভক্ত জুটে গিয়েছিল ক্যাসেডিনের। মাঝে মাঝে এখনও বিরক্ত করে তারা। কেউ কেউ বলে, তার কাছে ওয়াটারগেট কেলেঙ্কারির চেয়ে জটিল রহস্য আছে। বদলে বেশি কিছু দিতে হবে না, জমজমাট কাহিনি বুঝে একহাজার ডলার বা দুই হাজার ডলার দিলেই সে সন্তুষ্ট থাকবে।

কিন্তু রবিন এন কার্বি লোকটা একবারও টাকা চায়নি। আর এখন ক্যাসেডিন চলে এসেছে তার এলাকার কাছেই, সুতরাং...

'এমনও হতে পারে লোকটা গুরুত্বপূর্ণ কিছু বলবে,' বলল ক্যাসেডিন। 'তার বাড়ির কাছে চলে এসেছি, তাই ভাবছি ঘুরেই আসি।'

'পরে আবার বোলো না তোমাকে সাবধান করিনি,' বলল সান্থা, 'ঠিক আছে, ঘুরে এসো।'

ফোন রেখে দড়াম করে গাড়ির দরজা বন্ধ করল ক্যাসেডিন।

দ্য ওয়াশিংটন পোস্ট পত্রিকা অফিসে ফোন রেখে ছাতের দিকে চাইল সান্থা ক্যাসেডিন, উদাস হয়ে উঠছে। অবশ্য কিছুক্ষণ পর সচেতন হলো।

মাঝ সকাল। নিচু ছাতের বিশাল এই ঘরে বুক-সমান সব পার্টিশনের ওপাশে এক শ'র বেশি কলিগ ব্যস্ত হয়ে যে যার কাজ করছে। একের পর এক ফোন আসছে। খটখট করছে কি-বোর্ড। কাগজ বা ফাইল নিয়ে নানা দিকে ছুটছে অনেকে।

নীল জিন্স প্যান্ট ও সাদা শার্ট পরেছে সান্থা, গলা থেকে ঝুলছে কালো টাই। চুলগুলোকে পনিটেইল করা।

আরও কয়েক সেকেণ্ড পর হাতের দিকে চাইল। স্বামীর কাছ থেকে পাওয়া তথ্যগুলো টুকে নিয়েছে নোট বুকে। সাবধানে প্রতিটি লাইন পড়ল সান্থা। বেশিরভাগ অংশ ফালতু মনে হলো। মাসুদ রানা নামের এক লোক, আয়োনোস্ফেরিক সমস্যা, সামনের দল ও দ্বিতীয় দলের কথা বলেছে।

কিন্তু তিনটে লাইন গুরুত্বপূর্ণ মনে হলো সান্থার:

মাইনাস সিক্সটি-সিক্স পয়েন্ট ফাইভ
আয়োনোস্ফেরিক সমস্যায় যোগাযোগ হারিয়ে
ওয়ান-ফিফটিন, টোয়েন্টি মিনিট্স্, টুয়েলভ সেকেণ্ড ইস্ট

ভুরু কুঁচকে এই তিনটি লাইনে চোখ বোলাল সান্থা, কিছুক্ষণ পর উঠে দাঁড়াল, চলে এল পাশের ডেস্কে। ওদিকের শেলফ থেকে তুলে নিল বাদামি ফোলিও আকৃতির বই। কাভারে চোখ বুলিয়ে নিল: বার্থেলেমিউ'স অ্যাডভান্সড্ অ্যাটলাস অভ ওয়ার্ল্ড

জিয়োগ্রাফি। কয়েকটা পৃষ্ঠা উল্টেই চট্ করে পেয়ে গেল যা খুঁজছে।

পাতার একটা লাইন অনুসরণ করছে ওর আঙুল।

'আরিহ্!' উচ্চারণ করে বলল। কাছের ডেস্কে অন্য এক রিপোর্টার তার কাজ থেকে মুখ তুলে চাইল।

খেয়াল করল না সান্থা ক্যাসেডিন। সামনের পৃষ্ঠার উপর আটকে গেছে ওর চোখ।

আঙুল থেমেছে ম্যাপের ল্যাটিচ্যুড ৬৬.৫ ডিগ্রি দক্ষিণে ও লংগিচ্যুড ১১৫ ডিগ্রি, ২০ মিনিট বারো সেকেণ্ড পুবে।

ভুরু কুঁচকে গেল সান্থার। ওর আঙুল থেমেছে অ্যান্টার্কটিকার উপকূলে।

ই-ডেকে পুলের পারে জড় হয়েছে রানার দলের সবাই।

একটু পর সার্জেন্ট জনি ওয়াকার, লেফটেন্যান্ট তিশা করিম ও লেফটেন্যান্ট গোলাম মোরশেদ পিঠে ঝুলিয়ে নেবে স্কুবা ট্যাঙ্ক। পরতে শুরু করেছে কালো থারমাল-ইলেকট্রিক ওয়েটসুট।

চুপ করে ওদেরকে দেখছে রানা ও গানারি সার্জেন্ট ভাইপার। তাদের পিছনে দাঁড়িয়েছে কর্পোরাল নাজমুল। নিঃশব্দে ই-ডেকের গুদাম-ঘরের দিকে রওনা হলো সার্জেন্ট হোসেন আরাফাত দবির। আরেকবার দেখে আসবে আহত নিশাত সুলতানাকে।

গোলাম মোরশেদের ড্রিল রুমে খুঁজে পাওয়া কালো ব্যাকপ্যাক কাছেই পড়ে আছে। ওটার ভিতর থেকে বের করা হয়েছে ফ্রেঞ্চদের আনা ভিএলএফ ট্র্যান্সমিটার, রাখা হয়েছে রানার পায়ের সামনে।

কেভিন হাক্সলের মৃত্যু ওদের সবাইকে প্রবলভাবে ঝাঁকি দিয়েছে। ফ্রেঞ্চ ডাক্তার ম্যাথিউ ফ্যেনুয়্যা রানাকে বলেছে, কেভিনের গলার ভিতর অংশে ল্যাকটিক অ্যাসিড ছিল। ল্যাকটিক

অ্যাসিড মানেই অন্য কোনও ক্ষতের কারণে মরণ হয়নি কেভিন হাক্সলের।

কণ্ঠনালীতে ওই অ্যাসিডের অর্থ: হঠাৎ করেই ফুসফুসে অক্সিজেন যাওয়া থেমে গেছে। তখন চালু থাকবার জন্য বাধ্য হয়ে ফুসফুস চিনি পোড়াতে শুরু করেছে। তৈরি হয়েছে ল্যাকটিক অ্যাডোসিসস। অন্য কথায়: কণ্ঠনালীর ভিতর ল্যাকটিক অ্যাসিড মানেই হঠাৎ করেই ফুসফুস অক্সিজেন পায়নি। অর্থাৎ, কেভিনের অ্যাজফিক্সিয়েশন বা সাফোকেশন হয়েছে।

গুলির কারণে মারা যায়নি কেভিন। মরেছে, কারণ ফুসফুসে অক্সিজেন যায়নি। কেউ একজন গলা টিপে মেরে ফেলেছে ওকে।

খুন হয়েছে কেভিন হাক্সলে।

সেই সময়ে বাইরে জনি ওয়াকারের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল রানা ও নিনা ভিসার। ওই একই সময়ে ই-ডেকে নেমে আসে কর্পোরাল নাজমুল, ফ্যেনুয়্যার হ্যাণ্ডকাফ খুলে দিয়ে তাকে নিয়ে উপরে রওনা হয়। আর সে সময়ে এ-ডেকের ডাইনিংরুমে ঢোকে কেউ, গলা টিপে মেরে ফেলে মুমূর্ষু কেভিন হাক্সলেকে।

খুব চিন্তিত হয়ে পড়েছে রানা।

ওদের সঙ্গেই আছে ঠাণ্ডা মাথার কোনও খুনি।

অন্যদেরকে সব খুলে বলেনি রানা, শুধু জানিয়েছে কেভিন হাক্সলে আর নেই। কীভাবে মরল, তা এড়িয়ে গেছে। ওর মনে হয়েছে, খুনিকে আরও সতর্ক হওয়ার সুযোগ না দেয়াই ভাল। লোকটা এখনও জানে না রানা টের পেয়েছে। নাজমুল ও ফ্যেনুয়্যা শপথ করেছে, তারা এ বিষয়ে একটা কথাও বলবে না।

চুপচাপ অন্যদেরকে পোশাক পরতে দেখছে রানা, দ্রুত চলছে ওর মগজ।

খুনি যে-ই হোক, সে ভেবেছে অন্যরা মনে করবে গুরুতর

জখমের কারণেই মরেছে হাক্সলে। রানাকে যদি তাই বলা হতো, ওই একই কথা ও-ও ভাবত। গুরুতর আহত ছেলেটা নিঃশব্দে বিদায় নিয়েছে। সবাই ঠিক তা-ই ভাববে, এটা ধরে নিয়েছে খুনিও। গলা টিপে মেরে ফেললে রক্ত বেরোয় না। কোনও ক্ষতও তৈরি হয় না। এটা স্বাভাবিক যে সবাই ভেবে নেবে শেষ যুদ্ধে হেরে গেছে আহত কেভিন।

কিন্তু খুনি জানত না গলা টিপে মারলে একটা প্রমাণ রয়ে যায়, গলার ভিতর অংশে থাকে ল্যাকটিক অ্যাসিড।

রানা বুঝতে পারছে, উইলকক্স আইস স্টেশনে কোনও ডাক্তার না থাকলে, কেউ জানত না কীভাবে মরেছে কেভিন।

নানা চিন্তা আসছে রানার মনে।

এমনও হতে পারে, স্টেশনের ভিতর রয়ে গেছে কোনও ফ্রেঞ্চ সৈনিক! এমন কেউ, যাকে খুঁজেই পায়নি ওরা। একাকী কোনও কমাণ্ডো, যে ঠিক করেছে একে একে শেষ করবে ওদের। সবচেয়ে দুর্বল, মুমূর্ষু মানুষটাকে দিয়ে শুরু করেছে নিজের কাজ।

মন থেকে চিন্তাটা দূর করে দিল রানা। গোটা স্টেশন, এর চারপাশ, বাইরে রয়ে যাওয়া অবশিষ্ট ফ্রেঞ্চ হোভারক্রাফট— সব জায়গা ভালভাবে খুঁজে দেখেছে ওর লোক। না, উইলকক্স আইস স্টেশনের বাইরে বা ভিতরে কোথাও শত্রু-সেনা নেই।

তার মানেই আরেকটা বড় সমস্যা চেপেছে ঘাড়ে।

কেভিন হাক্সলেকে যে খুন করেছে, সে ওর পরিচিত কেউ। এমন কেউ, যাকে বিশ্বাস করে ও।

দুই ফ্রেঞ্চ বিজ্ঞানী খুনি হতে পারে না। লড়াই শেষে তাদেরকে হ্যাণ্ডকাফ দিয়ে আটকে রাখা হয়েছে লোহার খুঁটির সঙ্গে।

হতে পারে উইলকক্স আইস স্টেশনের বিজ্ঞানীদের কেউ খুনি। রানার সঙ্গে ছিল নিনা ভিসার ও জনি ওয়াকার, অন্য

বিজ্ঞানীরা ছিল বি-ডেকের কমন রুমে। বলতে গেলে, তাদেরকে ঘিরে ছিল মেরিন সৈনিক ও রানার দলের সবাই। কোন্ কারণে কোনও বিজ্ঞানী একজন মেরিন সৈনিককে খুন করবে? খুন করেই বা কী পাবে? বিজ্ঞানীদেরকে উদ্ধার করে সরিয়ে নেয়ার জন্যেই এসেছে ওরা।

অবশ্য, অন্য কিছুও হতে পারে।

কোনও মেরিন খুন করেছে কেভিন হাক্সলেকে।

এমন হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম, কিন্তু হতেও তো পারে?

সেক্ষেত্রে আঙুল তুলতে হয় সার্জেন্ট ভাইপারের দিকে। সে ছাড়া স্টেশনের ভিতর অংশে দ্বিতীয় কোনও মেরিন ছিল না।

রানা ও নিনা ভিসার গিয়েছিল সার্জেন্ট জনি ওয়াকারের সঙ্গে দেখা করতে। এই দু'জন খুনি হতে পারে না। অন্য মেরিন অর্থাৎ সার্জেন্ট ভাইপারের ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া অসম্ভব। সে ছিল স্টেশনে, এমন সময় খুন হয় হাক্সলে।

অবশ্য, যে-কেউ কাজটা করে থাকতে পারে।

এক এক করে সবাইকে হিসাবের ভিতর আনছে রানা।

গানারি সার্জেন্ট পল সিংগার, ওরফে ভাইপার। সে ছিল সি-ডেকে, ব্যস্ত ছিল বিধ্বস্ত উইঞ্চ কন্ট্রোল ঠিক করবার কাজে। একা ছিল সে।

ভাবতে শুরু করে মনটা খুব তেতো হয়ে গেল রানার।

আর কোনও মেরিন নেই যাকে সন্দেহ করবে। অন্যরা মারা গেছে। তার মানে, সার্জেন্ট ভাইপার বা অন্য চার বিজ্ঞানী ছাড়া তেমন কেউ নেই যাকে সন্দেহ করবে।

নাকি আছে?

ওর নিজের দলের বেশ কয়েকজন?

তাদের কেউ ওই খুন করে থাকলে?

চুপ করে ভাবছে রানা।

কৃষ্ণাঙ্গদের মত কুচকুচে কালো লেফটেন্যান্ট গোলাম মোরশেদ। স্টেশনের উপর থেকে শুরু করে নীচ পর্যন্ত ফ্রেঞ্চদের ইরেজার খুঁজেছে সে। পেয়েছে ভিএলএফ ট্র্যান্সমিটার। ওটা এখন ওর পায়ের কাছে। মোরশেদও একা ছিল।

এবার নাজমুল। তরুণ সৈনিক, ওকে কিশোরও বলা যায়। ওর উপর সবচেয়ে আগে সন্দেহ পড়ে। সে বলেছিল, আপাতত কেভিনের রক্ত থামাতে পেরেছে। তার মানেই ওই ছেলেটা আগের চেয়ে স্টেবল ছিল। নইলে নাজমুল ই-ডেকে নেমে আসত না। লড়াই শেষে ডাইনিংরুমে হাক্সলের সঙ্গে একা ছিল নাজমুল। ভাবতে ভাল লাগছে না, কিন্তু এমন হতেই পারে, কেভিনকে খুন করেছে সে একঘণ্টা আগেই।

কিন্তু, কেন করবে কাজটা? কোনও ধরনের যুক্তি তো নেই! ম্যাকমার্ডো থেকে আসবার পথে নাজমুল ও কেভিন হাক্সলে আলাদা হোভারক্রাফটে এসেছে। ওদের দু'জনের ভিতর ঝগড়া হওয়ারও কোনও সুযোগ ছিল না। নাজমুলের বয়স মাত্র একুশ বছর। কোনও কাজ দিলে ব্যস্ত হয়ে শেষ করে। কোনও নির্দেশ দিলে ঝাঁপিয়ে পড়ে সোৎসাহে। ওর এত বয়স হয়নি যে কাজে ফাঁকি দেবে বা কোনও প্রতিহিংসা পুষবে। সরল একটা ছেলে। নিজের দেশ বা মা'র কথা বলতে গিয়ে আবেগ তাড়িত হয়ে ছলছল করে ওঠে ওর দুই চোখ।

নাজমুলকে খুনি ভাবতে গিয়ে বিদ্রোহী হয়ে উঠল রানার মন। হঠাৎ অন্য একটা স্মৃতি মনে পড়ল। ওই তিক্ত অতীত স্মৃতি ভুলে যেতে চেয়েছে, কিন্তু পারেনি।

রবিন কার্লটন!

পেরু। এপ্রিল, দু' হাজার এগারো সাল!

মানুষটা ছিল আমেরিকান। দক্ষ সেনা। পদ ছিল মেজরের। নুমা অফিসে পরিচিত হয় ওরা। দশ মিনিট পেরুবার আগেই

বুঝতে পারে, পরস্পর পরস্পরকে পছন্দ করে ফেলেছে। দারুণ মিলে যায় দু'জনের রুচি। দূর-সাগরকে মন থেকে ভালবাসে ওরা। দ্রুত চালাতে পছন্দ করে গাড়ি। এমন অসংখ্য মিল পেয়েছে ওরা নিজেদের ভিতর।

কার্লটন ওকে দাওয়াত দিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। অবিবাহিত মানুষের বাড়ির মত অগোছালো ছিল না তার কটেজ। দারুণ চমৎকার রাঁধে কার্লটন। কিচেনে রান্নার কাজে সাহায্য করবার সময় রানা টের পেল, খুবই বুদ্ধিমান লোক ওর এই নতুন বন্ধু। স্ট্র্যাটেজির উপর দারুণ সব আইডিয়া আসে তার মগজে।

এরপর বহুবার ওদের দেখা হয়েছে নুমা অফিসে বা অন্য কোথাও। যোগাযোগ ছিল ফোনে। রানার জন্মদিনে বা ঈদে পৌঁছে যেত কার্লটনের দামি উপহার। একইভাবে ক্রিসমাস বা কার্লটনের জন্মদিনে পৌঁছে যেত রানার সুন্দর কোনও উপহার।

তারপর, দু'হাজার এগারো সালের এপ্রিলে রানা ছিল পেরুর আকাশছোঁয়া আন্দেজ পর্বতে, বাংলাদেশ আর্মির একটা কমাণ্ডো ইউনিট নিয়ে ট্রেনিঙে ছিল। সেসময় গুজব শুনল, আন্দেজ পর্বতের অনেক উপরে প্রাচীন এক ইনকা মন্দিরের ভিতর আবিষ্কৃত হয়েছে খুব গুরুত্বপূর্ণ এক আর্টিফ্যাক্ট। দামি আর্টিফ্যাক্ট কেড়ে নিতে ইউনিভার্সিটি রিসার্চারদেরকে খুন করেছে একদল ট্রেজার-হাণ্টার। তাদের সঙ্গে আধুনিক সব অস্ত্র। পেরুভিয়ান প্রেসিডেন্ট সহায়তা চেয়েছেন ইউনাইটেড স্টেট্সের কাছে।

রানা তখন ঠিক করল, পর্বতের ওই মন্দিরে ওর দল নিয়ে যাবে, তাতে ট্রেইনি অফিসাররা বাস্তব সমস্যা কেমন হয় তা বুঝবে। জায়গাটা খুব দূরেও নয়, সেদিনই রওনা দিল ওরা।

পাহাড়ের ওই এলাকায় পৌঁছে রানা দেখল, ওখানে আগেই হাজির হয়েছে ইউএস আর্মি রেঞ্জারের পুরো এক প্লাটুন সৈনিক। সবুজ একটা পাহাড় ঘিরে রেখেছে তারা। চারপাশের দুই মাইলের

ভিতর কাউকে ঢুকতে দিচ্ছে না। পাহাড়ের চূড়ায় প্রায় ধসে পড়া পিরামিড আকৃতির ইনকা মন্দির দূর থেকেই চোখে পড়ছিল।

রেঞ্জারদের কর্নেলের কাছ থেকে রানা শুনল, ওই মন্দিরের ভিতর ঢুকেছে মেরিনদের একটি রিকনিসেন্স ইউনিট। মেরিনদের আরেকটি দল এসেছে। কিন্তু তাদেরকে মন্দিরের দিকে যেতে দেয়া হয়নি। রানা আরও জানল, মন্দিরের ভিতর যে ইউনিট ঢুকেছে, সেটার নেতৃত্বে আছে মেজর রবিন কার্লটন।

সবার আগে পৌঁছেছে সে। ওর দল নিয়ে ব্রাজিলের জঙ্গলে ট্রেইনিঙে ছিল। আমেরিকান সামরিক বাহিনীর উঁচু পদ থেকে নির্দেশ আসতেই এখানে চলে এসেছে।

আর্মি রেঞ্জার কর্নেল জানেন না, কী ঘটছে পোড়ো মন্দিরের ভিতর। অন্য ইউনিটগুলোকে বলে দেয়া হয়েছে, এই এলাকার দুই মাইলের ভিতর কেউ যেন ঢুকতে না পারে। ওই সীমানা পেরুবার উপায় ছিল না রানার, ওখানেই থামতে হয় বাংলাদেশ আর্মির দলটিকে। অবশ্য, দ্বিতীয় মেরিন ইউনিটের পরিচিত একজনের কাছ থেকে একটা হেলমেট চেয়ে নিয়েছিল রানা।

এর কিছুক্ষণ পর হাজির হলো নতুন আরেকটা মিলিটারি ইউনিট।

এদেরকে অবশ্য ভিতরে ঢুকতে দিল রেঞ্জারদের কর্নেল। ওই দলটি ছিল সিল টিম। তখন মেরিনদের কে যেন বলল, এরা এসেছে মাইন সরিয়ে নিতে। মেজর রবিন কার্লটন নাকি মন্দিরের চারপাশে মাইন পেতে রেখেছে।

একঘণ্টা পর মন্দিরের ভিতর শুরু হলো তুমুল গোলাগুলি।

নীচ থেকে দেখা গেল, মন্দিরের ভিতর ঢুকে পড়েছে সিল ইউনিট। এরপর মেরিনদের কাছ থেকে ধার নেয়া হেলমেটের ইয়ারপিসে রানা শুনল চিৎকার। বেশ স্ট্যাটিক চলছে, তার ভিতর দিয়ে চিৎকার করে বলা হলো:

'আমি মেজর রবিন কার্লটন, ইউনাইটেড স্টেট্স্ মেরিন ফোর্স রিকনিসেন্স ইউনিট ফোর। রিপিট করছি: আমি ইউএস মেরিন ফোর্স রিকনিসেন্স ইউনিটের মেজর রবিন কার্লটন। বাইরে কি মেরিন ইউনিট আছ? থাকলে দয়া করে সাড়া দাও!'

দ্বিতীয় মেরিন ইউনিটের মেজর জবাব দিল না, অন্য কাজে ব্যস্ত।

কিন্তু রানা সাড়া দিল। বলল, 'আমি মাসুদ রানা। ছোট একটা ইউনিট নিয়ে পাহাড়ের গোড়াতেই আছি। এরা আমাদের ঢুকতে দিচ্ছে না। রবিন, তুমি অনুমতি আদায় করে দিতে পারবে?'

কিন্তু ওর মনে হলো, কার্লটন ট্র্যান্সমিট করলেও এদিকের কোনও কথা শুনছে না।

আবারও বলল কার্লটন: 'মন্দিরের বাইরে আছ কোনও মেরিন? দয়া করে এখনই রেইড করো! আমার ইউনিটের ভিতর বিশ্বাসঘাতক ঢুকিয়ে দিয়েছে ওরা! মেরিনস্, সিল টিম বলেছিল আমাদেরকে সাহায্য করতে এসেছে! বলেছিল, ওরা স্পেশাল ইউনিট! মন্দির পাহারা দেয়ার জন্য ওয়াশিংটন থেকে এসেছে! তারপর পিস্তল বের করে একে একে আমাদেরকে খুন করতে শুরু করেছে! এখন আমাকেও খুন করতে চাইছে! আমার নিজের লোক রয়েছে তাদের সঙ্গে! হারামজাদারা বিক্রি হয়ে গেছে! আমার ইউনিটের ভিতর বিষ ঢুকিয়ে দিয়েছে ওরা! আমার নিজের লোকই এখন হামলা করছে...'

এরপর কেটে গেল সিগনাল। চট্ করে মেরিনদের দিকে চাইল রানা। একটু আগে মেরিনদের মেজর খুলে রেখেছে হেলমেট। টুলে বসে ওটা দিয়ে হাঁটুর উপর টোকা দিচ্ছে। গাজরের মত লালচে চেহারায় মহাবিরক্তি। লোকটা বোধহয় কার্লটনের কথা শুনতে পায়নি। না কি ব্যাপারটা ইচ্ছাকৃত? দুশ্চিন্তার কোনও ছাপ নেই তার মুখে। একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে তরুণ লেফটেন্যান্ট।

তার মাথায় হেলমেট নেই, তারটা দিয়ে দিয়েছে রানাকে। বুঝতে দেরি হলো না রানার, কার্লটন ট্র্যান্সমিট করেছে অফিসার্স-ওনলি ফ্রিকোয়েন্সিতে। তার মানে, ও নিজে ছাড়া কেউ শুনতে পাচ্ছে না কিছু।

নিজের দলকে তৈরি হতে বলল রানা, পাঁচ মিনিট পেরুনোর আগেই রওনা হলো মন্দির লক্ষ্য করে। কিন্তু বিশ ফুট যাওয়ার আগেই ওদেরকে ঘিরে ফেলল রেঞ্জারদের বড় একটা সশস্ত্র দল। সংখ্যায় তারা ষাটজন, ওদিকে রানা সহ ওর দলে মাত্র চোদ্দজন।

রেঞ্জার কর্নেল কঠোর স্বরে বলল, 'মেজর রানা, আমাকে স্পষ্ট নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কেউ ওদিকে যাবে না। কেউ না। কেউ বা কোনও দল মন্দিরে ঢুকতে চাইলে, তাকে বা তাদেরকে গুলি করা হবে। আপনারা বিদেশি... আমি চাই না আপনাদের উপর গুলি চালাতে হোক।' এরপর আরও শীতল হয়ে উঠল তার কণ্ঠ, 'আপনার কি মনে হয় আমরা গুলি করব না? ...আমি কিন্তু দ্বিতীয়বার মুখে কিছু বলব না।'

চুপ করে রেঞ্জার কর্নেলের দিকে চেয়ে ছিল রানা।

লোকটার উচ্চতা সাড়ে ছয়ফুট মত। বয়স হবে পঁয়তাল্লিশ। ঢাল আকৃতির বুক। লালচে চেহারা। ক্রু-কাট চুল। চোখদুটো মৃত মাছের চোখের মত। রানার এখনও মনে আছে লোকটার নাম। রোবটের মত করে বলেছিল: 'শুনে রাখুন, আমি ইউনাইটেড স্টেটস আর্মির কর্নেল ন্যাট লেদারউড।'

মন্দিরের কাছে যাওয়া আর হয়নি রানা বা ওর দলের কারও। মেরিন লেফটেন্যান্টের দিকেও এগোতে পারেনি, তার হেলমেটও ফিরিয়ে দেয়া সম্ভব হয়নি। তখনও হেলমেট ইন্টারকমে রবিন কার্লটনের আর্তি শুনছে রানা: 'মেরিনদের কেউ কি নেই তোমরা? আমাদের খুন করছে ওরা!'

বারবার যোগাযোগ করেছে কার্লটন। তখন প্রচণ্ড রাগে থরথর

করে কাঁপছে রানা। সিল টিম এরই ভিতর কার্লটনের বেশিরভাগ লোককে মেরে ফেলেছে। কার্লটন হতাশ হয়ে বলেছিল: 'আমার নিজের লোক যোগ দিয়েছে ওদের সঙ্গে! আমাদেরকে মেরে ফেলছে! আমি বুঝতে পারছি না কী ঘটছে!'

কিছুক্ষণ পর রবিন কার্লটন বলেছে, 'হায় ঈশ্বর! আমি ছাড়া কেউ নেই আমার দলের!'

মন্দির থেকে আর বেরোয়নি সে।

বাংলাদেশ আর্মির কমাণ্ডোদের ট্রেইনিং শেষে সোজা ইউএসএ ফেরে রানা। মেরিন অফিসে খোঁজ নিতেই ওখান থেকে জানানো হলো: ওই মন্দিরের ভিতর কোনও শত্রু পায়নি মেজর রবিন কার্লটন। ওখানে কোনও লড়াইও হয়নি। আসলে মন্দিরের ভিতর রহস্যজনক কোনও আর্টিফ্যাক্ট ছিল না। ফাঁকা পড়ে ছিল ভাঙা মন্দির। চারপাশ খুঁজতে শুরু করবার পর তার দলের কয়েকজন, তাদের ভিতর কার্লটন নিজেও, পড়ে যায় গোপন এক কূপের ভিতর। ওটা ছিল কমপক্ষে এক শ' ফুট গভীর। চারদিকে ছিল পাথরের দেয়াল। অত উপর থেকে পড়ে একজনও বাঁচেনি। পরে উদ্ধার করা হয়েছে মৃতদেহগুলো।

অবশ্য, মেজর রবিন কার্লটনের লাশ পাওয়া যায়নি।

মেরিন অফিসের রিপোর্ট অনুযায়ী: ওই মন্দিরে অস্বাভাবিক কিছুই ঘটেনি; সতর্ক না হলে এমন মর্মান্তিক দুর্ঘটনা তো ঘটতেই পারে!

সেদিন মারা পড়ে বারোজন মেরিন।

রানা জানে, ও একমাত্র মানুষ যে কার্লটনের কথা শুনেছিল। কাউকে বললেও বিশ্বাস করবে না, কার্লটনের নিজ লোক ওদেরকে খুন করেছে! এরপর আমেরিকার সেনাবাহিনীর ব্যাপারে খোঁজ-খবর নিতে শুরু করে রানা। কিন্তু জরুরি তথ্য না পাওয়ায় বেশি দূর এগোতে পারেনি।

এখন বরফের নীচে অ্যান্টার্কটিকার উইলকক্স আইস স্টেশনে কথাটা মনে পড়ে কেমন যেন কু ডাকছে ওর মন। কার্লটনের কণ্ঠ বাজছে কানে: 'আমার ইউনিটের ভেতর বিশ্বাসঘাতক ঢুকিয়ে দিয়েছে ওরা!'

বিজ্ঞানীদের ভিতর কেউ হাক্সলেকে খুন করে থাকতে পারে। কার্লটনের বলা সেই 'ওরা' কারা? ইউএস সরকার? ইউএস মিলিটারি?

হতে পারে।

প্রাক্তন সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ইউনাইটেড স্টেটসের মিলিটারিতে বিশেষ কিছু লোক ঢুকিয়ে দিত সরকার। আসলে তাই করে প্রায় প্রতিটি দেশ। সাধারণ অফিসার বা সৈনিকরা এদেরকে ছুঁচোর চেয়ে বেশি ঘৃণা করে।

নিজের দলের ভিতর বিশ্বাসঘাতক থাকতে পারে, ঠাণ্ডা একটা শিরশিরে অনুভূতি নেমে গেল রানার মেরুদণ্ড বেয়ে। মনে মনে আবার হিসাব কষতে শুরু করেছে:

তিশা করিম। মিষ্টি একটা মেয়ে। তরুণ এবং আহত কেভিন হাক্সলেকে খুন করবে কেন? কোনও কারণ তো নেই। কারও সঙ্গে কোনও রাগারাগি নেই তিশার। স্কুবা গিয়ার তৈরি রাখতে ই-ডেকে নেমে এসেছে। তার সঙ্গে এখনও আছে সার্জেন্ট হোসেন আরাফাত দবির। তিশা কি কোনওসময়ে একেবারে একা ছিল? সেই সময়ে উঠে যায় এ-ডেকে? খুন করে কেভিন হাক্সলেকে?

সার্জেন্ট হোসেন আরাফাত দবির সত্যিকারের দক্ষ সৈনিক, যার উপর ভরসা করা যায়। একটু পর পর গিয়ে নিশাত সুলতানাকে দেখে আসছে। সে ই-ডেক ছেড়ে এ-ডেকে গিয়েছিল? উপরে উঠে যাওয়ার কোনও কারণ নেই। কিন্তু পারে তো যেতে?

একমাত্র নিশাত সুলতানাকে বিশ্বাস করতে পারবে রানা। সে নিজেই আহত, চাইলেও কেভিন হাক্সলেকে খুন করতে পারত না।

থমথমে চেহারা নিয়ে সাগরের পুলের দিকে চেয়ে রইল রানা। ওদের ভিতর বরফ-ঠাণ্ডা মগজের খুনি আছে! ওয়াকার, নিশাত, নিনা ভিসার এবং ও নিজে ছাড়া অন্যরা যে-কেউ খুনি হতে পারে!

দুই লেফটেন্যান্ট গোলাম মোরশেদ ও তিশা করিম এবং সার্জেন্ট জনি ওয়াকার ডাইভ দেয়ার জন্য প্রস্তুত। ওদের পিঠে নেভির লো-অডিবিলিটি এয়ার ট্যাঙ্ক। আজকাল ওই জিনিসকে স্টেলথ ট্যাঙ্ক বলে।

পানির ভিতর খুব দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে আওয়াজ, আর সাধারণ স্কুবা ট্যাঙ্ক নানা শব্দ তৈরি করে। মাউথ পিস থেকে কমপ্রেস্‌ড্ বাতাস বেরুবার সময় বেশ জোরালো বগ-বগ শব্দ তোলে। কমার্শিয়াল আণ্ডারওয়াটার মাইক্রোফোন চট্ করে ধরতে পারে ডুবুরির ব্রিদিং গিয়ারের হিসহিস আওয়াজ। এটা মাথায় রেখে ইউএস নেভি কোটি ডলার খরচ করে নিঃশব্দ আণ্ডারওয়াটার ব্রিদিং অ্যাপারেটাস তৈরি করিয়েছে। লাবা, বা লো-অডিবিলিটি ব্রিদিং অ্যাপারেটাস তাদের চাহিদা ভালভাবেই পুরণ করেছে। কোনও আওয়াজ করে না ওই জিনিস। সাধারণ অডিও ডিটেকশন সিস্টেম যেমন স্টেলথ এয়ারক্রাফট ধরতে পারে না, ঠিক তেমনই বর্তমানের স্টেলথ ট্যাঙ্ক।

ওর দলের দিকে চাইল রানা। যে যার মুখে মুখোশ বসিয়ে নিয়েছে। এবার ঝাঁপিয়ে পড়বে রক্ত মিশ্রিত লালচে পানিতে। আরেকবার পুলের দিকে চাইল রানা। মাঝে ভাসছে ডাইভিং বেল, এ ছাড়া পানিতে কিছুই নেই। কমপক্ষে চল্লিশ মিনিট আগে বিদায় নিয়েছে খুনি তিমিগুলো। চট্ করে আবার ফিরবে বলে মনে হয় না। কাঁধে টোকা পড়তেই ঘুরে চাইল রানা।

কখন যেন এসেছে নিনা ভিসার। পরনে নীল-কালো থারমাল-ইলেকট্রিক ওয়েটসুট। একটু চমকে গেল রানা। টানটান হয়ে আছে নিনার পোশাক। এখানে পৌঁছে তাকে ভাল করে দেখেনি

ও। অপূর্ব সৌষ্ঠবের কারণে বড় মাপের মডেল হতে পারত নিনা ভিসার।

'একটু আগেও আপনার সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছি,' বলল নিনা। 'ব্যস্ততার কারণে সময় হয়নি আপনার। ...আমি অন্যদের সঙ্গে নামতে চাই।'

চুপ করে আছে রানা।

'ওই গুহায় নামতে গিয়ে মরেছে এই স্টেশনের নয়জন। আমি জানতে চাই, ওখানে আসলে কী আছে।'

নিনা ভিসারের দিক থেকে চোখ সরিয়ে বামে দাঁড়িয়ে থাকা তিন যোদ্ধাকে দেখল রানা। একটু কুঁচকে গেছে ওর ভুরু।

'আমি ওদেরকে সাহায্য করতে পারব,' বলল নিনা। 'বিশেষ করে গুহার বিষয়ে।'

'খুলে বলুন, কীভাবে।'

'জন প্রাইস বলেছিলেন ওই গুহা পানির নীচে,' বলল নিনা। 'উনি আরও বলেন, গুহার বরফ-দেয়াল কয়েক শ' ফুট চওড়া। ...এখন, গুহার দেয়াল যদি খাড়া হয়, ধরে নিতে পারেন ওটা তৈরি হয়েছে ভূমিকম্পের কারণে। বা সাগরের নীচের লাভার চাপে। শুধু নীচ থেকে পাথরের প্রচণ্ড ঠেলা খেলে তৈরি হয় এমন দেয়াল।'

'আমার লোক সতর্ক থাকবে, ডক্টর ভিসার।'

'ঠিক আছে। কিন্তু আমি বলতে পারব ওখানে কী আছে।'

এবার পুরো মনোযোগ দিল রানা। পানির পুলের কিনারে চলে গেছে তিন ডুবুরি। 'ওয়াকার-তিশা-যোরশেদ, একমিনিট অপেক্ষা করো।' ঘুরে নিনা ভিসারের দিকে চাইল রানা। 'তা হলে বলুন, ডক্টর ভিসার, নীচে কী আছে।'

'বলছি,' কথা গুছিয়ে নেয়ার জন্য থামল নিনা। রানা বুঝতে পারছে, এ ব্যাপারে অনেক ভেবেছে সে।

'এক নম্বর থিয়োরি। ওটা এলিয়েনদের। অন্য গ্রহ থেকে এসেছে স্পেসশিপ। অন্য সভ্যতা থেকে। এই বিষয়ে খুব বেশি জানি না। কিন্তু স্পেসশিপ যদি এলিয়েনদের হয়, ওটা একবার দেখার জন্য নিজের হাত কেটে দিতেও গররাজি হব না।'

'আপনার হাত-পা কাটতে হবে না, এমনিতেই আমাদের একজন পা হারিয়েছে,' শুকনো শোনাল রানার কণ্ঠ। 'আর কিছু বলবেন?'

'দুই নম্বর থিয়োরি,' বলল নিনা। 'ওটা আসলে এলিয়েন নয়।'

'তাই?' ভুরু নাচাল রানা।

'হতেই পারে,' বলল নিনা, 'ওটা এলিয়েন বিমান নয়। আর এ থিয়োরি আমার পরিচিত। সত্যিকারের প্যালিয়োণ্টোলজি। এটা অনেক পুরোনো থিয়োরি। কিন্তু আজ পর্যন্ত কেউ প্রমাণ করতে পারেনি।'

'কী ধরনের প্রমাণ?'

চাপা শ্বাস ফেলল নিনা ভিসার। 'এই থিয়োরিতে বলা হয়েছে, বহুকাল আগে পৃথিবীতে সভ্য কোনও জাতি ছিল।' থামল সে, চেয়ে আছে রানার চোখে। বুঝতে চাইছে মনের কথা।

কিছুক্ষণ পর বলল রানা, 'বলতে থাকুন।'

'সে বহু হাজার বছর আগের কথা।' মিটিমিটি হাসল নিনা। 'আমি বলছি ডাইনোসর আসার আগের কথা। ধরুন, চার শ' মিলিয়ন বছর আগে? ...আপনি যদি ভাবতে শুরু করেন, ঠিক বুঝবেন এমন হতেই পারে— সে আমলে অতি সভ্য কোনও জাতি ছিল। নিশ্চয়ই জানেন, আমাদের মানব-সভ্যতার উত্থান মাত্র এক মিলিয়ন বছরের কম সময়ের।

'পৃথিবীর ইতিহাসে আমাদের উদ্ভব অল্প ক'দিনের। যদি ধরে নিই পৃথিবীর বয়স চব্বিশ ঘণ্টা, তো প্রথম মানব জন্ম নিয়েছে মাত্র তিন সেকেণ্ড আগে। তার মানে, মানব-সভ্যতা এসেছে আরও

অনেক পরে। নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, আমি হোমো সেপিয়েন্সদের কথা বলছি। মাত্র বিশ হাজার বছর ধরে সভ্য হচ্ছি আমরা। অর্থাৎ, পৃথিবীর চব্বিশ ঘন্টার জীবনে মাত্র এক সেকেণ্ড সময় ধরে সভ্য হচ্ছি আমরা।'

চুপ করে আছে রানা। বলতে গিয়ে উত্তেজিত হয়ে উঠেছে নিনা ভিসার, পছন্দের বিষয় পেয়ে চকচক করছে দুই চোখ।

'প্যালিয়োণ্টোলজি আমাদেরকে জানিয়েছে, ঢের পরে এসেছে স্তন্যপায়ী প্রাণী। তারও অনেক পরে এসেছে মানুষ। সূর্য থেকে পৃথিবীর সঠিক দূরত্ব, ঠিক তাপমাত্রা, উপযুক্ত পরিবেশ, পরিবেশে পর্যাপ্ত অক্সিজেন, সবচেয়ে বড় কথা— ডাইনোসর বিলুপ্ত হওয়া, এর ফলে পৃথিবীতে উদ্ভব হয়েছে মানব জাতির। আমরা সবাই জানি অ্যালভেরেজ থিয়োরি, একটা প্রকাণ্ড গ্রহাণু আকাশ থেকে পড়ে শেষ করে দিল সমস্ত ডাইনোসর, তারপর রাজত্ব শুরু করল স্তন্যপায়ী প্রাণী। কিন্তু একটা কথা বোধহয় জানেন না, গত সাত শ' মিলিয়ন বছরে কমপক্ষে চারটে গ্রহাণু এই গ্রহের বুকে পড়েছে।'

'অল্পস্বল্প পড়েছি,' বলল রানা।

'হ্যাঁ। জানার তো কথা, আপনি শিক্ষিত মানুষ। স্যার এডমুণ্ড হ্যালি মন্তব্য করেছেন, গোটা কৃষ্ণ সাগর তৈরি হয়েছে বিশাল একখণ্ড গ্রহাণুর আঘাতে। এমনটি ঘটে কয়েক শ' মিলিয়ন বছর আগে। নিউ যিল্যাণ্ডের বিখ্যাত ফিজিসিস্ট আলেকযাণ্ডার বিকারটন রাদারফোর্ডে পড়াতেন, তিনি বলেন: গোটা দক্ষিণ আটলাণ্টিক সাগর, অর্থাৎ দক্ষিণ আফ্রিকা এবং দক্ষিণ আমেরিকা আগে প্রকাণ্ড একটা গামলার মত ছিল। তিন শ' মিলিয়ন বছর আগে ওখানে এসে পড়ে বিশাল এক গ্রহাণু।

'এখন, আমরা যদি ধরে নিই, প্রকাণ্ড সব ডাইনোসরদের মত করেই অন্য সব সভ্যতা হারিয়ে গেছে প্রকাণ্ড গ্রহাণুর আঘাতে...

এবার নিজেদেরকে জিজ্ঞেস করতে পারি— কেমন ছিল সেই সভ্যতা? আর কেন ওভাবে বিলুপ্ত হলো ডাইনোসরদের মত? গত কয়েক বছরে নামকরা ক'জন বিজ্ঞানী এই একই কথা বলেছেন। স্ট্যানফোর্ডের জোসেফ সরেনসন তাঁদের ভিতর বেশি প্রখ্যাত— তিনি বলেন, বহু আগের সেই সমাজ বোধহয় অন্য কোনও প্রাণীর ছিল না, ছিল মানব-সভ্যতার।'

অন্যদের দিকে চাইল রানা। ওরা অপেক্ষা করছে। মনোযোগ দিয়ে শুনছে নিনা ভিসারের প্রতিটা কথা।

খেই ধরল নিনা ভিসার: 'হয়তো জানেন, প্রতি বাইশ হাজার বছরে আধ ডিগ্রি কাত হয় পৃথিবী। সরেনসন বলতে চেয়েছেন, চার শ' মিলিয়ন বছর আগে এমন করেই কাত হয়েছিল পৃথিবী। তখন এই গ্রহ ঠিক এতটা দূরেই ছিল সূর্য থেকে। তার মানে, তাপমাত্রা ছিল এখনকার মতই। আমরা এই স্টেশন থেকে যে আইস কোর স্যাম্পল পেয়েছি, তাতে দেখা গেছে: আমাদের বর্তমানের পরিবেশের মতই ছিল সেই বাতাস। তাতে ছিল একই পরিমাণ অক্সিজেন, নাইট্রোজেন ও হাইড্রোজেন। ...আপনি কি এর মানে বোঝেন? আগেও ঠিক এমনই অবস্থানে ছিল পৃথিবী।'

রানা মনে মনে বলল, তাই?

'ওই পাতাল-গুহা সাগরের পনেরো শ' ফুট নীচে,' বলল নিনা। 'অর্থাৎ, অ্যাণ্টার্কটিকার সাধারণ সমতল থেকে কমপক্ষে আড়াই হাজার ফুট নীচে। হতে পারে ওখানে রয়েছে চার শ' মিলিয়ন বছরের বরফ। ওটা যদি নীচ থেকে ঠেলা খেয়ে উঠে আসে, তো ওই বরফ আসলে আরও অনেক আগের হতে পারে।

'ওখানে যা-ই থাক্, সেটা লক্ষ লক্ষ বছর ধরে জমাট বেঁধে আছে। তার মানেই বহু আগেকালের কথা। হতে পারে ওই স্পেসশিপ এলিয়েনদের। অথবা অতীতের মানুষের। লক্ষ লক্ষ বছর ধরে টিকে আছে মানুষ। যাই হোক, মেজর, এটা পৃথিবীর

সবচেয়ে বড় প্যালিয়োণ্টোলজিকাল আবিষ্কার, আর আমি সে-মুহূর্তে উপস্থিত থাকতে চাই।'

প্রচুর কথা বলে হাঁপিয়ে উঠেছে নিনা ভিসার, বড় করে শ্বাস নিতে শুরু করেছে।

চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে রানা, ভাবছে।

নরম স্বরে বলল নিনা, 'মেজর, আমি জীবনের সামান্যতম তোয়াক্কাও করি না। এমন আবিষ্কারের জন্য মরতেও দ্বিধা করব না। এটা হতে পারে মানব-সভ্যতার সবচেয়ে বড় আবিষ্কার। আমার সারাজীবন ধরে...'

কৌতূহল নিয়ে নিনার দিকে চেয়ে আছে রানা। ও নিজে কিছু বলবে, সেটা টের পেয়ে থেমে গেল নিনা।

'আপনার মেয়ের কী হবে?' জানতে চাইল রানা।

আস্তে করে মাথা কাত করল নিনা। এ ধরনের প্রশ্নের জন্য তৈরি ছিল না।

'আপনি মেরিকে রেখে নীচে নামতে চান?' বলল রানা।

'ও নিরাপদেই থাকবে,' হেসে ফেলল নিনা। 'ওর জন্য তো আপনি থাকছেন।'

আগে কখনও নিনা ভিসারকে হাসতে দেখেনি রানা। ঝলমল করে উঠেছে গোটা মুখ। যেন নীল-সাগরে বইছে ঝিরঝিরে হাওয়া, চারপাশে সোনালী রোদ, দূরে দারুণ সুন্দর কোনও সবুজ দ্বীপ।

'তা ছাড়া, নীচে গেলে আমাদের হারিয়ে যাওয়া ডুবুরিদের পরিচয় জানিয়ে দিতে পারব আপনাদেরকে। আর...'

হাত তুলে বাধা দিল রানা। 'ঠিক আছে, আপনি যেতে পারেন। কিন্তু ব্যবহার করবেন আমাদের স্কুবা ডাইভিং গিয়ার। কারও জানা নেই পাতাল-গুহায় ডুবুরিদের কী হয়েছে। কিন্তু সন্দেহ করছি, ওখানে যা আছে, সেটা ব্রিদিং গিয়ারের আওয়াজ পেয়েই

হাজির হয়েছিল। চাই না আপনারও করুণ পরিণতি হোক।'

'আমার জন্য ভেবেছেন, তাই অসংখ্য ধন্যবাদ, মেজর,' বলল নিনা ভিসার। গলা থেকে চেইন ও লকেট খুলল সে, রানার দিকে বাড়িয়ে দিল। 'ডাইভ দেয়ার সময় এটা সঙ্গে রাখতে চাই না। এটা রাখুন। ফিরে এসে নেব।'

'বেশ,' জিনিসটা নিল রানা, রেখে দিল প্যান্টের পকেটে।

ঠিক তখন পুলের বামে জোরালো গোঙানির আওয়াজ উঠল। চট্ করে ঘুরে চাইল রানা, গভীর থেকে বিশাল কালো কী যেন উঠে আসছে। চারপাশ ভরে গেছে সাদা বুদ্বুদ ও ফেনায়। রানা প্রথমে ভেবেছিল, আবার দেখা দিয়েছে কিলার ওয়েইল, বোধহয় পেট ভরেনি ওদের। কিন্তু এক মুহূর্ত পর টের পেল, ওটা বিন্দুমাত্র সাঁতার কাটছে না। হুইশ্ আওয়াজ তুলে মসৃণভাবে উঠে এল পুলের সমতলে। চারপাশে ছড়িয়ে গেল ঢেউ ও ফেনা। সেই ফেনার ভিতর মিশছে সরু রেখার রক্ত। প্রকাণ্ড কালো জিনিসটা প্রায় ডুবু-ডুবু। প্ল্যাটফর্মে কয়েক পা পিছিয়ে গেছে সবাই।

এক মুহূর্ত পর ওটাকে চিনল রানা। কিলার ওয়েইলই। মৃত। পানিতে শিথিলভাবে ভাসছে কালো-সাদা লাশ। পাশেই প্ল্যাটফর্ম। ওখান থেকে ছুঁয়ে দিতে পারবে যে-কেউ। বোধহয় পালের সবচেয়ে বড়টা এটা, পুরুষ তিমি। দৈর্ঘ্যে কমপক্ষে তিরিশ ফুট। ওজন হবে সাত টন।

রানা ভেবেছিল, এই তিমির মাথায় গুলি করেছে নিশাত সুলতানা। ওটা ছাড়া অন্য কোনও তিমি মরেনি; কিন্তু এক সেকেণ্ড পর সিদ্ধান্ত পাল্টে নিল ও।

নিশাতের গুলিতে ক্রিকেট বলের মত গর্ত হওয়ার কথা। কিন্তু এই তিমির মাথায় কোনও ক্ষত নেই।

তা ছাড়া, আরেকটি বিষয় লক্ষ্য করবার মত।

এটা পানির ভিতর ভেসে উঠেছে।

কোনও স্তন্যপায়ী প্রাণী মরলে প্রথমে পানিতে ভাসতে থাকে, তারপর পেট ভরে গেলে টুপ করে ডুবে যায়। নিশাত যে তিমিকে মেরেছে, এতক্ষণে ওটা সাগরের মেঝেতে গিয়ে ঠেকেছে।

কিন্তু এই তিমিকে খুন করা হয়েছে একটু আগে।

অবাক চোখে মৃত তিমির দিকে চেয়ে আছে সবাই।

পানির ভিতর অল্প অল্প করে গড়িয়ে চলেছে লাশ। একটু পর চিত হলো। প্রকাণ্ড তিমির সাদা পেটে চোখ পড়তেই ঢোক গিলল রানা।

নিনা ভিসারের মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল।

বিড়বিড় করে কী যেন বলল তিশা।

চিরে দেয়ার দীর্ঘ দুটো রক্তাক্ত ক্ষত তিমির তলপেটে। পাশাপাশি উঠে গেছে গলা পর্যন্ত। ছিঁড়ে দেওয়া হয়েছে পেট-বুক ও গলা। পেট থেকে বেরিয়ে এসেছে কুণ্ডলি পাকানো সাদাটে-খয়েরি নাড়িভুঁড়ি, পরিধি মানুষের হাতের চেয়ে বেশি।

ছুরি দিয়ে কাটা হয়নি সমান্তরাল দুই ক্ষত, যেন পেট ফুটো করেছে মস্ত দুটো দাঁত, তারপর চিরচির করে কেটে থেমেছে গিয়ে গলার গোড়ায়। চামড়া-মাংস উপড়ে ছিঁড়ে নেয়া হয়েছে।

চুপ করে লাশের দিকে চেয়ে আছে ওরা, প্রায় সবার চোখে চিন্তা ও ভয়ের ছাপ। বুঝতে পারছে, নীচে এমন কিছু আছে যেটা মেরে ফেলতে পারে এই বিশাল কিলার ওয়েইলকে!

আস্তে করে শ্বাস ফেলল রানা, তারপর ঘুরল নিনা ভিসারের দিকে। 'এখনও যেতে চান?'

আরও কয়েক সেকেণ্ড তিমির লাশের দিকে চেয়ে রইল নিনা, তারপর ফিরে চাইল রানার দিকে। 'না,' নিচু স্বরে বলল, 'যাব না, এ-কথা বলব না।'

উনিশ

পুল ডেকে থম মেরে বসে আছে কর্পোরাল নাজমুল, খুব চিন্তিত হয়ে পড়েছে। কিছুক্ষণ পর চাইল পুলের মাঝে। উপর থেকে নেমে এসেছে উইঞ্চের কেবল, চলে গেছে পানির অনেক গভীরে। কেবলের শেষে ডাইভিং বেল। ওদের দলের ডুবুরিদের সঙ্গে গেছে নিনা ভিসার। যত দ্রুত সম্ভব গতি তুলে নামছে কেবল।

একঘণ্টার বেশি হলো পানির নীচে ডুবুরিরা। থামবে গিয়ে তিন হাজার ফুট গভীরে। অর্থাৎ, প্রায় এক কিলোমিটার। সেজন্য বেশ সময় লাগবে। বিশ মিনিট আগে সার্জেন্ট হোসেন আরাফাত দবির, গানারি সার্জেন্ট ভাইপার ও মেজর স্যার উপরে উঠেছেন। পোর্টেবল রেডিয়ো দিয়ে ম্যাকমার্ডো স্টেশনের সঙ্গে যোগাযোগ করবার চেষ্টা করবে সার্জেন্ট দবির ও ভাইপার। স্যার গেছেন উপরের ডেকগুলো ঘুরে দেখতে। তার আগে ওদেরকে বলেছেন, জেনে নিতে হবে কখন আসবে আমেরিকান সেনাবাহিনী। যখন-তখন অন্য দেশের সেনাবাহিনীর হামলা হতে পারে। বাইরে যেভাবে তুষার-ঝড় হচ্ছে, চাইলেও ওরা সবাইকে নিয়ে রওনা দিতে পারবে না।

ই-ডেকে চুপ করে বসে আছে নাজমুল। শব্দ বলতে শুধু সি-ডেকের উইঞ্চ মোটরের একঘেয়ে ঘং-ঘং আওয়াজ। ওই আওয়াজ ভাল লাগছে না ওর।

হঠাৎ একটা আওয়াজ পেয়ে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল নাজমুল।

শব্দটা হঠাৎ করেই শুরু হয়ে আবারও থেমে গেছে। কারও গলার আওয়াজ। পুরুষ কণ্ঠ। বলে উঠেছে ফ্রেঞ্চ ভাষায়!

ভিএলএফ ট্র্যান্সমিটারের উপর চোখ পড়ল ওর। ওটা কয়েক ফুট দূরে।

হঠাৎ করেই শিসের মত তীক্ষ্ণ আওয়াজ তুলল যন্ত্রটা। তারপর আবারও শোনা গেল কণ্ঠ। ধীর গতিতে বলছে। একই কথা দু'বার বলল। বোধহয় রিপোর্ট করতে বলছে।

স্যর ফ্রেঞ্চ ভাষা জানেন! কখন ছুটতে শুরু করেছে, নাজমুল জানে না। ভুলেই গেছে হেলমেট মাইকে কথা বলতে পারবে। রাং-ল্যাডারে বেয়ে দ্রুত উঠছে, দেড় মিনিট পর পৌঁছে গেল বি-ডেকে। ভাঙা ক্যাটওয়াকে রানাকে দেখেই দৌড়ে গিয়ে থামল সামনে। 'স্যর! ফরাসিদের রেডিয়ো থেকে কী যেন বলছে!'

'নীচে থেকে জানালে তাড়াতাড়ি নামতে পারতাম,' রাং-ল্যাডারের দিকে ছুটতে শুরু করেছে রানা। 'তুমি গিয়ে দবির আর ভাইপারের কাজে সাহায্য করো।'

মই বেয়ে দ্রুত নামছে রানা, মিনিট পেরুবার আগেই পৌঁছে গেল ই-ডেকে। থমথম করছে চারপাশ। কোথাও কোনও আওয়াজ নেই। বোধহয় ট্র্যান্সমিট শেষ করে চুপ হয়ে গেছে রেডিয়ো। হতাশ লাগছে রানার। হেলমেট মাইক চালু করে ঝুঁকে দাঁড়িয়েছে রেডিয়োর সামনে। কোনও কথা এলে অন্যরাও শুনবে।

'আর মাত্র একবার বল্,' মনে মনে বলল রানা।

ঠিক তখনই আবারও বলে উঠল বার্তা প্রেরক: 'হায়েনার পাল, তিনঘণ্টার ভিতর রিপোর্ট দিতে হবে। আবারও বলছি, তিনঘণ্টার ভিতর রিপোর্ট চাই। এর ভিতর যোগাযোগ না করলে ধরে নেয়া হবে সময় শেষ। সেক্ষেত্রে ইঞ্জিন চালু করব আমরা। আবারও বলছি, তিনঘণ্টার ভিতর যোগাযোগ না করলে ইঞ্জিন চালু করা হবে। আউট, কিলার ওয়েইল।

চুপ হয়ে গেছে ভিএলএফ ট্র্যান্সমিটার।

'ইরেজার ডিভাইস,' বিড়বিড় করে বলল রানা। চট্ করে ক্যাসিয়ো ডিজিটাল ঘড়িতে কাউন্ট-ডাউন চালু করল। হেলমেট মাইকে বলল, 'ফ্রেঞ্চদের কাছে ইরেজার ছিল। মন দিয়ে শোনো, ফ্রেঞ্চদের সঙ্গে ইরেজার ছিল। তিনঘণ্টার আগেই ওটা খুঁজে বের করতে হবে, নইলে উড়ে যাবে এই স্টেশন।'

'স্যর,' স্টেশনের বাইরে থেকে বলল নাজমুল। 'ওটা কোথায় রেখেছে আমরা খুঁজে দেখেছি, পাইনি।'

নাজুমলের কথায় মন নেই রানার, দ্রুত ভাবছে। ফ্রেঞ্চ বার্তায় বলা হয়েছে, তারা কিলার ওয়েইল। আর হায়েনা ফ্রেঞ্চ কমাণ্ডোরা, হামলা করেছে এই স্টেশনে। ওদিকের লোকটা নিজেকে কিলার ওয়েইল বলেছে কেন?

কারণ, তারা আছে পানিতে। উপকূলের কাছে। বোধহয় অ্যান্টার্কটিকার তীরের কাছে থেমেছে কোনও ফ্রেঞ্চ রণতরী!

সাধারণত দীর্ঘ ওয়েভলেন্থের জন্য ভিএলএফ ট্র্যান্সমিটার ব্যবহার করে জাহাজ বা সাবমেরিন। কমাণ্ডোরা ট্র্যান্সমিটার সঙ্গে এনেছে জাহাজের সঙ্গে যোগাযোগ করবে বলে!

ওই জাহাজ কোনও ফ্রিগেট বা ডেস্ট্রয়ার, হয়তো আছে তীর থেকে এক শ' মাইল দূরে। এখন উইলকক্স আইস স্টেশনের উপর তাক করেছে অস্ত্র। বোধহয় এক ব্যাটারি নিউক্লিয়ার টিপড্ ক্রুজ মিসাইল!

আগে রানার সন্দেহ হয়নি যে কেন ফ্রেঞ্চ কমাণ্ডোরা সঙ্গে ইরেজার আনেনি, কিন্তু এখন বুঝতে পারছে, বাইরে রয়ে গেছে তাদের ইরেজার— উপকূল থেকে অনেক দূরে জাহাজ ও অস্ত্র। এবং তিনঘণ্টা পর কোনও ডেস্ট্রয়ার থেকে স্টেশনের উপর ফেলবে মিসাইল, সব মিশিয়ে দেবে বরফে।

এখন মাত্র দুটো জিনিস ইরেজার ডিভাইস থামাতে পারে।

প্রথমত: বারো মৃত ফ্রেঞ্চ কমাণ্ডোদের কেউ রিপোর্ট করলে ছোঁড়া হবে না মিসাইল। কিন্তু তা হওয়ার নয়। রানার সামনে এখন একমাত্র উপায়: ম্যাকমার্ডো স্টেশনে যোগাযোগ করা। জানতে হবে কখন উইলকক্স আইস স্টেশনে পৌঁছবে আমেরিকান সৈনিকরা। একইসঙ্গে ম্যাকমার্ডোর মেরিনদেরকে জানাতে হবে, এদিকে এক ব্যাটারি মিসাইল তাক করেছে ফ্রেঞ্চ কোনও রণতরী। হাতে মাত্র তিনঘণ্টা, তার আগেই যেভাবে হোক ঠেকাতে হবে ফ্রেঞ্চদেরকে।

মাইকে বলে উঠল রানা, 'দবির, কথা শুনতে পাচ্ছেন?'

'জী, স্যর,' জবাব দিল সার্জেন্ট আরাফাত।

'আপনারা ম্যাকমার্ডোর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পেরেছেন?'

'জী-না, স্যর।'

'বারবার চেষ্টা করুন,' বলল রানা। 'ওদেরকে লাইনে পেতে হবে। হাতে তিনঘণ্টার চেয়ে কম সময়, তারপর এই স্টেশন গুঁড়িয়ে দেয়া হবে।'

'আমরা চেষ্টা করছি,' জানাল গানারি সার্জেন্ট ভাইপার।

ক্রুজ মিসাইলের কথা ভাবতে গিয়ে শীতল শিরশিরে অনুভূতি নামছে রানার মেরুদণ্ড বেয়ে। চেয়ে আছে ও উইঞ্চের কেবলের দিকে। একটু পর পায়চারি শুরু করল। আসলে হাতে বড়জোর দুই ঘণ্টা, তারপর তুষার-ঝড়ের ভিতর স্টেশন থেকে অনেক দূরে সরে যেতে হবে। কিন্তু সাগরের অনেক নীচে রয়ে গেছে তিশা, মোরশেদ, ওয়াকার ও নিনা ভিসার। ওদেরকে আবার তুলে আনতে অনেক সময় বেরিয়ে যাবে।

'স্যর,' হঠাৎ শুনতে পেল তিশার কণ্ঠ, 'আমি তিশা। রিপিট করছি। আমি লেফটেন্যান্ট তিশা। শুনতে পাচ্ছেন, স্যর?'

হেলমেট মাইক চালু করল রানা। 'হ্যাঁ, শুনছি, তিশা। নীচে তোমাদের কী অবস্থা?'

'প্রায় তিন হাজার ফুট গভীরতায় পৌছে গেছি। এবার কেবল বন্ধ করব।' চুপ হয়ে গেছে মেয়েটি। সামান্য বিরতি নিয়ে বলল, 'ঠিক আছে, কেবল নেমে যাওয়া থেমে গেছে।'

ওর কথা শেষ হতেই হঠাৎ ঝটকা খেল ই-ডেকের উপরের কেবল। অনেক নীচে আচমকা থেমে গেছে ডাইভিং বেল।

'স্যর, আমাদের সময় অনুযায়ী দুটো দশ মিনিট,' বলল তিশা। 'কনফার্ম করুন।'

'তিশা, কনফার্ম করছি, সময় দুপুর দুটো দশ মিনিট,' বলল রানা। ডিপ-ডাইভিং করবার সময় কখন রওনা হয়েছে, তা ভালভাবেই মনে রাখা হয়। গত কয়েক দিন আগে তিশার মত করেই উইলকক্স আইস স্টেশনের বিজ্ঞানীরা এই নিয়ম মেনে ডাইভ দিয়েছে। এবং এরপর একজনও ফিরে আসেনি।

'আবার বলছি, সময় দুপুর দুটো দশ মিনিট। নিজেদের বাতাস ব্যবহার করছি। এবার বেরুব ডাইভিং বেল থেকে।'

হাঁটবার ফাঁকে একবার প্যান্টের পকেটে চাপড় দিল রানা, ওর মনে পড়ল নিনা ভিসার দিয়ে গেছে— একটা লকেট ও চেইন। জিনিসটা বোধহয় হোয়াইট গোল্ডের। একবার ভাবল বের করে দেখবে, পরক্ষণে বাতিল করে দিল চিন্তাটা।

প্রতি মিনিটে একবার হলেও যোগাযোগ করছে তিশা।

কোনও দুর্ঘটনা ছাড়াই ডাইভিং বেল থেকে বেরিয়ে গেছে ওরা চারজন— তিশা, ওয়াকার, মোরশেদ ও নিনা ভিসার। কয়েক মিনিট পর তিশা জানাল, ওরা পাতাল-সুড়ঙ্গের মুখ খুঁজে পেয়েছে। এখন ওটার ভিতর দিয়ে উপরের দিকে উঠছে।

ধীরে ধীরে পায়চারি করছে রানা, ডুবে গেছে গভীর চিন্তার ভিতর।

অনেক নীচের ওই গুহায় কী আছে? ওটার জন্য প্রাণ বাজি ধরেছিল ফ্রেঞ্চ কমাণ্ডোরা, সঙ্গে ইরেজার আনেনি। ভেবেছিল

জিনিসটা নিয়ে চট্ করে সরে পড়বে। তাদের ইরেজার আছে সাগরে, ওখান থেকে মিসাইল এসে পড়বে এই স্টেশনের উপর। হাতে বড়জোর দুই ঘণ্টা। এদিকে ওর দলে আছে ঠাণ্ডা-মাথার খুনি। সে যে কখন কী করে বসবে, কেউ জানে না।

হেলমেট ইন্টারকম জ্যান্ত হয়ে উঠল: 'স্যর, দবির।'

'যোগাযোগ করতে পেরেছেন?'

'না, স্যর।'

রানাদের সঙ্গে আনা পোর্টেবল রেডিয়ো দিয়ে বহুক্ষণ হলো ম্যাকমার্ডো স্টেশনে বার্তা পাঠাতে চাইছে হোসেন আরাফাত দবির, ভাইপার ও নাজমুল। স্টেশনের মেইন এন্ট্র্যান্স দিয়ে বেরিয়ে ফাঁকা জায়গায় থেমেছে ওরা। মনে আশা ছিল, এতে সিগনাল পাবে।

'ইন্টারফেয়ারেন্স কেমন?' জানতে চাইল রানা।

'অনেক বেশি, স্যর,' বিষণ্ন স্বরে বলল দবির।

একমুহূর্ত কী যেন ভাবল রানা, তারপর বলল, 'দবির, আপনারা সিগনাল পাঠাবার চেষ্টা বাদ দিন। ভিতরে চলে আসুন। আপনি বি-ডেকে বিজ্ঞানীদের সঙ্গে কথা বলবেন। তাঁরা আছেন কমন-রুমে। হয়তো তাঁদের কেউ স্টেশনের রেডিয়ো ব্যবহার করে ম্যাকমার্ডোয় খবর পাঠাতে পারবেন।'

'জী, স্যর।'

নীরব হয়ে গেল ইন্টারকম। পুলের পানির দিকে চেয়ে রইল রানা। একটু পর আবারও ওকে পেয়ে বসল দুশ্চিন্তা।

চোখের সামনে ভাসছে কেভিন হাক্সলের ক্ষত-বিক্ষত মৃতদেহ। ওকে খুন করল কে? আপাতত বিশ্বাস করতে পারবে শুধুমাত্র জনি ওয়াকার ও নিনা ভিসারকে। তারা ওর সঙ্গেই ছিল। অন্যরা যে-কেউ খুন করে থাকতে পারে।

সে-কারণে হোসেন আরাফাত দবির, ভাইপার ও নাজমুলকে

কাছাকাছি রাখতে চাইছে। ওদের কেউ খুনি হয়ে থাকলে অন্য দু'জনের সামনে খুন করতে পারবে না।

হঠাৎ আরেকটা চিন্তা এল, মাইকে বলল রানা, 'সার্জেন্ট দবির, আপনি এখনও বাইরে?'

'জী, স্যর।'

'আপনি যখন বি-ডেকে নামবেন, বিজ্ঞানীদের কাছে জিজ্ঞেস করবেন, তাঁদের কেউ আবহাওয়ার ব্যাপারে কিছু জানে কি না,' বলল রানা।

উইলকক্স আইস স্টেশনে এ-ডেকের দক্ষিণ-পুব কোণে রেডিয়ো রুম। ডাইনিংরুমের ঠিক উল্টো পাশে। মাঝে বিশাল শাফট। রেডিয়ো রুমের ভিতর স্যাটালাইট টেলিকমিউনিকেশন গিয়ার ও শর্ট রেডিয়ো ট্র্যান্সমিটার। ঘরের দু'পাশে চারটে রেডিয়ো কন্সোল, প্রতিটির সঙ্গে মাইক্রোফোন, একটা করে কমপিউটার স্ক্রিন, কি-বোর্ড এবং কয়েকটি ফ্রিকোয়েন্সি ডায়াল।

একটা রেডিয়ো কন্সোলের সামনে বসেছে রাফায়লা ম্যাকানটায়ার, রানা ঘরে ঢুকতেই ঘাড় কাত করে চাইল সে।

মেয়েটির বয়স পঁচিশ, আন্দাজ করল রানা। খুব দুশ্চিন্তা করছে। গোল মুখকে ঘিরে বাদামি চুলগুলো। বড় দুই বাদামি চোখে ভয়। কালির মত মাসকারা লেপ্টে আছে গালে। মেয়েটির পাশে দাঁড়িয়েছে হোসেন আরাফাত দবির, নাজমুল ও ভাইপার। ঘরে রাফায়লা একমাত্র বিজ্ঞানী।

হোসেন আরাফাত দবিরের দিকে চাইল রানা। 'আবহাওয়ার ব্যাপারে কিছুই জানে না আর কেউ?'

'তা নয়, স্যর,' বলল দবির। 'আমাদের কপাল ভাল। ইনি মিস রাফায়লা ম্যাকানটায়ার, স্টেশনের রেডিয়ো বিশেষজ্ঞ ও রেসিডেন্ট মিটিয়োরোলজিস্ট।'

'আমি আসলে রেডিয়ো এক্সপার্ট নই,' বলল মেয়েটি। 'বব হিউবার্ট ছিল... কিন্তু পাতাল-গুহার ভিতর হারিয়ে গেছে সে। তাকে কাজে সাহায্য করতাম। এখন আমাকেই এসব দেখতে...' কথা শেষ না করে থেমে গেল সে।

ভরসা দেয়ার ভঙ্গিতে হাসল রানা। 'আপনাকে দিয়েই চলবে, মিস ম্যাকানটায়ার।'

'আমাকে রাফায়লা বলে ডাকতে পারেন।'

'ঠিক আছে রাফায়লা, এবার অন্য একটা আলাপ সেরে নেয়া যাক। এখন আমাদের সামনে দুটো সমস্যা। আপনি হয়তো দুটোর ব্যাপারেই সাহায্য করতে পারবেন। প্রথম: আমাদেরকে খুব দ্রুত ম্যাকমার্ডোর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। তাদেরকে খুলে বলতে হবে এখানে কী ঘটছে। তারা এখনও সেনাবাহিনী না পাঠিয়ে থাকলে, এখনই যেন পাঠায়। একটু আগে পর্যন্ত আমরা আমাদের পোর্টেবল রেডিয়ো দিয়ে ম্যাকমার্ডোয় যোগাযোগ করতে চেয়েছি, কিন্তু সম্ভব হয়নি। এখন প্রথম প্রশ্ন: আপনাদের রেডিয়ো কাজ করবে?'

দুর্বল হাসি দিল রাফায়লা। 'আগে তো কাজ করত। মানে, এসব শুরু হওয়ার আগে। কিন্তু তারপর শুরু হলো সোলার ফ্লেয়ার। আমাদের সবার ট্র্যান্সমিশন নষ্ট হলো। শেষদিকে আমাদের অ্যান্টেনা ভেঙে পড়ল ঝড়ে। ওটা এখনও ঠিক করতে পারিনি আমরা।'

'ঠিক আছে, আমরা ওটা ঠিক করব,' বলল রানা।

মহিলার অন্য একটা কথা শুনে চিন্তিত হয়ে পড়েছে। আগেও অ্যান্টার্কটিকায় এসে সোলার ফ্লেয়ারের খপ্পরে পড়েছে, কিন্তু এটা নিয়ে বেশি ভাবতে যায়নি। জিনিসটা আসলে বিকল করে দেয় ইলেকট্রোম্যাগনেটিক স্পেকট্রাম। সব রেডিয়ো কমিউনিকেশন বাধাগ্রস্ত হয়।

'সোলার ফ্লেয়ার সম্পর্কে খুব বেশি জানি না,' বলল রানা। 'একটু খুলে বলবেন?'

'বেশি কিছু বলার তো নেই,' বলল রাফায়লা। 'আমরা বিজ্ঞানীরাও ওটা সম্বন্ধে খুব বেশি জানি না। সংক্ষেপে সোলার ফ্লেয়ার হচ্ছে: সূর্যের গায়ে প্রচণ্ড তাপের বিস্ফোরণ। বেশিরভাগ লোক বলে সানস্পট। ওই সানস্পট যখন দেখা দেবে, আমাদের গ্রহে এসে পড়বে বিপুল পরিমাণ আলট্রাভায়োলেট রেডিয়েশন। এতই বেশি, চিন্তা করা যায় না। এমনিতে সূর্য থেকে যে তাপ আসে, ঠিক সেভাবেই পৃথিবীর বুকে নামে এই রেডিয়েশন। বিষাক্ত করে ফেলে আয়োনোস্ফেয়ার। তৈরি হয় একটা পুরু চাদর, ওটা ভেদ করে বেরুতে পারে না ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ। বিকল হয় রেডিয়ো সিগনাল। উপর থেকে সিগনাল পাঠাতে পারে না স্যাটালাইটও।'

হঠাৎ রাফায়লার চোখ পড়েছে একটি কমপিউটারের স্ক্রিনের উপর। ক্লান্ত স্বরে বলল, 'আসলে, আমাদের কাছে ওয়েদার-মনিটরিং গিয়ার আছে। একমিনিট সময় দিলে দেখাতে পারব সোলার ফ্লেয়ার কেমন দেখতে।'

'বেশ,' বলল রানা।

পাশের কমপিউটার চালু করল রাফায়লা। ফ্যানের গুঞ্জন শুরু হয়েছে। কিছুক্ষণ পর স্ক্রিনে প্রোগ্রামগুলোর আইকন দেখা গেল। একটা প্রোগ্রামের উপর ক্লিক করল রাফায়লা। কয়েক সেকেণ্ড পর ঝড়াৎ করে স্ক্রিনে দেখা দিল দক্ষিণ-পুব অ্যান্টার্কটিকার স্যাটালাইট ম্যাপ। তার ভিতর বেশ কয়েকটি রঙের খেলা। রানা খেয়াল করল, ওটা ব্যারোমেট্রিক ওয়েদার ম্যাপ। সারা দিন ধরে এই জিনিস দেখায় বিবিসি বা সিএনএন।

'এটা অ্যান্টার্কটিকার পুবের ওয়েদার সিস্টেম,' স্ক্রিনের কোণে তারিখ দেখে নিল রাফায়লা। 'দু'দিন আগের।' রানার দিকে ঘুরে

চাইল। 'সোলার ফ্লেয়ার শুরু হওয়ার আগে এটা পাই। এরপর ঢাকা পড়ে ওয়েদার স্যাটালাইট।'

মাউসে ক্লিক করল রাফায়লা। আরেকটা স্ক্রিন ভেসে উঠল। 'ওহ্, একমিনিট। পরে আরেকটা পাওয়া গেছে। এটাই এখন নতুন।'

পর্দার অর্ধেক জুড়ে ম্যাপ, তার ভিতর হলদে-সাদা বিশাল বিস্ফোরণ। বামের বেশিরভাগ স্ক্রিন জুড়ে অ্যাটমোস্ফিয়ার ডিসটার্বেন্স, প্রায় ঢাকা পড়েছে অ্যান্টার্কটিকার উপকূল।

প্রকাণ্ড সোলার ফ্লেয়ার, ভাবল রানা।

'এটা আমাদের সোলার ফ্লেয়ার, মেজর,' আবারও রানার দিকে চাইল রাফায়লা। 'এই ছবি তোলার পর আরও পুবে সরে এসেছে, ঢেকে দিয়েছে আমাদেরকে।'

বিস্ফোরণের ভিতর কয়েকটা রঙের খেলা। কোথাও কোথাও লাল ও কমলা রং, কয়েক জায়গায় কালো দেখা গেল।

'সাধারণত সূর্যে বিস্ফোরণ হলে পৃথিবীর নির্দিষ্ট জায়গায় ফ্লেয়ার হয়,' বলল রাফায়লা। 'হয়তো একটা স্টেশনে চলছে রেডিয়ো ব্ল্যাকআউট, কিন্তু মাত্র দুই শ' মাইল দূরের স্টেশনে কোনও সমস্যা নেই।'

স্ক্রিনের দিকে চেয়ে আছে রানা। 'এবারেরটা কতদিন ধরে চলবে বলে মনে করছেন?'

শ্রাগ করল মেয়েটি। 'হয়তো একদিন, বা দুই দিন। কতক্ষণ ধরে সূর্য থেকে রেডিয়েশন আসবে, তার উপর নির্ভর করে। বড় সানস্পট কয়েক দিন ধরেও চলে।'

আবারও কমপিউটারের স্ক্রিনে চাইল রাফায়লা। ডুবে গেছে চিন্তার ভিতর। নীচের ঠোঁট কামড়ে আঁচ করতে চাইছে কী যেন। তারপর দ্বিধান্বিত স্বরে বলল, 'আসলে জানি না। এবারেরটা অনেক বড়। মনে হয়, আরও পাঁচ দিন ধরে চলবে।'

মেয়েটি চুপ হয়ে যাওয়ায় নীরবতা নেমেছে ঘরে। সবাই টের পেল, রেডিয়ো সুবিধা পাবে না।

রানার পিছন থেকে বলে উঠল নাজমুল, 'পাঁ...আঁচ দিন?'

পিছনে আছে বলে দেখতে পেল না, ভুরু কুঁচকে গেছে তার স্যরের। 'রাফায়লা, আপনি বলেছেন আয়োনোস্ফেয়ারে নানা বিঘ্ন তৈরি করে ফ্লেয়ার, ঠিক?'

'হ্যাঁ।'

'আর আয়োনোস্ফেয়ার হচ্ছে...'

'বড় একটা স্তর, মেজর, এটা পৃথিবীর পরিবেশে পঞ্চাশ থেকে শুরু করে উপরের আড়াই শ' মাইল জুড়ে ছড়িয়ে থাকে,' বলল রাফায়লা। 'আয়োনোস্ফেয়ার বলা হয় কারণ, বাতাসে মিশে থাকে আয়োনাইয্‌ড্‌ মলিকিউল।'

'বুঝলাম,' বলল রানা। 'তার মানে, সূর্যে বিস্ফোরণের ফলে পৃথিবীতে এসে পড়ছে বিপুল শক্তি, তখন আয়োনোস্ফেয়ারে নানা সমস্যা দেখা দিচ্ছে। আমাদের অনেক উপরে একটা বর্ম তৈরি হচ্ছে, আর তাই রেডিয়ো সিগনাল পাঠাতে পারছি না। ঠিক বলেছি?'

'হ্যাঁ।'

আবার স্ক্রিনের দিকে চাইল রানা। হলদে-সাদা বিস্ফোরণের ভিতর কালো দাগগুলোকে দেখছে। সাদা-হলুদের মাঝে ওরকম বেশ বড় একটা কালো দাগ, তার উপর চোখ ওর। 'এটা কি ইউনিফর্ম?' জানতে চাইল।

'ইউনিফর্ম?' চোখ পিটপিট করে চাইল রাফায়লা। বুঝতে পারেনি।

'ওই রেডিয়েশনের বর্ম কি সব জায়গায় সমান শক্তিশালী? আসলে জানতে চাইছি, এর কোনও দুর্বল জায়গা আছে? এমন কোনও জায়গা, যেখানে বর্ম ভেদ করা যায়? যেমন ধরুন, ওই

কালো দাগগুলো, ওদিক দিয়ে রেডিয়ো সিগনাল পাঠাতে পারব?'

'এটা সম্ভব,' বলল রাফায়লা ম্যাকানটায়ার। 'খুব জটিল কাজ, কিন্তু অসম্ভব নয়। কিন্তু ঠিক স্টেশনের উপরে থাকতে হবে ফ্লেয়ারের ফাটল।'

'বেশ,' বলল রানা, 'এবার বলুন, আপনি হিসাব কষে বের করতে পারবেন কখন এই স্টেশনের উপর কালো দাগ আসবে? যেমন ধরুন, ওদিকের ওই বড় কালো গর্তটা।'

হলদে-সাদা বিস্ফোরণের মাঝে কালো গর্ত দেখিয়ে দিল ও।

মনিটরের দিকে চেয়ে ভাবতে শুরু করেছে রাফায়লা। দু'মিনিট পর বলল, 'একটা উপায় আছে। যদি ফ্লেয়ারের আগের কয়েকটা ইমেজ বের করি, হিসাব কষে বের করতে পারব ফ্লেয়ার কী গতিতে এই মহাদেশের উপর দিয়ে যাচ্ছে। ওটার গতি ও লক্ষ্য যদি বের করে নিই, মোটামুটি একটা কোর্স বুঝতে পারব।'

'তা হলে কাজটা করুন,' বলল রানা। 'কিছু পেলে আমাকে জানাবেন। আমাদের জানতে হবে স্টেশনের উপর কখন আসবে কালো গর্ত। খুব জরুরি ম্যাকমার্ডো স্টেশনে মেসেজ পাঠানো।'

'তার আগে অ্যান্টেনা ঠিক করতে হবে, নইলে...'

'ওই কাজে হাত দিচ্ছি,' বলল রানা, 'আপনি ফ্লেয়ারের মাঝে গর্ত খুঁজে বের করুন। আমরা অ্যান্টেনা ঠিক করছি।'

বিশ

'ঠিক আছে! এইবার তুইল্লা ধর্!' চেঁচিয়ে উঠল সার্জেন্ট হোসেন আরাফাত দবির।

স্ট্যাবিলাইযিং কেবল দিয়ে উইলকক্স আইস স্টেশনের তুবড়ে যাওয়া রেডিয়ো অ্যান্টেনা তুলে আনতে চেষ্টা করছে নাজমুল ও ভাইপার। অ্যান্টেনা বলতে তিরিশ ফুট উঁচু একটা কালো খুঁটি। মাথার উপর দপদপ করছে সবুজ বাতি। আস্তে আস্তে উপরের দিকে উঠছে খুঁটি। কয়েক সেকেণ্ড পর পর জ্বলে উঠছে সবুজ বাতি, সে আলোয় ভূতের মত লাগছে তিনজনকে।

'আর কতক্ষণ লাগবে?' নীচে দাঁড়িয়ে ঝোড়ো হাওয়ার উপর দিয়ে জানতে চাইল রানা।

'তুলে ধরতে বেশিক্ষণ না, স্যর, কিন্তু এটা হচ্ছে সবচেয়ে সোজা কাজ,' জানাল দবির। 'আসল কঠিন কাজ রেডিয়োর সবক'টা তার ঠিকভাবে লাগানো। বিদ্যুৎ চালু হয়ে গেছে। কিন্তু আরও পনেরো-বিশটা তার ঝালাই দিতে হবে।'

'আন্দাজ কতক্ষণ?'

'তিরিশ মিনিট, স্যর।'

'কাজ করতে থাকুন।'

র‍্যাম্প বেয়ে আবারও স্টেশনের সুড়ঙ্গের দিকে নামতে শুরু করেছে রানা। ভিতরে ঢুকবে দুটো কারণে। নিশাত সুলতানাকে দেখে আসা উচিত। তা ছাড়া, দেখা করতে হবে রাফায়লা ম্যাকানটায়ারের সঙ্গে।

এ-ডেকের ক্যাটওয়াকে ওর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল মেয়েটির। রানা বাইরে গিয়েছিল অন্যদের কাজ দেখতে। আর এ সময়ে রেডিয়ো রুমে কমপিউটারের মনিটরে ওয়েদার ম্যাপ দেখেছে রাফায়লা। খুঁজে বের করতে চেয়েছে সোলার ফ্লেয়ারের দুর্বলতা।

'কপাল খুলল?' জানতে চাইল রানা।

'নির্ভর করে আপনি কী আশা করছেন,' বলল রাফায়লা। 'রেডিয়োতে কখন যোগাযোগ করতে চান?'

'যত দ্রুত সম্ভব।'

'সেক্ষেত্রে ভাল সংবাদ নেই আমার কাছে,' বলল রাফায়লা। 'আমার হিসাব অনুযায়ী, এই স্টেশনের উপর দিয়ে সোলার ফ্লেয়ারের একটা গর্ত পেরুবে পঁয়ষট্টি মিনিট পর।'

'পঁয়ষট্টি মিনিট,' বিড়বিড় করল রানা, পরক্ষণে জানতে চাইল, 'ওটা কতক্ষণ চলবে?'

কাঁধ ঝাঁকাল রাফায়লা। 'বড়জোর দশ বা পনেরো মিনিট। এরই ভিতর সিগনাল পাঠিয়ে দেয়া কঠিন হবে না।'

আরও অনেক আগেই রেডিয়ো ব্যবহার করতে পারলে ভাল হতো, খুব জরুরি হয়ে উঠেছে ম্যাকমার্ডোর সঙ্গে যোগাযোগ করা। তাদেরকে জানাতে হবে, অ্যান্টার্কটিকার কাছে হাজির হয়েছে ফ্রেঞ্চ রণতরী, এক ব্যাটারি মিসাইল তাক করেছে উইলকক্স আইস স্টেশনের উপর।

রানা জানতে চাইল, 'এরপর স্টেশনের আকাশে আবারও কোনও গর্ত আসবে না?'

মৃদু হাসল রাফায়লা। 'জানতাম আপনি জানতে চাইবেন। তাই আগেই জেনে নিয়েছি। প্রথমটা পেরিয়ে গেলে আরও দুটো আসবে। কিন্তু সেজন্য অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে। ...এখন দুপুর দুটো ছেচল্লিশ মিনিট। তার মানে, প্রথম সুযোগ আসবে পঁয়ষট্টি মিনিট পর। এরপর আরও অনেক পরে আসবে অন্য দুই সুযোগ। দ্বিতীয়টা আজ সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার সময়। তারপর আবারও একটা সুযোগ মিলবে রাত দশটায়।'

চাপা শ্বাস ফেলল রানা। প্রথমবারে ম্যাকমার্ডোর সঙ্গে যোগাযোগ করতে না পারলে এই স্টেশন থাকবে না।

'গুড ওঅর্ক, রাফায়লা,' বলল। 'অনেক ধন্যবাদ। আরেকটা কাজ করে দিলে খুশি হব— আমার লোক যখন অ্যান্টেনা ঠিক করবে, তখন রেডিয়ো রুমে থাকলে ভাল হয়। কোনও মেসেজ আসতে পারে।'

মৃদু মাথা দোলাল মেয়েটি। 'কোনও অসুবিধে নেই।'

'থ্যাঙ্কস্,' বলল রানা। টের পেল, গত কয়েক ঘণ্টার লড়াই-খুন-গোলাগুলি দেখে হাঁপিয়ে গেছে মেয়েটি। মন সরিয়ে নেয়ার জন্য কোনও কাজ খুঁজছিল।

রাফায়লার দিকে চেয়ে মৃদু হাসল রানা, রাং-ল্যাডারের দিকে পা বাড়াল। তিন মিনিট পর নেমে এল ই-ডেকে। গুদাম-ঘরের দিকে চলেছে। টানেলের মাঝে পৌঁছে নির্দিষ্ট দরজার সামনে থামল, এক সেকেণ্ড পর নিঃশব্দে খুলল কবাট।

মেঝেতে বসে আছে নিশাত সুলতানা, পিঠ ঠেকিয়ে রেখেছে বরফ-দেয়ালে। চোখ দুটো বোজা। অবশ্য রানার পায়ের অস্পষ্ট আওয়াজ পেয়েছে। চোখ মেলল না। জানতে চাইল: 'কে?'

আস্তে করে নিশাতের সামনে বসল রানা। 'এখন কেমন লাগছে, আপা?'

চোখ মেলল না নিশাত। 'মেথাডনের কাজ শেষ।'

ছিঁড়ে যাওয়া হাঁটুর দিকে চাইল রানা। এবড়োখেবড়ো হাড় বেরিয়ে ছিল, পরে ভালভাবে ব্যাণ্ডেজ করে দিয়েছে হোসেন আরাফাত দবির। অবশ্য, এখন রক্তে চুপচুপে ভেজা ব্যাণ্ডেজ।

'মনে হয় না আর কখনও ম্যারাডোনার মত ফুটবল খেলতে পারব,' বলল নিশাত।

ওর মুখের দিকে চেয়ে আছে রানা। বুঝতে পারছে, কতটা কষ্ট সহ্য করছে বেচারি।

চোখ মেলল নিশাত। 'ওই হারামজাদা মাছ আমার পা নিয়ে গেছে,' রাগ নিয়ে বলল।

'পরে দেখেছি।'

'ঠেকানোর কোনও উপায় ছিল না,' নাক দিয়ে ঘোঁৎ আওয়াজ করল নিশাত। চুপ করে চেয়ে আছে রানা। হাসবার চেষ্টা করল নিশাত। 'ভাই, আপনি কি জানেন আপনি কত সুন্দর?'

'মেথাডন ঠিকই কাজ করছে,' মন্তব্য করল রানা।

'ভাল মানুষ চিনতে আমার ভুল হয় না,' দেয়ালে আরও ঠেস দিয়ে বসল নিশাত। 'ওই চোখদুটো দেখেই প্রেমে পড়ে মেয়েরা। আর সব গুণ তো আছেই।'

চুপ করে আছে রানা।

'ঠিক আছে, ফালতু কথা বাদই দিই,' বলল নিশাত। 'কী কাজে এসেছেন? শুধু আমাকে দেখে যাওয়ার জন্য?'

'না।'

'তা হলে কী?'

'কেভিন হাক্সলে মারা গেছে।'

'কী?' চমকে গেল নিশাত। 'ওরা তো বলেছিল ছেলেটা বাঁচবে।'

'ওকে খুন করা হয়েছে।'

'ফ্রেঞ্চরা?'

'না, পরে। অনেক পরে। ততক্ষণে ফ্রেঞ্চরা মারা পড়েছে।'

'কোনও বিজ্ঞানী?'

'এখনও জানি না,' বলল রানা। 'এ থেকে কার উদ্দেশ্য পূরণ হবে তা-ও জানি না।'

নীরবতা নামল দু'জনের মাঝে।

একটু পর বলল নিশাত, 'যে বিজ্ঞানীকে আটকে রাখা হয়েছে? ওই যে বাঙালি বিজ্ঞানী? কী যেন নাম? ...হ্যাঁ, রাশেদ হাবিব।'

চমকে গেছে রানা। নানা কাজে ভুলেই গিয়েছিল। বাঙালি এক বিজ্ঞানী খুন করেছে এক আমেরিকান বিজ্ঞানীকে। ওরা স্টেশনে আসবার একটু পর নিনা ভিসার তার কথা বলেছিল। রাশেদ হাবিবকে বি-ডেকে তার ঘরে আটকে রাখা হয়েছে। কিন্তু সত্যি লোকটা ঘরে আছে কি না, পরে আর পরখ করে দেখেনি রানা। সে যদি ছাড়া পেয়ে থাকে, তা হলে হয়তো সে-ই...

'দিনে দিনে গাধা হচ্ছি,' বলল রানা। হেলমেট মাইকে বলল, 'আরাফাত, ভাইপার, নাজমুল, আপনারা বাইরে?'

'হ্যাঁ, বাইরে,' জবাব দিল সার্জেন্ট ভাইপার।

'আপনাদের একজনকে বি-ডেকে যেতে হবে, দেখবেন ওই বন্দি বিজ্ঞানী এখনও তার ঘরে আছে কি না।'

'ঠিক আছে, যাচ্ছি,' বলল ভাইপার।

হাসতে চাইল নিশাত। 'স্যর, আপনার উপর খুব কাজের চাপ পড়ছে।'

আপন মনে কী যেন ভাবতে শুরু করেছে রানা।

'কী ভাবছেন, স্যর?' জানতে চাইল নিশাত।

মুখ নিচু করে নিয়েছে রানা, আস্তে করে মাথা নাড়ল।

'আমার আগেই বোঝা উচিত ছিল ওরা সৈনিক, আপা।'

'কী যে বলেন, স্যর।'

'হ্যাঁ, আগেই ওদেরকে বন্দি করা উচিত ছিল।'

'কিছুই না জেনে বন্দি করা কি ঠিক হতো, স্যর?'

'আমাদের কয়েকজনকে হারিয়েছি।'

'কিন্তু জিতেছি আমরাই।'

'আমাদের কপাল ভাল যে মরিনি,' বলল রানা, 'ওরা ক্যাটওয়াকে আমাদের পাঁচজনকে পেয়ে গেল, সবাই মরত, কিন্তু তখন ক্যাটওয়াক ধসে পড়ল পুলের ভিতর। তারপর ভাবুন ড্রিলিং রুমে কী ঘটল। ওদের পরিকল্পনা ছিল নিখুঁত। নাজমুল যদি না বুঝত, আমাদেরকে সহজেই মেরে ফেলা হতো। ওরা সবসময়েই এগিয়ে ছিল আমাদের চেয়ে; পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়েছে, অথচ পরিকল্পনা বলতে আমার কিছুই ছিল না।'

'শুনুন, স্যর,' একটু জোর দিয়ে বলল নিশাত, 'একটা কথা শুনতে চান?'

'কী, আপা?'

'স্যর, আপনি কি জানেন ছয় মাস আগে আর্মি থেকে আমাকে স্যাণ্ডহার্স্টে কমাণ্ডো ট্রেইনিং নিতে পাঠাতে চেয়েছিল?'

'না, জানি না।'

'সেই চিঠি এখনও আমার কাছে আছে,' বলল নিশাত। 'আর্মি চিফের সই ছিল ওটাতে। আমি সেই চিঠি পড়ে কী করেছি আপনি জানেন, স্যর?'

'কী করেছেন?'

'চিফকে ধন্যবাদ জানিয়ে চিঠি পাঠিয়েছি, তাতে লিখেছি: এত বড় সুযোগ দেয়ার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। কিন্তু আমি বর্তমান পোস্টে সন্তুষ্ট। আমি মেজর মাসুদ রানার সঙ্গে দ্য মার্ভেল অভ গ্রিস জাহাজের মিশনে কাজ করতে চাই।'

অবাক হয়ে গেছে রানা। নিশাত সুলতানা এ-কাজ করবে ভাবতে পারেনি।

রানার চোখে নিষ্পলক চাইল নিশাত। 'কারণটা জানতে চান, স্যর? আপনি একজন সত্যিকারের নেতা। বুদ্ধিমান, সাহসী, তার চেয়ে বড় কথা, সত্যিকারের মানুষ। মানুষের মধ্যে এ গুণ খুব কমই পাওয়া যায়। ...আর তাই আপনার সঙ্গে থাকতে চেয়েছি। কয়েকজন বড় অফিসারের সঙ্গেও কাজ করেছি, কিন্তু আপনার মত কাউকে পাইনি। সেই যে গরিলার দ্বীপে গিয়েছিলাম আপনার সঙ্গে, তার পর থেকে আপনার সঙ্গে কাজ করার সুযোগ খুঁজেছি। এরপর আপনার মার্ভেলে যোগ দেয়ার পর বুঝলাম সত্যি সত্যিই আপনি কেমন মানুষ। এরপর থেকে আপনার পাশে দাঁড়িয়ে জীবনের ঝুঁকি নিতে দ্বিধা করিনি। যেমন এখন, আপনি আমার কথা ভেবে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন। ...আসলে বেশিরভাগ সামরিক অফিসার চিন্তা করেন শুধু নিজেদের মহৎ কীর্তি ও পদোন্নতি নিয়ে। তাঁদের কিছুই যায় আসে না অধীনস্থ অফিসার বা সৈনিক মরল, না বাঁচল। এখানেই আপনি আলাদা, স্যর, আপনি সবার

কথা ভাবেন, তাদের আপদে বিপদে হাজির থাকেন। আর সেটা আমাদের সবার মন ছুঁয়ে যায়।'

অস্বস্তি বোধ করছে রানা। বিব্রত ভঙ্গিতে হাত তুলল, 'আপা, প্লিজ! লজ্জা দেবেন না। এসব কথা...'

'বলছি, কারণ আর কখনও বলার সুযোগ না-ও পেতে পারি। ...আপনি আসলে নিজের উপর রেগে আছেন, কারণটা হচ্ছে: আমরা মরতে বসেছিলাম। কিন্তু মনে রাখবেন, স্যর, আপনি দুর্দান্ত কৌশলী ও বুদ্ধিমান। তার চেয়ে বড় কথা, আপনি সত্যিকারের একজন মানুষ। কাজেই নিজের উপর বিশ্বাস রাখুন। যে ধরনের বিপদই আসুক না কেন, আপনি উতরে যাবেন। আমরা আপনার পাশে থাকব।'

রানা চুপ করে চেয়ে রইল নিশাতের চোখে। কয়েক সেকেণ্ড পর বলল, 'আমার সাধ্যমত দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করব, আপা।'

একটু বেসুরো স্বরে জানতে চাইল নিশাত, 'রাফায়লা ম্যাকানটায়ার নতুন কিছু জানাতে পারল, স্যর?'

'তেমন কিছু না।' উঠে দাঁড়াল রানা। 'ঠিক আছে, যাই গিয়ে দেখি রাশেদ হাবিব তার ঘরে আছে কি না।' দরজার কাছে চলে গিয়েও আবার ঘুরে চাইল। নরম স্বরে বলল, 'আপা, আপনি কখনও শুনেছেন যে আর্মি ইউনিটের ভেতর গুপ্তচর ঢুকিয়ে দেয় সরকার?'

'ঠিক কী বোঝাতে চাইছেন, স্যর?'

এক মুহূর্ত দ্বিধা করল রানা, তারপর বলল, 'আমি যখন কেভিন হাক্সলের লাশ পেলাম, তখন একজনের একটা কথা মনে পড়ল। সে ছিল আমেরিকান মেরিন কর্পসের একজন মেজর, আমার খুব ভাল বন্ধু। মারা যাওয়ার আগে বলেছিল, ওর ইউনিটের ভিতর বিশ্বাসঘাতক ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে।'

চুপ করে চেয়ে আছে নিশাত, আস্তে করে ঠোঁট চাটল। কী

যেন ভাবছে। কয়েক মুহূর্ত পর বলল, 'শুনেছি অনেক দেশের আর্মিতেই এই কাজ করা হয়।'

'কী শুনেছেন, আপা?'

'এদের কাজ এলিমিনেট করা। সরকারের উঁচু পদের কেউ যদি কিছু গোপন রাখতে চায়, এদেরকে নির্দেশ দিলেই এরা খুন করে সহযোদ্ধাদের সবাইকে।'

'নিরাপত্তার স্বার্থে যেকোনও দেশের আর্মির ভিতর সরকারের নিজস্ব লোক থাকতেই পারে,' বলল রানা। 'তারা ডিপ-কভার এজেন্ট, তাদের কাজই প্রতিরক্ষা ইউনিটের নাড়ির ভিতর ঢুকে যাওয়া। সবার উপর চোখ রাখা।'

মাথা ঝাঁকাল নিশাত।

'সেই যে একবার তিন মাসের জন্যে ইউ.এস. মেরিনদের রেমালপাগো রোহো, বা আর-সেভেন ট্রেইনিং এক্সারসাইজে গিয়েছিলাম আপনার সঙ্গে, ওখানেই প্রশিক্ষণের সময় কানাঘুষা শুনেছি মেরিন কর্পসেও আছে ডিপ কাভার এজেন্ট। অফিসাররা বলেছে, তাদের ভিতর ডিপ-কভার এজেন্ট ঢুকিয়ে রেখেছে সিআইএ। কেউ কেউ বলেছে, তাদের উপর নজর রাখছে ন্যাশনাল রেকনিসেন্স অফিস ও জয়েন্ট চিফস্ অভ স্টাফদের সাবকমিটি। ওটার নাম নাকি ইন্টেলিজেন্স কনভার্জেন্স গ্রুপ। এদের কাজ আমেরিকান মিলিটারি ইউনিটগুলোর ভেতর ইনফিলট্রেট করা।

'এক অফিসার আমাকে বলেছিল, আইসিজি আসলে কয়েকটি ইন্টেলিজেন্স এজেন্সির আল্ট্রা-সিক্রেট কমিটি। ঠিক জায়গায় নিজ লোক রাখে তারা। কোনও ইউনিট মিশনে গিয়ে যা পাওয়ার কথা নয় এমন কিছু পেলে— যেমন ধরুন স্পেসশিপ বা এলিয়েন কিছু বা মূল্যবান ধাতু— সেক্ষেত্রে আইসিজি'র লোকের কাজ হয় গ্রুপের সৈনিক আর অফিসারদেরকে সবাইকে মেরে ফেলা, যাতে

খবরটা লিক-আউট না হয়, এরা কাউকে কিছু বলতে না পারে।'

আস্তে করে শ্বাস ফেলল রানা। এই একই কথা ও নিজেও শুনেছে। সাধারণ ইউনিটের ভিতর ভরে দেয়া হয় ডাবল-এজেন্ট। রবিন কার্লটনের কথা আবারও মনে পড়ে গেছে ওর। মারা যাওয়ার আগে হেলমেট মাইকে বলেছিল সে: 'আমার দলের ভিতর বিশ্বাসঘাতক ঢুকিয়ে দিয়েছে ওরা!'

ওটা কোনও ফালতু কথা ছিল না। রানার সঙ্গে আসা বাঙালি সৈনিক বা অফিসারদের বিষয়ে এভাবে ভাবতে চাইছে না। ওদের কারও সঙ্গে আমেরিকার আইসিজির যোগাযোগ থাকবারও কথা নয়। কিন্তু বিজ্ঞানী বা মেরিনদের ভিতর আমেরিকান সরকারের লোক থাকতেই পারে।

'ঠিক আছে, আপা, পরে আবার আপনাকে দেখে যাব,' বলল রানা।

'কাজ তো গুছিয়ে আনতেই হবে,' বলল নিশাত। 'কিন্তু একটু অন্যদিকেও মন দেয়া দরকার। যেমন, কোনও মেয়ে হয়তো পাগলের মত ভালবাসে আপনাকে, সেদিকটাও...'

ভুরু উঁচু করল রানা। 'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ, স্যর। সত্যি ভালবেসে ফেলেছে।'

মাথা নেড়ে হাসল রানা। 'আপনার মেথাডন ঠিকই কাজ করছে, আপা। চমৎকার গল্প বানাচ্ছেন।'

'বিশ্বাস করুন বা না করুন, এটা বাস্তব সত্য। ঠিক আছে, স্যর, পরে কথা হবে।' দেয়ালে ভাল করে ঠেস দিয়ে বসল নিশাত।

গুদাম-ঘর থেকে বেরিয়ে গেল রানা। আবারও চোখ বুজল নিশাত, নরম স্বরে বলল, 'জানেন, স্যর, কার চোখ পড়েছে আপনার উপর? যদি বুঝতেন কীভাবে চেয়ে থাকে ওর দুই চোখ!'

পুল ডেকে বেরিয়ে এসেছে রানা, ওর মনে হচ্ছে পরিত্যক্ত হয়েছে গোটা স্টেশন। পুলের মাঝে নেমে গেছে ডাইভিং বেলের অনড় কেবল।

'স্যর, তিশা বলছি,' ইয়ারপিসে শুনতে পেল রানা। 'আপনি কি এখনও উপরে?'

'এখন পুল ডেকে। তুমি কোথায়?'

'পঞ্চান্ন মিনিট হলো ডাইভের। বরফের সুড়ঙ্গ বেয়ে উঠছি।'

'কোনও সমস্যা?'

'এখনও না। ...একমিনিট। আরে, এ কে?'

'কী দেখেছ, তিশা?' সতর্ক হয়ে উঠেছে রানা।

'না, কিছু নয়, স্যর,' একটু লজ্জিত কণ্ঠ তিশার। 'কোনও সমস্যা নেই। আপনার সঙ্গে ছোট্ট মেয়েটা আছে যে, ওর বন্ধু এখানে নেমে এসেছে।'

'কার কথা বলছ?' পরক্ষণে বুঝতে পারল রানা।

'ওই যে আপনার বন্ধু সিল লিলি। এইমাত্র টানেলে ঢুকেছে। আমাদের পিছু নিয়ে।'

মনের চোখে রানা দেখল, ডাইভারদের সঙ্গে বরফের সুড়ঙ্গ ধরে খুশি মনে চলেছে লিলি, অবাক হয়ে দেখছে মেকানিকাল ব্রিদিং অ্যাপারেটাস পরা লোকগুলো কী কষ্টই না করছে। ওর তো কোনও সমস্যাই হচ্ছে না!

'তোমাদেরকে আর কতটা উপরে উঠতে হবে?' জানতে চাইল রানা।

'বলা কঠিন। খুব সাবধানে উঠতে হচ্ছে। গতি কম। আন্দাজ পাঁচ মিনিট পর উপরে পৌঁছব।'

'আমার সঙ্গে যোগাযোগ রেখো,' বলল রানা। 'আরেকটা কথা, খুব সতর্ক থাকবে।'

'জী, স্যর। আউট তিশা।'

ক্লিক আওয়াজ তুলে কেটে গেল রেডিয়ো লিঙ্ক। পুলের দিকে চেয়ে রইল রানা। পানি এখনও লালচে। আপাতত একদম স্থির, কাঁচের মত। পুলের সামনে গিয়ে দাঁড়াবে বলে এক পা এগোলো রানা, পরক্ষণে থেমে গেল। পায়ের নীচে মুড়মুড় করে কী যেন ভেঙেছে।

মাথা নিচু করে বুটের দিকে চাইল রানা। পা সরিয়ে নিতেই দেখা গেল ধাতব ডেকে গুঁড়ো হয়ে গেছে কাঁচ। জিনিসটা সাদা, ফ্রস্টেড গ্লাস।

ভুরু কুঁচকে গেছে রানার। ঠিক তখন হঠাৎ করেই হেলমেট ইণ্টারকমে একটা কণ্ঠ শুনল।

'মেজর, আমি ভাইপার। বি-ডেকে। এইমাত্র রাশেদ হাবিবের রুম থেকে ফিরেছি। দরজায় চাপড় দিয়ে সাড়া পাইনি। তারপর দরজা ভেঙে ভিতরে ঢুকে দেখি কেউ নেই। রাশেদ হাবিব উধাও। আবারও বলছি, হাবিব তার ঘরে নেই।'

রানার মেরুদণ্ড বেয়ে নেমে গেল শিরশিরে অনুভূতি।

লোকটা কোথায় যেতে পারে?

ঘুরে বেড়াচ্ছে স্টেশন জুড়ে!

সবাইকে একত্র করে খুঁজে বের করতে হবে লোকটাকে। ঘুরে দাঁড়াবে, তার আগে হালকা মৃদু শিসের আওয়াজ পেল। বাতাস চিরে কী যেন আসছে!

তারপর হঠাৎ ঠক্ করে আওয়াজ হলো। তীক্ষ্ণ ব্যথা পেল রানা, ভীষণ জ্বলছে ঘাড়ের পিছনে। এক সেকেণ্ডের দশ ভাগ সময়ে বুঝল, ঘাড়ে এসে লেগেছে তীব্র গতির কিছু!

ভাঁজ হয়ে যেতে চাইল দুই হাঁটু, নিজেকে বড় দুর্বল মনে হলো রানার। ডানহাতটা চলে গেল ঘাড়ের পিছনে, হাত ফিরিয়ে এনে চোখের সামনে ধরল।

ওর হাতে তাজা রক্ত!

খুব ধীরে চোখের সামনে নামছে কালো চাদর। জানে না, কখন হাঁটু গেড়ে বসে পড়েছে। বরফ-ঠাণ্ডা প্ল্যাটফর্মের উপর ঠাস্ করে পড়ল রানার কপাল। খুব দুশ্চিন্তা হলো— গুলি লেগেছে ঘাড়ে!

তারপর হঠাৎ করেই ঝাপসা হয়ে হারিয়ে গেল সব দুশ্চিন্তা, চারপাশে নেমে এল গাঢ় অন্ধকার।

থেমে গেল ওর হৃৎপিণ্ড! মারা গেছে কিংবদন্তির নায়ক, মেজর জেনারেল রাহাত খানের অতি আদরের প্রিয় শিষ্য, ব্রিগেডিয়ার সোহেল আহমেদের প্রাণের বন্ধু মাসুদ রানা।

একুশ

খাড়া বরফ-টানেল ধরে উঠছে তিশা করিম।

কোথাও আওয়াজ নেই। বড় শান্তিময় পরিবেশ। চারপাশে শুধু আকাশের মত সাগরের নীল জল।

সাবলীলভাবে সাঁতরে চলেছে তিশা, লো-অডিবিলিটি ব্রিদিং গিয়ারের কারণে সামান্য হিসহিস আওয়াজ, এ ছাড়া সব চুপচাপ। সঙ্গের তিন ডাইভার ও লিলি ছাড়া কোথাও কিছু নড়ছে না। কোনও শিসের আওয়াজ নেই, গান গাইছে না কোনও তিমি।

বড়সড় ফুল-ফেস ডাইভিং মাস্কের ভিতর দিয়ে চেয়ে আছে তিশা। ওর হ্যালোজেন ডাইভ ল্যান্টার্ন আলো ফেলেছে বরফের দেয়ালে, সব লাগছে নীল ও সাদা।

অন্য ডাইভাররা— জনি ওয়াকার, গোলাম মোরশেদ ও

বিজ্ঞানী মহিলা নিনা ভিসার ওর পাশে নিঃশব্দে সাঁতরে চলেছে।

একটু পর হঠাৎ করেই অনেক চওড়া হয়ে গেল সুড়ঙ্গ, উপরে উঠবার সময় দু'পাশের দেয়ালে বেশ কয়েকটা গোল গর্ত দেখল তিশা।

গর্তগুলো কীসের বুঝতে পারল না। একেকটা ব্যাসে দশ ফুটের মত হবে। মস্ত কোনও ফুটবল ঢুকিয়ে দেয়া যাবে তার ভিতর দিয়ে। মোটমাট আটটা গর্ত গুনল তিশা, ভাবতে শুরু করেছে কী ধরনের প্রাণী ওগুলো তৈরি করেছে।

কয়েক মুহূর্ত পর হঠাৎ করেই গর্তের কথা একেবারে ভুলে গেল ও। অনেক বেশি মনোযোগ দিতে হয়েছে ঢের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে।

উপরে আর কোনও সুড়ঙ্গ নেই!

প্রায় উঠে এসেছে ওরা গুহার ভিতর!

ইন্টারকমে বলল তিশা, 'স্যর, তিশা বলছি।' ওদিক থেকে কোনও জবাব নেই। 'স্যর, আপনি কি আমার কথা শুনছেন?'

না, কোনও সাড়া নেই।

এমনটা হওয়ার কথা নয়, ভাবল তিশা। স্যর জবাব দিলেন না কেন? মাত্র কয়েক মিনিট আগে যোগাযোগ করেছে ও।

হঠাৎ ইয়ারপিসে খড়খড় করে উঠল একটা কণ্ঠ। সে মাসুদ রানার কণ্ঠ নয়।

'লেফটেন্যান্ট তিশা, আমি কর্পোরাল নাজমুল।' তিশার মনে হলো শোঁ-শোঁ ঝড়ের ভিতর কথা বলছে নাজমুল। বোধহয় স্টেশনের বাইরে সে। 'আপনার কথা শুনতে পেলাম। কী হয়েছে আপনার?'

'আমরা পানির উপরে উঠে আসছি,' বলল তিশা। 'স্যরের কী হয়েছে? উনি জবাব দিলেন না,' বিচলিত হয়ে জানতে চাইল ও।

'উনি স্টেশনের কোথাও আছেন। বোধহয় আপার ওখানে।

হয়তো কোনও কারণে হেলমেট খুলেছেন।'

'ওঁকে খুঁজে বের করো, নাজমুল। ওঁকে না পেলে আমাকে জানাবে। আমরা গুহার কাছে পৌঁছে গেছি।'

'যাচ্ছি, লেফটেন্যান্ট।'

রেডিয়ো বন্ধ করে দিল তিশা, আবার উঠতে শুরু করেছে উপরের দিকে।

পানির নীচ থেকে উপরের দিকে চাইলে কেমন যেন অদ্ভুত লাগে। ঠিক যেন কাঁচের মত। বিকৃত হয়ে যায় একটু দূরের সব কিছু।

সারফেসের দিকে উঠছে তিশা, ওর পাশে অন্যরা। প্রায় একইসঙ্গে পানির উপর মাথা তুলল ওরা।

চারপাশে চাইছে। ওরা আছে মস্ত এক নোনা পানির পুকুরের মাঝে। একদিকে বিশাল এক পাতাল-গুহা। তিশার পাশে ভাসছে জনি ওয়াকার ও গোলাম মোরশেদ। ওদের পিছনে নিনা ভিসার।

আগে কখনও এত বড় গুহা দেখেনি ওরা কেউ। ছাত হবে কমপক্ষে এক শ' ফুট উপরে। চারদেয়াল এতই দূরে, মেরিনদের আনা শক্তিশালী হ্যালোজেন ল্যান্টার্ন দিয়েও দেখা গেল না গুহার শেষমাথা।

তারপর দেখতে পেল তিশা। মোরশেদের বিড়বিড় শুনতে পেল ও, 'আরেশ্‌শালা!'

পুরো একমিনিট একটা কথাও বলতে পারল না তিশা, চেয়ে রইল বিস্ফারিত চোখে। তারপর পুকুরের পাড়ে উঠবে বলে সাঁতরাতে শুরু করল। একটু পর পায়ের নীচে কঠিন জমিন পেয়ে গেল। পুরোপুরি চমকিত ও। একটা জিনিসের উপর থেকে চোখ সরাতে পারছে না।

আগে কখনও এমন কিছু দেখেনি তিশা। এসব দেখা যায় সিনেমার পর্দায়। টের পেল, শ্বাস আটকে রেখেছে।

ওটা কোনও ধরনের উড়োজাহাজ।

কুচকুচে কালো। নাক থেকে শুরু করে লেজ পর্যন্ত নিকষ কালো। আকার হবে সাধারণ ফাইটার জেট বিমানের মতই। বরফ-দেয়ালের ভিতর গেঁথে আছে বিশাল দুটো টেইল ফিন। যেন বহু বছর ধরে ধীরে ধীরে গিলে নিতে চেয়েছে বরফের দেয়াল বিমানটাকে।

বিশাল কালো স্পেসশিপ। ঠাণ্ডা-সাদা গুহার বিপরীতে দেখতে কর্কশ লাগছে। উঁচু তিনটে শক্তিশালী হাইড্রলিক ল্যাণ্ডিং স্ট্রাটের উপর দাঁড়িয়ে আছে।

মনে হলো না পৃথিবীর কোনও মানুষের তৈরি হতে পারে ওই স্পেসশিপ।

খুবই নীচ় চেহারা ওটার।

চকচকে কালো নাক ঝুঁকে এসেছে, ঠিক যেন বাজপাখির ঠোঁট। ওটার দিকে চাইলে কনকর্ডের কথা মনে আসে। ফিউজেলাজের দু'পাশে নেমে এসেছে কালো দুটো ডানা, দেখলে মনে হয় যে-কোনও সময়ে উড়াল দেবে হিংস্র কোনও পাখি। রিইনফোর্সড় টিন্টেড গ্লাস ক্যানোপি ঠিক নাকের উপর বসানো।

বিশাল ঈগল, ভাবল তিশা। আজ পর্যন্ত সর্বকালের সবচেয়ে দ্রুত, ভয়ঙ্কর, এবং মস্ত পাখি!

তিশা টের পেল, অন্যরা ওর পাশে উঠে এসেছে বরফের মেঝেতে। চুপ করে দেখছে অদ্ভুত সুন্দর স্পেসশিপটাকে। সবার মুখের উপর থেকে ঘুরে এল তিশার চোখ।

হাঁ হয়ে গেছে গোলাম মোরশেদ।

বিস্ফারিত জনি ওয়াকারের দুই চোখ।

অবশ্য, নিনা ভিসারের প্রতিক্রিয়া অস্বাভাবিক মনে হলো তিশার। চোখ সরু করে স্পেসশিপের দিকে চেয়ে আছে মেয়েটা। কেন যেন শিউরে উঠল তিশা। নিনা ভিসারের চোখে কীসের যেন

নেশা দেখেছে ও। বিপজ্জনক কোনও চিন্তা করছে সে। হয়তো ভাবছে এ থেকে কী ধরনের সুবিধা আদায় করতে পারবে।

এক সেকেণ্ড পর মাথা থেকে চিন্তাটা দূর করে দিল তিশা। স্পেসশিপের মোহ কেটে গেছে ওর, বিশাল গুহা ভালভাবে দেখবার জন্যে চারপাশে চাইল।

দৃশ্যটা চোখে পড়তে লাগল দশ সেকেণ্ড।

দেখেই চমকে গেল তিশা। নিচু স্বরে বলল, 'হায় আল্লাহ্!'

ওরা নয়জন! বা বলা উচিত, নয়টা মৃতদেহ।

বুঝতে দেরি হয়েছে যে ওগুলো মানুষের শরীর। পুকুরের ওদিকে, কোনোটা চিত হয়ে, অন্যগুলো বড় বড় পাথরের এখানে ওখানে গুঁজে রাখা। চারপাশে শুধু রক্ত— মেঝের উপর পুরু রক্তের স্তর, ছলকে লেগেছে দেয়ালে, মেখে আছে শরীরগুলোতে।

যেন কসাইখানা!

হাত-পা ছিঁড়ে নিয়েছে। কাঁধ থেকে উপড়ে নেয়া হয়েছে মাথা। কারও বুক থেকে খুবলে তুলেছে মাংস। মেঝের উপর ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ভাঙা হাড়। বেশিরভাগে ফাটল ধরা। এখনও জড়িয়ে আছে শুকনো মাংস।

বড় করে ঢোক গিলল তিশা, ঠেকাতে চাইছে উথলে ওঠা বমি। বুঝতে পারছে, ওরা আইস স্টেশনের নয় ডুবুরি।

তিশার পাশে থমকে গেছে মোরশেদ, ড্যাবড্যাব করে দেখছে পুকুরের ওদিকে ছিঁড়েখুঁড়ে খাওয়া শরীরগুলো।

ভাঙা ভাঙা স্বপ্ন দেখছে মাসুদ রানা।

প্রথমে কোনও স্বপ্ন ছিল না। শুধু গাঢ় অন্ধকার। যেন ও ভাসছিল মহাশূন্যে। তারপর হঠাৎ করেই এল উজ্জ্বল সাদা আলো। ওটা ওর আত্মা। তখন ভীষণ বৈদ্যুতিক শক লাগল। আগে কখনও ভাবতে পারেনি এমন তীব্র ব্যথা লাগতে পারে।

তারপর আবার ফিরে এল সব স্মৃতি। মনে হলো, ও আছে মেঝের মত কোনও জায়গায়। খুব ঠাণ্ডা, বড় একা ও, ঘুমিয়ে আছে, কিন্তু জেগেও আছে।

এটা আবার কী করে হয়?

ঘুটঘুটে অন্ধকার। চারপাশে কোনও দেয়াল নেই।

কী যেন চেটে চলেছে ওর গাল।

বোধহয় কোনও কুকুর। বড় কোনও কুকুর। কী জাতের, কে জানে! রানা শুধু বুঝতে পারছে, ওটা মস্ত। এত বড় হয় না কুকুর।

ওর গালে নাক ঠেকিয়ে শুঁকছে, কৌতূহলী। ওটার ভেজা নাক লাগছে মুখে। গোঁফগুলো সুড়সুড়ি দিচ্ছে ওর নাক-মুখে।

খুবই কৌতূহলী কুকুর, একইসঙ্গে ওটাকে হিংস্রও মনে হচ্ছে। তারপর হঠাৎ করেই গর্জে উঠল কুকুরটা। গলা এত জোরালো, মনে হলো নরক থেকে আসছে গর্জন।

ভীষণ চমকে গেছে রানা। অজানা কোনও শত্রুর বিরুদ্ধে গর্জে চলেছে কুকুর। ভীষণ খেপেছে। উন্মাদ হয়ে উঠেছে রাগে। লাফ-ঝাঁপ দিচ্ছে। শত্রুর দিকে ফিরে বের করেছে হিংস্র দাঁত।

দেয়াল বিহীন বিশাল ঘরে চুপ করে পড়ে আছে রানা। বুঝতে পারছে না, কেন নড়তে পারছে না। নাকি নড়তে ইচ্ছাই করছে না? তারপর ধীরে ধীরে চোখের সামনে দেখল দেয়াল। কয়েক মুহূর্ত পর টের পেল, আছে ই-ডেকের ধাতব প্ল্যাটফর্মে।

এখনও ওর উপর ঝুঁকে আছে মস্ত কুকুরটা। ক্ষুরধার দাঁত বেরিয়ে এসেছে, ভয়ঙ্কর ঘড়ঘড় আওয়াজ করছে। এই কুকুর যেন ওকে আড়াল দিতে চাইছে।

কিন্তু কী থেকে? কুকুরটা কী দেখছে, যেটা নিজে ও দেখতে পাচ্ছে না?

তারপর হঠাৎ করেই ঘুরল কুকুরটা, দৌড়ে চলে গেল। স্টিলের ডেকে পড়ে রইল একা রানা।

ঘুমন্ত অথচ জাগ্রত। নড়তে পারছে না। হঠাৎ ওর মনে হলো, ও খুব অসহায়।

পায়ের দিক থেকে কী যেন আসছে ওর দিকে। দেখতে পেল না রানা, কিন্তু শুনতে পেল পায়ের আওয়াজ। খুব ধীরে, স্টিলের প্ল্যাটফর্মে এক পা এক পা করে আসছে।

তারপর হঠাৎ ওর চোখের সামনে ঝুঁকে এল পৈশাচিক এক মুখ! দেখল রানা, হাসছে সে।

জ্যাকুস ফিউভিল!

চটচটে রক্তে মাখা বিকৃত মুখ। ঠোঁটে বাঁকাচোরা হাসি। কপালের ক্ষত থেকে ছিঁড়ে ঝুলছে মাংস। জ্বলজ্বল করছে দুই চোখ, তাতে তীব্র ঘৃণা। ছোরা উপরে তুলল ফ্রেঞ্চ কমাণ্ডো, ওটা দেখাল।

তারপর ঝাঁকি খেল ছোরা, নামতে শুরু করেছে রানার গলা লক্ষ্য করে...

'এই যে,' নরম স্বরে বলল কে যেন।

চট্ করে চোখ মেলল রানা। ভেঙে গেছে দুঃস্বপ্ন। টের পেল, চিত হয়ে শুয়ে আছে। এটা কোনও বিছানা হতে পারে। ঘরে উজ্জ্বল ফ্লুরোসেন্ট বাতি। দেয়ালের রং সাদা। আসলে বরফের দেয়াল।

ওর পাশে দাঁড়িয়ে আছে এক লোক।

তার উচ্চতা হবে বড়জোর সোয়া পাঁচ ফুট। আগে কখনও একে দেখেনি রানা।

বেশ খাটো, কিন্তু গিটারের ছয় নম্বর তারের মত টানটান শরীর। মস্ত দুটো খয়েরি চোখ। মাথা ছোট বলে লোকটার দুই চোখ আরও বড় লাগছে। কাঁধে সাদা-কালো চুল। মনে হলো, এক মাসের ভিতর চিরুনি পড়েনি ওখানে। সামনের উপরের দুটো দাঁত অনেক বড়, সেগুলোর মাঝের ফাঁক দিয়ে ম্যাচের দুটো কাঠি

ঢুকিয়ে দেয়া যাবে। পরনে লোকটার সাদা শার্ট ও পলিয়েস্টার প্যান্ট। উইলকক্স আইস স্টেশনের বরফ-ঠাণ্ডা পরিবেশে তাকে বেমানান লাগছে।

লোকটার হাতে কী যেন।

দীর্ঘ একটা স্ক্যালপেল।

ওটার দিকে দ্বিতীয়বার চাইল রানা।

স্ক্যালপেলে তাজা রক্ত।

চিকন স্বর বলল, 'হ্যাঁ। আপনি জেগে আছেন।'

উজ্জ্বল আলোয় ভুরু কুঁচকে ফেলল রানা, উঠে বসতে চাইল। সম্ভব হলো না। কী যেন ওকে বাধা দিয়েছে। এবার বুঝতে পারল, কেন উঠে বসতে পারেনি।

বিছানার দু'পাশে দুটো চামড়ার ফিতা আটকে রেখেছে ওর দুই হাত। আরও দুটো আটকে দিয়েছে ওর দুই পা। উঁচু হয়ে চারপাশ দেখতে চাইল রানা, সেটাও পারা গেল না। কপালেও সমস্যা। ফিতা দিয়ে আটকানো ওর মাথা। বিছানা থেকে উঠবার উপায় নেই ওর।

বিদঘুটে লোকটার দিকে চেয়ে রইল রানা।

ভালভাবেই ওকে আটকে রেখেছে সে।

'একমিনিট,' বলল খাটো লোকটা। 'আর বড়জোর... দুই সেকেণ্ড... তারপর...'

উঁচু করে ধরল রক্তাক্ত স্ক্যালপেল, তারপর সরে গেল। আর তাকে দেখতে পেল না রানা, তাড়াতাড়ি করে বলল, 'দাঁড়ান!'

পরের সেকেণ্ডে আবারও লোকটাকে দেখা গেল। ভুরু কুঁচকে চাইল রানার দিকে। 'কী ব্যাপার?'

'আপনি... কী করতে চাইছেন?' ব্যাঙের ডাকের মত আওয়াজ বেরুল রানার কণ্ঠ থেকে। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে।

হাসল লোকটা। বেরিয়ে এল এবড়োখেবড়ো দাঁতগুলো। 'ভয়

নেই, মেজর। আপনি এখনও উইলকক্স আইস স্টেশনেই আছেন ...আপনাকে দেখে মনে হয় যেন বাঙালি।'

বাংলায় জানতে চাইল রানা, 'আপনি কে?'

'কেন, মেজর,' বলল সে, 'খুনি বিজ্ঞানী রাশেদ হাবিব।'

বড় করে ঢোক গিলল রানা।

লোকটা আবার চলে গেছে ওর মাথার পিছনে। কী যেন করছে। আবার গুনগুন করে নাকি সুরে গানও গাইছে। ব্যথা লাগছে ঘাড়ে। ওদিক দিয়ে স্ক্যালপেল ঢুকিয়ে দেবে নাকি?

কাঁচির খচখচ আওয়াজ, তারপর ঠক করে কী যেন ফেলল। আবার পাশে চলে এল লোকটা, এখন হাতে স্ক্যালপেল নেই। রানার কপাল আটকে রাখা ফিতা খুলতে শুরু করেছে। তার মূল কাজ শেষ, বের করে নিয়েছে বুলেটের চারটে টুকরো। বাঁধন খুলবার ফাঁকে বলল, 'আপনি কবর থেকে ফিরে এলেন, মেজর।'

'কবর থেকে?'

'হ্যাঁ,' মাথা দোলাল বিজ্ঞানী। 'আপনার কপাল খুব ভাল। কলারের ভিতর কেভলার কলার না থাকলে... এতক্ষণে হুরপরীদের সঙ্গে... বুলেটের সমস্ত শক্তি খেয়ে ফেলেছে ওই কেভলার।'

গলা ও ঘাড় থেকে গোলাকার কলার সরিয়ে নিল সে, রানার চোখের সামনে ধরল। স্নাইপারদের বুলেট ঠেকাতে অফিসারদের ওই জিনিস দেয়া হয় মেরিন ফোর্স থেকে। সার্জেন্ট বা কর্পোরালদেরকে দেয়া হয় না, কারণ স্নাইপাররা সাধারণ কাউকে গুলি করবে না।

কপালের ফিতা খুলে দিল রাশেদ হাবিব। আরও মনোযোগ দিয়ে কেভলার কলার দেখল রানা। জিনিসটা দেখতে যাজকের সাদা কলারের মত, টার্টল-নেক গেঞ্জির কলারের ভিতর অংশে ছিল। ঘাড়ের কাছে এবড়োখেবড়ো গর্ত। ওদিক দিয়ে ঢুকেছে

বুলেট।

'এটা না থাকলে মরতেন,' বলল বিজ্ঞানী। 'বুলেট ছিঁড়ে দিত ক্যারোটিড। তারপর আপনাকে বাঁচায় কার বাপের সাধ্যি। কলারে লেগে থেমেছে বুলেট, ঘাড়ে লেগেছে সামান্য কয়েকটা টুকরো। তাতেও নিশ্চিন্তে মরা যেত। এবং মরেও ছিলেন। অন্তত কিছুক্ষণের জন্যে।'

বকবক করছে লোকটা। হতাশ হয়ে মনোযোগ হারাল রানা। ঘরের চারপাশে চোখ বোলাতে শুরু করেছে। এই ঘর কারও লিভিং কোয়ার্টার। একপাশে একটা খাট, একটা ডেস্ক, তার উপর কমপিউটার ও দুটো সাদা-কালো টিভি মনিটর। শেষের দুটো রাখা হয়েছে প্রাচীন এক ডিভিডি রেকর্ডারের উপর।

ঘুরে চাইল রানা। 'কী যেন বলছিলেন?'

'আপনার ঘাড়ে বুলেটের কয়েকটা টুকরো গেঁথেছিল, মেজর। ধরুন একমিনিটের জন্য থেমে গেছিল হৃৎস্পন্দন। আপনি ছিলেন তখন ক্লিনিক্যালি ডেড।'

'তাই?' মাথা উঁচু করে ঘাড় নাড়ল রানা। কিন্তু দুই হাত নাড়তে পারল না। এখনও ওর হাত-পায়ের ফিতা খুলে দেয়া হয়নি।

'ভয় পাবেন না, সব ফিতাই খুলে দেব,' বলল রাশেদ হাবিব। 'বুলেটের টুকরোগুলো সরিয়ে নিয়েছি, পরিষ্কারও করেছি ক্ষত। ওখানে কেভলার কলারের কয়েক টুকরোও ছিল। সরিয়ে নিতে কষ্ট হয়নি। আপনি যখন জেগে গেলেন, তার আগে এই কাজই করছিলাম।' বিছানার পাশে রুপালি একটি ট্রেতে রেখেছে রক্তাক্ত স্ক্যালপেল। পাশে রক্তে ভেজা ধাতুর সাতটা টুকরো।

'কোনও ভয় পাবেন না, হয়তো ভাবছেন আমি ডাক্তার নই,' বড় বড় দাঁত দুটো বেরিয়ে এল হাসিতে। 'এমবিবিএস পাশ করে মনে হলো কাজটা আমার নয়, তাই জিয়োফিযিক্স পড়তে শুরু

করি।'

'আমার বাঁধন তো খুলবেন?' বলল রানা।

'হ্যাঁ, তা তো খুলে দেবই। ভুলেই গিয়েছিলাম।' নার্ভাস মনে হলো লোকটাকে। 'প্রথমে আপনার মাথা স্থির রাখতে হয়েছে, নইলে বুলেট আর কেভলারের টুকরো ঘাড় থেকে বের করতে পারতাম না। আপনি কি জানেন ঘুমের ভিতর খুব নড়চড়া করেন? জানবেন কোত্থেকে? ঘুমে কাদা! তা যাই হোক, আমি বুঝলাম এই মালকে ধরে রাখতে পারব না, আর তখন আচ্ছামত বেঁধে নিতে হলো।' দুর্বল হাসি দিল হাবিব। 'ছাড়া পেয়ে আমাকে আবার আটকে রাখবেন না তো?'

গম্ভীর মুখে রাশেদ হাবিবকে দেখল রানা। লোকটা আসলেই খুব নার্ভাস। কিছুদিন আগে খুন করেছে এক সহকর্মীকে। এখন ভাবছে, তার উপর প্রতিশোধ নেয়া হতে পারে। কিন্তু আমার কী হবে, ভাবল রানা। আমি আর এখানে আটকা থাকতে চাই না। পাগলাটে লোক, কখন কী করে বসবে তার কোনও ঠিকও নেই।

'আরও কিছু বলবেন?' জানতে চাইল রানা। কথার ফাঁকে ঘরের ভিতর চোখ বোলাল। দূর দেয়ালে দরজা। ভালভাবেই আটকে রাখা। সব দেয়াল বরফের।

'মেজর, আমি বলতে চাই: আমি কোনও খুনি নই। আমি কক্ষনো চার্লস মুনকে খুন করিনি।'

কোনও কথা বলল না রানা। চট্ করে মনে পড়ে গেল নিনা ভিসারের কথাগুলো— এই লোকই চার্লস মুনকে খুন করেছে। যে রাতে খুন হয় লোকটা, খুব ঝগড়া করেছিল রাশেদ হাবিব। তারপর মুনের কণ্ঠে গেঁথে দেয়া হয় হাইপোডারমিক সিরিঞ্জ। তার ভিতর ছিল লিকুইড ড্রেন ক্লিনার। রক্তে মিশে যায় বিষ। পরে যখন লাশ পাওয়া যায়, ঘাড় থেকে ঝুলছিল সিরিঞ্জ।

'আমার কথা বিশ্বাস করতে পারছেন না?' নিচু স্বরে বলল

হাবিব। সন্দেহ নিয়ে চেয়ে আছে রানার দিকে।

কোনও জবাব দিল না রানা।

'মেজর, আমার কথা আপনাকে বিশ্বাস করতেই হবে। বুঝতে পারছি ওরা কী বলেছে। কী ভয়ঙ্কর খুনি আমি। কিন্তু আমার কথা শুনতে হবে আপনাকে। আমি খুন করিনি। আল্লার কসম! ওই কাজ আমি করিনি।'

বড় করে শ্বাস ফেলল সে, ধীর গতিতে বলতে শুরু করল:

'মেজর, এটা সাধারণ কোন ইস্টিশন না। এখানে অদ্ভুত সব ঘটনা ঘটছিল। আপনি এখানে আসার আগে অনেক কিছুই ঘটেছে। কাউকে বিশ্বাস করতে পারবেন না।'

'কিন্তু আপনাকে বিশ্বাস করতে পারব, তা-ই না?' জানতে চাইল রানা।

'হ্যাঁ। ঠিক তা-ই।' ঘন ঘন মাথা দোলাল বিজ্ঞানী। 'কিন্তু আপনি আমাকে বিশ্বাস করতে পারছেন না, ঠিক? আপনাকে বলা হয়েছে, মাত্র চার-পাঁচ দিন আগে এক লোককে খুন করেছি, তার ঘাড়ে গেঁথে দিয়েছি ইণ্ডাস্ট্রিয়াল-স্ট্রেংথ ড্রেইনো। ঠিক? হ্যাঁ, বেশ, এবার বুঝতে হবে আপনাকে...' রানার দিকে এক পা সামনে বাড়ল সে।

'কী করতে চান?' সাবধানী চোখে চেয়ে রইল রানা।

'আপনি এবার বুঝবেন...' বন্দির বুকের কাছে ঝুঁকে এল রাশেদ হাবিব। ওকে পাহাড়ের মত উঁচু মনে হলো রানার। ঠাণ্ডা দুই চোখ চেয়ে আছে ওর দিকে।

আরও আড়ষ্ট হয়ে গেল রানা। হৃৎস্পন্দন বাড়তে শুরু করেছে। পুরোপুরি অসহায়। লোকটা যে কী করে বসবে...

খস্! হঠাৎ করেই খুলে গেল রানার বামহাতের ফিতা, লুটিয়ে পড়েছে মেঝের উপর। এক সেকেণ্ড পর ডানহাত খুলে গেল।

দুই হাত খুলে গেছে রানার। এবার ওর বুক আটকে রাখা

ফিতা খুলে দিল বেঁটে বিজ্ঞানী। চট্ করে উঠে বসল রানা। সরে গেছে লোকটা, দুই পায়ের ফিতা খুলছে ব্যস্ত হয়ে।

দীর্ঘ কয়েক মুহূর্ত রাশেদ হাবিবের দিকে চেয়ে রইল রানা, তারপর নরম স্বরে বলল, 'ধন্যবাদ।'

'আমাকে ধন্যবাদ দেবেন না, মেজর,' বলল হাবিব। 'আমাকে বিশ্বাস করুন। ...কথা দিনঃ সব ঝামেলা শেষ হলে চার্লস মুনের লাশ পরখ করে দেখবেন। তার চোখ আর জিভ দেখলেই হবে। তা হলেই সব বুঝবেন। আপনি আমার একমাত্র ভরসা, মেজর। আপনি একমাত্র লোক যে প্রমাণ করতে পারবেন আমি আসলে নিরপরাধ।'

রানাকে মুক্ত করে দিয়েছে রাশেদ হাবিব। উঠে বসল রানা, আস্তে করে ধরল ঘাড়ের পিছন অংশ। ব্যথায় দপদপ করছে জায়গাটা। কাছের এক আয়না দিয়ে ঘাড়ের পিছন দিক দেখল। ভালভাবেই ক্ষত বুজে দিয়েছে হাবিব। সেলাইয়ে কোনও খুঁত নেই।

লোকটার হাত থেকে অ্যাডহেসিভ গজ নিল রানা, ক্ষতের উপর শক্ত করে বসিয়ে দিল। নিজের দেহের দিকে চাইল। ওর বেশিরভাগ আর্মার সরিয়ে নিয়েছে বিজ্ঞানী। এখনও পরে আছে ক্যামোফ্লেজ ফেটিগ। তার নীচে টার্টল-নেক গেঞ্জি। পায়ে এখনও বুট, তুবড়ে গেছে গোড়ালি ও হাঁটুর গার্ডগুলো। দূরের দেয়ালের কাছে একটা টেবিল, তার উপর রাখা পিস্তল, ছোরা, এমপি-৫ মেশিন পিস্তল ও ম্যাগহুক।

বন্ধ ঘরের দরজা আবারও দেখল রানা। কী যেন মনে পড়তে চাইছে। ও, হ্যাঁ, রিভেট মেরে বন্ধ করে দেয়া হয় রাশেদ হাবিবের রুমের দরজা। কিন্তু মন বলছে, ও যেন দেখেছে ভেঙে ফেলা হয়েছে দরজা।

হঠাৎ জানতে চাইল রানা, 'কীভাবে এখানে আনলেন?'

'সোজা কাজ। আপনার শরীরটা ভরে দিলাম লিফটে, তারপর তুলে আনলাম এই লেভেলে,' বলল হাবিব।

'কিন্তু আপনার ঘরের দরজা বন্ধ করে দেয়া হয়। কীভাবে বেরুলেন বা ঢুকলেন?'

চতুর হাসল বিজ্ঞানী। 'আপনি আমাকে জাদুকর হ্যারি হুডিনি বলতে পারেন।'

ঘরের আরেক প্রান্তে চলে গেল সে, থমকে দাঁড়িয়ে গেল দুই টিভি মনিটরের সামনে। 'চিন্তা করবেন না, মেজর, সবই বলব। অবশ্য তার আগে, আপনাকে একটা দৃশ্য দেখাতে চাই।'

'সেটা কীসের?'

আবারও হাসল হাবিব। সেই চতুর হাসি। 'মেজর, আপনি নিশ্চয়ই দেখতে চান কে আপনাকে গুলি করেছে?'

কয়েক পলক হাবিবের দিকে চেয়ে রইল রানা, তারপর বিছানা থেকে নেমে এল। টনটন করছে ঘাড়, শুরু হয়ে গেছে বেদম মাথাব্যথা। তিক্ত মনে ঘরের আরেক প্রান্তে পৌঁছে গেল ও, হাবিবের পাশে দুই টেলিভিশন মনিটরের সামনে থামল।

'আপনার ঠাণ্ডা লাগছে না?' লোকটার নিশ্চিন্তভাব দেখে জানতে চাইল।

শার্টের দুটো বোতাম খুলে ফেলল হাবিব, দেখা গেল সুপারম্যানের মত নীল ওয়েটসুটের আণ্ডারগার্মেন্ট। 'নিয়োপ্রেন বডিসুট,' গর্ব করে বলল। 'আসলে স্পেসওয়াকের জন্য এই জিনিস ব্যবহার করে। এখানে হিমাঙ্কের এক শ' ডিগ্রি নীচে নেমে গেলেও টের পাব না।'

ডানপাশের মনিটর চালু করল বিজ্ঞানী, সাদা-কালো স্ক্রিনে কিছুই দেখা গেল না। অবশ্য দশ সেকেণ্ড পর দৃশ্য ফুটল। আইস স্টেশনের নীচের ডেক দেখতে পেল রানা। ওই যে কালো পুল।

ছবিটা একটু অদ্ভুত। অনেক উপর থেকে ক্যামেরা দিয়ে

তোলা হয়েছে। পুল ও চারপাশের দৃশ্য।

'লাইভ ফিড,' মন্তব্য করল হাবিব। 'সি-ডেকের সেতুর নীচ থেকে এই দৃশ্য তুলছে ক্যামেরা। একেবারে নীচে নীল পানির পুল।'

স্ক্রিনে সাদা-কালো ছবি দেখছে রানা ভুরু কুঁচকে।

'ছয় মাসে একবার করে বিজ্ঞানীদের পালা করে সরিয়ে নেয়া হয় অন্য ঘরে,' বলল হাবিব। 'আমার আগে এ ঘরে যে লোক ছিল, সে এক পাগল মেরিন বায়োলজিস্ট। এসেছিল নিউ যিল্যাণ্ড থেকে। কিলার ওয়েইল খুব পছন্দ করত সে। সারাদিন ধরে খুনি তিমি দেখত। ঘণ্টার পর ঘণ্টা শুধু এ-ই। কিলার ওয়েইলগুলো বাতাস নেয়ার জন্য আসত স্টেশনে। ওগুলোর প্রতিটার নাম দিয়েছিল। লোকটার নাম ছিল... কী যেন! কার্কাস? না...' মাথা নাড়ল হাবিব। 'তা যাই হোক। বুড়ো কার্কাস সেতুর নীচে একটা ক্যামেরা বসাল। ঘরে বসে পুলের ভিতর খুনি তিমি দেখবে। ওরা এলেই দৌড়ে এসে ঘরে মনিটর চালু করত। কখনও গিয়ে ঢুকত ডাইভিং বেলের ভিতর। কাছ থেকে কিলার ওয়েইল দেখবে বলে। পাগল না?'

রানার দিকে চেয়ে ফিক করে হেসে ফেলল হাবিব। আর রানার মনে হলো, সামনেই তো আস্ত পাগল দেখছি!

'যাই হোক, কিলার ওয়েইল নিয়ে আমরা কথা বলছি না।' আবার মনিটরের দিকে চাইল হাবিব।

'আপনি কিলার ওয়েইলের সঙ্গে আমাদের লড়াই দেখেছেন?' জানতে চাইল রানা।

'ভয়ঙ্কর, তা-ই না?' বলল হাবিব। 'দেখিনি মানে! ডিভিডি করে রেখেছি! কাছ থেকে দেখেছেন? একেকটা দানব। আপনি কি জানেন কীভাবে শিকার করে? শিকারের আগের অভ্যেস খেয়াল করেছেন? শিকার ধরার আগে একবার পাশ দিয়ে যায়, তারপর

ফিরে এসে হামলা শুরু করে।'

'আগে খেয়াল করিনি,' বলল রানা।

'আমার কথা বিশ্বাস করতে পারেন। প্রতিবার একই কাজ করে। আগেই বইয়ে পড়েছিলাম। আমার কী মনে হয় জানেন, ওরা আগেই কোনোভাবে অন্যদেরকে বুঝিয়ে দেয়— এই শিকারটা আমার। আপনি চাইলে দেখাতে পারি যে কীভাবে...'

'অন্য কিছু দেখাতে চেয়েছিলেন,' তাড়াতাড়ি করে বলল রানা। 'এক লোক গুলি করছে আমাকে।'

'ও, হ্যাঁ। ঠিক কথাই তো বলেছেন। ভুলে গিয়েছিলাম।' রানা ভুরু কুঁচকে চেয়ে আছে দেখে টেবিলের উপর থেকে একটা ডিভিডি ডিস্ক নিল সে, ভরে দিল প্লেয়ারে। লোকটা বোধহয় পাগল, ধারণা করল রানা। খুব নার্ভাস, সর্বক্ষণ তিরতির করছে চোখের তারা। অবশ্য বোঝা যায় তুখোড় বুদ্ধিমান লোক। অনেক বেশি কথা বলে। একবার শুরু করলে চট্ করে থামতে পারে না। রানা আঁচ করতে চাইল কত হবে তার বয়স। কয়েক সেকেণ্ড পর সিদ্ধান্ত নিল, পঁয়তাল্লিশ থেকে পঞ্চাশ।

'এই তো পেয়েছি!' হঠাৎ বলে উঠল রাশেদ হাবিব।

'কী?' জানতে চাইল রানা।

'আর্লিং কর্গ্যান! ওই মেরিন বায়োলজিস্টের নাম...'

'ডিভিডি চালু করুন,' বিরক্ত হয়ে বলল রানা।

'ও, হ্যাঁ, ঠিকই তো বলেছেন,' প্লে বাটন টিপল হাবিব।

কয়েক সেকেণ্ড পর দ্বিতীয় মনিটরে দৃশ্য ফুটল। প্রথম মনিটরের মতই, অনেক উপর থেকে ছবি তোলা হয়েছে। পুল ও চারপাশের প্ল্যাটফর্ম।

অবশ্য, একটা ব্যতিক্রম আছে।

দ্বিতীয় মনিটরে দেখা গেল এক লোক দাঁড়িয়ে আছে নীচের ডেকে। মেরিনদের মত পোশাক। একা।

বোঝা গেল না সে কে হতে পারে। ক্যামেরা ঠিক তার মাথার উপর থেকে ছবি তুলেছে। চকচক করছে লোকটার হেলমেটের উপর অংশ এবং শোল্ডারপ্লেট।

তারপর হঠাৎ করেই মুখ তুলে চাইল লোকটা। বিশাল কূপের উপর দিকে চেয়েছে। নিজের মুখ দেখতে পেল রানা। ভুরু কুঁচকে নিজের ভুরু কোঁচকানো মুখ দেখছে ও। হাবিবের দিকে চাইল রানা, 'এটা কখন রেকর্ড করেছেন?'

'দেখতে থাকুন।'

আবার মনিটরে মন দিল রানা। পুলের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছে ও, হেলমেটে কী যেন বলল। কোনও আওয়াজ নেই। মুখ নড়ছে। কথা শেষ হলে ডেকের উপর এক পা সামনে বাড়ল।

ওখানেই থেমে গেল। কীসের উপর যেন পা পড়েছে।

রানা নিজের ছবি দেখছে, সামনের দিকে ঝুঁকে গেছে ও। ডেকের উপর ভাঙা কাঁচ। চারপাশ দেখে নিল। তারপর যেন কান পাতল। কিছু শুনতে হলে অনেকে এভাবে মুখ কাত করে। বোধহয় হেলমেট মাইক্রোফোনে কিছু বলছে কেউ।

ছবির রানা আবার সোজা হয়ে দাঁড়াল, ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করেছে। হঠাৎ করেই ভীষণ ঝাঁকি খেল ওর দেহ। ঘাড় থেকে ছিটকে বেরুল সরু রেখার রক্ত। থমকে দাঁড়িয়ে গেছে রানা, টলমল করছে দু'দিকে। ঘাড়ের উপর রাখল হাত, আবার মুখের সামনে নিয়ে এল ওটা। বোধহয় তাজা রক্ত।

হঠাৎ করেই ভাঁজ হয়ে গেল দুই হাঁটু। ডেকের উপর ধপ্ করে পড়ল। আর একটুও নড়ছে না।

নিজেকে টেলিভিশনের পর্দায় দেখছে রানা, কিন্তু খুশি হতে পারছে না।

এইমাত্র ওকে গুলি করা হয়েছে।

রাশেদ হাবিবের দিকে চাইল রানা।

'আরও আছে,' মনিটরে মনোযোগ দিল হাবিব। 'অনেক কিছু আছে।'

টেলিভিশনের পর্দায় মন দিল রানা। পুলের পাশে পড়ে আছে ওর দেহ। কিছুক্ষণ পেরিয়ে গেল, কিছুই ঘটছে না। তারপর হঠাৎ করেই দৃশ্যপটের এক পাশে কী যেন নড়ে উঠল।

রানার শিরার ভিতর বান নামল অ্যাড্রেনালিনের, এবার দেখবে কে ওকে গুলি করেছে।

প্রথমে একটা হেলমেট দেখা গেল। ওরই মত মেরিনদের পোশাক পরা।

হাঁটবার ভঙ্গি দেখে বোঝা গেল সে পুরুষ। কিন্তু মুখ দেখা গেল না।

ওর নিথর দেহের দিকে খুব-ধীর ভঙ্গিতে আসছে সে। কোনও ব্যস্ততা নেই। হোলস্টার থেকে বের করে ফেলেছে পিস্তল। স্লাইড টেনে নিল। কক করেছে। এবার গুলি করবে।

টেলিভিশনের দৃশ্যে পুরো মনোযোগ দিয়েছে রানা।

হেলমেটের কারণে লোকটার মুখ দেখা যাচ্ছে না। অচেতন রানার পাশে বসল সে, দুই আঙুল দিয়ে রক্তাক্ত গলা স্পর্শ করল।

'পাল্‌স্‌ পরখ করে দেখছে,' বিড়বিড় করল রাশেদ হাবিব।

কয়েক সেকেণ্ড পর উঠে দাঁড়াল খুনি, সন্তুষ্ট হয়েছে যে রানার হৃৎস্পন্দন থেমে গেছে। আনকক করল পিস্তল, হোলস্টারে রেখে দিল।

'এবার মন দিয়ে দেখুন,' বলল হাবিব। রানার দিকে ফিরে চাইল। 'মেজর, সত্যিই আপনার হার্ট থেমে যায়।'

লোকটার দিকে চেয়ে নেই রানা, সমস্ত মনোযোগ মনিটরে। আঠার মত আটকে গেছে স্ক্রিনে ওর দৃষ্টি।

'এবার দেখুন কী করে,' বলল হাবিব। 'আর এখানেই মস্ত ভুল করল সে, নইলে...'

দৃশ্যের লোকটার দিকে চেয়ে আছে রানা। হেলমেটের জন্য এখনও দেখা যাচ্ছে না মুখ। প্রচণ্ড লাথি দিয়ে রানার দেহ গড়িয়ে নিচ্ছে লোকটা। নিয়ে চলেছে পুলের ধারে। জোরালো তিনটে লাথি খেয়ে পুলের পাশে পৌঁছে গেল রানা। পরের লাথিতে ঝুপ্ করে পানিতে পড়ল ওর শিথিল দেহ।

'লোকটা জানে না,' বলল হাবিব, 'ব্যাটা লাথিয়ে আপনার হার্ট চালু করে দিয়েছে।'

'বলতে পারেন কীভাবে কী হলো?'

'ধারণা করেছি, পানি এতই ঠাণ্ডা, ওটা ডেফিব্রিলেটরের কাজ করেছে। আপনি তো জানেন, টেলিভিশনে দেখেননি? প্যাডেল দিয়ে ইলেকট্রিক-শক মেরে লোকের হার্ট চালু করে? ঠিক ওভাবে আপনার দেহে ঝাঁকি দিয়েছে বরফ-ঠাণ্ডা পানি। এবার বুঝুন? আপনার কোনও প্রস্তুতি নেই, এখন ওই ঠাণ্ডা সহ্য করতে পারে কোনও শরীর? ওই ঝাঁকি খেয়ে চালু হয়ে গেল আপনার হৃৎপিণ্ড।'

মনিটরে চেয়ে আছে রানা।

পুলের কিনারায় দাঁড়িয়েছে লোকটা, চেয়ে আছে পানির দিকে। বুদ্বুদ ও ঢেউ নীচে। আধ মিনিট পর ঘুরে দাঁড়াল লোকটা, দেখে নিল চারপাশ। কিন্তু তার পিছনে পুলের ভিতর কী যেন! বিড়বিড় করল রানা, 'ওটা আবার কী!'

দ্রুত হেঁটে দৃশ্যপট থেকে বিদায় নিল লোকটা।

এবার রাশেদ হাবিবের দিকে চাইল রানা।

'সব শেষ হয়নি তো, ভাই,' আপত্তির সুরে বলল লোকটা। 'ভাল করে দেখুন।'

আবারও মনিটরে মন দিল রানা।

পুল ডেক ফাঁকা। কেউ নেই। দীর্ঘ কয়েক সেকেণ্ড পেরিয়ে গেল। কিছুই ঘটছে না। ধীরে ধীরে একমিনিট পেরুল, তারপর হঠাৎ করেই ওটা দেখতে পেল রানা।

'কী হতে পারে?' বিড়বিড় করে বলল।

ঠিক তখনই হঠাৎ করে আপনা-আপনি পুলের পানি সরে যেতে লাগল। সরছে বুদ্বুদ ও ফেনা, তারপর ভেসে উঠল অচেতন রানার দেহ।

অবাক হয়ে দেখছে রানা। শিরার ভিতর ঠাণ্ডা হয়ে আসতে চাইল ওর রক্ত।

জিনিসটা যাই হোক, আসলেই প্রকাণ্ড। আকারে কিলার ওয়েইলের চেয়ে খুব বেশি ছোট নয়।

কিন্তু কোনও কিলার ওয়েইল নয়।

পানি থেকে তুলে ফেলল রানার অচেতন দেহ, আস্তে করে নামিয়ে রাখল ডেকের উপর। চারপাশে গড়িয়ে গেল হালকা ঢেউ। এবার ডেকের উপর উঠে এল গণ্ডারের চেয়ে অনেক বড় প্রাণীটা। ওটার বিপুল ওজনে থরথর করে কেঁপে উঠল ডেক।

হতবাক হয়ে দেখছে রানা। ওটা কোনও ধরনের সিল।

কিন্তু ওর জানা ছিল না, এত বড় সিল পৃথিবীতে আছে।

বিপুল চর্বির কারণে থলথল করছে বিশাল দেহ, পিছনের দুই ফ্লিপারের উপর ভর করেছে। রানা আঁচ করল, ওটা ভয়ঙ্কর শক্তিশালী। অমন শরীরের ভর রাখতে হলে পেশিও হতে হবে প্রকাণ্ড। ওই প্রাণীর ওজন কমপক্ষে আট টন।

অবাক করা ওটার দাঁত। বিশাল সিলের দুই শ্বদন্ত উপর থেকে নীচের দিকে নামেনি, শুরু হয়েছে নীচের মাড়ি থেকে, উঠে গেছে নাকের দু'পাশে।

'কী ওটা?' নিচু স্বরে বলল রানা।

'আমি জানি না,' বলল হাবিব। 'নাক, চোখ, মাথার আকৃতি দেখে মনে হয় এলিফ্যান্ট সিল। কিন্তু এত বড় হয় না ওই জিনিস। বা অমন দাঁতও কোনোদিন বাপের জন্মে দেখিনি। এলিফ্যান্ট সিলের নীচের ক্যানাইন বড়, কিন্তু এমন বিশাল হয় না।'

ডেকের উপর প্রায় দাঁড়িয়ে পড়েছে সিল, তারপর নিচু হয়ে রানার দেহ দেখল। মনে হচ্ছে শুঁকছে ওকে। দীর্ঘ গোঁফ ঘষা লাগছে রানার নাকে-গালে। অনড় পড়ে আছে রানা।

তারপর খুব ধীরে মস্ত একটা হাঁ করল সিল। আরও ঝুঁকে এল, কোদালের মত দাঁতগুলো দেখা গেল পরিষ্কার। ওই জন্তুর চোয়ালের ভিতর সহজেই ঢুকে যাবে রানার মাথা।

চোখ বিস্ফারিত করে দেখছে রানা।

এবার গেল আমার মাথা!

তো বাঁচলাম কী করে?

ডিনার সারতে আরও নেমে এল সিল। হাঁ-টা আরও বড় করেছে, তারপর হঠাৎ করেই চরকির মত ঘুরে গেল ওটা। এতই দ্রুত যে, চমকে গেল রানা। এই সাইজের মাল এমন দ্রুত নড়লে... থরথর করে কেঁপে উঠল ডেক।

দূরের কিছু দেখছে ওটা। কিন্তু অন্য কাউকে দেখা গেল না।

কুকুরের মত ঘেউ-ঘেউ শুরু করেছে সিল।

দৃশ্যের সঙ্গে আওয়াজ নেই, কিন্তু চোখের সামনে দেখা যাচ্ছে কুকুরের মত ডাক ছাড়ছে। সরে গেছে দুই ঠোঁট, বেরিয়ে এসেছে ক্ষুরধার দাঁতগুলো। খেপে গিয়ে চরকির মত ঘুরছে, সেইসঙ্গে ঘেউ ঘেউ। ভঙ্গি দেখে মনে হলো ছুটে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে শত্রুর উপর। পিছনের দুই ফ্লিপারের পেশি থরথর করে কাঁপছে।

তারপর হঠাৎ করেই ঘুরে দাঁড়াল দানবীয় সিল, ঝপাস্ করে ঝাঁপিয়ে পড়ল পুলের ভিতর। তৈরি হলো বিশাল ঢেউ। ডেকের উপর দিয়ে বয়ে গেল পানির স্রোত। তার ভিতর পড়ে থাকল রানা।

'দাঁড়ান-দাঁড়ান,' নাটকীয় ভাবে বলল রাশেদ হাবিব। 'এবার আসছেন ত্রাতা হাবিব।'

দৃশ্যপটে পা রাখল এক বেঁটে লোক, এর মাথায় মেরিনদের

হেলমেট নেই। পরিষ্কার দেখা গেল তাকে, বিজ্ঞানী রাশেদ হাবিব। ছুটে চলে গেল রানার দেহের পাশে, তারপর দু'হাত ভরে দিল বগলের ভিতর, টেনে নিয়ে চলেছে। কয়েক সেকেণ্ড পর কাউকে দেখা গেল না। ফাঁকা পুল ডেক দেখাচ্ছে ক্যামেরা।

স্টপ বাটন টিপল বিজ্ঞানী। 'আর কিছু নেই।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল রানা। এখনও হজম করতে পারেনি সব।

প্রথমে ওকে গুলি করেছে এক লোক, ওর পালস দেখেছে, তারপর নিশ্চিত হয়ে লাথি মেরে ওকে ফেলে দিয়েছে পানির ভিতর। ওকে আর খুঁজে পাওয়া যেত না।

এরপর এল এলিফ্যাণ্ট সিল। ওটা পানি থেকে তুলে আনল ওকে, আস্তে করে নামিয়ে দিল প্ল্যাটফর্মে। তারপর খেতে চেয়েও ফিরতে হলো কালো পানিতে। হাজির হলো রাশেদ হাবিব।

'এবার কী বুঝলেন?' বলল বিজ্ঞানী। 'আমি না বলেছি আপনি ক্লিনিক্যালি ডেড ছিলেন? ওই লোক নিশ্চিত ছিল যে আপনি আর ফিরছেন না।'

'নিশ্চিত না হলে আর একটা গুলি পাঠিয়ে দিত মগজে,' বলল রানা। আস্তে করে মাথা নাড়ল। ওর মনে হলো, মৃত্যুই ওকে রক্ষা করেছে আরেক মৃত্যু থেকে। কয়েক মুহূর্ত পর বলল, 'এই ডিভিডি আরেকবার দেখতে চাই। তখন ওই লোককে ভাল করে দেখতে পাইনি।'

আবারও প্লে বাটন টিপল রাশেদ হাবিব।

নিজেকে পুল ডেকে দেখল রানা। বলল, 'এবার জলদি করে সামনে বাড়ুন।'

ফাস্ট ফরওয়ার্ড করছে হাবিব।

হাসির সিনেমার চার্লি চ্যাপলিনের মত করে নড়ছে রানা। তারপর হঠাৎ করেই ধুপ করে পড়ে গেল।

হাজির হলো খুনি লোকটা। দেখতে না দেখতে পরীক্ষা করল হৃৎস্পন্দন। হাস্যকর ভাবে উঠে দাঁড়িয়ে লাথি মারতে শুরু করেছে রানার নিথর দেহে।

'এবার স্বাভাবিক ভাবে চলতে দিন,' বলল রানা।

শেষবারের মত লাথি মারল লোকটা, পানির ভিতর গিয়ে পড়ল মৃত রানা।

'ঠিক আছে, এবার স্টপ করার জন্য তৈরি থাকুন,' বলল রানা। খুব মনোযোগ দিয়ে দৃশ্যটা দেখছে।

লোকটা আছে পানির ধারে, চেয়ে আছে পুলের ভিতর। ডুবে গেছে রানা।

ঘুরে দাঁড়াল লোকটা, চারপাশ দেখে নিল।

'ব্যস! থামুন!' বলল রানা।

'পয' বাটন টিপল রাশেদ হাবিব। দৃশ্য আটকে গেছে।

লোকটার হেলমেটের উপর অংশ দেখা যাচ্ছে। ঘুরে চারপাশ দেখতে চেষ্টা করেছে বলে সামান্য উঁচু হয়েছে কাঁধ।

'আপনি আসলে কী চান?' বলল হাবিব। 'আপনি তো চেহারা দেখছেন না।'

'আমি ওর মুখ দেখতে চাই না,' বলল রানা।

আসলেই চেহারা নিয়ে মাথাব্যথা নেই ওর। চোখ পড়ে আছে লোকটার কাঁধে। বা বলা উচিত ডান কাঁধের আর্মার্ড প্লেটের উপর।

থরথর করে কাঁপছে দৃশ্য, কিন্তু পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে।

প্লেটের উপর একটা ছবি।

শিরশির করছে রানার মেরুদণ্ড, ওই লোকের কাঁধের প্লেটে একটা টাট্টু। ছবিটা একটা ভাইপার সাপের, ছোবল দেয়ার জন্য বেরিয়ে এসেছে দুই শ্বদন্ত!

বাইশ

ই-ডেকের গুদাম-ঘরে ঠাণ্ডা বরফ-দেয়ালে মাথা রেখে বসে আছে নিশাত সুলতানা, বুজে রেখেছে চোখ দুটো। আধ ঘণ্টা হলো কেউ ওকে দেখতে আসেনি। ওর মন বলছে: একটু পর চলে আসবে হোসেন আরাফাত দবির। কনকনে ব্যথা শুরু হয়েছে ছেঁড়া হাঁটুতে, আরেক ডোজ মেথাডন দেয়া দরকার।

বড় করে শ্বাস ফেলল নিশাত, ব্যথা থেকে সরিয়ে রাখতে চাইছে মনকে। কিন্তু কিছুক্ষণ পর কেমন যেন করে উঠল মন। এই ঘরে অন্য কেউ আছে।

আস্তে করে চোখ মেলল নিশাত। দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে কে যেন।

একটা লোক। মেরিনদের পোশাক পরা।

চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। যেন পাথরের মূর্তি। ছায়ার কারণে মুখ দেখা গেল না। একটা কথাও বলছে না।

'দবির?' আস্তে করে সোজা হয়ে বসল নিশাত। দেখতে চাইছে কে এসেছে।

এক মুহূর্ত পর চমকে গেল। দবির না।

যে এসেছে সে দবিরের চেয়ে লম্বা, আরও পোক্ত শরীর।

লোকটা একটা কথাও বলছে না। চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। অন্ধকার থেকে চেয়ে আছে নিশাতের দিকে। কয়েক সেকেণ্ড পর নিশাত বুঝল, এই লোক কে হতে পারে।

'ভাইপার,' বলল। 'কী হয়েছে? কথা বলছেন না কেন?'

দরজা থেকে সরল না পল সিংগার। নিষ্কম্প চোখে দেখছে নিশাতকে। কয়েক মুহূর্ত পর বলে উঠল, কিন্তু ঠোঁট নাড়া দেখা গেল না। নিচু কণ্ঠ, কর্কশ, 'আমি দবিরের বদলে এসেছি। আপনার ব্যবস্থা করছি।'

'ভাল হলো,' বলল নিশাত, আরও সোজা হয়ে বসল। 'সত্যি আরেক ডোজ মেথাডন খুব দরকার।'

দরজা থেকে নড়ল না ভাইপার।

ভুরু কুঁচকে গেল নিশাতের। 'কী হলো?' জানতে চাইল। 'দেরি করছেন কেন? আপনাকে সাদর আমন্ত্রণ জানাতে হবে?'

'না,' ঠাণ্ডা স্বরে বলল লোকটা। গুদাম-ঘরে এসে ঢুকল।

বিস্ফারিত হয়ে গেল নিশাতের দুই চোখ। করিডোরের আলো এসে পড়েছে লোকটার উপর। হাতে একটা ছোরা!

বরফ-দেয়ালে ঢুকে যেতে চাইল নিশাত। ভাইপারের হাতের ছোরা মেরিনদের বাউয়ি নাইফ। 'কী করতে চান, ভাইপার?'

'আমি দুঃখিত, ম্যাডাম,' শীতল কণ্ঠে বলল লোকটা। 'আপনি ভাল সৈনিক, কিন্তু ভুল যুদ্ধে এসেছেন।'

'তার মানে কী?'

কাছে চলে এসেছে ভাইপার। তার ছোরার উপর আঠার মত আটকে গেছে নিশাতের চোখ।

'ন্যাশনাল সিকিউরিটি, ম্যাডাম,' বলল সিংগার। 'জাতীয় স্বার্থে...'

'ন্যাশনাল সিকিউরিটি?' ঢোক গিলল নিশাত। 'এসব আবার কী বলছেন?'

সরু ঠোঁটে দেখা দিল হাসি, পৈশাচিকভাবে হাসছে সিংগার। 'আরে ম্যাডাম, বুঝলেন না? এসব তো আপনাদের আর্মিতেও থাকার কথা। অনেক কাহিনি তো শুনবার কথা। আপনি বুঝতে

পারছেন না আমি কে?'

'একটা পিশাচ, একটা রক্তপিশাচ,' বলল নিশাত। এক চোখ রেখেছে নিজের হেলমেটের উপর। ওটা আছে ওর এবং ভাইপারের মাঝে। উল্টো হয়ে পড়ে আছে। মাইক্রোফোন তাক করা উপরের দিকে।

আস্তে করে বেল্টের দিকে ডানহাত নামিয়ে দিল নিশাত।

'যা করতেই হবে, তাতে আমরা দেরি করি না,' বলল ভাইপার।

'আপনি কী করতে চান?' বেল্টের বাটন টিপে চালু করে দিল নিশাত হেলমেট মাইক।

বি-ডেকে রাশেদ হাবিবের ঘরে বডি আর্মার পরে নিয়েছে রানা, দ্রুত হাতে তুলে নিচ্ছে অস্ত্র। পিস্তল চলে গেছে কোমরের হোলস্টারে, গোড়ালির খাপের ভিতর ছোরা, কাঁধের হোলস্টারে এমপি-৫। এবার পিঠে ঝুলিয়ে নিল ম্যাগহুক। মাথার উপর চাপিয়ে নিল হেলমেট। আর তখনই শুনতে পেল:

'...জাতীয় স্বার্থে।'

'ভাইপার, নামিয়ে রাখুন ওই...'

হঠাৎ স্ট্যাটিকের আওয়াজ শুরু হলো, আর শোনা গেল না কিছুই।

কিন্তু যা বুঝবার বুঝে গেছে রানা।

নিশাত সুলতানা আছে গুদাম-ঘরে, আর ওখানে গিয়ে ঢুকেছে পল সিংগার, ওরফে ভাইপার! ঝট্ করে রাশেদ হাবিবের দিকে চাইল রানা। 'জাদুকর হ্যারি হুডিনি, দেখিয়ে দিন কীভাবে বেরুতে হবে। পাঁচ সেকেণ্ড পাবেন, তারপর গুলি করব ঠ্যাঙে!'

'ওরে বাপরে!' দরজার দিকে ছুট দিয়েছে বিজ্ঞানী। 'এত তাড়া কীসের?'

পাশে ছুটতে শুরু করেছে রানাও। 'আমার এক অফিসারকে খুন করতে চাইছে এক আমেরিকান সৈনিক।'

গুদাম-ঘরে নিশাতের ভাঙা হেলমেটের উপর পা রেখেছে ভাইপার। চুরমার করে দিয়েছে মাইক। 'ম্যাডাম, কী হয় মরলে?' নরম স্বরে বলল। 'আমি আপনাকে বুদ্ধিমতি মনে করেছিলাম। ওই সিগনাল তো আমিও শুনতে পেয়েছি।'

'আপনি কেভিন হাক্সলেকে খুন করেছেন?' জানতে চাইল নিশাত।

'নিশ্চয়ই!'

চট্ করে পাল্টে গেল নিশাতের সম্বোধনঃ 'তুমি কি জানো তোমার বাবার পশ্চাদ্দেশ দিয়ে বেরিয়েছ?'

নিশাতের সামনে পাহাড়ের মত দাঁড়িয়ে পড়েছে সিংগার। দেয়ালে একটু সরে গেল নিশাত।

'এবার মরতে হয়, ম্যাডাম,' হাসি-হাসি সুরে বলল ভাইপার।

ঘোঁৎ করে উঠল নিশাত। 'ভাইপার, একটা কথা জানতে খুব ইচ্ছে আমার— তোমার বাবার কতটা কষ্ট হয়েছিল?'

কাঠ-কাঠ হাসি দিল পল সিংগার। 'আপনার মনে রাখতে হবে আমি অন্য জাতের। আমি আইসিজি।'

পুরু কাঠের দরজার সামনে থেমে গেছে বিজ্ঞানী রাশেদ হাবিব, এইমাত্র রানা খেয়াল করেছে দশটি সমান্তরাল তক্তা দিয়ে তৈরি ওই দরজা।

একটা তক্তার উপর হাত রেখেছে হাবিব। 'বাইরের দিকে বিম, আর তাই ওদিক থেকে কেউ দেখেনি ভিতরে দরজার তক্তা কেটেছি।'

সরু হয়ে গেল রানার চোখ। পরক্ষণে বুঝতে পারল। ভারী

দরজার পুরু তক্তা সমান্তরাল করে কেটেছে হাবিব। বাইরের দিকে খাড়া বিম ঠিকই আছে, কিন্তু সেটাও খানিকটা কেটে ফেলা হয়েছে। ওদিক থেকে কেউ দেখলে বুঝবে না ফোঁপড়া করেছে দরজা।

ব্যাটার বুদ্ধি আছে, স্বীকার করে নিল রানা।

'করাতের কাজ চালাতে হয়েছে স্টেক নাইফ দিয়ে,' বলল হাবিব। 'আসলে তিনটে ছুরির বারোটা বাজিয়েছি। কঠিন তক্তা, সহজে নষ্ট হয় ছুরির ধার।' ডানপাশের টেবিল থেকে একটা স্টেক ছুরি তুলে নিল সে, খাড়া বিমের সরু ফাটলে চাড় দিল। ক্রোবারের কাজ করছে জিনিসটা। এক মুহূর্ত পর টাস্ করে খুলে এল সমান্তরাল একটা তক্তা।

ওটা আস্তে করে মেঝেতে নামিয়ে রাখল হাবিব। দরজার বুকে চৌকো একটা ফোকড় তৈরি হয়েছে। ওদিক দিয়ে বি-ডেকের বাইরের বাঁকা টানেল দেখল রানা।

দ্রুত কাজ করছে রাশেদ হাবিব, দুই হাতে সরিয়ে নিল দ্বিতীয় তক্তা। আরও বড় হলো গর্ত। দরজার বুকে মাঝারি একটা ফোকড় তৈরি হয়েছে। পাশের খাড়া বিম সরাতে শুরু করেছে রানা, তিন সেকেণ্ড পর বেশ বড় হলো গর্ত। রাশেদ হাবিবের মত চিকন লোক বেরিয়ে যেতে পারবে।

'এবার তিন পা পিছিয়ে যান,' বলল রানা। নিজেও কয়েক পা পিছিয়েছে। এক পলক হাবিবকে দেখে নিয়েই দৌড় শুরু করল, ঝাঁপিয়ে পড়ল দরজার উপর।

জোর মড়াৎ আওয়াজ তুলে ভেঙে পড়ল কয়েকটা তক্তা। সব চারদিকে ছিটকে দিয়ে সুড়ঙ্গের মেঝেতে পড়েছে রানা। পরক্ষণে লাফ দিয়ে উঠেই ঝেড়ে দৌড় দিল। কেউ দেখলে ভাববে, বেচারা আমাশা রোগীর লোটা-কম্বল নিয়ে ভাগছে ছিঁচকে চোর।

পিছন থেকে চেঁচাল হাবিব, 'ভাই রে, আমার জন্য একটু

অপেক্ষা করেন! আমি কী করে একা থাকব?'

টানেলে বাঁক নিল রানা। 'কোনও ভয় নেই!'

উড়ে চলেছে রানা, ওর পিছু নিল হাবিব, বিড়বিড় করে বলল, ওভাবে ঝাঁপ দিলে আমার সব ক'টা হাড় মুড়মুড় করে ভাঙত!'

পাখির মত উড়ে চলেছে সে, বাঁক নিয়েই দূরে রানাকে দেখতে পেল।

চিতার মত ছুটছে রানা, ধুপধুপ করে লাফিয়ে চলেছে হৃৎপিণ্ড। মাথার ভিতর দপদপে ব্যথা। বামে মোড় নিল সেণ্ট্রাল শাফটের দিকে। একহাজার একটা চিন্তা মনের ভিতর। যে-লোক ওকে গুলি করেছে, তার শোল্ডারপ্লেটে ভাইপারের টাট্টু।

ওই লোক গানারি সার্জেণ্ট পল সিংগার, ওরফে ভাইপার! খুবই সম্মানিত সৈনিক, বহু বছর কাজ করেছে মেরিন কর্পসে। এ ধরনের জঘন্য কাজ কেন করছে সে? নিজ দলের আহত যোদ্ধাকে মেরে ফেলছে!

নিশাত সুলতানা এখন ই-ডেকের গুদাম-ঘরে। মেরে ফেলা হচ্ছে তাকে!

ভাইপার এরই ভিতর কেভিন হাক্সলেকে খুন করেছে। আহত তরুণ ছিল সবার ভিতর সবচেয়ে দুর্বল। আর এখন নিশাত সুলতানাকে খুন করতে গেছে ঠাণ্ডা মাথার খুনিটা। এক পা নেই নিশাতের, তার উপর মেথাডন দেয়া হয়েছে, ঝিমিয়ে পড়ে থাকবার কথা। সহজেই ওকে মেরে ফেলবে সিংগার।

প্রায় উড়তে উড়তে বি-ডেকের ক্যাটওয়াকে বেরিয়ে এল রানা। ছুটতে শুরু করেছে কাছের রাং-ল্যাডারের উদ্দেশে। পাঁচ সেকেণ্ড পর পিছলে নেমে যেতে লাগল সি-ডেকে। তার দশ সেকেণ্ড পর রাং-ল্যাডার বেয়ে নেমে গেল ডি-ডেকে। পরের লেভেলে নামতে শুরু করেছে।

কয়েক মুহূর্ত পর পৌঁছে গেল ই-ডেকে। পুলের পাশ কেটে

ছুটছে, চোখের কোণে দেখল ছোট সব ঢেউ এসে লাগছে ডেকের পাশে। পরক্ষণে ঢুকে পড়ল দক্ষিণ টানেলে। একটু দূরে নিশাতের গুদাম-ঘরের দরজা।

দৌড়ের গতি কমাল রানা, প্রায় নিঃশব্দে চলেছে। কাঁধের পিছন থেকে তুলে নিয়েছে ম্যাগহুক। স্টেশনের গ্যাসীয় পরিবেশে ব্যবহার করতে পারবে না পিস্তল। অস্ত্রের মত করে সামনে বাড়িয়ে ধরল ম্যাকহুক।

পৌঁছে গেল খোলা দরজার সামনে। ঘরের ভিতর দুই পা ঢুকে থমকে দাঁড়িয়ে গেল। কোমর থেকে বাগিয়ে ধরেছে ম্যাকহুক, কিন্তু ভিতরের দৃশ্য দেখে ওখানেই থমকে গেছে। অবাক হয়ে চেয়ে রইল। বিড়বিড় করে বলল, 'কী করে সম্ভব!'

গুদামের মেঝেতে নিশাত সুলতানা ও পল সিংগার।

টানটান হয়ে বসা নিশাত সুলতানা। পিঠ ঠেকিয়ে দিয়েছে একদিকের দেয়ালে। ওর ভাল পা কাজে ব্যস্ত। পায়ের পাতা দিয়ে টিপে ধরে আছে ভাইপারের গলা। লোকটা গেঁথে আছে কাঠের শেলফের ভিতর। তাক থেকে মেঝেতে গড়িয়ে পড়েছে কয়েকটা স্কুবা ট্যাঙ্ক। নিশাতের বিশাল পায়ের পাতা চেপে ধরেছে ভাইপারের গলা, কাঠের শেলফে মাথা গুঁজে দিতে হয়েছে লোকটাকে। নিজের হোলস্টার থেকে কোল্ট অটোমেটিক পিস্তল বের করেছে নিশাত, দুই হাতে ধরেছে। অস্ত্রের নল তাক করেছে সিংগারের কপাল লক্ষ্য করে।

স্টেশনের বাতাসে গ্যাস ভাসছে বলে গুলি হলে বিস্ফোরণ হবে, কিন্তু মনে হলো এসব নিয়ে ভাবছে না নিশাত। বাম ভুরুতে দুটো কাটা চিহ্ন, নষ্ট কলের পানির মত গাল বেয়ে ফোঁটা ফোঁটা পড়ছে রক্ত। ওদিকে খেয়াল নেই নিশাতের, কঠোর চোখে চেয়ে আছে পল সিংগারের চোখে। মনে হলো চিবিয়ে খেয়ে ফেলবে লোকটাকে।

বাতিল কাগজের মত তাকের ভিতর গুঁজে আছে ভাইপার, বারকয়েক সরে যাওয়ার চেষ্টা করে থেমে গেছে। নিশাতের শারীরিক শক্তি সম্পর্কে কিছুই জানে না সে। যতবার সরতে চেয়েছে, তার কণ্ঠার উপর বেকায়দা চাপ দিয়েছে বারো নম্বরি বুট। পা দিয়ে গলা টিপে মেরে ফেলছে নিশাত লোকটাকে।

ঘরের ভিতর যেন ঝড় বয়ে গেছে। মেঝের উপর পড়ে আছে দুটো শেলফ। স্কুবা ট্যাঙ্কগুলোর মাঝে ভাইপারের বাউয়ি ছোরা দেখল রানা। রক্ত মেখে আছে ফলায়।

খুব ধীরে রানার দিকে চাইল নিশাত। দরজার কাছে থমকে গেছে রানা।

একটু আগের লড়াইয়ের ফলে ঘনঘন শ্বাস ফেলছে নিশাত, বড় করে একবার দম নিয়ে বলল, 'কী ব্যাপার, স্যর? আপনি কি চুপ করে দাঁড়িয়েই থাকবেন?'

তেইশ

ম্যাথিউ ফ্যেনুয়্যা ও স্যাঁ ডেনি পেঁয়েযিকে ই-ডেকে যেখানে রাখা হয়েছিল, সেখানেই খুঁটির সঙ্গে আটকে রাখা হয়েছে পল সিংগার বা ভাইপারকে। চাইলেও হ্যাণ্ডকাফ খুলতে পারবে না। সব বডি আর্মার সরিয়ে নেয়া হয়েছে। চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। এখনও পরনে ক্যামোফ্লেজ পোশাক, অর্থাৎ কমব্যাট ফেটিগ।

লোকটার সামনে দাঁড়িয়েছে মাসুদ রানা, হোসেন আরাফাত দবির ও নাজমুল, ওদের সবার চোখ থেকে তীব্র ঘৃণা ঝরছে। পুল

ডেকে বয়ে আনা হয়েছে নিশাত সুলতানাকে, বসে আছে একটা চেয়ারে রাণী ক্লিয়োপেট্রার মত।

রানার পিছনে দাঁড়িয়েছে বিজ্ঞানী রাশেদ হাবিব, শুকনো মুখ।

পরিবেশে টানটান উত্তেজনা। কেউ কথা বলছে না।

হাতঘড়ি দেখল রানা। বিকেল তিনটা বেয়াল্লিশ মিনিট। সোলার ফ্লেয়ারের বিষয়ে রাফায়লা ম্যাকানটায়ার কী বলেছিল, মনে আছে রানার। উইলকক্স আইস স্টেশনের উপরের আকাশ পরিষ্কার হবে তিনটা একান্ন মিনিটে।

আর মাত্র নয় মিনিট।

তার আগেই যা করবার করতে হবে। তিশা এবং অন্যরা এখনও পাতাল-গুহার ভিতর। আগে তাদের সঙ্গে কথা বলবে, তারপর যোগাযোগ করবে ম্যাকমার্ডো স্টেশনে? হাতঘড়ির পাশের একটি নব টিপে দিল রানা। বদলে গেল ডিসপ্লে। স্টপওয়াচ স্ক্রিন। টিকটিক করে বাড়ছে সময়।

১:৫২:৫৮

১:৫২:৫৯

১:৫৩:০০

হাতে সময় নেই। তিনটে একান্ন মিনিটে ম্যাকমার্ডোর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করবার পর, হাতে সময় থাকবে এক ঘণ্টারও কম। এর ভিতর ফ্রেঞ্চ রণতরীকে ঠেকাতে না পারলে উইলকক্স আইস স্টেশনের উপর এসে পড়বে মিসাইল।

'ঠিক আছে,' চারপাশে জড় হওয়া প্রত্যেকের উদ্দেশে বলল রানা, 'দবির ও নাজমুল, যা বলার তাড়াতাড়ি।'

ওদের কাহিনি সংক্ষেপে বলল ওরা। দু'জন ছিল বাইরে, স্টেশনের অ্যান্টেনা ঠিক করছিল।

'তারপর, স্যর, আপনি বললেন আমাদের একজন যেন মিস্টার হাবিবের ঘর দেখে আসি,' বলল দবির। 'কাজটা নিল

ভাইপার। দেরি না করে চলে গেল। এরপর পনেরো মিনিট পর ফিরে এল। বলল, সব ঠিক। এখনও ঘরের ভিতর আছেন রাশেদ হাবিব। খামোকা চিন্তা করেছেন স্যর।'

আস্তে করে মাথা দোলাল রানা। ওই সময়ের আগেই গুলি করা হয়েছে ওকে।

'এর একটু পর, আমি উঠে পড়লাম, আপাকে দেখে আসব,' বলল দবির। 'কিন্তু বাধা দিল ভাইপার, জানাল সে-ই দেখে আসবে। তখন কোনও সন্দেহ করিনি। ভাবলাম, লোকটার একটা নরম সুন্দর মন আছে।'

আবারও মাথা দোলাল রানা। ওই সময়ে হামলা হয় নিশাতের উপর। দু'পা সামনে বাড়ল রানা, বিশ্বাসঘাতকের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে। 'গানারি সার্জেন্ট, তোমার কিছু বলার আছে?'

চুপ করে থাকল পল সিংগার।

'গানারি সার্জেন্ট, তোমার কোর্ট-মার্শাল হবে,' বলল রানা।

বিন্দুমাত্র চিন্তা নেই লোকটার, টিটকারির ভঙ্গিতে হাসছে।

তীব্র ঘৃণা বোধ করছে রানা। এই লোক তরুণ এক সৈনিককে খুন করেছে। ওকে গুলি করেছে। তারপর খুন করতে গেছে আহত নিশাত সুলতানাকে।

পরে ই-ডেকে ঝাপসা কাঁচ কোথেকে এল, খুঁজে বের করেছে রানা। এ-ও বোঝা গেছে, কীভাবে স্টেশনে গ্যাসের বলয়ের ভিতর গুলি করেছে ভাইপার।

কাজটা খুবই সোজা ছিল।

স্টেশনের ভিতর স্নাইপার রাইফেল ব্যবহার করেনি ভাইপার। বাইরে থেকে গুলি করেছে। গম্বুজের সাদা ঝাপসা কাঁচে ছোট গর্ত তৈরি করে শাফটের অনেক উপর থেকে গুলি করেছে। ওই ছোট্ট গোল কাঁচ ই-ডেকের মেঝেতে দেখেছে রানা।

ঠাণ্ডা চোখে পল সিংগারের চোখে চাইল রানা।

'আমাকে বলেছে ও আইসিজি,' বলল নিশাত।

একটু অবাক হয়ে চাইল দবির-নাজমুল, বুঝতে পারছে না।

'পরে তোমাদেরকে বলব,' বলল নিশাত।

'গানারি সার্জেন্ট?' গুড়গুড় করে উঠল রানার কণ্ঠ।

কোনও কথা বলছে না লোকটা।

'তোমার কিছুই বলার নেই?' বলল রানা।

'কিন্তু স্যর, আমাকে যখন শেষ করতে এল, অনেক কথা বলছিল,' বলল নিশাত। 'আমার মনে হয়, ওর দুটো বলই কেটে নেয়া উচিত, পরে তিমি মাছকে খেতে দেয়া যেতে পারে।'

সিংগারের দিকে চেয়ে আছে রানা। খুশি খুশি একটা ভাব ভাইপারের মুখে।

প্রচণ্ড রাগে মেজাজ বিগড়ে গেল রানার। যদি পারত, দুই হাতে ছিঁড়ে ফেলত লোকটাকে।

সামরিক নেতার উচিত নয় রেগে ওঠা— মাথার ভিতর জুলিয়াস বি. গুণ্ডারসনের কণ্ঠ শুনল রানা। মনে মনে বলল: কখনও আপনার দলের ভিতর বিশ্বাসঘাতক ঢুকেছে?

নিজেকে জিজ্ঞেস করল, এই পরিস্থিতিতে বিখ্যাত এসএএস কমাণ্ডার কী করতেন?

'আপনাদের কারও কোনও মতামত— দবির?' জানতে চাইল রানা।

আস্তে করে মাথা নাড়ল সার্জেন্ট। দুঃখিত চেহারা। ভাবতে পারেনি এতক্ষণ ভয়ঙ্কর এক সাপের সঙ্গে ওঠবস করেছে। আস্তে করে বলল, 'ভাবতে পারিনি তুমি মীর জাফর।' ঘুরে চাইল রানার দিকে। 'স্যর, একে খুন করা আমাদের কাজ না, বাধ্য না হলে। আমেরিকান অফিসার এলে তার হাতে তুলে দেয়া যেতে পারে।'

ভাইপারের দিকে চেয়ে আছে রানা। পাল্টা জ্বলন্ত চোখে চেয়ে আছে লোকটা।

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত পেরিয়ে গেল, তারপর রানা বলল, 'ভাইপার, সংক্ষেপে বলো ইন্টালিজেন্স কনভার্জেন্স গ্রুপ কী।'

'সুন্দর ক্ষত,' নরম স্বরে বলল লোকটা, চেয়ে আছে রানার ঘাড়ের দিকে। ওখানে সেলাই ও ব্যাণ্ডেজ। 'আপনার তো মরবার কথা ছিল।'

'সময় হলে মরব,' বলল রানা। 'আইসিজি সম্পর্কে বলো।'

সরু ঠোঁট টিপে হাসল লোকটা। দুলছে হাসতে গিয়ে। কয়েক মুহূর্ত পর বলল, 'আপনি মারা পড়বেন, মেজর।' অন্যদের দিকে চাইল সে। 'তোমরাও কেউ বাঁচবে না।'

'কেন? তুমি মেরে ফেলবে আমাদেরকে?' বলল রানা।

'আপনি তো আইসিজির বিষয়ে জানতে চান,' বলল ভাইপার। 'আমি তো আইসিজি সম্পর্কে সবই বলেছি।'

'আইসিজি আমাদেরকে মেরে ফেলবে?'

'বাঁচবেন না,' বলল সিংগার। 'আপনাদের কারও বাঁচবার উপায় নেই। এখানে যা দেখে ফেলেছেন, তার ফলে কুকুরের মত গুলি করে মারা হবে। আমেরিকান সরকার যখন স্পেসশিপ হাতে পাবে, চাইবে না কয়েকটা ফালতু লোক ওটা নিয়ে কথা বলুক সবাই মরবেন। আমার কথা ফলবে, আপনারা আসলে সবাই জিন্দা লাশ।'

কথাগুলোর রণন মিলিয়ে গেল। থমথম করছে ই-ডেক।

রানা ওর দল নিয়ে উইলকক্স আইস স্টেশনে এসেছিল বাঙালি ও আমেরিকান বিজ্ঞানীদেরকে সরিয়ে নেবে ম্যাকমার্ডো স্টেশনে, বদলে জড়িয়ে গেছে ফ্রেঞ্চ কমাণ্ডোদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে। আর এখন টের পাচ্ছে, আমেরিকান সরকার ওদেরকে দাবার ঘুঁটির মত ব্যবহার করছে। প্রয়োজন শেষে মেরে ফেলা হবে ওদেরকে!

'নিজেকে নিয়ে তোমার খুব গর্ব হচ্ছে, তা-ই না?' ভাইপারের চোখে চেয়ে আছে রানা।

'আমি দেশের কাজ করেছি, আমার দেশ উপকৃত হলেই হবে,' বলল সিংগার।

লোকটাকে পিটিয়ে মারবে ঠিক করেছে রানা, হয়তো তাই করত, কিন্তু অনেকটা উপর থেকে এল এক নারী কণ্ঠ: 'মেজর!'

মুখ তুলে চাইল রানা।

এ-ডেকের রেলিং থেকে ঝুঁকে আছে রাফায়লা ম্যাকানটায়ার। আবারও বলল, 'সময় হয়ে গেছে, মেজর!'

'একে পাহারা দিতে হবে না,' বলল রানা, রওনা হয়ে গেল রাং-ল্যাডারের দিকে।

তিন মিনিট পর এ-ডেকে রেডিয়ো রুমে ঢুকল রানা। ওর সঙ্গে এসেছে দবির ও বিজ্ঞানী হাবিব। ই-ডেকে রয়ে গেছে নাজমুল, মেথাডন দেবে নিশাত সুলতানাকে।

রেডিয়ো কন্সোলের সামনে বসে পড়েছে রাফায়লা। রাশেদ হাবিবকে দেখে মস্ত ঢোক গিলল।

'কী খবর, ডারলিং রাফায়লা?' খুশি-খুশি স্বরে বলল হাবিব।

'এই তো,' খুব সাবধানী সুরে বলল মেয়েটা। রানার দিকে ...ল। 'এখন যে-কোনও সময়ে ফ্লেয়ার সরে যাবে।' কয়েকটা ...ন টিপল সে। ছাতের কাছে ঝুলন্ত দুটো স্পিকারে শুরু হয়েছে ...্যাটিক।

স্স্স্স্স্স্।

'এটা ফ্লেয়ারের আওয়াজ,' বলল রাফায়লা। 'কিন্তু কয়েক সেকেণ্ড অপেক্ষা করলে...'

হঠাৎ থেমে গেল সব আওয়াজ, নেমে এসেছে নীরবতা।

'আকাশ পেয়ে গেছি,' বলল রাফায়লা। 'এই সুযোগ। মেজর, যোগাযোগ করুন।'

কন্সোলের সামনে বসে পড়ল রানা, তুলে নিল মাইক্রোফোন।

টক বাটন টিপে যোগাযোগ করতে চাইতেই খুব তীক্ষ্ণ শিসের

আওয়াজ শুরু হলো। যেন সিগনালকে বাধা দিচ্ছে কিছু। মাইক্রোফোন নামিয়ে রাখল রানা। চাইল রাফায়লার দিকে। 'এবার কী? কোনও বাটন টিপতে হবে?'

কয়েকটা সুইচ টিপল মেয়েটি। 'না, আপনাকে কিছু করতে হবে না।'

'সোলার ফ্লেয়ার? ঠিক সময় বের করতে পারেননি?'

'তা নয়,' আপত্তি নিয়ে বলল রাফায়লা।

কিছুই ঘটছে না। শুধু কানে কনকনে আওয়াজ।

মেয়েটা যা-ই করুক, রেডিয়ো ঠিক হচ্ছে না। উঁচু পর্দার আওয়াজ থামছে না। কিছুক্ষণ পর রাফায়লা বলল, 'কী যেন হয়েছে! এটা ফ্লেয়ারের কারণে হচ্ছে না। অন্য কিছু। মনে হচ্ছে ইলেকট্রনিক। কেউ গলা টিপে ধরছে জ্যামার দিয়ে...'

কথাটা শুনে চমকে গেছে রানা।

'জ্যামিং করছে?'

'ম্যাকমার্ডো আর আমাদের মাঝে কেউ তা-ই করছে। সিগনাল পাঠাতে দিচ্ছে না।'

'স্যর...' কোত্থেকে যেন ভেসে এল একটি কণ্ঠ।

ঘুরে চাইল রানা। দরজার কাছে নাজমুল।

'কী?'

'স্যর, এটা দেখুন,' বামহাত বাড়িয়ে দিয়েছে তরুণ।

হোভারক্রাফটের পোর্টেবল ভিউস্ক্রিন, কিছুক্ষণ আগে ওটা দেখেছে রানা। ছোট টিভি পর্দার মত। তথ্য পাঠিয়ে চলেছে হোভারক্রাফটের রেঞ্জফাইণ্ডার।

রেডিয়ো রুমের শেষপ্রান্তে রানার সামনে পৌঁছে গেল নাজমুল। মনিটর নিয়ে চোখ বোলাল রানা, পরক্ষণে চমকে গেল। 'সর্বনাশ!'

স্ক্রিনে বেশ কয়েকটা লাল বিন্দু। বিশটার কম হবে না।

বিশটা শত্রুযান এলে...

সব আসছে উইলকক্স আইস স্টেশনের দিকে!

থমকে গেছে রানা, আর ঠিক তখনই শুনল ওই কণ্ঠ। শুকনো কাঠের মত শুকিয়ে গেল ওর গলা। গমগম করছে রেডিয়ো রুম। ওই কথা যেন আসছে স্বয়ং স্রষ্টার তরফ থেকে।

'উইলকক্স আইস স্টেশন, শোনো...' নাটকীয় চর্চিত কণ্ঠ: 'উইলকক্স আইস স্টেশনের তোমরা, ভালভাবে মন দিয়ে শোনো: এরই ভিতর জেনেছ, তোমাদেরকে ম্যাকমার্ডো স্টেশনে সিগনাল পাঠাতে দেয়া হচ্ছে না। কাজেই সে চেষ্টা করে লাভ নেই। এখন ভাল করবে যার যার অস্ত্র নামিয়ে রাখলে। কারণ আমরা যখন আসব, কারও সঙ্গে অস্ত্র থাকলে, বাধ্য হয়ে তাকে বা তাদেরকে মেরে ফেলব। লেডিজ অ্যাণ্ড জেন্টলমেন, তোমাদেরকে মেরে ফেলতে আমার ভীষণ কষ্ট হবে।'

বিস্ফারিত হয়েছে রানার দুই চোখ। ওই কণ্ঠ ওর খুব চেনা। আর ওই ইংরেজি উচ্চারণ!

এই কিছুদিন আগেও ট্রেইনিং নিয়েছে ওই মস্ত গুরুর কাছ থেকে!

ওই কণ্ঠ এসএএসের কমাণ্ডার, মেজর জেনারেল জুলিয়াস বি. গুণ্ডারসনের!

এক

'বলছে সবাইকে মেরে ফেলবে,' বিড়বিড় করে বলল কর্পোরাল নাজমুল।

'স্যর, ওরা কখন পৌঁছবে?' জানতে চাইল সার্জেন্ট হোসেন আরাফাত দবির।

জবাব দিল না রানা। ওর সন্দেহ নেই, ওই কণ্ঠ এসএএসের কমাণ্ডার, মেজর জেনারেল জুলিয়াস বি. গুণ্ডারসনের! পোর্টেবল ভিউস্ক্রিনে আঠার মত সেঁটে আছে ওর চোখ। স্ক্রিনের নীচের দিকে চাইল। ছোট বক্সের ভিতর সরু রেখা দিয়ে তৈরি হোভারক্রাফট, একটু একটু নড়ছে। নীচে লেখা: 'বেল টেক্সট্রন সিরিয়াল নং.এন৭-এস– ল্যাণ্ডিং ক্রাফট এয়ার কুশণ্ড (ইউকে)।'

'এসএএস...' অবিশ্বাস নিয়ে বলল নাজমুল। 'ওরা কেন?'

'আমরা এখনও মরিনি,' গম্ভীর স্বরে বলল হোসেন আরাফাত দবির।

'কিন্তু প্রায় মরেই গেছি,' মনে মনে বলল রানা। দবিরের দিকে চাইল। 'ওরা চৌত্রিশ মাইল দূরে। আশি মাইল বেগে আসছে।'

'সাহায্য করতে যে আসছে না, তা বুঝতে পারছি,' বলল দবির।

রানা হিসাব কষতে শুরু করেছে: 'চৌত্রিশ মাইল দূরে, আশি মাইল বেগে...'

'তার মানে ছাব্বিশ মিনিট,' চট্ করে বলে দিল রাফায়লা।

'শালার কপাল,' বিড়বিড় করল দবির।

নীরব হয়ে গেছে ঘর। কেউ কিছু বলছে না।

কানের কাছে নাজমুলের দম ফেলবার আওয়াজ পাচ্ছে রানা। সবাই চেয়ে আছে ওর দিকে।

বড় করে শ্বাস নিল রানা, শান্ত করতে চাইছে মনকে। নতুন করে হিসাব কষতে শুরু করেছে। এসএএস— ব্রিটিশ স্পেশাল এয়ার সার্ভিস, দুনিয়ার সবচেয়ে বিপজ্জনক স্পেশাল ফোর্স! ওই দলের লোক আসছে উইলকক্স আইস স্টেশন লক্ষ্য করে।

নেতৃত্বে মেজর জেনারেল জুলিয়াস বি. গুণ্ডারসন, উনিই নিজে ওকে শিখিয়েছেন কেমন হওয়া উচিত কভার্ট ইনকারশনারি ওয়ারফেয়ার। বছরের পর বছর এসএএসের চিফ, আজ পর্যন্ত কখনও কোনও মিশনে ব্যর্থ হননি।

তার চেয়ে ঢের খারাপ কথা: উনি জ্যাম করে দিয়েছেন ওর রেডিয়ো, চাইলেও ম্যাকমার্ডোয় খবর পাঠাতে পারবে না। তার মানেই, ফ্রেঞ্চ রণতরীকে ঠেকাবার কেউ নেই। স্টেশনের উপর নামবে নিউক্লিয়ার টিপ্ড্ মিসাইল!

স্টপওয়াচ দেখল রানা।

২:০২:৩৫

২:০২:৩৬

২:০২:৩৭

এক ঘণ্টাও নেই, তার আগেই মিসাইল লঞ্চ করবে ফ্রেঞ্চরা।

বড় জলদি সব ঘটছে। আবারও রেঞ্জফাইণ্ডার ভিউস্ক্রিন দেখল রানা। ওদের দিকে ভোমরার মত আসছে ব্রিটিশ হোভারক্রাফট।

কমপক্ষে বিশটা!

প্রতিটার ভিতর দুই থেকে তিনজন।

তার মানেই, কম করে হলেও পঞ্চাশজন কমাণ্ডো!

ওর দলে ক'জন?

রানার মনে হলো: শুধুমাত্র লেংটি পরে বিশাল জনসভায় বক্তৃতা দিতে উঠেছে ও! শুধু তা-ই নয়, ও আসলে জনম বোবা!

আবার হিসাব কষতে শুরু করেছে রানা: স্টেশনের ভিতর ওর দলে তিনজন, পাতাল-গুহায় আরও তিনজন। গুদাম-ঘরে আহত নিশাত সুলতানা। আর ই-ডেকে খুঁটিতে আটকে রেখেছে বিশ্বাসঘাতক পল সিংগারকে।

ভীষণ শুকিয়ে গেল রানার গলা।

এখন আত্মহত্যা করবার জন্য লড়বে, না পালাতে শুরু করবে?

একবার ম্যাকমার্ডো পৌঁছুতে পারলে...

ওদের হাতে অন্য কোনও উপায় আছে?

না, নেই।

চুপ করে আছে সবাই।

'ঠিক আছে, আমরা খুব শীঘ্রি রওনা হব,' বলল রানা।

ই-ডেকের বরফ-ঠাণ্ডা প্ল্যাটফর্মে রানা নামতেই ধপ্ আওয়াজ হলো। ডেক পেরিয়ে দক্ষিণ টানেলের দিকে চলেছে।

'হঠাৎ কী হলো?' একপাশ থেকে জানতে চাইল পল সিংগার। 'কোনও সমস্যা?'

হ্যাণ্ডকাফ পরা সৈনিকের সামনে থামল রানা। খুঁটির নীচে পা ছড়িয়ে বসেছে দুই ফ্রেঞ্চ বিজ্ঞানী। ক্লান্ত চোখে রানাকে দেখছে।

'আগেই নিজের লোক মেরে সাফ করতে গিয়ে মস্ত ভুল করেছ,' ভাইপারকে বলল রানা। 'আগে নিশ্চিত হওয়া উচিত ছিল স্টেশন দখলে রাখতে পারবে। ব্রিটিশদের বিশটা হোভারক্রাফট

আসছে, পৌঁছবে তেইশ মিনিট পর।'

কোনও বিকার দেখা গেল না লোকটার চোখে।

'ওরা যখন আসবে, সম্বর্ধনার জন্য তুমি থাকছ,' হাঁটতে শুরু করেছে রানা।

'আমাকে ফেলে যাবেন?' অবিশ্বাস নিয়ে বলল সিংগার।

'হ্যাঁ।'

'কেন? আমার সাহায্য আপনার দরকার।'

চট্ করে ঘড়ি দেখে নিল রানা। বাইশ মিনিট পর হাজির হবে এসএএস প্লাটুন।

দক্ষিণ টানেলের মুখে পৌঁছে বলল রানা, 'জুলিয়াস বি. গুণ্ডারসনকে অভ্যর্থনা দিয়ো।' হনহন করে হেঁটে চলেছে, টানেল ধরে সামনে বেড়ে পৌঁছে গেল নিশাতের গুদাম-ঘরের দরজায়।

চেয়ারে পিঠ ঠেকিয়ে বসেছে নিশাত সুলতানা। মুখ তুলে রানাকে দেখল, 'কোনও সমস্যা, স্যর?'

'আপনাকে সরিয়ে নিতে হবে।'

'কী হয়েছে?'

'আমেরিকার সেরা মিত্র চোখ উল্টে নিয়েছে। স্টেশন দখল করতে আসছে এসএএস।'

'কতজন, স্যর?'

'বিশটা হোভারক্রাফট।'

'কপাল!' বিড়বিড় করল নিশাত।

'আপা, নড়তে পারবেন?' নিশাতের পাশে পৌঁছে গেছে রানা, গুছিয়ে তুলছে ফ্লুইড ব্যাগ ও ইন্ট্রাভেনাস ড্রিপ।

'কখন আসবে, স্যর?'

চট্ করে ঘড়ি দেখে নিল রানা। 'আর বিশ মিনিট পর।'

'বিশ মিনিট,' ভোঁতা শোনাল নিশাতের কণ্ঠ।

ওর পিছন থেকে দুই ফ্লুইড লাইন তুলে নিল রানা।

'স্যর, একমিনিট।'

কাজ থামিয়ে ওর দিকে চাইল রানা।

'বাদ দিন,' নরম স্বরে বলল নিশাত।

'বুঝলাম না।'

'স্টেশন ছেড়ে বেরিয়ে যান,' বলল নিশাত। 'দেরি করবেন না। আমরা দলে বিশজন থাকলেও এসএএস কমাণ্ডোদের প্লাটুন ঠেকাতে পারতাম না।'

'আপা...'

'ওরা রেগুলার ট্রুপ নয়, প্রশিক্ষিত খুনি। খুন করাই কাজ। শত্রু এলাকায় কাউকে দেখামাত্র হত্যা করে, কাউকে বন্দি করে না। কোনও প্রশ্নও করে না।' চুপ হয়ে গেল নিশাত। কয়েক সেকেণ্ড পর বলল, 'আপনি এসব জানেন, স্যর। স্টেশন থেকে বেরিয়ে যান।'

'যাব।'

'আমার মত লেংড়ি আপনার গতি কমিয়ে দেবে। ওদের ব্লকেড পেরুতে হলে দ্রুত চলতে পারে এমন লোক লাগবে।'

'আপনাকে ফেলে যাব না, আপা।'

'যেভাবে হোক আপনাকে ম্যাকমার্ডোয় পৌঁছুতে হবে, নইলে আমেরিকান ফোর্স পাশে পাবেন না।'

'পেয়েই বা কী হবে?'

'তারপর ফিরবেন, উদোম ন্যাঙটো করে ছাড়বেন ব্রিটিশের বাচ্চাগুলোকে।'

নিশাতের চোখে চাইল রানা।

পাল্টা নিষ্পলক চেয়ে আছে নিশাত। 'যান, স্যর,' নরম স্বরে বলল, 'ফাঁদ থেকে বেরিয়ে যান। আমি ঠিকই থাকব।'

চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে রানা।

'বড় আপার কথা শুনতে হয়!' গম্ভীর স্বরে বলল নিশাত।

'দেরি করা ঠিক হচ্ছে না, রানা। আমি লুকিয়ে থাকব।'

আস্তে করে মাথা উঁচু-নিচু করল রানা। 'আমি আবারও ফিরব, আপা। আমার জন্য অপেক্ষা করবেন।'

'নিশ্চয়ই, ভাই।'

ঘুরে দাঁড়িয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল রানা।

দুই

ওয়াশিংটন ডি.সি.।

দৈনিক পত্রিকা অফিসের কমপিউটার ল্যাবে বসে আছে সান্থা ক্যাসেডিন, সামনে সর্বাধুনিক কমপিউটারের মনিটর। ঘরের কোণে মাইক্রোফিল্ম ভিউয়িং মেশিন। চারদেয়ালে ফাইলিং কেবিনেট। একের পর এক কমপিউটার।

যে সাইটে ঢুকেছে সান্থা, তা অল-স্টেট্স্ লাইব্রেরির ডেটাবেস। অনেকে বলেন, যারা এসব লাইব্রেরি থেকে লয়েলের বই ধার করে, তাদেরকে চোখে চোখে রাখে এফবিআই। এর মাধ্যমে সিরিয়াল কিলারদের খুঁজে বের করা সহজ হয়। এই জনশ্রুতি আসলে অর্ধ-সত্য। কিন্তু একটা সিস্টেম প্রতিটি লাইব্রেরি কমপিউটারে ক্রসলিঙ্ক করা। এই সিডি-রম সার্ভিস আপডেটেবল। দেশের কোথায় কোন্ বই আছে, তা বের করা যায়। অবশ্য, বই কে নিল, তার হিসাব থাকে না। কয়েকটা উপায়ে বই পাওয়া যায়। আপনি লেখকের নাম লিখে সার্চ করতে পারেন। বা, বইয়ের নাম, অথবা বইয়ের নির্দিষ্ট কোনও লাইন

লিখেও সার্চ দিতে পারেন। এ ধরনের সুবিধা দেয় অল-স্টেট্‌স্ লাইব্রেরি ডেটাবেস।

মনিটরে চেয়ে আছে সান্থা ক্যাসেডিন। ক্লিক করে সার্চ বাই কি-ওঅর্ড বাটন টিপল ও। টাইপ করল: অ্যান্টার্কটিকা।

তিন সেকেণ্ড পর সার্চের রেজাল্ট এল মনিটরে:

৫৪,৬০০ এণ্ট্রি ফাউণ্ড। উড ইউ লাইক টু সি এ লিস্ট?

'খুব খুশি হলাম, বাপ্‌,' মনে মনে বলল সান্থা। 'মাত্র কয়েক হাজার বই পড়লেই দুনিয়ার সব জ্ঞান আমার! ...এতগুলো বইয়ে লেখা হয়েছে অ্যান্টার্কটিকা শব্দটা?'

না, এতে চলবে না। কিছুক্ষণ চুপ করে কী যেন ভাবল সান্থা, তারপর ঠিক করল, আরও সংক্ষিপ্ত কোনও কি-ওঅর্ড দরকার ওর। একটা ধারণা তৈরি হয়েছে মনে, কাজটা করলে সুবিধা পেতে পারে। অন্তত চেষ্টা করে দেখা যাক, ভাবল সান্থা। কি-বোর্ডে লিখতে শুরু করেছে, কাজটা শেষে এণ্টার টিপল।

ল্যাটিচ্যুড –৬৬. লংগিচ্যুড ১১৫° ২০' ১২"

সার্চ শুরু করেছে কমপিউটার। এক সেকেণ্ড পর মনিটরে ভেসে উঠল রেজাল্ট:

সিক্স এণ্ট্রি ফাউণ্ড। উড ইউ লাইক টু সি এ লিস্ট?

'আবার জিগায়!' বিড়বিড় করল সান্থা। ওয়াই কি-তে বোঝানো হয়েছে ইয়েস। ওটা টিপে দিতেই মনিটরে ভেসে উঠল একটা লিস্ট। বইয়ের নাম এবং ওগুলো কোথায় রয়েছে পরিষ্কার ভাবে জানিয়ে দেয়া হয়েছে:

অল-স্টেট্‌স্ লাইব্রেরি ডেটাবেস

সার্চ বাই কি-ওঅর্ড

সার্চ স্ট্রিং ইউজড:

ল্যাটিচ্যুড –৬৬.৫*

নং. অভ এণ্ট্রিজ ফাউণ্ড: সিক্স

টাইটেল: 'দ্য আইস ক্রুসেড: রিফ্লেকশন্স অন এ ইয়ার স্পেন্ট ইন অ্যান্টার্কটিকা।' অথার: এন ভিসার, হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি, ২০০৯।

টাইটেল: 'ডক্টরাল থিসিস।' অথার: রবার্ট হিগিন্স, স্ট্যানফর, ১৯৯৯।

টাইটেল: 'ডক্টরাল থিসিস।' অথার: জর্জ হিউবার্ট, স্ট্যানফর, ১৯৯৮।

টাইটেল: 'পোস্ট-ডক্টরাল থিসিস।' অথার: এম ভিসার, ইউএসসি, সিটি, ১৯৯৭।

টাইটেল: 'ফেলোশিপ গ্র্যান্ট রিসার্চ পেপার।' এম ভিসার, হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি, ১৯৯৪।

টাইটেল: 'প্রিলিমিনারি সার্ভে।' অথার: শ্যারন স্টোন, লাইবকং, ১৯৭৮।

লিস্টের দিকে চেয়ে আছে সান্ত্বা। প্রতিটি এণ্ট্রিতে বলা হয়েছে এসব বই বা থিসিসে আছে ল্যাটিচ্যুড −৬৬.৫° এবং লংগিচ্যুড ১১৫° ২০' ১২"।

বেশিরভাগই ইউনিভার্সিটির থিসিস। লেখকদের কারও নাম থেকে কিছুই বুঝবার নেই সান্ত্বার। দুইজন ভিসার, রবার্ট হিগিন্স, জর্জ হিউবার্ট ও শ্যারন স্টোন।

দুই হাজার নয় সালে অ্যান্টার্কটিকার উপর নতুন বই লিখেছে এন ভিসার। এই বইয়ের লোকেশন রেফারেন্স দেখল সান্থা। হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি থেকে প্রকাশ করা হয়েছে। প্রতিটি বড় লাইব্রেরিতে পাওয়া যায়।

অন্য এণ্ট্রি থেকে আঁচ করা যায়, লেখক নিজ পয়সায় বই প্রকাশ করেছেন। কিন্তু ওই এন ভিসারের বই প্রচুর চলেছে, ধারণা করল সান্থা। ঠিক করল, পরে এই বিষয়ে আরও খোঁজ নেবে।

আরেকটা এণ্ট্রির উপর চোখ আটকে গেল ওর:

> টাইটেল: 'প্রিলিমিনারি সার্ভে।' অথার: শ্যারন
> স্টোন, লাইবকং, ১৯৭৮।

এটাই শেষ এণ্ট্রি। চট্ করে মনিটরে রেফারেন্স লিস্ট দেখে নিল সান্থা। ওখানে ডেটাবেসের প্রতিটি অ্যাব্রেভিয়েশনের ব্যাখ্যা লেখা। ওখানেই পেয়ে গেল 'লাইবকং'।

'আচ্ছা,' বিড়বিড় করে বলল।

'লাইবকং' মানে লাইব্রেরি অভ কংগ্রেস। ক্যাপিটল বিল্ডিঙের ওপাশের রাস্তায় লাইব্রেরি অভ কংগ্রেস, এখান থেকে বেশি দূরেও নয়।

শেষ এণ্ট্রি আরেকবার দেখল সান্থা ক্যাসেডিন, বুঝছে না কেন প্রিলিমিনারি সার্ভে করা হলো। এণ্ট্রির তারিখ দেখে নিল।

১৯৭৮

মানে তিরিশ বছরেরও আগে। একবার দেখে আসতে হয়! মৃদু হেসে প্রিন্ট স্ক্রিন লেখা বাটন টিপল সান্থা ক্যাসেডিন।

অ্যাডোনিস ক্যাসেডিনের টয়োটা গাড়ি এসে থেমেছে নিউ মেক্সিকোর রবিন এন কার্বির ষোলো নিউম্যান স্ট্রিট, লেক

আর্থারের বাড়ির সামনে।

ষোলো নিউম্যান স্ট্রিটের কটেজটা বেশ সুন্দর, সাদা রঙের। সামনে ছোট্ট বাগান। ফুটে আছে অসংখ্য পাহাড়ি গোলাপ। বাগানের মাঝে ছোট্ট একটা পুকুর। অবসর নেয়া কোনও লোকের বাড়ি মনে হলো। সব কিছুর ভিতর যত্নের ছাপ।

আরেকবার বিজনেস কার্ড দেখে নিল অ্যাডোনিস। 'ঠিক আছে, রবিন এন কার্বি, দেখা যাক আপনার কী বলার আছে।'

গাড়ি থেকে বেরিয়ে বাগান পেরিয়ে বারান্দায় উঠল ও, নক করল স্ক্রিন দরজায়। আধ মিনিট পর ভিতরের কোনও দরজা খুলল, তার পনেরো সেকেণ্ড পর স্ক্রিন দরজার ওপাশে থামল এক লোক। বয়স হবে তার তিরিশের মত। সুঠামদেহী। ক্লিনশেভ করা। মৃদু হাসছে লোকটা।

'মর্নিং, কী সাহায্য করতে পারি?' দক্ষিণের উচ্চারণে টেনে টেনে কথা বলে।

'আমি এসেছি রবিন এন কার্বির সঙ্গে দেখা করতে, তিনি কি আছেন?' বিজনেস কার্ড বাড়িয়ে দিল অ্যাডোনিস। 'আমার নাম অ্যাডোনিস ক্যাসেডিন, কাজ করি দ্য ওয়াশিংটন পোস্টে। মিস্টার কার্বি এই কার্ড পাঠিয়েছিলেন।'

হঠাৎ করেই মিলিয়ে গেল লোকটার হাসি। তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে দুই চোখ। যেন সামনের লোকটার ওজন নিচ্ছে। চোখ চলে গেল সামনের রাস্তায়। বোধহয় বুঝতে চাইছে কেউ পিছু নিয়েছে কি না।

তারপর হঠাৎ করেই ক্যাসেডিনের উপর ফিরে এল দুইচোখ।

'মিস্টার ক্যাসেডিন, দয়া করে ভিতরে আসুন,' দরজা খুলে দিল সে। 'ধারণা করেছি যোগাযোগ করবেন, কিন্তু ভাবিনি এত দ্রুত আসবেন। প্লিয, ভিতরে আসুন।'

চৌকাঠ পেরুল ক্যাসেডিন, বাড়ির ভিতর ঢুকবার পর টের

পেল লোকটার দক্ষিণা টানের কথা মিলিয়ে গেছে, এখন ইস্ট কোস্টের পশ ইংরেজি বলছে! সন্দেহ নেই শিক্ষিত লোক।

পথ দেখিয়ে ওকে ছোট্ট ড্রয়িং রুমে নিয়ে এল লোকটা। দু'জন মুখোমুখি দুটো সোফায় বসবার পর বলল, 'মিস্টার ক্যাসেডিন, রবিন এন কার্বি আমার সঠিক নাম নয়।'

পকেট থেকে পেন্সিল ও প্যাড বের করল ক্যাসেডিন। আস্তে করে জানতে চাইল, 'আমি কি আপনার সত্যিকারের নাম জানতে পারি?'

কী যেন ভাবছে যুবক, এই সুযোগে তাকে ভাল করে দেখে নিল ক্যাসেডিন। দীর্ঘাকায় লোক, সুর্দশন, কাঁধদুটো অস্বাভাবিক চওড়া, অ্যাথলেটদের মত। কিন্তু তার ভিতর কী যেন বড় অস্বাভাবিক।

চোখদুটো, এক সেকেণ্ড পর বুঝল ক্যাসেডিন।

একটু লাল হয়ে আছে। চোখের নীচে ঝুলছে ছোট থলি। এই লোক সর্বক্ষণ দুশ্চিন্তা করে, ভাবল ক্যাসেডিন। দিনের পর দিন ঘুমাতে পারে না।

'আমার আসল নাম,' ধীরে ধীরে বলল যুবক, 'রবিন কার্লটন।'

'কী কাজ করেন?'

'আগে ছিলাম মেরিন ফোর্সের মেজর। আটলাণ্টিক বেস্‌ড্ রিকনিসেন্স ইউনিটে। কিন্তু অফিশিয়াল ইউএসএমসি রেকর্ডে দেখবেন, আমি মারা গেছি পেরুতে, এগারো সালে।'

নিচু স্বরে কথা বলে যুবক, তিক্ত তার কণ্ঠ।

'তা হলে আপনি একজন মৃত লোক,' বলল ক্যাসেডিন। 'ভাল কথা। তা হলে আমার প্রথম প্রশ্নঃ কেন আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে চাইলেন?'

'আমি আপনার লেখা পড়েছি,' বলল রবিন। 'এবং পছন্দ

করি। গ্র্যাণ্ড মাদার মিশেলে লিখতেন। তারপর পোস্টে। যা লেখার সরাসরি লেখেন আপনি। এটা আমার পছন্দ। অন্য অনেকের মত যা খুশি লেখেন না। আগে ভাল করে সব যাচাই করেন। আর আমার তাই দরকার। যা বলব, সেটা যেন মানুষ উড়িয়ে না দেয়।'

'যদি বিশ্বাসযোগ্য হয়, তো উড়িয়ে দেবে না,' বলল ক্যাসেডিন। 'ঠিক আছে, এবার খুলে বলুন কেন ইউনাইটেড স্টেট্স্ গভার্নমেণ্ট আপনাকে মৃত ঘোষণা করেছে।'

হাসল রবিন কার্লটন, তাতে শুধু তিক্ততা ও কষ্ট। 'যদি এসবের বিশ্বাসযোগ্যতা থাকে,' বলল। 'মিস্টার ক্যাসেডিন, আমি যদি বলি, ইউনাইটেড স্টেট্স্ অভ আমেরিকার সরকার নির্দেশ দিয়েছে, যাতে আমার গোটা ইউনিটকে মেরে ফেলা হয়?'

চুপ করে আছে অ্যাডোনিস।

'যদি বলি, আমাদের সরকার— আপনার আমার সরকার— আমার ইউনিটের ভিতর নিজেদের খুনি রেখেছিল? আমরা মিশনে অস্বাভাবিক কিছু খুঁজে পেলে যেন আমাদেরকে মেরে ফেলা হয়।

'এগারো সালে পেরুর আন্দেজ পাহাড়ে তাই করা হয়েছে। মিস্টার ক্যাসেডিন, আপনার কি মনে হয় এই কাহিনি উপযুক্ত?'

'হ্যাঁ,' নড়েচড়ে বসল অ্যাডোনিস।

এবার বলতে শুরু করল রবিন। ওরা ছিল পাহাড়ের অনেক উপরে এক ইনকা মন্দিরের ভিতর। তার আগে ওখানে মন্দিরের ভিতর কাজ করছিল ইউনিভার্সিটি রিসার্চারদের একটি টিম। এরা কয়েকটি দেয়ালে গভীর তাক খুঁজে পেল। সেখানে ছিল অতীত ইনকাদের সমাজের দৃশ্য।

কিন্তু একটি পাথুরে তাকে অন্য কিছু পেল তারা। আগে কখনও এ ধরনের ছবি পাওয়া যায়নি। বিখ্যাত ইনকা সম্রাট আতাহুয়ালপা সাক্ষাৎ করছেন স্প্যানিশ বিজয়ীদের সঙ্গে।

একপাশে দাঁড়িয়েছেন সম্রাট, পরনে রাজকীয় পোশাক, তাঁকে ঘিরে রেখেছে সভাসদ-বৃন্দ। সম্রাটের হাতে সোনার পাত্র, বাড়িয়ে ধরেছেন। ওটা দিয়ে বোঝানো হয়েছে উপহার-সামগ্রী।

ছবির বামদিকে অদ্ভুত চেহারার পাঁচজন লোক। এরা একেবারেই ইনকাদের মত নয়, হাড়ের মত সাদা। খুব চিকন ও লম্বা, যেন বছরের পর বছর খেতে দেয়া হয়নি। বড় গোল গোল চোখ, বাটির মত ফোলা কপাল। সরু ও দীর্ঘ থুতনি, কোনও মুখ নেই।

পাথরে খোদাই করা চিত্রে এই সাদা দলের নেতা দুই হাতে কী যেন বাড়িয়ে দিয়েছে সম্রাটের দিকে।

বোধহয় দু'জন দু'জনকে উপহার দেবে।

'এসব পেতে কত দিন লাগে?' শুকনো স্বরে জানতে চাইল অ্যাডোনিস।

'বেশি দিন নয়,' বলল কার্লটন।

বলতে শুরু করল সে: রিসার্চাররা যেটার জন্য গিয়েছিল, সেটা পেয়ে গেল মন্দিরের এক কলামের গায়ের তাকে। ওখানে ছিল ছোট একটা জিনিস। বড়জোর জুতোর বাক্সের সমান হবে, রুপালি।

প্রস্তর চিত্রের ঠিক সেই জিনিসই ওটা।

'খুব খুশি হয়ে ওঠেন বিজ্ঞানীরা,' বলল রবিন কার্লটন। 'দেরি না করে স্টেট্সে নিজেদের ইউনিভার্সিটিতে যোগাযোগ করলেন, জানিয়ে দিলেন জিনিসটা পেয়ে গেছেন। ওটা সম্ভবত কোনও এলিয়েন দলের কাছ থেকে পাওয়া উপহার।'

আস্তে করে মাথা নাড়ল কার্লটন। 'গাধা ছিলেন ওঁরা। সাধারণ মোবাইল ফোনে যোগাযোগ করেন। আজকাল যে-কোনও সরকার যে-কারও ফোনে আড়ি পাততে পারে। অন্য কোনও দল তাঁদের কাছ থেকে জিনিসটা ডাকাতি করতে পারে,

কাজেই আমার ইউনিটকে ব্রাজিল থেকে পাঠানো হলো।'

সোফায় ঝুঁকে বসল সে। 'কিন্তু সমস্যা, ওই ইউনিট তখন আর আমার নয়।'

এরপর মেরিন ইউনিট মন্দিরে পৌঁছবার পর কী হলো, বলতে শুরু করল সে। যখন একটা সিল টিম তাদের সঙ্গে মিলিত হলো, এরপর ওর নিজের লোকই মেরে ফেলতে চাইল ওকে।

'মিস্টার ক্যাসেডিন, আমার ইউনিটের ভিতর নিজেদের লোক গুঁজে দিয়েছিল সরকার। এ-কাজ করার জন্য কমিটি করেছে তারা। নাম দিয়েছে ইন্টেলিজেন্স কনভার্জেন্স গ্রুপ। ওটা নিয়ন্ত্রণ করে জয়েণ্ট চিফস অভ স্টাফের ন্যাশনাল রিকনিসেন্স অফিস। সোজা কথায়, ওটার প্রাথমিক কাজ আমেরিকার টেকনোলজিক্যাল শ্রেষ্ঠত্ব নিশ্চিত করা।

'এরা আমার ইউনিটের সবাইকে মেরে ফেলল, মিস্টার ক্যাসেডিন। পুরো ইউনিট। খুঁজতে থাকল আমাকে মেরে ফেলার জন্য। বারোদিন আমাকে খুঁজল। তারা আমেরিকার সৈনিক। ছোট একটা ফাটলের ভিতর লুকিয়ে ছিলাম। পাথুরে দেয়াল থেকে নেমে আসা লবণাক্ত পানি দিয়ে পেট ভরিয়েছি। এরপর চলে গেল তারা।'

'আর ইউনিভার্সিটি রিসার্চারদের কী হলো?' জানতে চাইল অ্যাডোনিস।

আস্তে করে মাথা নাড়ল রবিন। 'সিল টিম সবাইকে সরিয়ে নিয়ে গেল। আর কখনও তাদেরকে দেখা যায়নি।'

চুপ হয়ে গেছে অ্যাডোনিস ক্যাসেডিন।

'বারো দিন পর মন্দির থেকে বের হই,' বলল রবিন। 'সময় লেগেছিল, কিন্তু ফিরে এলাম গোপনে নিজ দেশে। বাবা-মা'র বাড়িতে গেলাম। কিন্তু ভিতরে ঢুকতে পারলাম না। সামনে এবং পিছনের রাস্তায় দুটো ভ্যান ছিল। ওই বাড়ির উপর নজর রাখছিল

চারজন লোক। ফিরে এলেই আমাকে শেষ করবে।'

তিক্ত হাসল রবিন কার্লটন। 'তখন বুঝলাম, আমাকে জানতে হবে এসবের পিছনে কারা। এরপর একজনকে অনুসরণ করলাম। জানলাম সে আসলে আইসিজি।'

অবাক হয়ে সুদর্শন লোকটার দিকে চেয়ে আছে অ্যাডোনিস। কয়েক সেকেণ্ড পর বলল, 'ঠিক আছে, এই লোক আইসিজি। ওটা জয়েন্ট কমিটি, ঠিক? জয়েন্ট অভ স্টাফ ও দ্য ন্যাশনাল রিকনিসেন্স অফিসের লোক?'

'হ্যাঁ।'

দ্য জয়েন্ট চিফস অভ স্টাফ সম্পর্কে জানে অ্যাডোনিস, সামান্য শুনেছে ন্যাশনাল রিকনিসেন্স অফিসের কথাও। ওটা আমেরিকার প্রতিটি স্পাই স্যাটালাইট নিয়ন্ত্রণ করে। ওই অফিসের গোপনীয়তা কিংবদন্তীর মত। সামান্য কয়েকটি এজেন্সি ব্ল্যাক বাজেটে চলে, এই অফিস সেগুলোরই একটা। খুব প্রতিক্রিয়াশীল বিষয় নিয়ে কাজ করে। সিনেট ফিন্যান্স কমিটি এই অফিসের বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে পারে না। কোল্ড ওঅরের সময় ইউএস সরকার বারবার বলেছে, তাদের দেশে এনআরও নেই। অবশ্য, উনিশ' শ' একানব্বুই সালে প্রচুর প্রমাণ ছড়িয়ে গেলে সরকার বাধ্য হয়ে স্বীকার করে, আসলেই এই অফিস আছে।

'আইসিজি আসলে দেশের সবচেয়ে বড় দু' পক্ষের বিয়ের মত,' বলল রবিন কার্লটন। 'একপক্ষে প্রতিটি আর্মড ফোর্সের সুপ্রিম কমাণ্ডিং বডি, অন্য দিকে আমাদের দেশের ইন্টেলিজেন্সের হর্তাকর্তারা।'

'আর আপনি বলছেন, ওটার কাজ দুনিয়ার আর সব দেশকে পিছনে ফেলে আমেরিকার টেকনোলজিক্যাল সুপিয়ারিটি অর্জন করা?'

'হ্যাঁ,' বলল কার্লটন। 'প্রথম কাজ: বড় টেকনোলজিক্যাল

ব্রেকথ্রু দখল করে নেয়া। তা কমপ্যাক্ট ডিস্ক হোক, কমপিউটার চিপ্‌স্ বা স্টেলথ টেকনোলজি— যেভাবে হোক এসব পেতে হবে ইউনাইটেড স্টেট্‌স্ অভ আমেরিকাকে।'

বড় করে শ্বাস ফেলল রবিন কার্লটন। 'মিস্টার ক্যাসেডিন, আমি বোধহয় আপনাকে ভাল করে বুঝিয়ে বলতে পারিনি। অন্য ভাবে চেষ্টা করে দেখা যাক। আইসিজির কাজ ইণ্টেলিজেন্স জোগাড় করা, বা সরকারের কথা অনুযায়ী *ইণ্টেলিজেন্স কনভার্জেন্স করা*।

'এই অফিসের কাজ মূল্যবান তথ্য জোগাড় করা। নিশ্চিত করা যে, ওটার ব্যাপারে অন্য কোনও দেশ জানবে না। এ কাজ করতে গিয়ে বিনা দ্বিধায় মানুষ খুন করে আইসিজি। এদের কাজ অন্যদের মুখ বুজে দেয়া। জিনিসটা যেন শুধু আমেরিকার থাকে। আইসিজির প্রধান কাজ: আমেরিকা যেন দুনিয়ার নেতৃত্বে থাকে।'

'আচ্ছা,' মৃদু মাথা দোলাল অ্যাডোনিস। 'আর আপনি বলছেন, এসব করতে গিয়ে এলিট মিলিটারি ইউনিটের ভিতর নিজেদের লোক ঢুকিয়ে দিচ্ছে তারা।'

'প্রয়োজনে মিলিটারি ইউনিটের যোদ্ধাদেরকে মেরে ফেলা আইসিজির মাত্র একটা কাজ, মিস্টার ক্যাসেডিন। এটা তাদের সহজ কাজ। এবার এভাবে দেখুন,' বলল রবিন কার্লটন, 'দ্য জয়েন্ট চিফস অভ স্টাফ আইসিজির ছোট একটি অংশ। তারা নিজেদের বিশ্বস্ত লোক দিয়ে সংগঠনকে সাহায্য করছে। বয়স্ক যোদ্ধা, সিনিয়র সার্জেণ্ট, গানারি সার্জেণ্ট, ক্যারিয়ার সোলজার— এরা বসে আছে ভাল সব ইউনিটের ভিতর। প্রথমেই ঘটনাস্থলে হাজির হতে হয় র‍্যাপিড-রেসপন্স ইউনিটগুলোকে। যেমন মেরিন রিকনিসেন্স, সিল টিম বা আর্মি রেঞ্জার।

'তাদের ভিতর ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে আইসিজির লোক। ধরুন, হঠাৎ এক শত্রু গুপ্তচর স্যাটালাইট বা কোনও গ্রহাণু

পড়েছে কোথাও...

'এবার ভেবে দেখুন, গ্রহাণু বা স্যাটালাইট পড়েছে ব্রাজিলের জঙ্গলে, তারা চারপাশ ঘিরে ফেলতে পাঠাবে মেরিনদেরকে। যদি ওই গ্রহাণুর ভিতর মূল্যবান কিছু পাওয়া যায়, প্রথমেই খুন করা হবে মেরিনদেরকে।'

'খুন করা হবে?'

'হ্যাঁ,' তিক্ত স্বরে বলল কার্লটন। 'আপনি তো হাই-স্কুল পাশ করা সাধারণ সৈনিকদেরকে বিশ্বাস করবেন না। এরা যদি মুখ খোলে? জিনিসটা যদি হয় দেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ, এই লোকগুলোকে তো মেরে ফেলতেই হবে। হয়তো ওই জিনিসের মাধ্যমে কমপক্ষে বিশ বছর এগিয়ে যাবে ইউনাইটেড স্টেটস।

'আসলে সাধারণ কোনও সৈনিকের পেট থেকে কথা বের করতে আপনার সোডিয়াম নাইট্রেট লাগবে না। কয়েকটা বিয়ার গিলিয়ে দেবেন, সঙ্গে মিষ্টি একটা মেয়ে, আশা দেবেন ভাল চাকরি মিলে যেতে পারে; ব্যস, মস্ত স্তনওয়ালী মেয়েটাকে সবই বলে দেবে সাধারণ মেরিন সৈনিক— ব্রাজিলের জঙ্গলে সে পেয়েছিল নীল গ্রহাণু।

'এই তথ্যগুলোর মূল্য ভুলবেন না, মিস্টার ক্যাসেডিন,' বলল রবিন কার্লটন। 'কয়েকজন সাধারণ সৈনিক বা অফিসার মরলে কী হবে দেশের? হয়তো এই দেশ অন্য দেশকে বিশ বছরের জন্য পিছনে ফেলবে। বা...'

হাত তুলে বাধা দিল অ্যাডোনিস ক্যাসেডিন। 'ঠিক আছে, এবার বলুন এমনটা কতদিন পর পর ঘটে? যেমন পুরো এক ইউনিটের সবাইকে মেরে ফেলা হলো— এমন তো খুব কম হওয়ার কথা।'

আস্তে করে মাথা দোলাল কার্লটন। 'এটা ঠিকই বলেছেন। গত পনেরো বছরে মাত্র চারবার হয়েছে।'

সন্দেহ নিয়ে রবিন কার্লটনের দিকে চাইল সাংবাদিক। 'মিস্টার কার্লটন, বুঝতে পারছি কী বলতে চান। কিন্তু এসব কাজ করতে হলে একদল ট্রেইণ্ড লোকের নেটওঅর্ক থাকতে হবে। তাদের হাতে থাকতে হবে সঠিক অনুগত লোক। হাই র‍্যাঙ্কিং সৈনিকরা দ্য জয়েন্ট চিফস্ নয়, তারা সরকারের ভিতর চাইলেই...'

'মিস্টার ক্যাসেডিন, আপনি অ্যাণ্ড্রু লিলিওয়েলেনের নাম শুনেছেন?'

'আবছা মনে পড়ছে...'

'সার্জেন্ট মেজর অ্যাণ্ড্রু লিলিওয়েলেন মেরিন কর্পসের সার্জেন্ট মেজর। আপনি কি জানেন মেরিন কর্পসের সার্জেন্ট মেজর মানে কী, মিস্টার ক্যাসেড়িন?

'না, খুলে বলুন।'

'মেরিন কর্পসের নন-কমিশণ্ড অফিসার সার্জেন্ট মেজর মানেই মস্ত এক লোক। যদিও এনলিস্টেড, মিস্টার ক্যাসেডিন, সে নীচের সবার প্রধান। সার্জেন্ট মেজর অ্যাণ্ড্রু লিলিওয়েলেন তেত্রিশ বছর মেরিন কর্পসের সঙ্গে কাটিয়েছে। দেশের সবচেয়ে বেশি পদক পাওয়া লোক সে।'

আস্তে করে মাথা দোলাল কার্লটন। 'সে আইসিজি।'

দীর্ঘ মুহূর্ত চুপ করে চেয়ে রইল অ্যাডোনিস। তারপর প্যাডে নামটা টুকে নিল।

'কর্পসের প্রতিটি বদমাস সৈনিকের অভিভাবক সে। পেরু থেকে ফিরবার পর কার কাছে যেন শুনেছিলাম, ওই ঘটনার পর জীবিত মেরিনদেরকে সরিয়ে নেয় সে, তারা বিশ্বাসঘাতক। তাদের কাজের জন্য মেডেল দেয়ার জন্য আবেদনও করেছে। বেশিরভাগ সিনিয়র এনলিস্টেড সৈনিক বিশ্বাসঘাতক।'

বিড়বিড় করে কী যেন বলল অ্যাডোনিস ক্যাসেডিন।

'ওটাই হচ্ছে নেটওঅর্ক, মিস্টার ক্যাসেডিন। মেরিন ফোর্সের

নীচ থেকে শুরু করে একেবারে মাথা পর্যন্ত আছে এরা। তারাই ঠিক করে কোন্ ইউনিটকে পাঠানো হবে। তারপর আর ফিরে আসতে পারে না সৈনিকরা। কোনও এলিট মিলিটারি ইউনিট শেষ করে দেয়া আইসিজির সামান্য কাজ। আইসিজি শুধু মিলিটারির ভিতর লোক রেখেছে তা নয়, তার চেয়ে অনেক বেশি ছড়িয়ে পড়েছে সরকারের নানা জায়গায়।'

'যেমন?'

'যেমন যেসব সংগঠন ব্রেকথ্রু টেকনোলজি আবিষ্কার করছে, সেখানে।'

'একটা উদাহরণ দিন।'

'যেমন ব্যবসা।

'বলতে চাইছেন প্রাইভেট কোম্পানির কথা?'

আস্তে করে মাথা দোলাল রবিন কার্লটন।

'আপনি বলতে চাইছেন ইউনাইটেড স্টেটসের সরকার নিজেদের লোক ঢুকিয়ে দিয়েছে প্রাইভেট কর্পোরেশনে? চোখ রাখছে তাদের উপর?'

'যেমন মাইক্রোসফট। আইবিএম। বোয়িং। লকহিড।' রবিন কার্লটন গম্ভীর। 'শুধু তাই নয়, এ ছাড়া নেভি, আর্মি ও এয়ার ফোর্সের কণ্ট্রাক্টারদের উপর নজর রাখা হয়। বিশেষ করে যারা এ দেশের সরকারের কাজ করে।'

'কী করে সম্ভব?' মাথা নাড়ল অ্যাডোনিস ক্যাসেডিন।

'এ ছাড়া আরও অনেক জায়গায় এরা আছে।'

'যেমন?'

'যেমন ধরুন ইউনিভার্সিটি,' বলল কার্লটন। 'আইসিজির লিস্টে সবচেয়ে আগে ইউনিভার্সিটিগুলোর নাম। বহু শিক্ষক বিক্রি হয়ে গেছেন। যেমন ধরুন, আইসিজি জানত উনিশ শ' তিরানব্বুই সালেই ভেড়া ক্লোন করা হয়েছে। গত বছর আইসিজি

জেনেছে, ইচ্ছে করলে মানুষ ক্লোন করতে পারবে।' ক্লান্ত ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল কার্লটন। 'এমনই হওয়ার কথা ছিল। যদি জানতে হয় পাইপলাইনের ভিতর কী, আপনার নিজের লোক রাখতে হবে পাইপের ভিতর।'

মৃত মেজর থেমে যাওয়ার পর পুরো একমিনিট চুপ করে বসে রইল অ্যাডোনিস ক্যাসেডিন।

আমেরিকান বিস্তৃত ইন্টেলিজেন্স গ্যাদারিং ষড়যন্ত্রের চিন্তাটা কাঁপিয়ে দিয়েছে ওকে। এই নেটওঅর্ক থেকে থাকলে ওটা একটা অক্টোপাস, চারপাশে ছড়িয়ে দিয়েছে শুঁড়। পেন্টাগনের ছোট কমিটির বোর্ডরুম থেকে নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসা ও ইউনিভার্সিটি। কিন্তু এসব নিয়ে কিছু লিখবার আগে আরও অনেক তথ্য দরকার ক্যাসেডিনের।

'মিস্টার ক্যাসেডিন,' গম্ভীর স্বরে বলল রবিন কার্লটন। 'ভয়ঙ্কর একটা সংগঠন আইসিজি। খুবই বিপজ্জনক। মাত্র একটা বিষয়ে তারা মন দিয়েছে: উন্নতি করতে হবে দ্য ইউনাইটেড স্টেটস অভ আমেরিকার। আমেরিকা যেন সবসময় জিতে যেতে পারে, সেজন্য যা করবার করবে তারা। যদি একদল লোক মেরে ফেলতে হয়, তো তাই করবে। আপনাকে খুন করবে, আমাকেও। মিস্টার ক্যাসেডিন, দেশপ্রেম আসলে হিংস্র লোকের গর্ব। ওই সংগঠন নিজেদের আর্মড ফোর্সের ভিতর ঢুকে পড়েছে, নিজেদের লোক মেরে ফেলছে। এসব করছে নিজেদের দেশের গোপন তথ্য লুকিয়ে রাখতে। আমরা কেউ ওই সংগঠন থেকে নিরাপদ নই।'

আস্তে করে মাথা দোলাল অ্যাডোনিস। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল, 'মিস্টার কার্লটন, আপনার কাছে কোনও তথ্য আছে? ধরুন কোনও নাম, বা এমন কিছু যেটা থেকে প্রমাণ করা যাবে...'

পাশের টেবিল থেকে এ-ফোর সাইজের একটা কাগজ নিল রবিন। বাড়িয়ে দিল সাংবাদিকের দিকে। 'এখানে আমার সংগ্রহ

করা কিছু নাম, তাদের চাকরি অবস্থান ও র‍্যাঙ্ক টুকে দিয়েছি।'.

কাগজটা নিল ক্যাসেডিন। দ্রুত পড়তে শুরু করল:

ট্র্যান্সমিট নং. ৫৯৭-৯৭১৭-০৮১০১।

রেফারেন্স নং. ৪৫৩১

বিষয়: সেনাবাহিনী কর্তৃপক্ষের কাছের কয়েকজন ব্যক্তির নাম।

নাম:	চাকরিস্থল:	ফিল্ড/র‍্যাঙ্ক:
উইলিয়াম বীব।	লিঙ্কন ল্যাব।	নিউক্লিয়ার ফিযিসিস্ট।
জর্জ লোবো লার্সেন।	বার্কলি।	অ্যারোনটিকাল ইঞ্জিনিয়ার।
মাইক গোউল্ড।	নেভি সিল।	লেফটেন্যান্ট কমাণ্ডার।
ন্যাট নেদারউড।	আর্মি রেঞ্জার্স।	কর্নেল।
মার্লা হেয়েয।	কলাম্বিয়া।	কমপিউটার সায়েন্টিস্ট।
সামান্থা রিভ্স্।	হার্ভার্ড।	ইণ্ডাস্ট্রিয়াল কেমিস্ট।
রাস্টি ফেরিস।	মাইক্রোসফট।	সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার।
উইলিয়াম ফেল্পস।	আইবিএম।	হার্ডওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার।
লেস্টার গ্রিম।	ক্রে।	হার্ডওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার।
ভ্যালেনি ফার্গো।	ইউএসএমসি।	কর্পোরাল।
ক্রিস হার্ট।	বোয়িং।	টেকনিশিয়ান।
প্রস্টন স্টোন।	ইউএসসি।	জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ার।
রিপলি জেনড্রুন।	জেপিএল।	অ্যারোনটিকাল ইঞ্জিনিয়ার।
অ্যামি কার্ভেল।	লকহিড।	অ্যারোনটিকাল ইঞ্জিনিয়ার।
জ্যাক বোল্ট।	আর্মি রেঞ্জার্স।	সিনিয়র সার্জেন্ট।
সুয়েড নিলসেন।	ইয়েল।	নিউক্লিয়ার ফিযিস্ট।
নর্মা হবসন।	অ্যারিয।	বায়োটক্সিন।
মাইক গ্যানন।	ইউএসএমসি।	গানারি সার্জেন্ট।
নিনা অস্টিন।	হার্ভার্ড।	ক্যাপ্টেন।
জাড হর্সফল।	জন্স হপকিন্স।	
কলিন সিম্পসন র‍্যানডলফ।	ইউএনএসসি।	সার্জেন্ট মেজর।
জিম বেলিংগার।	আর্মালাইট।	ব্যালেস্টিক্স।

এনিস কনরাড।	ইউ.টেক্স।	ইনসেক্টেস.
জনি ওয়াকার।	ইউএসএমসি।	সার্জেন্ট।
অ্যাণ্ড্রু লিলিওয়েলেন।	আইসিজি।	সার্জেন্ট মেজর।
লি মণ্ট্যানা।	ইউ.কলোরাডো।	কেমিকেল এজেন্টস্।
ম্যাক্স ডারিউ কেইন।	টেক্সাস ল্যাব।	কেমিস্ট।
ফ্রেডারিক সিম্পসন।	প্রিন্সটন।	?
জেনি ফেয়ারওয়েল।	থার্ড মেরিন কর্পস।	?
পল সিংগার।	ইউএসএমসি।	গানারি সার্জেন্ট।
গুয়েন রাসেল।	ইউএসসি।	?
পার্কস আর. শর্ট।	নেভি সিল।	কমোডোর।
পল মর্গান।	ইউএসএমসি।	সার্জেন্ট।
চাক হ্যালুম।	সিসিএ সিএলএও।	সায়েন্টিস্ট।
পলি রিগস্।	উকলা।	জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ার।
অলিভার টার্নার।	ইউএসএমসি।	মেজর।
জন সিমন।	ইউএসএএফ।	ক্যাপ্টেন।

রবিন কার্লটনের দিকে মুখ তুলে চাইল অ্যাডোনিস। 'কোত্থেকে পেলেন?'

মৃদু হাসল মেজর। প্রথমবারের মত আন্তরিক হাসি।

'আপনার মনে পড়ে, আমার বাবা-মা'র বাড়ির উপর নজর রেখেছিল একদল লোক?'

'হ্যাঁ।'

'তাদের একজনের পিছু নিই। অ্যাপার্টমেন্টে ঢুকবে, এমন সময় তাকে থামাই। কয়েকটা প্রশ্ন করি। খুব আন্তরিকতার সঙ্গেই জবাব দিয়েছিল।'

'তারপর তার কী হয়েছে?' ক্লান্ত স্বরে জানতে চাইল ক্যাসেডিন।

কোনও আবেগ থাকল না রবিন কার্লটনের হিমশীতল কণ্ঠে: 'লোকটা মারা যায়।'

তিন

গর্জে উঠেছে হোভারক্রাফটের ইঞ্জিন। ড্রাইভিং সিটে বসে মেঝের সঙ্গে অ্যাক্সেলারেটার টিপে ধরেছে নাজমুল। টেকোমিটারের কাঁটা ছুঁই-ছুঁই করছে ৬,০০০ আরপিএম।

এক সেকেণ্ড পর নাজমুলের পাশে, জমাট তুষারে থামতে শুরু করল দ্বিতীয় মেরিন হোভারক্রাফট, এখনও পিছলে চলেছে।

নাজমুলের রেডিয়োতে শোনা গেল হোসেন আরাফাত দবিরের কণ্ঠ: 'আর পনেরো মিনিট, বাছা। চলো মেইন বিল্ডিঙের কাছে, সবাইকে তুলে নিতে হবে।'

বি-ডেকের ভিতর দিকের টানেলে হেঁটে চলেছে রানা, চট্ করে দেখে নিল হাতঘড়ি। আর মাত্র পনেরো মিনিট!

'তিশা, শুনছ?' হেলমেট মাইকে বলল রানা। মাইক্রোফোনের উপর হাত রেখে গলা ছাড়ল: 'এবার সবাই চলুন!'

উইলকক্স আইস স্টেশনের বাসিন্দা বলতে তিন বিজ্ঞানী—হ্যাভেনপোর্ট, টমসন ও হ্যারি। যে যার ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে তারা।

রানাকে এক ছুটে পাশ কাটাল হ্যাভেনপোর্ট ও হ্যারি, পরনে কালো, পুরু উইণ্ডব্রেকার। চলেছে সেণ্ট্রাল শাফটের দিকে।

রানা হঠাৎ করেই শুনল তিশার কণ্ঠ: 'স্যর, তিশা। আপনি বিশ্বাস করবেন না নীচে কী ঘটেছে।'

'তুমিও বিশ্বাস করবে না উপরে কী ঘটছে,' বলল রানা। 'আপাতত শুনবার সময় নেই, তিশা। সামনে বিরাট ঝামেলা। এই স্টেশনে আসছে এক প্লাটুন এসএএস কমাণ্ডো। চোদ্দ মিনিট পর পৌঁছবে।'

'হায় আল্লা! আপনি কী করবেন, স্যর?'

'এখান থেকে বেরিয়ে যাব। এ ছাড়া কোনও উপায়ও নেই। যেভাবে হোক যেতে হবে ম্যাকমার্ডোতে, ওখান থেকে সৈনিক নিয়ে ফিরব।'

'নীচে আমরা কী করব, স্যর?'

'ওখানেই থাকবে। পুলের ধারে। কেউ উঠে এলে গুলি করে ফেলে দেবে।' চারপাশ দেখে নিল রানা। কোথাও নেই মেরি। 'পরে তোমার সঙ্গে কথা হবে, তিশা,' বিমর্ষ শোনাল রানার কণ্ঠ।

'সাবধান থাকবেন, স্যর।'

'তোমরাও সতর্ক থেকো। আউট।' চরকির মত ঘুরে দাঁড়াল রানা। 'মেয়েটা গেল কোথায়!'

কেউ জবাব দিল না। এইমাত্র যার যার ঘর থেকে ফিরেছে রাফায়লা ও টমসন, ব্যস্ত হয়ে পারকা পরছে। পকেটে গুঁজছে দরকারী কাগজ।

'রাফায়লা, মেরি ভিসার কোথায়?' জানতে চাইল রানা।

'মনে হয় ঘরে ফিরেছে।'

'ওর ঘর কোনটা?'

'সুড়ঙ্গের আরেক দিকে, সামনের বামদিকের দরজা,' বলল রাফায়লা।

তীরের মত ছুটতে শুরু করেছে রানা।

আর মাত্র বারো মিনিট!

বামদিকের দরজা পেয়েই ঝট্ করে খুলল ও।

শোবার ঘর। কেউ নেই।

দ্বিতীয় দরজা। ওটা তালা বন্ধ। দরজার উপর তিনটে রিঙের মাঝে বায়োহ্যাযার্ড সাইন। বায়োটক্সিন ল্যাব। এর ভিতর মেরি থাকবে না।

তৃতীয় দরজা। দড়াম করে কবাট খুলল রানা। ওখানেই থমকে গেল।

আগে এ ঘরে আসেনি। জায়গাটা ওয়াক-ইন ফ্রিযার, খাবার রাখা হয় এসব ফ্রিযে। কিন্তু এখন ওই কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে না। ফ্রিযার রুমের ভিতর অন্য কিছু।

মেঝেতে। তিনটে দেহ।

কেভিন হাক্সলে, জর্জ মারফি এবং হলিডে স্যাম্পসন। চিত হয়ে পড়ে আছে। মুখ রক্তাক্ত।

লড়াই শেষে দলের সবাইকে বলেছে রানা, কোনও ফ্রিযারে ওদের সহযোদ্ধাদের লাশ রাখতে হবে। পরে সুযোগ পেলে কবর দিতে হবে। এটাই সেই ফ্রিযার রুম।

কিন্তু ফ্রিযার রুমে চতুর্থ এক মৃতদেহ। হলিডের পাশে। বস্তা দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে তার মুখ।

ভুরু কুঁচকে গেল রানার।

চতুর্থ মৃতদেহ?

ফ্রেঞ্চ কমাণ্ডো হতে পারে না। যেখানে মরেছে, এখনও সেখানেই পড়ে আছে তারা। তা হলে এ...

হঠাৎ মনে পড়ল রানার।

চার্লস মুন।

ডক্টর চার্লস মুন।

ওরা এই স্টেশনের এসে শুনেছে, কয়েক দিন আগে এই লোককে খুন করেছে বাঙালি বিজ্ঞানী রাশেদ হাবিব। অন্য

বিজ্ঞানীরা এর লাশ রেখে গেছে এই ঘরে।

ঘড়ি দেখল রানা।

আর মাত্র এগারো মিনিট।

ওর মনে পড়ল, রাশেদ হাবিবের ঘরে জ্ঞান ফিরবার পর, লোকটা ওকে অদ্ভুত এক অনুরোধ করেছিল। বলেছিল, যদি সুযোগ হয়, মুনের লাশ দেখবেন। বিশেষ করে জিভ ও চোখ।

কেন দেখতে হবে মৃতের জিভ ও চোখ, তখন ভাবেনি রানা। কিন্তু জোর দিয়ে বলেছিল হাবিব, এ থেকে প্রমাণ হবে সে খুন করেনি।

আর মাত্র সাড়ে দশ মিনিট।

হাতে সময় নেই।

স্টেশন থেকে বেরিয়ে যেতে হবে।

কিন্তু রাশেদ হাবিব ওর প্রাণ বাঁচিয়েছে...

দেরি না করে ফ্রিযার রুমে ঢুকে পড়ল রানা, এক হাঁটু গেড়ে বসল বস্তার পাশে। সরিয়ে দিল বস্তা।

ঠাণ্ডা অপলক চোখে রানার দিকে চেয়ে আছে চার্লস মুন। কচ্ছপের চোখের মত অস্বচ্ছ চাহনি, প্রাণ নেই তাতে। বিশ্রী চেহারার লোক ছিল সে। মোটা, মাথা ভরা টাক। ফুলে ওঠা থলথলে মুখ। ত্বক হাড়ের মত সাদা।

সময় নষ্ট করল না রানা, চট্ করে পরীক্ষা করল চোখ।

টকটকে লাল, যেন চোখ থেকে ছিটকে বেরুচ্ছে রক্তিম আগুন। কোনও ড্রাগনের চোখ এমন হতে পারে।

লাশের মুখে মনোযোগ দিল রানা।

চোয়াল খুলবার চেষ্টা করল, খুব শক্ত করে বন্ধ মুখ।

আরেকটু ঝুঁকে গেল রানা, দু'হাতে খুলতে চাইল চোয়াল। চাপ দিতে খুব ধীরে খুলল মুখ।

'এহ্হে,' মুখ কুঁচকে ফেলল রানা। বমি পেয়ে গেছে।

চার্লস মুন দাঁত দিয়ে কেটে দুই টুকরো করে ফেলেছে জিভ।

মরবার আগে যে কারণেই হোক, ভয়ঙ্কর কামড় দিয়েছে জিভের উপর। চোয়াল খুলবার আগে দাঁতে দাঁত খিঁচে ছিল।

আর মাত্র দশ মিনিট!

যথেষ্ট হয়েছে, আর সময় নেই।

লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল রানা, বেরুবে দরজা দিয়ে, কিন্তু তার আগে মৃত মেরিন জর্জ মারফির হেলমেট তুলে নিল মেঝে থেকে, বেরিয়ে এল টানেলে।

ওদিক থেকে ছুটে আসছে মেরি ভিসার।

'পারকা আনতে দেরি হলো,' দুঃখ-প্রকাশ করল। 'অন্যটা ভিজে গেছে তো...'

'জলদি চলো,' মেয়েটির হাত ধরল রানা, হালকা পায়ে ছুটতে শুরু করেছে।

সুড়ঙ্গে বাঁক নিতেই দূরে দেখা গেল সেণ্ট্রাল শাফট। পিছন থেকে কে যেন চেঁচিয়ে উঠল: 'ওরে ভাই, আমাকে ফেলে যাবেন না!'

ঘুরে চাইল রানা। রাশেদ হাবিব। খাটো পাদুটো উড়িয়ে আনছে তাকে। পরনে নীল, ভারী পারকা। বগলের নীচে মোটা বই।

'ওটা দিয়ে কী করবেন? জলদি!'

'এই বই না থাকলে মরব রে, ভাই,' বামহাতে বগলের বই দেখাল সে। পাঁচ সেকেণ্ড পেরুবার আগেই রানাকে পাশ কাটাল সে, মেরির কথা ভুলে উড়ে চলেছে।

দেরি না করে তার পিছু নিল রানা ও মেরি।

'বই দিয়ে কী করবেন?' জানতে চাইল রানা।

'এটাই আমার প্রমাণ, আমি আসলে নিরপরাধ!'

উইলকক্স আইস স্টেশনের বাইরে দিগন্ত থেকে আরেক দিগন্তে কাত হয়ে শোঁ-শোঁ আওয়াজে ছুটছে ধবল তুষার।

মেইন বিল্ডিং থেকে বেরিয়ে সমতলে ঝড়ের ভিতর উঠে এল রানা। সঙ্গে পিচ্চি মেরি ভিসার ও বিজ্ঞানী রাশেদ হাবিব।

আর মাত্র আট মিনিট, তারপর হাজির হবে এসএএস ফোর্স।

মেইন বিল্ডিঙের সামনে মেরিনদের দুই হোভারক্রাফট। বিশাল দুই যানের পাশে কর্পোরাল নাজমুল ও সার্জেন্ট হোসেন আরাফাত দবির, প্রায় ধাক্কা দিয়ে সবাইকে তুলছে নাজমুলের হোভারক্রাফটে।

সহজ প্ল্যান করেছে রানা।

নাজমুলের হোভারক্রাফট হবে যাত্রীবাহী। ওটাতে উঠবে ছয়জন। অর্থাৎ, উইলকক্স আইস স্টেশনের প্রত্যেকে। রাফায়লা ম্যাকানটায়ার, হ্যাভেনপোর্ট, টমসন, হ্যারি, মেরি ভিসার এবং ড্রাইভার নাজমুল।

সার্জেন্ট দবির ও রানার সঙ্গে থাকবে শটগান, ওরা পাহারা দেবে যাত্রীবাহী হোভারক্রাফটকে। সোজা পুবে ছুটবে, দৌড়ে হারাতে চাইবে এসএএসের হোভারক্রাফটকে।

দ্বিতীয় মেরিন হোভারক্রাফট ড্রাইভ করবে দবির, এদিকে ফ্রেঞ্চ কমলা হোভারক্রাফট চালাবে রানা। ঠিক করেছে, ওর সঙ্গে নেবে বাঙালি বিজ্ঞানী রাশেদ হাবিবকে।

নাজমুলকে হোভারক্রাফটের স্লাইডিং দরজা বন্ধ করতে দেখল রানা। লাফ দিয়ে নিজের হোভারক্রাফটের স্কার্টে উঠল দবির, হারিয়ে গেল কেবিনের ভিতর। তিন সেকেণ্ড পর আবারও বেরুল কালো এক মস্ত স্যামসোনাইট ট্রাঙ্ক নিয়ে, তুষারের ভিতর দিয়ে টেনে আনছে রানার দিকে। ধপ্ করে পাশে ফেলল।

'এই যে আপনার পোকা মারার ওষুধ, স্যার!' বলেই ছুট দিয়েছে নিজ হোভারক্রাফটের উদ্দেশে।

'এই যে, হাবিব!' তাড়া দিল রানা, 'জলদি!'

লোকটার হাতে ফ্রিযার রুম থেকে আনা হেলমেট ধরিয়ে দিল ও। নিজে ধরল স্যামসোনাইট ট্রাঙ্কের টানা হাতল, টেনে নিয়ে চলেছে ওটা হোভারক্রাফট লক্ষ্য করে।

তুষারের ভিতর মেইন এণ্ট্র্যান্সের সামনে নিথর ফ্রেঞ্চ যান।

আর মাত্র সাত মিনিট, এরপর পৌঁছুবে এসএএস ফোর্স।

ট্রাঙ্ক রেখে লাফ দিয়ে কমলা হোভারক্রাফটের স্কার্টে উঠল রানা, টান দিয়ে খুলে ফেলল স্লাইডিং ডোর। 'তুলে ধরুন আমার দিকে!'

প্রাণপণ চেষ্টায় স্যামসোনাইট উঁচু করেছে বিজ্ঞানী, তার হাত থেকে ভারী জিনিসটা নিল রানা, ছুঁড়ে ফেলল ভিতরে। দেরি না করে কেবিন পেরিয়ে ধপ করে বসল ড্রাইভিং সিটে। গাড়িতে উঠে স্লাইডিং ডোর বন্ধ করে দিয়েছে হাবিব।

রানা ইগনিশনে চাবির কান মুচড়ে দিতেই গর্জন ছাড়ল ইঞ্জিন। হোভারক্রাফটের পিছনে ঘুরতে শুরু করেছে সাত ফুটি বিশাল ফ্যান। গতি আরও বাড়ছে, কয়েক সেকেণ্ড পর হয়ে উঠল পুরনো কোনও বাইপ্লেনের প্রপেলারের মত। তিন সেকেণ্ড পর ওভারড্রাইভ করল, দেখা গেল না পাখা, রইল শুধু আবছা ঘুরন্ত কী যেন।

হোভারক্রাফটের কালো রাবারের স্কার্টের নীচে চালু হয়েছে চারটে টার্বোফ্যান। ধীরে তুষার থেকে উঠে এল মস্ত ওই হোভারক্রাফট, বেলুনের মত ফুলে উঠল স্কার্ট।

কমলা যন্ত্রদানব ঘুরিয়ে নিল রানা, চলে গেল মেরিনদের সাদা দুই হোভারক্রাফটের পাশে। ড্রাইভাররা একইদিকে তাক করেছে সব ক'টার মুখ, সাগরকে পাশে রেখে ছুটবে ম্যাকমার্ডো স্টেশন লক্ষ্য করে।

রিইনফোর্সড উইণ্ডস্ক্রিনের ভিতর দিয়ে দক্ষিণ-পশ্চিম দিগন্তে

চাইল রানা। ওদিকে জ্বলজ্বলে ভুতুড়ে কমলা আলো। তার ভিতর কালো সব ছায়া। কালো সব বাক্স, নীচের দিকে গোলাকৃতি কী যেন। নীচ থেকে উড়ছে ধুলোর মত কিছু।

ব্রিটিশ হোভারক্রাফট। উইলকক্স আইস স্টেশনের কাছে পৌঁছে গেছে।

'এবার রওনা দাও,' হেলমেট মাইকে বলল রানা।

একইসঙ্গে ছুটতে শুরু করল তিন হোভারক্রাফট। খুব দ্রুত গতিবেগ উঠল আশি মাইলে।

পিছনে পড়ছে বরফ-জমিন। তীব্র গতি তুলে চলেছে রানাদের হোভারক্রাফট। নাজমুলের দু'পাশে রানা ও দবির। লক্ষ্য পুবের ম্যাকমার্ডো স্টেশন। পাশেই আকাশ-ছোঁয়া ক্লিফ, ওপাশে অনেক নীচে উথাল-পাতাল উপসাগর। দু'পাশে বরফ ছাওয়া প্রান্তর। কিন্তু মাঝের এই এক মাইল সাগর পেরুনো অসম্ভব। ওদিকের জমিতে যেতে হলে পেরুতে হবে কমপক্ষে আট মাইল। ক্লিফের গোড়ায় আছড়ে পড়ছে দক্ষিণ সাগরীয় দানবীয় ঢেউ।

প্রচণ্ড গতি তুলে ছুটছে তিন হোভারক্রাফট, চট্ করে পিছন দিক দেখে নিল রানা। পশ্চিম-দক্ষিণ থেকে উইলকক্স আইস স্টেশনের কাছে পৌঁছে গেছে ব্রিটিশ হোভারক্রাফট বহর।

'এরা অস্ট্রেলিয়ানদের কোনও স্টেশনে নেমেছে,' হেলমেট ইণ্টারকমে বলল রানা। ধারণা করছে, কেইসি স্টেশন থেকেই এসেছে। ওটা সবচেয়ে কাছে, উইলকক্স স্টেশন থেকে সাত শ' মাইল দূরে।

'চুতিয়া অস্ট্রেলিয়ান,' মুখ ফস্কে বলে ফেলল দবির। পরক্ষণে তার খুকখুক কাশির আওয়াজ পাওয়া গেল।

মাত্র পাঁচ মাইল দূরে নীরব এক আমেরিকান বেল টেক্সট্রন সিরিয়াল নং. ৭-এস হোভারক্রাফটের রিইনফোর্সড উইণ্ডশিল্ডের

ওপাশ থেকে চেয়ে আছে এসএএস কমাণ্ডার, মেজর জেনারেল জুলিয়াস বি. গুণ্ডারসন।

দীর্ঘদেহী লোক সে, যেন লোহা পেটা শরীর, পুরো মাথা কামানো, থুতনিতে ছোরার মত দাড়ি। বয়স মাত্র ছাপান্ন। ঠাণ্ডা চোখে চেয়ে আছে সে দূরে। 'তা হলে ভাগছে, মাসুদ রানা,' আনমনে বলল। 'বাহ্, নিজেকে চালাক ভাবছে?'

'পুবে চলেছে, স্যর,' গুণ্ডারসনের পাশের রেডিয়ো কন্সোল থেকে বলল তরুণ এসএএস কর্পোরাল। 'উপকূল ঘেঁষে।'

'ওদের পিছনে আটটা ক্রাফট পাঠাও,' নির্দেশ দিল গুণ্ডারসন। 'ওদের একজনও যেন বাঁচতে না পারে। অন্যরা প্ল্যান অনুযায়ী স্টেশনে ঢুকবে।'

'জী, স্যর।'

চার

রানার হোভারক্রাফটের স্পিডোমিটার জানান দিচ্ছে: গতিবেগ নব্বুই মাইল। উইণ্ডশিল্ডের উপর আছড়ে পড়ছে ক্ষ্যাপা তুষার।

হেলমেট ইন্টারকমে নাজমুলের কণ্ঠ শুনল রানা: 'স্যর, ওরা আসছে!'

ডানদিকে মুখ ঘোরাল রানা, আরও গম্ভীর হয়ে গেল। তীব্র গতি তুলে ওদের দিকে আসছে শত্রুযান।

ব্রিটিশ বহর থেকে সরে এসেছে কয়েকটা হোভারক্রাফট, ধাওয়া শুরু করেছে ওদের পিছনে।

'অন্যরা স্টেশনে যাচ্ছে,' জানাল দবির।

ড্রাইভিং সিটে ঘুরে চাইল রানা, কেবিনের পিছনে রাশেদ হাবিব। জর্জ মারফির বড় হেলমেট পরেছে বলে তাকে দেখতে কাকতাড়ুয়ার মত অদ্ভুত লাগছে।

'মিস্টার হাবিব,' বলল রানা।

'জী, ভাই?'

'এবার আপনার কাজ দেখাবার সময় হয়েছে। দেখুন দেখি ট্রাঙ্ক খুলতে পারেন কি না।'

মেঝেতে স্যামসোনাইট ট্রাঙ্কের পাশে হাঁটু গেড়ে বসল রাশেদ হাবিব, খুলতে শুরু করেছে ল্যাচ।

তুমুল গতি তুলে ড্রাইভ করছে রানা, একটু পর পর ঘুরে চাইছে।

ঢাকনি খুলে ফেলেছে হাবিব, ভিতরের জিনিস দেখে বলল, 'সর্বনাশ! বন্দুক!'

তখনই বাইরে উঠল বিকট আওয়াজ। আবারও ড্রাইভিঙে মন দিল রানা। বুঝে ফেলেছে, ওটা কী। পরক্ষণে দেখল।

ওর হোভারক্রাফটের সামনে পড়েছে মিসাইল। তুষারের বুকে দশ ফুট ব্যাসের গর্ত তৈরি করেছে। পরক্ষণে গহ্বরের কিনারা পেরুল ওর হোভারক্রাফট। বিকট বিস্ফোরণে ছিটকে উঠেছে বরফের কুচি ও তুষার।

'আরও আসছে!' নাজমুলের চিৎকার শুনল।

'তীর থেকে সরে যাও!' নির্দেশ দিল রানা। বামপাশে এক শ' গজ দূরে ক্লিফ। 'ওদিক থেকে সরো!'

কথার ফাঁকে চট্ করে মুখ সরাল। ওর পিছনে হাজির হয়েছে কয়েকটা ব্রিটিশ হোভারক্রাফট। দ্বিতীয় মিসাইল আসতে দেখল রানা।

সিলিণ্ডারের মত জিনিসটা সাদা রঙের, সামনের ব্রিটিশ

হোভারক্রাফটের নাকের কাছ থেকে রওনা হয়েছে। লেজে ধোঁয়া নিয়ে ঘুরতে ঘুরতে আসছে।

ওটা মিলান অ্যান্টি-ট্যাঙ্ক মিসাইল!

'মরেছি!' গুঙিয়ে উঠল রাশেদ হাবিব।

মেঝের সঙ্গে অ্যাক্সেলারেটার টিপে ধরেছে রানা।

কিন্তু কাছে চলে এসেছে মিসাইল।

বাঁকা পথে আসছে রানার হোভারক্রাফট লক্ষ্য করে।

অনেক বেশি গতি ওটার।

একেবারে শেষ মুহূর্তে স্টিয়ারিং ইয়কে হ্যাঁচকা টান দিল রানা, দ্রুত বামে সরতে শুরু করেছে হোভারক্রাফট। ছুটছে ক্লিফের কিনারা লক্ষ্য করে।

ওদের নাকের সামনে দিয়ে পেরুল রকেট। পাগল হয়ে উঠেছে রানা, সরছে ডানদিকে। বিশ ফুট বামে বিস্ফোরিত হলো রকেট, চারপাশে ছড়িয়ে গেল পেঁজা তুষার।

আবারও বামে সরছে রানা, মাত্র দুই সেকেণ্ড পর ডানদিকে ছিটকে উঠল বিপুল তুষার। আধ সেকেণ্ড পর এল কান ফাটানো আওয়াজ।

'এঁকেবেঁকে!' হেলমেট মাইকে চেঁচাল রানা। 'কেউ টার্গেটি লক করতে দিয়ো না!'

প্রায় একইসঙ্গে বাঁক নিয়েছে তিন হোভারক্রাফট, যেন ভয়ঙ্কর ঝড়ের ভিতর দুলছে তিন জাহাজ। ওদের চারদিকের তুষার জমিতে নামছে ব্রিটিশদের আনগাইডেড মিসাইল। বিকট বিস্ফোরণের আওয়াজে ঝনঝন করছে কানের তালা। জমি থেকে ছিটকে উঠছে তুষার।

স্টিয়ারিং ইয়োকের সঙ্গে লড়ছে রানা, বরফের উপর বিশ্রী আওয়াজ তুলে পিছলে চলেছে হোভারক্রাফট। কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই বললেই চলে। একবার এদিকে সরতে চাইছে রানা, পরক্ষণে

অন্য দিকে। পিছন থেকে ধাওয়া করে আসছে একের পর এক মিসাইল।

'ট্রাঙ্ক, হাবিব!' গলা ছাড়ল রানা। 'ট্রাঙ্ক!'

'এই তো আপনার ট্রাঙ্ক!' স্যামসোনাইট খুলে কালো একটা টিউব বের করেছে সে। দৈর্ঘ্যে ওটা পাঁচ ফুট।

'ঠিক আছে,' আরেকটা ব্রিটিশ মিসাইল এড়াতে আরেক দিকে সরছে রানা। হড়কে চলেছে হোভারক্রাফট, ভারসাম্য রাখতে না পেরে দেয়ালে হুমড়ি খেয়ে পড়ল হাবিব, ওখান থেকে মেঝেতে।

'টিউবের সঙ্গে গ্রিপস্টক লক করুন,' নির্দেশ দিল রানা।

কয়েক সেকেণ্ড পর ট্রাঙ্কের ভিতর গ্রিপস্টক পেল হাবিব। জিনিসটা ব্যারেলহীন অস্ত্রের বাঁটের মত। সামনের দিকে নীচে ট্রিগার। টিউবের শেষে ক্লিক করে আটকে গেল গ্রিপস্টক।

'ঠিক আছে, হাবিব, আপনি একটা স্টিংগার মিসাইল লঞ্চার তৈরি করেছেন! এবার ওটা ব্যবহার করুন!'

'কীভাবে ব্যবহার করব, ভাই?'

'দরজাটা খুলুন! জিনিসটা কাঁধের সঙ্গে লাগান! দুষ্ট লোকের দিকে তাক করুন! যেই কানের কাছে ঝন শুনবেন, ট্রিগার টিপে দেবেন! বাকি কাজ ওটাই করবে!'

'জী, ভাই, কিন্তু...' সন্দেহ নিয়ে বলল হাবিব। কথা শেষ করল না, খুলে ফেলল ডানদিকের স্লাইডিং দরজা। ভিতরে ঢুকল অ্যান্টার্কটিকার হিম-শীত। 'ওরে বাপরে মরেছি! শী...ত!' ঝোড়ো হাওয়ার বিরুদ্ধে লড়ে দরজার কাছে পৌঁছে গেল হাবিব।

কাঁধে তুলে ফেলেছে স্টিংগার লঞ্চার, চোখ পাকিয়ে চাইল সাইটে। নাইট-ভিশনের ভিতর জ্বলজ্বলে সবুজ হোভারক্রাফট। ওটার উপর স্থির হলো ক্রস-হেয়ার। পরের সেকেণ্ডে একটা গুঞ্জন শুনল হাবিব।

'আমি শুনেছি!' উত্তেজিত হয়ে চেঁচিয়ে উঠল, যেন ওহী

শুনেছে, 'কিন্তু এবার কীভাবে ব্রিটিশগুলোকে শেষ করি?'

'ট্রিগার টিপে দিন!' ষাঁড়ের মত পাল্টা চেঁচাল রানা।

পরক্ষণে ট্রিগার টিপল হাবিব। তখনই পিছনে উড়াল দিল সে, ছিটকে গিয়ে পড়েছে কেবিনের ভিতর।

ওদিকে লঞ্চার থেকে বেরিয়ে গেছে মিসাইল। কালো ধোঁয়া ছিটকাল লঞ্চার। ছোট বিস্ফোরণ তৈরি করেছে, চুরচুর হয়ে ভেঙে পড়েছে হাবিবের পিছনে জানালার কাঁচ।

চোখ রেখেছে রানা, ঘুরতে ঘুরতে ব্রিটিশদের সামনের হোভারক্রাফটের দিকে চলেছে স্টিংগার। পিছনে পাক খাওয়া ধোঁয়া। ওটাই বুঝিয়ে দিল ফ্লাইট-পাথ।

ব্রিটিশ হোভারক্রাফটের নাকে লাগল স্টিংগার, পরক্ষণে বিস্ফোরিত হলো। মুহূর্তে হাজার টুকরো হলো ক্রাফট।

অন্যরা মোটেও হাল ছাড়ল না, পাত্তাই দিল না কিছু। পিছনের একটি হোভারক্রাফট এল সরাসরি জ্বলন্ত টুকরোগুলোর ভিতর দিয়ে।

'দারুণ লক্ষ্যভেদ, হাবিব!' উৎসাহ দিল রানা। ভাল করেই জানে, লোকটা আসলে ট্রিগার টেপা ছাড়া কিছুই করেনি। ব্রিটিশরা ব্যবহার করছে মিলান অ্যান্টি-ট্যাঙ্ক মিসাইল। ওই জিনিস ট্যাঙ্ক বা আর্মার্ড ভেহিকেল উড়িয়ে দেবে, অবশ্য শত্রুর গতি বড়জোর হতে হবে চল্লিশ মাইল। এবং সে কারণেই দ্রুতগতি হোভারক্রাফটের বিরুদ্ধে হিমশিম খাচ্ছে এসএএস কমাণ্ডোরা।

হিউয়েস এমআইএম-৯২ সারফেস-টু-এয়ার স্টিংগার মিসাইল একেবারেই অন্য জিনিস। ব্যবহার করা হয় সুপারসনিক ফাইটার বিমানকে ফেলে দিতে। খুব সহজেই নব্বুই মাইল বেগের হোভারক্রাফটকে গেঁথে ফেলেছে ওটা।

রানা এ-ও জানে, শোল্ডার-লঞ্চড্ অ্যাসল্ট ওয়েপন্সের ভিতর

সবচেয়ে সহজে ব্যবহার করা যায় স্টিংগার। শুধু তাক করতে হবে অস্ত্র, শুনতে হবে গুঞ্জন, তারপর টিপে দিতে হবে ট্রিগার। বাকি কাজ করবে মিসাইল।

রানার পিছনে মেঝে থেকে উঠেছে রাশেদ হাবিব, উঁকি দিল সাইড দরজা দিয়ে। ওই যে দেখা যায় বিধ্বস্ত হোভারক্রাফট, নানাদিকে ছিটকে পড়ে এখন জ্বলছে।

'কী বুঝলেন?' খুশি হয়ে জানতে চাইল সে।

'আপনি পারেনও,' বলল রানা। আবারও গলা শুকিয়ে গেছে ওর।

ঠিক পিছনে জোট বেঁধেছে সাতটা ব্রিটিশ হোভারক্রাফট!

'সার্জেন্ট, স্যর!' চেঁচিয়ে উঠল নাজমুল।

'আসছি!' পাল্টা চেঁচাল দবির। স্টিয়ারিং ইয়কে টান দিয়েছে সে। ডানদিকে বাঁক নিল ওর হোভারক্রাফট, চলে গেল নাজমুলের পাশে। আড়াল দেবে ব্রিটিশ হোভারক্রাফট থেকে।

ডানদিক দেখে নিল দবির, এইমাত্র ওর পাশের জানালায় লেগেছে অজস্র বুলেট। আঁচড় কাটবার দাগ পড়েছে কাঁচে, অবশ্য তৈরি হয়নি ফাটল। বুলেট-রেযিস্ট্যাণ্ট লেকসান গ্লাস।

ব্রিটিশ হোভারক্রাফটগুলো বড়জোর বিশ গজ দূরে। সীমাহীন বরফ প্রান্তরে পিছলে চলেছে। যেন এক পাল হাঙর, ছুটে আসছে তিন হোভারক্রাফট লক্ষ্য করে।

'সার্জেন্ট!'

নাজমুলের পিছনে চলে এল দবির। ডানদিক থেকে আসছে চারটে ব্রিটিশ হোভারক্রাফট। এমপি-৫ দিয়ে পাশের জানালার কাঁচ নিচু করে নিল দবির, পরক্ষণে টিপে ধরল ট্রিগার। সবচেয়ে কাছের ব্রিটিশ হোভারক্রাফটের গায়ে বিশটা গর্ত তৈরি হলো।

হঠাৎ করেই বাঁক নিল ওই হোভারক্রাফট। দড়াম করে ধাক্কা

দিল দবিরের হোভারক্রাফটে। অপ্রস্তুত ছিল দবির, জোর ঝাঁকি খেয়ে সিট থেকে পড়ে গেল মেঝেতে। বিরক্ত হয়ে জানতে চাইল, 'স্যর, আপনি কোথায়?'

কোনও সাড়া নেই।

'স্যর আর স্টিংগার গেল কই?' আবারও সিটে উঠল ও। পাশের জানালা দিয়ে উঁকি দিল। একটু দূরে ছুটছে ব্রিটিশ হোভারক্রাফট। এতই কাছে, ড্রাইভারকে দেখতে পেল। পরনে কালো পোশাক, কপালে এসএএসের কালো নেটের ব্যালাক্লাভা। পিছনে দু'জন, পরনে কালো ইউনিফর্ম। হোভারক্রাফটের পাশের দরজা খুলে ফেলেছে তাদের একজন।

ওরা উঠতে চায় এই হোভারক্রাফটে, ভাবল দবির।

কিন্তু এক সেকেণ্ড পর উজ্জ্বল আলোয় ভরে উঠল ব্রিটিশ হোভারক্রাফট। জানালার ফ্রেম থেকে ছিটকে বেরুল রিইনফোর্সড কাঁচ। বিস্ফোরিত হয়েছে সব।

অবাক হয়ে দেখছে দবির, এইমাত্র পাশে ছুটছিল লোকগুলো, এক সেকেণ্ড পর পিছনে পড়ে গেল জ্বলন্ত জঞ্জাল। কাঁধের উপর দিয়ে চাইল দবির। পিছনে হাজির হয়েছে মাসুদ রানার কমলা হোভারক্রাফট। ওটা থেকে বেরুচ্ছে স্টিংগার মিসাইলের ধোঁয়া।

'ধন্যবাদ, স্যর,' বলল দবির।

'বামে দেখুন!' সতর্ক করল রানা।

প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়ে সিট থেকে আবারও উড়াল দিল দবির, চোখের সামনে উল্টে গেল পৃথিবী। একপাশ থেকে এসেছে ভয়ঙ্কর গুঁতো। ধপ্ করে আবারও বরফ-সমতলে নামল ওর হোভারক্রাফট, বিন্দুমাত্র কমেনি গতি।

কোথায় আছে বুঝল না দবির। এক সেকেণ্ড পর হাঁচড়ে-পাঁচড়ে উঠতে চাইল ড্রাইভিং সিটে। আর ঠিক তখনই আবারও জোর ধাক্কা লাগল। এবার এসেছে ডানদিক থেকে।

'স্যর!' চেঁচিয়ে উঠল দবির।

'জানি, দবির!' তুষারের ভিতর উইণ্ডশিল্ডের এপাশ থেকে দেখছে রানা। আরও গতি বাড়ছে ওর হোভারক্রাফটের।

ধবল বরফের মাঠে রেসের গাড়ির মত ছুটছে দবিরের হোভারক্রাফট। দুই পাশে দুটো কালো ব্রিটিশ হোভারক্রাফট, পালা করে গুঁতো মারছে।

'হাবিব!' হাঁক ছাড়ল রানা। 'স্টিংগার!'

'লঞ্চারে প্রায় বসিয়ে নিয়েছি...' পিছন থেকে বলল হাবিব। নতুন করে গ্রিপস্টককে নতুন টিউব বসাতে চাইছে।

'এক সেকেণ্ড, দবির!' জানাল রানা।

গর্জে উঠল ওর হোভারক্রাফটের ইঞ্জিন। আরও বাড়ছে গতি। সামনে তিনটে হোভারক্রাফট। মাঝেরটা দবিরের। দু'পাশ থেকে ধাক্কা দিচ্ছে দুই এসএএস হোভারক্রাফট।

ইঞ্চি ইঞ্চি করে তাদের কাছে পৌঁছে গেল রানা। ওভারটেক করছে। বামদিকের হোভারক্রাফটকে পিছনে ফেলল, কয়েক মুহূর্ত পর চলে এল তিন হোভারক্রাফটের সামনে। একটু দূরে নাজমুলের হোভারক্রাফট। বামে মাত্র বিশ গজ দূরে।

'নাজমুল?' ডাকল রানা।

'জী, স্যর?'

'দবিরকে তুলে নেয়ার জন্য তৈরি থাকো!'

'জী?'

'তৈরি থাকো!'

চুপ হয়ে গেছে নাজমুল।

এমপি-৫ তুলে নিয়েছে রানা। ঘুরে চাইল রাশেদ হাবিবের দিকে। 'হাবিব...'

'জী, ভাই?'

'কিছু ধরে থাকুন!'

হোভারক্রাফটের গিয়ার নিউট্রাল করে দিল রানা, পরক্ষণে গায়ের জোরে ডানদিকে ঘোরাল স্টিয়ারিং ইয়োক।

দুই টনি বুলেটের মত ঘুরতে শুরু করেছে হোভারক্রাফট। এক শ' আশি ডিগ্রি চরকির মত ঘুরল। দবির ও অন্য দুই ব্রিটিশ হোভারক্রাটের মুখোমুখি হয়েছে।

কেবিনের ভিতর চট্ করে ইয়োকে রিভার্স দিল রানা, উল্টো ঘুরছে টার্বোফ্যান। তীব্র গতি তুলে পিছু হটছে হোভারক্রাফট!

গতিবেগ কমপক্ষে আশি মাইল!

দবিরের মেরিন হোভারক্রাফট ও ব্রিটিশ দুই হোভারক্রাফট রানার নাকের সামনে! ড্রাইভিং জানালা দিয়ে এমপি-৫ বের করল রানা, গুলি করল এক পশলা।

বিস্ফোরিত হয়েছে বামের ব্রিটিশ হোভারক্রাফটের উইণ্ডশিল্ড। ড্রাইভিং সিটে লোকটাকে ঝাঁকি খেতে দেখল রানা। এক সেকেণ্ড পর পিছাতে শুরু করল হোভারক্রাফট। হারিয়ে গেল আঁধারে।

নরকের ভিতর আছে সার্জেন্ট হোসেন আরাফাত দবির।

বামপাশের ব্রিটিশ হোভারক্রাফট নেই, কিন্তু ডানদিকের হোভারক্রাফট নতুন উদ্যমে ধাক্কা দিচ্ছে। শুভ্র বরফের মাঠে পাশাপাশি ছুটছে দুই হোভারক্রাফট। গর্জন ছাড়ছে ইঞ্জিন। হঠাৎ দবির দেখল, খুলে গেছে ব্রিটিশ হোভারক্রাফটের সাইড দরজা। ওখান থেকে বেরুল কালো, মোটা ব্যারেল।

'ব্রিটিশ কুকুরগুলো মারবে আমাকে,' ভাবল দবির।

ব্যারেলের মুখ থেকে বেরুল কী যেন। ওটা এম-৬০ গ্রেনেড লঞ্চার! মুহূর্ত পর দবিরের হোভারক্রাফটের দরজা বিস্ফোরিত হলো। কেবিনে এসে ঢুকল হিম-শীতল হাওয়া।

ওর হোভারক্রাফটের পাশের দেয়াল উড়িয়ে দিয়েছে!

একইসময়ে হোভারক্রাফটের ভিতর ঠং করে মেঝেতে পড়েছে কালো কী যেন!

বুঝতে দেরি হলো না দবিরের, ওটা কালো সিলিণ্ডার। গায়ে নীল অক্ষরে কী যেন লেখা। কেবিনের মেঝেতে গড়িয়ে ড্রাইভিং সিটের দিকেই আসছে। মনে হলো সাধারণ গ্রেনেড, কিন্তু দবির জানে, ওটা অনেক বেশি বিপজ্জনক।

ওটা নাইট্রোজেন চার্জ।

এসএএস ছাড়া অন্য কেউ ব্যবহার করে না।

দুনিয়ার সবচেয়ে বিপজ্জনক গ্রেনেড। ট্যাম্পার মেকানিজম আছে, যে ছুঁড়ে মারবে, চাইলে উল্টো তার দিকে ছুঁড়ে দেওয়া যায় না। স্ট্যাণ্ডার্ড টাইম ডিলেঃ পাঁচ সেকেণ্ড।

এখনই হোভারক্রাফট থেকে নামতে হবে। পরক্ষণে কেবিনের দক্ষিণ দিকে ডাইভ দিল দবির। ওদিকটা ব্রিটিশ হোভারক্রাফট থেকে দূরে। লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়েই খুলে ফেলল দরজা, পিছলে নেমে যেতে শুরু করেছে।

পাঁচ... চার...

অ্যান্টার্কটিকার বরফ-শীতল হাওয়া লাগছে। দিগন্ত থেকে সাঁই-সাঁই করে চোখে-মুখে এসে পড়ছে তুষার। পাত্তা দিল না দবির। তুষার ওকে শেষ করবে না, হোভারক্রাফট থেকে পড়লেও হয়তো মরবে না; কিন্তু নাইট্রোজেন চার্জ মুহূর্তে খুন করবে ওকে!

তিন... দুই...

জমাট ঠাণ্ডা হাওয়ার ভিতর প্রায় ঝাঁপিয়ে বেরিয়েছে দবির, তার আগে পিছনে বন্ধ করে দিয়েছে স্লাইডিং ডোর। দ্রুতগতি হোভারক্রাফটের ফুলে ওঠা কালো স্কার্টে শুয়ে পড়েছে। কেবিনের বেরিয়ে থাকা অংশে হাওয়ার বিরুদ্ধে লড়ছে। কানে শোঁ-শোঁ আওয়াজ। তুমুল বেগে ছুটছে হোভারক্রাফট।

দুই... এক...

প্রার্থনা করছে দবির: যেন জানালার রিইনফোর্সড লেকসান গ্লাস...

হোভারক্রাফটের ভিতর বিস্ফোরিত হলো নাইট্রোজেন চার্জ।

থ্যাক্! আওয়াজ হলো। দবিরের মুখের পাশে, কাঁচের ওপাশে লেগেছে তরল নাইট্রোজেন। ঝট্ করে মুখ সরিয়ে নিল ও।

দুই সেকেণ্ড পর ভিতর অংশে চোখ বোলাল। কেবিনের চারপাশে লেগেছে সুপারকুল্ড লিকুইড নাইট্রোজেন। পাশের জানালার ওপাশে থকথকে নীল কী যেন। আস্তে করে শ্বাস ফেলল দবির। যাক, টিকে গেছে গ্লাস!

কিন্তু এক সেকেণ্ড পর কী যেন কড়াৎ করে উঠল!

ঝট্ করে মুখ সরিয়ে নিল দবির। বরফ-ঠাণ্ডা জানালাকে চুরচুর করে দিয়েছে তরল নাইট্রোজেন, এখন খসে পড়ছে সব। এক হাজার টুকরো হলো কাঁচ।

'সার্জেন্ট, স্যর!'

ঘুরে চাইল দবির, পাশেই ছুটছে নাজমুলের হোভারক্রাফট। উইণ্ডস্ক্রিনের ওপাশে ড্রাইভিং সিটে তরুণ ছেলেটা।

'উঠে পড়ুন, স্যর!'

দবিরের যানকে ঘেঁষে ছুটছে নাজমুলের হোভারক্রাফট। সড়াৎ করে সরে গেল স্লাইডিং দরজা। মুহূর্তের জন্য পরস্পরকে ছুঁয়ে গেল দুটো স্কার্ট। আবারও সরে গেল।

'লাফ দিন!' চেঁচিয়ে উঠেছে নাজমুল।

দবিরের ইয়ারপিসে জোরালো শোনাল কথাটা। উঠে দাঁড়াতে শুরু করেছে ও।

'আসুন!' তাড়া দিল নাজমুল।

পাশের হোভারক্রাফটের কালো স্কার্টের দিকে চাইল দবির। চোখ পড়ল নীচে। দুই যন্ত্রদানবের মাঝে আশি মাইল বেগে পিছিয়ে চলেছে সাদা বরফ। তখনই চোখের কোণে কী যেন

দেখল।

আধ সেকেণ্ড পর বুঝল, নাজমুলের যানের পিছনে ওটা একটা কালো হোভারক্রাফট।

মাইকে চিৎকার করল নাজমুল, 'স্যর, আপনি কোথায়!'

খুলে গেছে কালো হোভারক্রাফটের সাইড ডোর। দবির আবছা দেখল, ভিতরে মিলান অ্যান্টি-ট্যাঙ্ক মিসাইল লঞ্চার।

পরক্ষণে ভুস্ করে উঠল পরিচিত ধোঁয়া, লঞ্চারের মুখ থেকে ছিটকে বেরুল মিসাইল, আসছে ঠিক ওর দিকেই! পিছনে ঘুরতে ঘুরতে আসছে পাগলাটে ধোঁয়া। ঠিক তখনই বুঝল দবির, বড় দেরি করে ফেলেছে।

'স্যর! সার্জেন্ট! লাফ দিন! লাফ দিন!'

ঝাঁপ দিল হোসেন আরাফাত দবির।

পাঁচ

তুমুল ঝোড়ো হাওয়ার ভিতর ডানা ভাঙা কাকের মত পড়তে শুরু করেছে দবির, চোখের কোণে দেখল বিস্ফোরিত হলো ব্রিটিশ হোভারক্রাফট। ওটাকে উড়িয়ে দিয়েছে স্টিংগার মিসাইল। কিন্তু তার আগেই মিলান অ্যান্টি-ট্যাঙ্ক মিসাইল ছুঁড়েছে এসএএস ক্রাফট। সাদা জিনিসটাকে ঘুরতে ঘুরতে আসতে দেখছে ও।

এর এক সেকেণ্ড পর নাজমুলের হোভারক্রাফটের কালো স্কার্টে পড়ল ওর দুই হাত। ভুলে গেল ব্রিটিশ মিসাইলের কথা, প্রাণপণে খামচে ধরতে চাইল কিছু। পাদুটো পড়তে শুরু করেছে

ছুটন্ত জমির দিকে। এবার ছিটকে পড়বে নীচে। কিন্তু হাতে কী যেন ঠেকল। নাজমুলের হোভারক্রাফটের স্কার্ট স্টাড। ওটা শক্ত করে ধরল দবির। তখনই দেখল, ব্রিটিশ মিসাইল গিয়ে লাগল ওর পরিত্যক্ত হোভারক্রাফটের পিছনে। এক সেকেণ্ডে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল সব।

'দবিরকে তুলেছ?' হেলমেট মাইকে বলল রানা।

এখনও রেসের বোটের মত ছুটছে ওর হোভারক্রাফট, তীর গতি তুলে পিছিয়ে চলেছে। নাজমুলের হোভারক্রাফট দেখছে।

'জী, স্যর,' জবাব দিল কর্পোরাল। 'গাড়িতে উঠে পড়েছেন।'

'গুড।' স্বস্তির শ্বাস ফেলল রানা, আর তখনই শুনতে পেল গোলাগুলির আওয়াজ। ঝট করে বামদিকে চাইল।

চিনতে পারল ওই হোভারক্রাফট। ওটাই উড়িয়ে দিয়েছে দবিরের হোভারক্রাফটের এক পাশ। এখন একদিকের দরজা খুলে গেছে, ওখান থেকে বেরিয়ে এসেছে মেশিনগানের নল। ওটা গিমপি নামে পরিচিত, বড় ক্যালিবারের হেভি-ডিউটি অস্ত্র, বসে আছে একটা ট্রাইপডের উপর। মাযলের মুখ থেকে বেরুল তিন ফুটি লেলিহান আগুনের জিভ। কান ফাটা গর্জন ছাড়ছে অস্ত্রটা।

নাজমুলের হোভারক্রাফটের উপর মনের ঝাল ঝাড়ছে এসএএস কমাণ্ডো। ছিটকে উঠছে ফুলকি, হোভারক্রাফটের শরীর ফুটো করছে অজস্র বুলেট, ফেটে গেল নানা জায়গায়।

নাজমুলের যানের পিছন থেকে বেরুতে লাগল কালো ধোঁয়া। পরিষ্কার দেখা গেল, গতি কমতে শুরু করেছে।

'স্যর!' ব্যস্ত হয়ে জানাল নাজমুল, 'মস্ত সমস্যা!'

'আমি তোমার দিকেই আসছি, অপেক্ষা করো,' বলল রানা।

'গতি কমে আসছে, স্যর! ওজন কমাতে হবে, নইলে গতি

রাখতে পারব না!'

ঝড়ের গতিতে ভাবতে চাইছে রানা। ধু-ধু বরফ প্রান্তরে এখনও পিছিয়ে চলেছে। ওর ডানে নাজমুলের হোভারক্রাফট, বামদিকে ব্রিটিশ হোভারক্রাফট।

কয়েক সেকেণ্ড পর বলল রানা, 'মিস্টার হাবিব...'

'জী, ভাই?'

'স্টিয়ারিং নিন।'

'জী, ভাই?' চমকে গেছে হাবিব।

'এই জিনিস গাড়ির মতই, তফাৎ শুধু চট্ করে এদিক ওদিক নেয়া যায় না,' বলল রানা। ড্রাইভিং সিট থেকে সরে এসেছে।

ওই সিটে বসে পড়ল রাশেদ হাবিব। দুই হাতে শক্ত করে ধরল স্টিয়ারিং ইয়োক।

'এবার চোখ বন্ধ করুন,' নরম স্বরে বলল রানা।

'কেন, ভাই?'

'বন্ধ তো করুন চোখ,' আরও শান্ত হয়ে গেছে রানার কণ্ঠ। ডানহাতে তুলে ধরেছে এমপি-৫, ওর একপশলা গুলি উড়িয়ে দিল হোভারক্রাফটের উইণ্ডশিল্ড!

দুই হাতে চোখ ঢেকে ফেলেছে হাবিব, চারপাশে ঝরঝর করে পড়ছে কাঁচ। কয়েক সেকেণ্ড পর চোখ খুলে দেখল তুষারের মাঠের উপর দিয়ে আসছে দুটো হোভারক্রাফট।

'ঠিক আছে,' বলল রানা, 'হাবিব, এবার আমাকে নিয়ে চলুন কালো হোভারক্রাফটের সামনে।'

স্টিয়ারিং ইয়োকে সামান্য চাপ দিল হাবিব। মসৃণভাবে বামে সরল হোভারক্রাফট, চলে গেল ব্রিটিশ হোভারক্রাফটের সামনে। ওখান থেকেই মেশিনগান চালানো হচ্ছে নাজমুলের যানের উপর।

'ঠিক আছে, এখানেই রাখুন,' বলল রানা।

এমপি-৫-র শোল্ডার স্ট্র্যাপ গলা দিয়ে ঘুরিয়ে আনল ও,

হোলস্টার থেকে বের করল ডেযার্ট ঈগল অটোমেটিক পিস্তল, কক করে নিল।

'এবার, হাবিব, ব্রেক টিপে ধরুন।'

বিস্ময় নিয়ে ওর দিকে চাইল বিজ্ঞানী। 'কী বললেন?'

'যা বলছি করুন!'

এবার সে বুঝল রানা কী করতে চাইছে।

'হায় আল্লা! আপনি কি পাগল, ভাই?'

'আপনার মতই। যা বলছি করুন।'

'ঠিক আছে, মরলে আপনি মরবেন, আমি কিন্তু এসবে নেই।'

'দেরি করলে দু'জনই মরব।'

হতাশ হয়ে আস্তে করে মাথা দোলাল রাশেদ হাবিব, বড় করে শ্বাস নিল, তারপর দুই পায়ে প্রাণপণে টিপে ধরল ব্রেক প্যাডেল।

রানার হোভারক্রাফটের পিছিয়ে যাওয়া থেমে গেছে। নাক সামনে দিয়ে আছাড় খেল ব্রিটিশ হোভারক্রাফট। মুখোমুখি সংঘর্ষ হলো দুই হোভারক্রাফটের।

আগেই তৈরি ছিল রাশেদ হাবিব, শক্ত করে ধরেছে সিটের দু'পাশ। প্রবল ঝাঁকিটা সিটের ভিতর গেঁথে দিল তাকে। চোখ খুলে রেখেছে, নিজ চোখ বিশ্বাস করতে পারল না। ভাঙা উইণ্ডশিল্ডের ফাঁকা জায়গা দিয়ে বেরিয়ে গেছে মাসুদ রানা, চার পা সামনে বেড়ে উঠে পড়েছে শত্রু হোভারক্রাফটের নাকে!

দুই হোভারক্রাফটের নাক পরস্পরকে ছুঁয়ে আছে। তুমুল গতি তুলে ব্রিটিশদের হোভারক্রাফট সামনে বাড়ছে। পিছিয়ে চলেছে হাবিবেরটা।

কালো হোভারক্রাফটের হুডে সামনে বাড়ছে রানা। দিগন্ত থেকে পিঠে এসে লাগছে তুষার-কণা। এমপি-৫ দিয়ে এক পশলা গুলিবর্ষণ করল রানা ব্রিটিশ হোভারক্রাফটের উইণ্ডশিল্ডে। চুরচুর হয়ে ভেঙে পড়ল কাঁচ। রানা পরিষ্কার দেখল, ড্রাইভারের বুক

থেকে ফোয়ারার মত বেরুচ্ছে রক্ত।

কেবিনের ভিতর আরও দু'জন। যে-কোনও সময়ে অস্ত্র তাক করবে ওর উপর। লাফ দিয়ে হোভারক্রাফটের ছাতে উঠল রানা, এক সেকেণ্ড পর কেবিনের ভিতর থেকে এল কমপক্ষে পঞ্চাশটা গুলি।

কালো হোভারক্রাফটের ছাতে পা পিছলে যেতে দিয়েছে রানা, চলে এসেছে বাম পাশে। ওদিকে খোলা স্লাইডিং দরজা। ছাতে পেট রেখেই ঝুঁকে গেল, খোলা দরজার ফোকরে ভরে দিয়েছে এমপি-৫-এর মাযল। অন্ধের মত এদিক-ওদিক মাযল ঘুরিয়ে ট্রিগার টিপল।

এক মুহূর্তে শেষ হয়ে গেল অস্ত্রের ম্যাগাযিন। কান পেতে অপেক্ষা করছে রানা, মনে হলো না গুলির তোড়ে কেউ বাঁচতে পেরেছে। যদি বেঁচেও থাকে, যে-কোনও সময়ে পাল্টা গুলি শুরু করবে।

হোভারক্রাফটের ভিতর কোনও আওয়াজ নেই। থেমে গেছে ট্রাইপডে বসা মেশিনগান। আওয়াজ বলতে শুধু কানের পাশে হাওয়ার শোঁও-শোঁও মাতম।

ছাত থেকে নেমে এল রানা, খোলা স্লাইডিং দরজার জায়গাটা দিয়ে ঢুকে পড়ল হোভারক্রাফটের ভিতর। গুলিবর্ষণে মরেছে তিন এসএএস কমাণ্ডো। নিথর পড়ে আছে কেবিনের মেঝেতে, চারপাশ ভেসে যাচ্ছে রক্তে।

গা গুলিয়ে উঠল আঁশটে গন্ধে। ড্রাইভিং সিটে বসে পড়ল রানা, মাইকে বলল, 'মিস্টার হাবিব, আমার কথা শুনছেন?'

কমলা ফ্রেঞ্চ হোভারক্রাফটের ভিতর স্টিয়ারিং ইয়োক শক্ত করে ধরেছে রাশেদ হাবিব, সাদা হয়ে গেছে নখগুলো। তুমুল গতি তুলে পিছিয়ে চলেছে হোভারক্রাফট।

বড়সড় হেলমেটের মাইক্রোফোনে বলল হাবিব, 'শুনছি।'

'এবার ঘুরিয়ে নিন হোভারক্রাফট,' জানাল রানা। 'আপনি নাজমুলকে সাহায্য করবেন। কয়েকজনকে নামিয়ে দেবে ও, নইলে গতি হারাবে। দুই বা তিনজনকে নিজের হোভারক্রাফটে নেবেন।'

'আপনি ভাল করেই জানেন, ওই কাজ আমি পারব না,' বলল হাবিব।

'মিস্টার হাবিব...'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে...'

'আমি কি খুলে বলব কীভাবে...'

'না, লাগবে না,' অভিমান ভরে বলল হাবিব। 'আমিই পারব।'

'তা হলে তাই করুন। আমাকে অন্য কাজে যেতে হবে।'

দখল করা কালো হোভারক্রাফট বামে বাঁক নিতে শুরু করেছে। চলেছে নাজমুলের ক্ষতিগ্রস্ত যানের দিকে।

'ঠিক আছে,' নিজেকে বলল হাবিব। আগের চেয়ে শক্ত করে ধরেছে স্টিয়ারিং ইয়োক। 'হ্যাঁ, আমি পারি। নিজ চোখে দেখেছি মিস্টার রানা এমন করেছেন। উনি পারলে আমি কেন পারব না?'

এবার হোভারক্রাফটের গিয়ার নিউট্রাল করল সে। টের পেল, একটু একটু করে গতি কমছে।

'হ্যাঁ... এবার,' বলল হাবিব, 'এইবার দেখি...'

হ্যাঁচকা টানে ডানদিকে ইয়োক সরিয়ে নিল সে।

চরকির মত ঘুরতে শুরু করেছে হোভারক্রাফট।

'ওরেব্বাবা!' চিকন গলা বিকটভাবে ছাড়ল হাবিব। 'আল্লা-রসুলের দোহাই!'

পরক্ষণে এক শ' আশি ডিগ্রি ঘুরে গেল হোভারক্রাফট, সরাসরি সামনে চলেছে। মস্ত শ্বাস ফেলে স্টিয়ারিং ইয়োক সঠিক

দিকে ঠেলে দিল হাবিব। হঠাৎই যেন স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে ভেহিকেল। বিড়বিড় করে বলল হাবিব, 'গুলিস্তানে গোলাপ শাহ্‌র মাজার যিয়ারত করতে হবে!'

দুই সেকেণ্ড পর দরুদ পড়ে বুকে ফুঁ দিয়ে উঁচু গিয়ার ফেলল সে। জোরে জোরে বলল, 'আমি পারি! আমি সত্যিই পারি!'

'কংগ্র্যাচুলেশন্স,' কানের ভিতর রানার কণ্ঠ শুনল সে। 'হ্যাঁ, আপনি পারেন। চালিয়ে যান। কিন্তু এবার চলে আসুন। আপনার সাহায্য নাজমুলের দরকার।'

নাজমুলের হোভারক্রাফটের পাশে পৌঁছে গেছে রানা। প্রায় বিধ্বস্ত ওদের দুই যান, বডিতে অসংখ্য বুলেটের গর্ত। উইণ্ডশিল্ড নেই রানার হোভারক্রাফটের।

ওদের ঘিরে ঘুরছে অবশিষ্ট তিন ব্রিটিশ হোভারক্রাফট। কখনও চলে আসছে সামনে, কখনও পিছনে।

নাজমুলের হোভারক্রাফটের ডানে রানা, পাশাপাশি দুই দরজা। নাজমুলের ডানদিকের দরজা খোলা।

'ঠিক আছে, দু'জন পাঠিয়ে দাও আমার হোভারক্রাফটে!' জানিয়ে দিল রানা। 'চলে আসছেন হাবিব। উনি নেবেন আরও দু'জনকে।'

'জী, স্যর,' জবাব দিল নাজমুল।

ড্যাশবোর্ডের ক্রুজ কণ্ট্রোল বাটন টিপল রানা, দেরি না করে বেরিয়ে এল কেবিনে, থামল খোলা দরজার সামনে। পাশাপাশি ছুটছে দুই হোভারক্রাফট। ওদিকের দরজায় দাঁড়িয়েছে হোসেন আরাফাত দবির। দু'জনের মাঝে আট ফুট দূরত্ব। দবিরের সঙ্গে পিচ্চি মেরি ভিসার।

'এবার, নাজমুল!' হেলমেট মাইকে বলল রানা। সরে আসতে শুরু করেছে কর্পোরাল। 'আগে মেরিকে পাঠাও!'

নাজমুলের হোভারক্রাফটের স্কার্ট ঘেঁষে দাঁড়াল দবির। শক্ত করে ধরেছে মেরিকে। ভয়ে ফ্যাকাসে হয়ে গেছে বেচারি। বরফ-ঠাণ্ডা হাওয়ার ভিতর থরথর করে কাঁপছে।

নিজের স্কার্টে এসে দাঁড়াল রানা। বাড়িয়ে দিয়েছে দু'হাত। নরম স্বরে বলল, 'এসো, মেরি! আমি জানি তুমি পারবে!'

অনিশ্চিত ভাবে এক পা সামনে বাড়ল মেরি।

'হাত বাড়িয়ে দাও! হাত বাড়িয়ে লাফ দাও! ভয় নেই, আমি তোমাকে ধরে ফেলব!'

এবার লাফ দিল মেরি ভিসার।

ওটাকে লাফ না বলাই ভাল, যেন সামান্য লাফিয়ে একই জায়গায় থেমে গেছে।

ঝট্ করে সামনে বাড়ল রানা, খপ করে ধরে ফেলল মেয়েটির পারকা। ওকে নিয়ে এল কালো হোভারক্রাফটের কেবিনের ভিতর।

'ঠিক আছ তো?' জানতে চাইল রানা।

জবাব দেয়ার জন্য মুখ খুলল মেরি, আর ঠিক তখনই প্রচণ্ড ঝাঁকি খেল ওরা। তাল সামলাতে পারল না রানা ও মেরি, হুমড়ি খেয়ে পড়ল ডোরওয়েের উপর। চিকন স্বরে চিৎকার করে উঠেছে মেরি, খোলা দরজা দিয়ে পড়ে যেতে শুরু করেছে। কিন্তু শেষ সময়ে খপ্ করে মেয়েটির গ্লাভস পরা হাত ধরে ফেলল রানা।

ডানদিক থেকে ওদেরকে ধাক্কা দেয়া হয়েছে। ঝট্ করে ওদিকে চাইল রানা।

আরেকটা ব্রিটিশ হোভারক্রাফট্।

প্রায় ধাক্কা দিয়ে মেরিকে কেবিনের ভিতর পাঠিয়ে দিল রানা। নিজে তৈরি হয়ে গেছে পরবর্তী ধাক্কার জন্য।

কিন্তু নতুন কোনও গুঁতো এল না।

বদলে হোভারক্রাফটের কেবিনের ডানদিকটা তুবড়ে ভিতরের

দিকে ঢুকে গেল। ওদিকে বিস্ফোরিত হয়েছে কিছু।

মেঝের উপর টানা চিৎকার শুরু করেছে মেরি। ওর উপর ডাইভ দিল রানা, উড়ন্ত জঞ্জাল থেকে আড়াল দিতে চাইছে। ধোঁয়া ও ভাঙা টুকরোর ভিতর দিয়ে ওদিকে চোখ বোলাল।

কিন্তু ওখানে কোনও হোভারক্রাফট নেই। শুধু ধোঁয়া ও তাপ-প্রবাহ।

তারপর ধপ্ করে আওয়াজ শুনল রানা। বুট পরা একজোড়া পা নেমেছে ওর হোভারক্রাফটের স্কার্টে। আবারও একই আওয়াজ। গলা শুকিয়ে গেল রানার। ধোঁয়া ও তাপ-প্রবাহের ভিতর হাজির হয়েছে একাধিক লোক!

অস্ত্র বাগিয়ে ঢুকে পড়েছে কেবিনের ভিতর!

ছয়

কটু ধোঁয়া ও তাপ-প্রবাহের ভিতর দুই এসএএস কমাণ্ডো সামনে বাড়ছে। রানা পড়ে আছে মেঝেতে। ঢেকে রেখেছে মেরিকে। এবার ওকে গেঁথে ফেলবে তারা।

'স্যর! মাথা নিচু করুন!' রানার ইয়ারপিসে জোরালো শোনাল দবিরের কণ্ঠ।

মেরির মাথার পাশে মুখ গুঁজল রানা। কানের কাছে শুনল দুটো বুলেটের হুউস-হুউস আওয়াজ। ওর মাথার একটু উপর দিয়ে গেছে। ভারী পাথরের মত ধুপ্ করে পড়ল প্রথম এসএএস কমাণ্ডো। তার হৃৎপিণ্ড ফুটো করে দিয়েছে দবির।

দ্বিতীয় এসএএস কমাণ্ডো দ্বিধা করল। আর ওই এক সেকেণ্ড বড় দরকার ছিল রানার। ক্ষিপ্র বিড়ালের মত লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল ও, পরক্ষণে ঝাঁপিয়ে পড়ল লোকটার উপর। একইসঙ্গে হোভারক্রাফটের ড্যাশবোর্ডের উপর আছড়ে পড়ল ওরা।

শুরু হয়ে গেল হ্যাণ্ড-টু-হ্যাণ্ড কমব্যাট।

কয়েক সেকেণ্ড পর রানা টের পেল, বেদম মার খেতে শুরু করেছে। লোকটার ঘুষি পড়েছে ওর আহত ঘাড়ে, আরেকটা লেগেছে পাঁজরের খাঁচার উপর। মট্ আওয়াজ শুনেছে রানা, সকেট থেকে খুলে গেছে হাড়। ওকে কুঁজো করে দিয়েছে তীক্ষ্ণ ব্যথা। কলার ধরে ওকে টেনে তুলল এসএএস কমাণ্ডো, অন্য হাতে ধরেছে বেল্ট, দুই হাতে ছুঁড়ে ফেলে দিল ভাঙা উইণ্ডশিল্ডের ভিতর দিয়ে।

ধপ্ করে হোভারক্রাফটের হুডের উপর পড়ল রানা। সারা শরীরে টনটনে ব্যথা। শ্বাস নিতে পারছে না। কাশির সঙ্গে উঠে এসেছে তাজা রক্ত। এক সেকেণ্ড পর কেবিনের ভিতর অংশে চোখ গেল, লোকটা হোলস্টার থেকে বের করেছে সার্ভিস পিস্তল। ওটার দিকে চেয়ে হঠাৎ করে শ্বাস নিতে পারল রানা। মনে পড়ে গেল সব।

প্রচণ্ড গতিতে চলেছে হোভারক্রাফট।

ওকে খুন করতে চাইছে লোকটা।

যে-কোনও সময়ে মারা পড়বে ও।

যন্ত্রণায় ঝনঝন করছে সারা শরীর, কিন্তু দেহ গড়িয়ে দিল, নেমে যেতে চাইছে হোভারক্রাফটের নাক দিয়ে। চোখে পড়েছে, সামান্য দূরে নেমে গেছে কালো রাবারের স্কার্ট। নীচে সাঁই-সাঁই করে সত্তর মাইল বেগে পিছিয়ে চলেছে বরফের মাঠ।

এবার মৃত্যু অনিবার্য।

পড়ে যেতে যেতে হোভারক্রাফটের নাকের কাছে কী যেন খপ্

করে ধরতে চাইল রানা। কোম্পানির ইস্পাতের মনোগ্রাম। তুমুল গতিতে পিছিয়ে যাওয়া জমিটা স্পর্শ করছে ওর দুই পায়ের ডগা।

বিস্মিত এসএএস কমাণ্ডো চেয়ে আছে পড়ন্ত রানার দিকে। দুই সেকেণ্ড পর পিস্তল তুলল সে, মাযল তাক করল শত্রুর মাথার উপর।

মার খেয়ে বিশ্রীভাবে ফুলতে শুরু করেছে রানার মুখ, দাঁতের গোড়া থেকে বেরুচ্ছে রক্ত। হোভারক্রাফটের বেড়ে থাকা স্কার্টে ঝুঁকে আছে, চোখ তুলে চাইল এসএএস কমাণ্ডোর চোখে। রানার ঠোঁটে ঝুলছে মৃদু হাসি। দাঁত বের করে পাল্টা হাসল লোকটা, আরেকটু উঁচু করল পিস্তলের নল। এবার বাগে পেয়ে গেছে শত্রুকে।

ঠিক তখনই স্কার্টের নীচে মাথা সরিয়ে নিল রানা। বুম করে উঠল পিস্তল। স্কার্টের উপরে লেগে বিঙ্গিং! শব্দে বেরিয়ে গেল বুলেট। হোভারক্রাফটের নাক থেকে ঝুলছে রানা, ভর দিয়েছে ফুলে থাকা রাবার স্কার্টের উপর। তীব্র গতি তুলে সরসর করে পিছিয়ে চলেছে তুষার-জমিন।

হঠাৎ ধপ আওয়াজ পেল রানা। মুখ তুলে দেখল হুডের উপর উঠে এসেছে এসএএস কমাণ্ডো। অনেক ঝুঁকে এসেছে, হাসছে পিস্তল হাতে।

গুলি করবার জন্য অস্ত্র তাক করল লোকটা। রানা এখন মাত্র একটা কাজই করতে পারে। সেটাই করল। ফুলে থাকা রাবার স্কার্ট থেকে সরিয়ে নিল হাত। হারিয়ে গেল হোভারক্রাফটের নীচে।

টার্বোফ্যানের আওয়াজ ঝালাপালা করে দিল ওর কান। ঠং করে বরফের উপর পড়েছে হেলমেটের পিছন অংশ। মাথার উপর শোঁ-শোঁ মাতম তুলছে চারটে টার্বোফ্যান। রানা যেন আছে কোনও উইণ্ড টানেলে। বাতাস ভরা স্কার্টের পেট দেখল। ওখানে

বনবন করে ঘুরছে টার্বোফ্যান। এক সেকেণ্ড পর হোভারক্রাফটের নীচ থেকে বেরিয়ে এল। কান ফাটানো আওয়াজ আর নেই। হিম বরফের মাঠে চিত হয়ে পড়ে আছে, সামনে মেরিকে নিয়ে ছুটে যাচ্ছে ওর দখল করা হোভারক্রাফট।

রানা ঝট্ করে গড়ান দিয়ে উপুড় হলো, বেল্ট থেকে খুলে নিয়েছে ম্যাগহুক। তাক করেছে ছুটন্ত হোভারক্রাফটের লেজ লক্ষ্য করে। পরক্ষণে টিপে দিল ট্রিগার।

বাতাস চিরে ছুটছে ম্যাকহুকের বাল্বের মত ম্যাগনেটিক হেড। পিছনে মহাব্যস্ত হয়ে ছুটছে দড়ি। হোভারক্রাফটের স্কার্টের একটু উপরে কেবিনের ধাতব গায়ে ঢং করে আটকে গেল হেড। ভয়ঙ্কর জোর টান খেল রানা, পরক্ষণে সরসর করে রওনা হয়ে গেল সত্তর মাইল স্পিডে।

হোভারক্রাফট টেনে হেঁচড়ে নিয়ে চলেছে ওকে। যেন পানিতে পড়া স্কিয়ার ও, প্রাণপণ চাইছে উঠে দাঁড়াতে। আর ঠিক তখনই চারপাশের জমিতে নাক গুঁজল একের পর এক বুলেট।

কাঁধের উপর দিয়ে পিছনে চাইল রানা।

পিছনে হাজির হয়েছে দ্বিতীয় ব্রিটিশ হোভারক্রাফট!

দ্রুত আসছে পিষে দেয়ার জন্য।

গড়ান দিয়ে চিত হলো রানা, বজ্র মুষ্ঠিতে ধরেছে ম্যাকহুক। ওকে টেনে নিয়ে চলেছে প্রথম হোভারক্রাফট। অন্য হাতে ডেযার্ট ঈগল বের করল, গুলি করল ধেয়ে আসা হোভারক্রাফট লক্ষ্য করে। বুম! বুম! আওয়াজ তুলছে ডেযার্ট ঈগল। হোভারক্রাফটের স্কার্টে বড় কয়েকটা গর্ত তৈরি করল।

তাতে কমছে না গতি।

প্রায় বুকের কাছে চলে এসেছে।

এবার পেটের ভিতর ভরবে, ধীরেসুস্থে কমাবে গতি। নীচের ধারালো টার্বোফ্যান কুচি করবে ওকে।

টার্বোফ্যান... দ্রুত ভাবতে চাইছে রানা। এমন কিছু দরকার, যেটা... এমন কিছু যা...

হেলমেট!

প্রথম হোভারক্রাফট টেনে নিচ্ছে ওকে, ঝট করে হোলস্টারে পিস্তল গুঁজল রানা, টান দিয়ে খুলে ফেলল হেলমেট।

যা করবার প্রথমবারে। ছিটকে উপরে উঠতে হবে হেলমেট, ঠিকভাবে লাগাতে হবে সামনের হোভারক্রাফটের ফ্যানের ব্লেডে।

হেলমেট ছুঁড়ে মারল রানা।

বাতাসে ভেসে উঠল ওটা, যেন চিরকাল ধরেই ভাসছে, তারপর বরফে পড়েই আবারও লাফিয়ে উঠল, আর ঠিক তখনই ওটার উপর দিয়ে পেরুল হোভারক্রাফট।

সামনের ফ্যানে লেগেছে হেলমেট, ভাবল রানা। ঠিক তখনই ভয়ঙ্কর ঝাঁকি খেল হোভারক্রাফট। চোখের পলকে উল্টে গেল, ডিগবাজি শুরু করেছে সত্তর মাইল বেগে। কয়েক সেকেণ্ড পর ধুম করে পড়ল— মেঝে হয়েছে ছাত, বরফ ছাওয়া প্রান্তরের উপর দিয়ে মসৃণভাবে চলেছে। পায়ের উপর দিয়ে চেয়ে আছে রানা। ওকে পঞ্চাশ গজ ধাওয়া করে থামল বিধ্বস্ত হোভারক্রাফট। দেখতে না দেখতে পিছনে পড়ে গেল জঞ্জাল।

আবারও উপুড় হলো রানা, শক্ত বরফ জমির উপর জোর ঝাঁকি খেয়ে ছুটে চলেছে। গতি আরও অনেক বেড়েছে সামনের হোভারক্রাফটের। চোখে-মুখে এসে পড়ছে অসংখ্য বরফ-কণা।

ম্যাকহুকের কালো বাটন টিপল রানা, ওটাই টেনে নেবে দড়ি। এখন উল্টো ওকে টানছে হোভারক্রাফটের দিকে ম্যাগনেটিক হুক। একমিনিট পেরুবার আগেই কালো রাবারের স্কার্টের কাছে পৌঁছে গেল রানা। পিছনের টার্বোফ্যান থেকে প্রচণ্ড হাওয়া মুখে এসে লাগছে। এসব পাত্তা দিল না রানা, স্কার্টের উপরে দড়ি বাঁধবার স্টাড আঁকড়ে ধরল, হোভারক্রাফটের উপর

টেনে তুলল নিজেকে।

পরের পাঁচ সেকেণ্ডে পৌঁছে গেল বামদিকের সাইড ডোরওয়েের সামনে, ঢুকে পড়ল কেবিনের ভিতর। এইমাত্র মুখে চড় খেয়ে মেঝের উপর ছিটকে পড়েছে মেরি। বেচারির পেটের উপর নামিয়ে আনবার জন্য পা তুলেছে এসএএস কমাণ্ডো।

'অ্যাই!' গর্জে উঠল রানা।

ঝট্ করে ঘুরে চাইল কমাণ্ডো, মুহূর্তে খিঁচিয়ে ফেলল মুখ।

'মেরি,' নরম স্বরে বলল রানা, চোখ সরাল না লোকটার উপর থেকে, 'চোখ বুজে ফেলো।'

দুই হাতে চোখ ঢাকল মেয়েটি।

দীর্ঘ কয়েক মুহূর্ত শত্রুর দিকে চাইল এসএএস কমাণ্ডো। পরস্পরকে দেখছে ওরা। তুমুল গতি তুলে ছুটছে কালো হোভারক্রাফট। ওরা যেন বুনো পশ্চিমের দুই দুর্ধর্ষ গানম্যান, মুখোমুখি হয়েছে কোনও সেলুনের সামনে।

তারপর হঠাৎ করেই পিস্তলে ছোঁ দিল ব্রিটিশ লোকটা।

একই কাজ করেছে রানাও।

ঝটকা খেয়ে বেরিয়ে এল দুই পিস্তল, কিন্তু মাত্র একটা গুলির আওয়াজ হলো।

সাত

'এবার চোখ খুলতে পারো, মেরি,' নরম স্বরে বলল কে যেন।

মৃত এসএএস কমাণ্ডোর লাশ এড়িয়ে সামনে বাড়ল রানা,

এক হাঁটু গেড়ে বসল মেরির পাশে।

খুব ধীরে চোখ মেলল মেয়েটা।

ওর বাম গালে রক্ত জমে গেছে চড়ের কারণে। রানা আস্তে করে জানতে চাইল, 'ঠিক আছ?'

'না,' দুই চোখ থেকে টপটপ করে বেরুল অশ্রু। পকেট থেকে বের করল অ্যাজমার পাফার, ওটার ভিতর দু'বার ফুঁপিয়ে উঠে শ্বাস নিল।

'আমার অবস্থাও ভাল না,' হতাশ হয়ে বলল রানা। মেরির হাত থেকে পাফার নিল, কয়েকবার দম নিয়ে আনমনে ওটা রেখে দিল পকেটে।

চুপ করে পড়ে আছে মেরি। উঠে দাঁড়িয়ে স্টিয়ারিং হুইল ধরল রানা, বসে পড়েছে ড্রাইভিং সিটে। ডেযার্ট ঈগলের পেট থেকে খালি ম্যাগাযিন বের করল, নতুন ক্লিপ আটকে নিল।

ওর পাশে এসে থেমেছে মেরি, কাঁপা স্বরে বলল, 'আপনি যখন... চলে গেলেন হোভারক্রাফটের নীচে... আমি ভাবলাম... ভাবলাম আপনি মরে গেছেন!'

হোলস্টারে রেখে দিল রানা পিস্তল। মুখ তুলে চাইল মেরির দিকে। গাল বেয়ে দরদর করে নামছে মেয়েটির অশ্রু।

'আমি কি মরতে পারি, বলো?' হাসল রানা। 'আমিই তো এই সিনেমার নায়ক!'

নিঃশব্দে কাঁদছে মেরি, অবশ্য এক মুহূর্ত পর হেসে ফেলল। ওর হাসি দেখে রানাও হাসল।

ওকে অবাক করে বুকে মুখ গুঁজল মেরি। বোঝা গেল না, হাসছে না কাঁদছে। ওর পিঠে আদরের চাপড় দিল রানা। এক সেকেণ্ড পর বিস্মিত হয়ে ভাবল, ওই আওয়াজ কীসের!

আগে ছিল না। জোর আওয়াজ। ছন্দবদ্ধ। আছড়ে পড়বার মত।

বুম!

বুম!

বুম!

আওয়াজটা যেন ঠিক... মস্ত ঢেউ আছড়ে পড়বার মত!

চমকে গেছে রানা, বুঝে গেছে ওরা কোথায়। খুব কাছে ক্লিফ। হোভারক্রাফট নিয়ে নানা দিকে ছুটতে গিয়ে চলে এসেছে ওরা তিন শ' ফুটি ক্লিফের পাশে।

তিন শ' ফুট নীচে উপসাগর!

দানবীয় সব ঢেউ আছড়ে পড়ছে বরফের ক্লিফের উপর!

ওর বুকে মুখ গুঁজে আছে মেরি, কিন্তু চোখের কোণে কী যেন দেখল রানা। ব্রিটিশ হোভারক্রাফটের ড্যাশবোর্ডের দেয়ালে ছোট এক কমপার্টমেন্ট, খুলে গেছে দরজা। ভিতরে দুটো রুপালি ক্যানিস্টার। একেকটা ক্যানিস্টার প্রায় এক ফুটি। মাঝে সবুজ ফিতার মত রঙে স্ট্যানসিল করা অক্ষর:

ট্রাইটোনাল ৮০/২০।

ট্রাইটোনাল ৮০/২০? অবাক হয়ে ভাবল রানা। এই জিনিস উইলকক্স আইস স্টেশনে কেন এনেছে ব্রিটিশরা?

ট্রাইটোনাল ৮০/২০ হাইলি কনসেন্ট্রেটেড এক্সপ্লোসিভ। খুবই দাহ্য বিস্ফোরক, আকাশ থেকে বোমার মত করে ফেলা হয়। ট্রাইটোনাল নিউক্লিয়ার বোমা নয়, কিন্তু ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণ তৈরি করে, চারপাশে ছড়িয়ে পড়ে বিপুল তাপ। রানা যে ক্যানিস্টার দেখছে, তার ভিতর আছে এক কিলোগ্রাম বিস্ফোরক। মাঝারি কোনও বাড়ি মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেয়ার জন্য যথেষ্ট।

আরেকবার মেরির পিঠ চাপড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াল রানা, চলে গেল ড্যাশবোর্ডের কমপার্টমেন্টের সামনে। বের করে নিল রুপালি-সবুজ একটা ক্যানিস্টার। আবারও ফিরল মেরির পাশে। 'এখন ঠিক আছ তো?'

'তাই তো মনে হয়,' হাসতে চাইল মেরি।

'গুড।' দেড় হাতি থাই পকেটে ট্রাইটোনাল ভরে রাখল রানা। 'তা হলে এবার ফিরতে হবে...'

কোথা থেকে এমন জোর ধাক্কা এল রানা জানে না। আরেকটু হলে পা ফস্কে পড়েই যেত মেঝেতে।

বামদিকে হড়কে সরে গেছে ওদের হোভারক্রাফট।

ডানদিকে চাইতেই চমকে গেল রানা। খোলা দরজার ওপাশে অবশিষ্ট দুই ব্রিটিশ হোভারক্রাফটের একটা!

আবারও গুঁতো দিল ওটা।

এতই জোরে, বামে সরে গেল ওর হোভারক্রাফট।

চট্ করে বামে চাইল রানা, চমকে গেছে। বুঝতে দেরি হয়নি এরা কী কাজে ব্যস্ত।

'সর্বনাশ!' বিড়বিড় করে বলল।

আবারও ধাক্কা দিয়েছে ব্রিটিশ হোভারক্রাফট। এবার আরও জোরে। পিছলে বামে সরছে রানার হোভারক্রাফট।

বিধ্বস্ত উইণ্ডশিল্ডের ভিতর দিয়ে দূরে চোখ গেল রানার। তীব্র গতিতে পিছিয়ে চলেছে বরফের প্রান্তর। কিন্তু বামে হঠাৎ করেই হারিয়ে গেছে তুষার-জমি। ওপাশে আর কিছুই নেই।

ক্লিফের শেষ প্রান্তে পৌঁছে গেছে ওরা!

একেক ধাক্কা ওদেরকে নিয়ে যাচ্ছে খাতের পাশে।

ওদিকে তিন শ' ফুট নীচে...

স্টিয়ারিং হুইল নিয়ে কুস্তি শুরু করল রানা, উল্টো গুঁতো মেরে সরে যেতে চাইছে। কিন্তু অপেক্ষাকৃত ভারী ব্রিটিশ হোভারক্রাফট মোটেও সরছে না।

কোথাও যাওয়ার নেই রানার।

ডানদিকের পথ বন্ধ। আবারও সামনের দিকে চাইল রানা। মাত্র দশ গজ বামে পিছিয়ে চলেছে ক্লিফের কিনারা। নীচে

ঢেউয়ের মাথায় সাদা ফেনা। একবার পড়লে...

হঠাৎ আরেকটা জোরালো ধাক্কা ওদেরকে সরিয়ে দিল আরও বামে। আট গজ দূরে কিনারা!

আরও কয়েক ধাক্কা খেলে... ভাবল রানা। দ্রুত মগজ চালাতে চাইছে। চট্ করে মনে পড়ে গেল হেলমেট মাইকের কথা, সাহায্য চাইতে হবে।

কিন্তু হেলমেটই তো নেই!

কারও সঙ্গে কথা বলতে পারবে না ও!

আরেকটা ধাক্কা লাগল। এবার আগের চেয়েও জোরে।

বামে সরে গেল হোভারক্রাফট।

মাত্র পাঁচ গজ দূরে কিনারা।

ডানদিকে চাইল রানা। ওদিকে হোভারক্রাফটের পাশে বড় গর্ত। ওদিক দিয়ে দেখা গেল, বরফের উপর দিয়ে ছুটে চলেছে কালো হোভারক্রাফট। দুই যানের মাঝে দূরত্ব তৈরি করছে। কিন্তু এক সেকেণ্ড পর দ্রুত সরে এল ধাক্কা দেয়ার জন্য।

সংঘর্ষ হলো দুই হোভারক্রাফটের। রানা টের পেল, ভীষণ দুলে উঠেছে ওর হোভারক্রাফট। আরও কয়েক ফুট সরে গেছে কিনারার দিকে।

মাত্র দুই গজ দূরে খাড়া পতন।

উঁচু ক্লিফের মাথায় তীব্র গতি তুলে ছুটছে দুই হোভারক্রাফট। তিন শ' ফুট নীচে দক্ষিণ সাগরের দানবীয় কালো ঢেউ।

ডানে চাইল রানা। পাশে ছুটছে ব্রিটিশ হোভারক্রাফট।

আবারও সরে গেছে, নতুন করে ধাক্কা দেবে। এই সুযোগে ডানে সরতে চাইল রানা। তারই ফাঁকে দেখল পিছন থেকে আসছে আরেকটা হোভারক্রাফট।

স্টিয়ারিং হুইল ঘোরাবার ফাঁকে চেয়ে রইল রানা। একটা কমলা হোভারক্রাফট। কিন্তু কমলা রঙের কেন?

তার মানেই ফ্রেঞ্চ... ওটার ভিতর থাকবার কথা...

রাশেদ হাবিবের!

দেখতে না দেখতে নাটকীয়ভাবে হাজির হলো বাঙালি বিজ্ঞানী, ব্রিটিশ হোভারক্রাফটের পাশে পৌঁছে গেছে। এখন তিন হোভারক্রাফট পাশাপাশি ছুটছে ক্লিফের কিনারে!

হঠাৎ করেই সরে এসে রানার যানকে ধাক্কা দিল ব্রিটিশ হোভারক্রাফট।

রানার স্কার্ট বেরিয়ে গেল কিনারা থেকে। ঝরঝর করে পড়তে শুরু করেছে আলগা সব বড় তুষার খণ্ড। চোখের সামনে ওগুলো ছোট হয়ে গেল, কয়েক সেকেণ্ড পর হারিয়ে গেল তিন শ' ফুট নীচের দানবীয় ঢেউয়ের ভিতর।

'মেরি, এসো!' খপ্ করে মেয়েটির হাত ধরল রানা।

'আমরা এবার কী করব?' আবারও কাঁদতে শুরু করেছে মেরি।

'কোনও ভয় নেই, হোভারক্রাফট থেকে নামব,' বলল রানা।

হোভারক্রাফটের ডানদিকের গর্তের দিকে ঠেলল মেরিকে। আবারও সরে গেছে ব্রিটিশ হোভারক্রাফট, শেষ ধাক্কা দেয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে।

অজান্তেই বড় করে ঢোক গিলল রানা। ওকে একেবারে সঠিক সময়ে...

ডেযার্ট ঈগল পিস্তল বের করল ও।

পাশ থেকে ওদের দিকে সরে আসছে ব্রিটিশ হোভারক্রাফট।

জোর ধাক্কা লাগল দুই হোভারক্রাফটে, আর ঠিক তখনই এক লাফে ব্রিটিশ হোভারক্রাফটের স্কার্টে উঠল রানা, বামহাতে জড়িয়ে এনেছে মেরিকে।

ঝট্ করে ঘুরে চাইল রানা, কিনারা পেরুল ওদের পরিত্যক্ত হোভারক্রাফট। মনে হলো দীর্ঘক্ষণ ঝুলে রইল আকাশে, তারপর

হঠাৎ করেই গতি পেল— রওনা হয়ে গেল নীচে! কয়েক মুহূর্ত পর আছড়ে পড়ল সাগরের বুকে, হাজার টুকরো হলো সব।

ওদিকে দেখবার সময় নেই রানার, মেরিকে নিয়ে সরছে। পাঁচ সেকেণ্ডে উঠে পড়ল ব্রিটিশ হোভারক্রাফটের ছাতে। পিস্তল তাক করল ছাতের উপর, দেরি না করে তিনবার গুলি করল। জানের ভয়ে একদিকে সরছে ব্রিটিশ কমাণ্ডোরা। হোভারক্রাফট নিয়ে সামনে চলে এসেছে রাশেদ হাবিব।

রানা ও মেরি ব্রিটিশ হোভারক্রাফটের স্কার্টে উঠতেই কাছে চলে এসেছে সে। এবার সরে এল পাশে। মেরিকে নিয়ে সাবধানে হাবিবের হোভারক্রাফটের স্কার্টে নামল রানা। কয়েক সেকেণ্ড পর ব্রিটিশ যান থেকে সরে যেতে লাগল কমলা হোভারক্রাফট।

ঘুরে চাইল রানা, ব্রিটিশ হোভারক্রাফটের উইণ্ডশিল্ডে নক্ষত্রের মত লাল দাগ। মারা পড়েছে ড্রাইভার। কিন্তু কেবিনের ভিতর কে যেন নড়ছে। বোধহয় ধরতে চাইছে স্টিয়ারিং হুইল।

কিন্তু অনেক দেরি করে ফেলেছে সে।

রানার মনে হলো, র‍্যাম্প বেয়ে উড়াল দিল স্টাণ্ট গাড়ি, ছিটকে কিনারা পেরুল ব্রিটিশ হোভারক্রাফট। উপরের দিকে উঠছে, তারপর মাধ্যাকর্ষণ টেনে ধরল ওটাকে। সাঁই-সাঁই করে নীচে রওনা হলো। তার আগে কিনারা পেরুনোর সময় হোভারক্রাফটে একটা ভীত মুখ দেখেছে রানা।

ঘুরে দাঁড়াল ও, কমলা হোভারক্রাফটের সাইড ডোর খুলে গেছে। উদয় হয়েছে রাশেদ হাবিবের উদ্ভাসিত হাসিমুখ।

'আপনার কী মনে হয়, ভালই চালাই?' গর্ব ভরে জানতে চাইল।

আর মাত্র একটা ব্রিটিশ হোভারক্রাফট রয়ে গেছে। ওটার বিরুদ্ধে রানাদের হোভারক্রাফট দুটো। বাধ্য হয়ে বেশ দূরত্ব বজায় রাখছে এসএএস কমাণ্ডোরা।

খপ্ করে হাবিবের মাথার হেলমেট দখল করল রানা, নিজে পরে নিল মাথায়। মাইক চালু করল, 'নাজমুল, শুনছ?'

'জী, স্যর।'

'সবাই ঠিক?'

'কমবেশি সবাই ভাল, স্যর।'

'হোভারক্রাফটের কী অবস্থা?' জানতে চাইল রানা।

'বেদম মার খেয়েছে, স্যর, অবশ্য এখনও ঠিকভাবেই চলছে। আবারও পুরো পাওয়ার পেয়েছি।'

'গুড,' বলল রানা। 'এবার শোনো, শেষ হোভারক্রাফট বাধা না দিলে ম্যাকমার্ডোর দিকে যেতে পারবে?'

'জী, স্যর।'

'ঠিক আছে,' মেরির দিকে চাইল রানা। 'অপেক্ষা করো। আরেকজন যাত্রী পাবে।'

রাশেদ হাবিবের দিকে চাইল রানা।

বুঝে গেল বিজ্ঞানী, আবারও হোভারক্রাফট নিয়ে তাকে যেতে হবে নাজমুলের যানের পাশে। যাত্রীবাহী হোভারক্রাফট রওনা হবে ম্যাকমার্ডো লক্ষ্য করে। আর এদিকে মাসুদ রানা আর ও লড়বে শেষ ব্রিটিশ হোভারক্রাফটের বিরুদ্ধে।

দু' মিনিট পর পাশাপাশি ছুটতে লাগল দুই হোভারক্রাফট। সাইড দরজা খুলে গেছে দুটোরই।

নাজমুলের হোভারক্রাফটের দরজায় এসে দাঁড়াল হোসেন আরাফাত দবির। কমলা যানের দরজায় মেরিকে নিয়ে দাঁড়াল রানা। যেন দুই দেশের সীমান্তে বন্দি বিনিময় হবে।

ওদের শ'-দুয়েক গজ পিছনে শেষ ব্রিটিশ হোভারক্রাফট।

'ঠিক আছে, স্যর,' রানার ইয়ারপিসে বলল দবির।

'তুমি তৈরি তো?' মেরির কাছে জানতে চাইল রানা।

'হ্যাঁ... আচ্ছা।'

পাশাপাশি স্কার্টে পা রাখল রানা ও মেরি।

যাত্রীবাহী হোভারক্রাফটের কেবিন থেকে ব্রিটিশ যানের উপর চোখ রেখেছে কর্পোরাল নাজমুল। ওটা থেকে তীক্ষ্ণ নজর রাখছে এসএএস কমাণ্ডোরা, অবশ্য চুপ করে সরে আছে দূরে।

'হারামজাদারা কী করছে?' আনমনে বলল নাজমুল।

'ঠিক আছে, স্যর, এবার ওকে এদিকে পা রাখতে বলুন!' চেঁচাল দবির।

মেরিকে নিয়ে সামনে বাড়ল রানা, হু-হু হাওয়া উড়িয়ে নিতে চাইছে ওদেরকে।

পাশের হোভারক্রাফটের স্কার্টে পা রেখেছে দবির। হাত বাড়িয়ে দিয়েছে মেরিকে টেনে নিতে। পিছন থেকে মেয়েটির দুই হাত ধরেছে রানা। সামনের স্কার্টে পা রাখতে চাইল মেরি, এবার উঠে পড়বে যাত্রীবাহী হোভারক্রাফটে।

কিন্তু ঠিক তখনই হেলমেট ইণ্টারকমে রানা শুনল নাজমুলের চিৎকার:

'কুকুরের বাচ্চা ব্রিটিশগুলো... রকেট মারছে!'

একইসঙ্গে ওদিকে ঘুরে চাইল রানা ও দবির।

প্রথমে ধোঁয়ার লেজ দেখল ওরা।

ঘুরতে ঘুরতে আসছে ধোঁয়া। সরু, সাদা, বাষ্পের মত।

ওটার সামনে উড়ে আসছে রকেট।

শেষ হোভারক্রাফট থেকে আসছে ওটা।

মিলান অ্যাণ্টি-ট্যাঙ্ক মিসাইল। নিচু হয়ে উড়ে আসছে। বরফ মাঠ থেকে তিন ফুট উপরে। দেখতে না দেখতে সব দূরত্ব গিলে নিয়ে পৌঁছে গেল, নাক গুঁজল কমলা হোভারক্রাফটের পিছনে, সঙ্গে সঙ্গে ডেটোনেট হলো।

ভয়ঙ্কর ভাবে ঝাঁকি খেয়েছে ফ্রেঞ্চ হোভারক্রাফট, রানার হাত

থেকে ছুটে গেছে মেরি। কেবিনের ভিতর চিত হয়ে পড়ল রানা। তার আগে দেখেছে দবিরকে, সে লাফ দিয়ে সামনে বেড়েছে, নিজে পড়তে শুরু করেছে— তাও পাগলের মত চাইছে মেরির হাত ধরতে।

তারপর দুই হোভারক্রাফটের মাঝে পড়ে গেল ওরা দু'জন!

পা পিছলে পড়ছে মেরি ও দবির।

এক পলকের জন্য কালো স্কার্ট দেখল দবির, তারপর পড়ে গেল দুই হোভারক্রাফটের মাঝের সরু ফাঁকে।

তার আগে মেরির হাত খপ করে ধরেছে, বুকের উপর তুলে নিয়েছে বেচারিকে। আছড়ে পড়বার বেদম ব্যথা শুধু নিজের জন্য রেখেছে।

মাত্র এক সেকেণ্ড পর বুকে মেরিকে নিয়ে ধড়াস্ করে পড়ল পিছিয়ে যাওয়া জমাট বরফের উপর!

'সার্জেন্ট দবির পড়ে গেছেন!' রানার ইয়ারপিসে চেঁচিয়ে উঠল নাজুমল। 'সঙ্গে গেছে ছোট মেয়েটাও!'

বরফের মাঠে দিগ্বিদিক হারিয়ে ছুটছে কমলা হোভারক্রাফট। কারও নিয়ন্ত্রণ নেই ওটার উপর।

মিসাইল লাগতে উড়ে গেছে পিছনের ফ্যান ও অর্ধেক রাডার। মাছের লেজের মত নড়ছে হোভারক্রাফট, আবারও রওনা হয়েছে বামের ক্লিফের দিকে!

স্টিয়ারিং ইয়োক নিয়ে লড়ছে রাশেদ হাবিব। কিন্তু অর্ধেক হাল নষ্ট হওয়ায় এখন শুধু বামদিকে সরছে হোভারক্রাফট। গায়ের জোরে ইয়োক ঠেলছে হাবিব। কয়েক সেকেণ্ড পর খুব ধীরে সাড়া দিল হোভারক্রাফট। সরছে ক্লিফের কিনারা থেকে। আবার রওনা দিয়েছে উইলকক্স আইস স্টেশনের দিকে!

'নাজমুল!' হেলমেট মাইকে বলল রানা। হাবিব প্রায় নিয়ন্ত্রণ ফিরে পেয়েছে হোভারক্রাফটের, সেদিকে ওর খেয়াল নেই।

'জী, স্যর?'

'ভাগো!'

'কী বললেন, স্যর?'

'আমাদের হোভারক্রাফট এখন বাতিল মাল,' বলল রানা। 'আর কিছু করার নেই। রওনা হয়ে যাও! সোজা ম্যাকমার্ডো স্টেশন যাবে। সাহায্য নিয়ে ফিরবে। তুমি আমাদের একমাত্র ভরসা।'

'কিন্তু আপনাদের কী হবে, স্যর?'

'যাও!'

'জী, স্যর।'

এক সেকেণ্ড পর রাশেদ হাবিব বলল, 'ইয়ে, মেজর...'

শুনছে না রানা। চেয়ে আছে নাজমুলের হোভারক্রাফটের দিকে। উল্টো দিকে চলেছে ওটা তুষার ঝড়ের ভিতর। কয়েক সেকেণ্ড পর পাশের জানালা দিয়ে চাইল রানা। দূরে বরফের ভিতর কালো ছোট একটি স্তূপ।

ওটা দবির ও মেরি।

'মেজর...'

ঘুরে চাইল রানা। দবির ও মেরির দিকে চলেছে ব্রিটিশ হোভারক্রাফট। কিছুক্ষণ পর থেমে গেল। নেমে পড়েছে কালো পোশাক পরা লোক।

'আর কিছু করার নেই,' বিড়বিড় করে বলল রানা।

ওর পাশে স্টিয়ারিং ইয়োকের সঙ্গে কুস্তি লড়ছে হাবিব। 'মেজর! কিছু ধরুন!'

ইয়োক আরও শক্ত করে ধরেছে হাবিব। আর ঠিক তখনই মট্ করে ভেঙে গেল ওটা। চরকির মত বামে ঘুরল

হোভারক্রাফট। পিছন দিকে ছুটছে।

'এসব কী করছেন?' বেশ রাগ নিয়ে জানতে চাইল রানা।

'আমি সামলাতে চাইছিলাম,' চেঁচাল হাবিব। আঙুল তুলে দেখিয়ে দিল হোভারক্রাফটের ভেঙে পড়া পিছন দিক।

হাবিবের আঙুল অনুসরণ করল রানা। বিস্ফারিত হলো দুই চোখ।

রিভার্সে ছুটছে হোভারক্রাফট, আবারও পৌঁছে গেছে ক্লিফের কিনারায়!

'আজকের দিন শেষ হবে না?' হতাশ হয়ে বলল রানা।

'নিশ্চই, এই তো এখন মজা করে মরব,' শুকনো স্বরে জানাল হাবিব।

তাকে ধাক্কা দিয়ে ড্রাইভিং সিট থেকে সরিয়ে দিল রানা, নিজে বসল ওখানে। পাম্প করতে শুরু করেছে ব্রেক পেডেল।

কিন্তু ভচ্ করে বডির সঙ্গে বসে গেল পেডেল। আর কখনও ব্রেক কষবে না।

তুমুল গতি তুলে পিছিয়ে চলেছে হোভারক্রাফট।

'ওই কাজ তো আমিও করেছি, ভাই!' বলল হাবিব, 'ব্রেক নেই!'

ক্লিফের কিনারার দিকে ফিরছে ওরা। কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই হোভারক্রাফটের উপর।

ভাঙা স্টিয়ারিং ইয়োক খপ্ করে ধরল রানা। এদিক-ওদিক নাড়ছে, কিন্তু কোনও ইতিবাচক সাড়া নেই।

এত উপর থেকে নীচের সাগরে গিয়ে পড়লে...

দেখতে না দেখতে চলে আসছে কিনারা!

তারপর হঠাৎ করেই নীচে কোনও জমিই থাকল না, পেটের ভিতর বেদম জোরালো মোচড় টের পেল রানা। ক্লিফ ছেড়ে আকাশে উড়াল দিয়েছে ওদের হোভারক্রাফট!

পিছন অংশ সামনে রেখে আকাশে ভেসে উঠেছে ওটার নাক, পেরিয়ে গেছে কিনারা।

কেবিনের ভিতর ঝট্ করে ড্রাইভিং সিট ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে রানা, উঁকি দিয়েছে ভাঙা উইণ্ডশিল্ড দিয়ে। শিরিষ কাগজের মত শুকিয়ে গেছে গলা, ক্লিফের কিনারা দেখতে না দেখতে দূরে সরছে!

ওর পাশের সিটে রাশেদ হাবিব, ফুঁপিয়ে চলেছে। 'আমরা মরে যাচ্ছি, মেজর রানা! আমরা সত্যিই মরে যাব!'

শুনবার সময় কই রানার, খাড়া হয়ে উঠেছে হোভারক্রাফট, সামনের দিক নাক তুলেছে উপরের দিকে। আকাশ ছাড়া কিছুই দেখা গেল না।

পাথরের মত নেমে চলেছে হোভারক্রাফট।

পাশের জানালা দিয়ে বাইরে চাইল রানা, সাঁই-সাঁই করে ওদেরকে পাশ কাটাচ্ছে খাড়া ক্লিফের দেয়ালটা!

খপ্ করে ম্যাগহুক তুলে নিল রানা, নাক নামিয়ে আনল হাবিবের নাকের আধ ইঞ্চি দূরে, ধমকে উঠল, 'কোমর জড়িয়ে ধরুন! ছাড়বেন না!'

ফুঁপিয়ে ওঠা বাদ দিয়ে অবাক হয়ে চাইল হাবিব, এক সেকেণ্ড পর মোটা অজগরের মত ভয়ঙ্কর ভাবে পেঁচিয়ে ধরল কোমর। ওদিকে খেয়াল নেই রানার, মাথার উপর ম্যাগহুক তুলেছে, ফায়ার করল ভাঙা উইণ্ডশিল্ডের ভিতর দিয়ে। খুব দ্রুত নীচে পড়ছে হোভারক্রাফট।

আকাশে ছিটকে উঠেছে ম্যাগহুকের আঁকশি, অর্ধেক পথ গিয়ে খুলে গেল ইস্পাতের গ্র্যাপলিং হুক। পিছনে সরসর করে ছুটছে দড়ি। এক সেকেণ্ড পর ক্লিফের কিনারা পেরুল গ্র্যাপলিং হুক, ওদিকে পড়েই আবারও ফিরতে লাগল। আঁচড়ে আনছে তুষার।

ক্লিফের পাশে নামছে হোভারক্রাফট, পিছন দিক নীচের দিকে

তাক করা।

ক্লিফের কিনারার বরফে আটকে গেছে গ্র্যাপলিং হুক, আর খুলে এল না, হঠাৎ করেই টানটান হয়ে উঠল দড়ি। আর দড়ির শেষে ঝটকা খেয়ে পড়ন্ত হোভারক্রাফটের নাক দিয়ে বেরুল রানা ও রাশেদ হাবিব।

ওদের দেড় শ' ফুট নীচে বিকট আওয়াজে সাদা ফেনার ভিতর আছড়ে পড়ল হোভারক্রাফট। হাজারখানেক টুকরো হলো।

মস্ত দোল খেয়ে ক্লিফের দিকে চলল রানা ও হাবিব। কমপক্ষে তিরিশ ফুট সরে পড়েছে হোভারক্রাফট, এখন দুলতে দুলতে ক্লিফের দিকে চলেছে ওরা। কয়েক সেকেণ্ড পর আছড়ে পড়ল খাড়া দেয়ালে।

ব্যথা ও ঝাঁকি ফস্কে দিল হাবিবের হাত, পড়তে শুরু করেছে সে। একেবারে শেষসময়ে খপ্ করে ধরল রানার ডানপায়ের বুট।

পুরো একমিনিট চুপ করে ঝুলে রইল ওরা। দেয়ালের মত খাড়া ক্লিফে কেউ নড়ছে না ভয়ে।

'এখনও আছেন?' একটু পর জানতে চাইল রানা।

'তাই তো মনে হয়,' ভয়ে ভয়ে বলল হাবিব।

'ঠিক আছে, এবার রিল করে উঠব,' বলল রানা। ডানহাত সামান্য সরাল ম্যাকহুক থেকে, টিপে দেবে কালো বাটন। ম্যাকহুক ওদেরকে টেনে তুলবে ক্লিফের মাথায়। অবশ্য, যদি টেকে ওই গ্র্যাপলিং হুক।

মুখ তুলে চাইল রানা। ওদের থেকে কমপক্ষে দেড় শ' ফুট উপরে কিনারা। আঁচ করল, ম্যাগহুকের দড়ির শেষে ঝুলছে ওরা।

আর ঠিক তখনই দেখল।

এক লোক। ক্লিফের কিনারায়। উঁকি দিয়েছে নীচে।

বরফের মূর্তি হয়ে গেল রানা।

লোকটার মাথায় কালো ব্যালাক্লাভা!

হাতে মেশিন পিস্তল!

'কী, উঠতে পারবেন?' রানার বুটের নীচ থেকে জানতে চাইল হাবিব। 'তা হলে দেরি করছেন কেন?' রানার কারণে ক্লিফের মাথায় এসএএস কমাণ্ডোকে দেখছে না সে।

'আমরা আর উঠছি না,' শুকনো স্বরে বলল রানা। চেয়ে আছে কালো পোশাক পরা কমাণ্ডোর দিকে।

'উঠছি না?' অবাক হলো হাবিব। 'এসব আবার কী বলেন?'

সরাসরি নীচে, রানার দিকে চেয়ে আছে এসএএস কমাণ্ডো।

আস্তে করে ঢোক গিলল রানা। নীচের দিকে চাইল। দূরত্ব দেড় শ' ফুট, ওখানে আছড়ে পড়ছে বিশাল সব ঢেউ। আবারও উপরে চাইল। খাপ থেকে চকচকে দীর্ঘ ছোরা বের করেছে এসএএস কমাণ্ডো, উবু হয়েছে ম্যাকহুকের দড়ি কাটতে।

'ধুশ্‌শালা!' বলল রানা।

'আমার তো বোনই নেই, আমাকে শালা বলছেন?' জানতে চাইল হাবিব।

'না, দীর্ঘ যাত্রার জন্য তৈরি থাকুন।'

'কোথায় যেতে হবে?'

'সোজা পাতালে! শেষ সময়ে বড় করে দম নেবেন।' ছুটন্ত হেলিকপ্টার থেকে পানিতে ঝাঁপ দেয়ার আগে এই কথাই শিখিয়ে দেয়া হয় কমাণ্ডো ট্রেইনিঙে। রানার ধারণা: এখন কাজে লাগবে এই বিদ্যা।

আবারও উপরে চাইল রানা। আরও ঝুঁকে এসেছে কমাণ্ডো, এবার ঘ্যাচঘ্যাঁচ করে দড়ি কাটবে।

'ঠিক আছে,' বলল রানা। 'শালাকে দড়ি কাটতে দেব না। হাবিব, আপনি তৈরি তো?'

এক সেকেণ্ড অপেক্ষা করল রানা, তারপর দুইবার টিপে দিল ম্যাকহুকের ট্রিগার।

একইসময়ে ক্লিফের মাথায় ছড়িয়ে থাকা গ্র্যাপলিং হুক স্ন্যাপ আওয়াজ তুলে বুজে গেল, বেরিয়ে এল তুষারের বুক থেকে। ক্লিফের উপর থেকে ছিটকে নীচের দিকে রওনা হলো আঁকশি ও দড়ি।

বিস্মিত এসএএস কমাণ্ডো চেয়ে রইল। একইসঙ্গে নীচে রওনা হয়েছে রানা, হাবিব ও ম্যাকহুক।

অনেক নীচে দক্ষিণ সাগরের বিশাল কালো ঢেউ!

আট

পাতাল-গুহার থমথমে নীরবতায় অর্ধেক খেয়ে ফেলা মানবদেহের দিকে চেয়ে আছে লেফটেন্যান্ট তিশা করিম। মস্ত সব বরফ-খণ্ডের এদিক ওদিক ছিটিয়ে রয়েছে দেহাবশিষ্ট।

গুহার ভিতর ঢুকবার পর পেরিয়েছে চল্লিশ মিনিট। জনি ওয়াকার, গোলাম মোরশেদ ও নিনা ভিসার ভুলেও লাশের দিকে চাইছে না। সবার চোখ বিশাল কালো স্পেসশিপের উপর। ওটার চারপাশে ঘুরেছে ওরা, কালো ধাতব ডানা স্পর্শ করেছে, উঁকি দিয়েছে ককপিট ক্যানোপির ধোঁয়াটে কাঁচের ভিতর দিয়ে।

উপর থেকে মাসুদ রানা জানিয়েছে, স্টেশনে আসছে ব্রিটিশ এসএএস কমাণ্ডো প্লাটুন। বাধ্য হয়ে সরে যেতে হচ্ছে ওদেরকে। এই খবর পাওয়ার পর দুটো ট্রাইপডে এমপি-৫ বসিয়েছে তিশা। অস্ত্রগুলো পুকুরের উপর তাক করা। এসএএস কমাণ্ডোরা উঠে এলে তাদেরকে অনায়াসেই শেষ করতে পারবে ওরা।

এসব কাজ শেষ হয়েছে আধ ঘণ্টা আগে।

উইলকক্স আইস স্টেশনে এলেও, এখানে আসতে দেরি হবে এসএএস কমাণ্ডোদের। ডাইভিং বেল নামাতে একঘণ্টা, আবার বরফের সুড়ঙ্গ দিয়ে উঠতে আরও একঘণ্টা।

এখন চুপচাপ অপেক্ষা। শুরু হয়েছে ধৈর্যের খেলা।

তিশা ট্রাইপড বসাবার পর আবারও স্পেসশিপ দেখতে গেছে ওয়াকার ও নিনা। তিশার সঙ্গে রয়ে গেছে মোরশেদ। কিন্তু কিছুক্ষণ পর সে-ও বিদায় নিয়েছে। অদ্ভুত সুন্দর, নিষ্ঠুর, কালো স্পেসশিপ ছুঁয়ে দেখবে।

অস্ত্রের পাশে রয়ে গেছে তিশা।

গুহার শীতল বরফ মেঝেতে বসে আছে, চোখ পুকুরের ওপাশে লাশগুলোর উপর। অবাক লাগছে ওর। কারা এভাবে খেয়ে ফেলল মানুষগুলোকে! ছিঁড়ে নিয়েছে মাথা-হাত-পা। কোথাও চিবিয়ে গুঁড়ো করেছে হাড়। চারপাশে ছলকে পড়েছে রক্ত।

কী এমন প্রাণী যেটা এদেরকে এভাবে মেরে ফেলল?

পুকুরের উপর দিয়ে লাশের দিকে চেয়ে আছে তিশা। পানির সামান্য উপরে বরফ-দেয়ালে গোল গর্ত, বিশাল। ব্যাসে হবে কমপক্ষে দশ ফুট। উঠে আসবার সময় পানির নীচে এমন আরও গর্ত দেখেছে।

ওই মস্ত গর্তগুলো বা ক্ষতবিক্ষত লাশের দিকে চাইলে অদ্ভুত অনুভূতি হচ্ছে তিশার। এই পাতাল-গুহা যেন ভীষণ অশুভ।

'এককথায় অকল্পনীয়,' বলল নিনা ভিসার। এইমাত্র তিশার পাশে এসে থেমেছে। ব্যস্ত হয়ে চোখের উপর থেকে সরিয়ে দিল এক গোছা চুল। স্পেসশিপ নিয়ে খুব উত্তেজিত।

'কোথাও কোনও মার্কিং নেই,' বলল। 'গোটা স্পেসশিপ কুচকুচে কালো।'

নিনা ভিসারের কথা বা স্পেসশিপ নিয়ে ভাবছে না তিশা। এই পাতাল-গুহা, নয়টি আধ-খাওয়া লাশ, স্টেশনে এসএএস প্লাটুন— এসব নিয়েই ওর চিন্তা। বারবার মন বলছে, আর কখনও উইলকক্স আইস স্টেশন থেকে জীবিত বেরুতে পারবে না ওরা।

'এককথায় অকল্পনীয়!' আবারও বলল নিনা ভিসার।

তুষার-ঝড়ের ভিতর আরেকটি ঝড়ের মতই উইলকক্স আইস স্টেশনে ঢুকে পড়েছে এসএএস কমাণ্ডো দল, দক্ষ, নির্মম।

অস্ত্র হাতে ঢুকেছে স্টেশনের ভিতর, জোড়া তৈরি করে ছড়িয়ে পড়েছে চারপাশে। প্রতিটি দরজা খুলে দেখছে, একটা ঘরও বাদ পড়ছে না।

'এ-ডেক পরিষ্কার,' একজন জানিয়ে দিল।

'বি-ডেকও,' জানাল আরেকজন।

এ-ডেকের ক্যাটওয়াকে থামল জুলিয়াস বি. গুণ্ডারসন। এখানে দাঁড়িয়ে পরিত্যক্ত স্টেশনে চোখ বোলাল। যেন কোনও রাজা, এইমাত্র দখল নিয়েছে নতুন রাজ্যের। শীতল চোখে স্টেশন দেখছে গুণ্ডারসন, সরু ঠোঁটে হাসি।

এসএএস ট্রুপ নেমে গেল ই-ডেকে। ওখানে খুঁটির সঙ্গে আটকে আছে পল সিংগার ও দুই ফ্রেঞ্চ বিজ্ঞানী। দুই এসএএস কমাণ্ডো এদেরকে কাভার করল। কালো পোশাক পরনে আরও কয়েকজন নামল রাং-ল্যাডার বেয়ে, ঢুকে পড়ল সুড়ঙ্গগুলোতে।

দক্ষিণ টানেলে ছুটে গেল চার এসএএস কমাণ্ডো। কিছু দূর গিয়ে বামের দরজা কাভার করল দু'জন। অন্য দু'জন ডানদিকের দরজা।

ডানদিকের দু'জন লাথি দিয়ে খুলল দরজা, ভিতরে উঁকি দিল।

এটা গুদাম-ঘর। লড়বড়ে কাঠের শেলফ। মেঝেতে কয়েকটা স্কুবা ট্যাঙ্ক।

আর কিছুই নেই।

উদ্যত অস্ত্র হাতে টানেল ধরে সামনে বাড়ল তারা। কিছুটা যেতেই দেখল লিফট। টানেলের শীতল সাদা আলোয় চকচক করছে স্টিলের দুই কবাট।

সংক্ষিপ্ত শিস বাজাল এসএএস কমাণ্ডো নেতা, মনোযোগ আকর্ষণ করছে অন্যদের।

থমকে গেছে সবাই লিফটের কাছে। ওটার দিকে দুই আঙুল তাক করল দলনেতা।

পাশের দু'জন সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পেরেছে। লিফটের দু'পাশে সরে গেল তারা, নেতা এবং চতুর্থ লোকটা অস্ত্র তাক করেছে স্টেইনলেস স্টিলের দরজার উপর।

আস্তে করে মাথা দোলাল দলনেতা। দু'পাশের দু'জন ঝটকা দিয়ে খুলল লিফটের কবাট। ভিতরে ব্রাশ ফায়ার করল দলনেতা।

খালি লিফটের চারদেয়াল ছিঁড়েখুঁড়ে গেল।

এসএএস কমাণ্ডোরা গুলিবর্ষণ শুরু করতেই চোখ বুজে ফেলেছে নিশাত সুলতানা। ওর মাথার এক ফুট দূরে বিকট আওয়াজে গুলি চলছে।

লিফটের শাফটের নীচে একেবারে ঘুটঘুটে অন্ধকার। গুটিসুটি মেরে বসে আছে নিশাত। মাথার উপর লিফটের মেঝে।

এসএএস কমাণ্ডোদের গুলি থরথর করে কাঁপিয়ে দিচ্ছে ছোট্ট লিফট। ছিঁড়ছে দেয়াল, নানা দিকে তৈরি হচ্ছে গর্ত। ঝরঝর করে মাথার উপর পড়ছে ধুলো ও কাঠের চল্টা। চোখ বুজে চুপ করে রইল নিশাত।

গুলির বিকট আওয়াজে ঝনঝন করছে কান। হঠাৎ অন্য

একটা চিন্তা এল ওর মনে।

এরা আবারও গুলি করছে স্টেশনের ভিতর।

তার মানে উধাও হয়েছে দাহ্য গ্যাস।

হঠাৎ করেই থেমে গেল গুলির আওয়াজ। ঘটাং করে বন্ধ হলো লিফটের দরজা। আবারও নীরবতা।

পাক্কা তিন মিনিট পর আবারও শ্বাস নিল নিশাত।

খাড়া ক্লিফের পাশ দিয়ে সাঁই-সাঁই করে পড়ছে মাসুদ রানা ও রাশেদ হাবিব, কয়েক সেকেণ্ড পর ঝপাস্ করে নামল ক্ষ্যাপা সাগরে।

শরীরে কনকনে ঠাণ্ডা হাতুড়ির বাড়ি, কিন্তু পাত্তা দিল না রানা। শিরা-উপশিরার ভিতর প্রচুর অ্যাড্রেনালিন, কাজেই ওর শরীর যথেষ্ট উত্তপ্ত। বেশিরভাগ এক্সপার্ট বলেনঃ অ্যাণ্টার্কটিকার বরফ-ঠাণ্ডা এই পরিবেশে বড়জোর আট মিনিট বাঁচবে যে-কেউ। অবশ্য অ্যাড্রেনালিন ও থারমাল ওয়েটসুটের কারণে রানা ধরে নিয়েছে: ও বাঁচবে কমপক্ষে আধ ঘণ্টা।

পানির উপর ভেসে উঠতে চাইছে এখন। আঁকুপাঁকু করছে ফুসফুস, খুব জরুরি হয়ে উঠেছে বাতাস নেয়া। হঠাৎ করেই সাগর-সমতলে ভেসেও উঠল, এবং চমকে গেল ভীষণভাবে। আগে এত বড় ঢেউ দেখেনি। সোজা নেমে আসছে ওর উপর। প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়ে আবারও ডুবে গেল রানা। ছিটকে পড়েছে পিছনের বরফ-দেয়ালের উপর।

ফুসফুসের সব বাতাস ভুস করে বেরিয়ে গেছে, এখন আঁকড়ে আসতে চাইছে বুকের ভিতর।

কয়েক মুহূর্ত পর সরে গেল ঢেউ, রানা টের পেল, ও আছে বিশাল দুই ঢেউয়ের মাঝের খোঁড়লে। আবারও নীচে টেনে নেয়া হচ্ছে ওকে। এক সেকেণ্ড পর সাঁতরাতে লাগল। বড় করে শ্বাস

নিল, দেখে নিতে চাইল চারপাশ।

সাগরে দানবীয় সব ঢেউ। একেকটা কমপক্ষে চল্লিশ ফুট উঁচু। ওর বিশ গজ ডানে ক্লিফের হাঁটুতে ভেঙে পড়ল প্রকাণ্ড এক ঢেউ। চারদিকে ভাসছে আইসবার্গ। কোনও কোনোটা উচ্চতা ও চওড়ায় বিশাল সব স্কাইস্ক্র্যাপারের বাড়া। বেশ কিছু আইসবার্গ দীর্ঘ ও চ্যাপ্টা, যেন ফুটবল মাঠ— উপকূল থেকে এক শ' গজ দূরে। যেন নীরব প্রহরী, বরফের ক্লিফকে পালাতে দেবে না।

হঠাৎ করেই ওর পাশে ভুস্ করে ভেসে উঠল রাশেদ হাবিব। হাঁ করে দম নিচ্ছে বেঁটে বিজ্ঞানী। রানা ভাবতে শুরু করেছে, এই যম-শীতে কী হবে লোকটার! পরক্ষণে ওর মনে পড়ল, হাবিবের পরনে নিয়োপ্রেন বডিসুট। সে বোধহয় ওর চেয়ে অনেক আরামে আছে। আর বোঝাই যাচ্ছে, ভালই সাঁতার জানে— হাজার হোক বাংলাদেশের গ্রামের ছেলে, মায়ের পেট থেকেই সাঁতার শিখে আসে।

প্রকাণ্ড এক ঢেউ আসছে ওদের দিকে।

'ডুব দিন!' সতর্ক করল রানা। বড় করে শ্বাস নিয়েই তলিয়ে গেল নিজেও। মুহূর্তে নীরব হয়ে গেল চারপাশ।

নীচের দিকে নামতে শুরু করেছে ও, একটু পর দেখল ওর পাশে সাঁতরে চলেছে হাবিব। ওদের মাথার উপরে বিস্ফোরণের আওয়াজ হলো, ক্লিফের উপর আছড়ে পড়েছে ঢেউ, চারপাশে ছড়িয়ে গেল সাদা ফেনা।

আবারও ভেসে উঠল রানা ও হাবিব।

উত্তাল সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছে ওরা, তারই ভিতর রানা দেখল পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে হোভারক্রাফটের আস্ত এক দরজা।

'তীর থেকে সরে যেতে হবে,' বলল রানা, 'নইলে বরফের দেয়ালে আছড়ে পড়ে মরব।'

'কিন্তু যাব কোথায়?' জানতে চাইল হাবিব।

'ওই যে, ওখানে,' ক্লিফ থেকে দুই শ' গজ দূরে মস্ত এক খণ্ড আইসবার্গ দেখাল রানা। ওটা কাত হয়ে যাওয়া বিশাল পিয়ানোর মত।

'হ্যাঁ, দেখেছি।'

'ওখানেই যাব,' বলল রানা।

'ঠিক আছে।'

'এক থেকে তিন পর্যন্ত গুনব, তারপর রওনা হব।'

তিন বলা শেষে বড় করে দম নিল ওরা, তারপর তলিয়ে গেল। ক্লিফ পিছনে ফেলে ব্রেস্টস্ট্রোক দিয়ে খোলা সাগরে চলেছে। ওদের মাথার উপর স্‌স্‌ আওয়াজ তুলছে সাদা ফেনা।

দশ গজ পেরিয়ে গেল। তারপর বিশ গজ।

বুক আঁকড়ে আসছে হাবিবের, ভেসে উঠল। বড় করে দম নিয়ে আবারও তলিয়ে গেল। একই কাজ করল রানা, দাঁতে দাঁত খিঁচে আবারও ডুবে গেল ঢেউয়ের নীচে। পাঁজরের ভাঙা হাড়ে ব্যথা শুরু হয়েছে, সেই সঙ্গে একটু পর পর তীক্ষ্ণ খোঁচা।

পঞ্চাশ গজ যাওয়ার পর আবারও ভেসে উঠল ওরা। পিছনে ফেলে এসেছে ক্লিফে আছড়ে পড়া ঢেউ। এবার নিশ্চিন্তে ফ্রিস্টাইলে এগুতে পারল। অবশ্য, বেয়ে উঠতে হচ্ছে কমপক্ষে চল্লিশ ফুট উঁচু ঢেউয়ের উপর।

আরও কিছুক্ষণ পর আইসবার্গের পায়ের কাছে পৌঁছে গেল ওরা। কাছ থেকে দেখে মনে হলো পাহাড়ের মত উঁচু, সাদা কোনও দেয়াল। কোথাও কোথাও নানা খাঁজ ও সুড়ঙ্গ। সব গেছে বরফের বুকে।

বিশাল আইসবার্গের পাশে তাক দেখা গেল। ওটা নেমে এসেছে সাগর-সমতলে। ওই কার্নিসের দিকে চলল রানা ও হাবিব। কিন্তু কাছে পৌঁছে দেখল ওই তাক ওদের চেয়ে কমপক্ষে তিন ফুট উপরে।

'বাঁদরের মত উঠে পড়ুন আমার কাঁধে,' বলল রানা।

কথাটা মনে ধরেছে বেঁটে বিজ্ঞানীর, সঙ্গীর কাঁধে বাম পা রাখল, তারপর উঠে যেতে চাইল।

বরফের তাকের কিনারা ধরে ফেলল। বেকায়দাভাবে হাঁচড়ে-পাঁচড়ে উঠে গেল। তাকের পাশে শুয়ে পড়েছে, হাত বাড়িয়ে দিল রানাকে তুলে নেওয়ার জন্য।

পানির ভিতর লাফিয়ে উঠল রানা, খপ্ করে ধরে ফেলল হাবিবের কবজি। উঠে আসতে শুরু করেছে। প্রায় পৌঁছেই গেল তাকের কাছে, কিন্তু ঠিক তখনই পিছলে গেল বিজ্ঞানীর ভেজা কবজি। ঝপাস্ করে পড়ল রানা সাগরে।

তলিয়ে গেছে, চারপাশে শুধু নৈঃশব্দ্য। এখন বরফের ক্লিফের উপর দানব ঢেউয়ের আছড়ানোর আওয়াজ নেই। চোখে পড়ল সাদা আইসবার্গের পেট। সাগরের ধোঁয়াটে পরিবেশে অনেক নীচে নেমে হারিয়ে গেছে।

উঠে আসতে শুরু করেছে রানা, আর ঠিক তখনই শুনল আওয়াজটা। ঝট্ করে ঘুরে চাইল। জানে, পানির ভিতর খুব দ্রুত চলে আওয়াজ। ওর ভুল হওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই।

ভ্-ম্-ম্-ম্-ম্-ম্-ম্-ম্-ম্-ম্!

নিচু আওয়াজ। গুঞ্জনের মত। ভিমরুল এমন আওয়াজ করে।

ভ্-ম্-ম্-ম্-ম্-ম্-ম্-ম্-ম্-ম্!

ভুরু কুঁচকে ফেলল রানা। ওর মনে হয়েছে আওয়াজটা যান্ত্রিক। কোনও মোটোরাইয্ড্ দরজা খুললে এমন হয়। খুব কাছেই আওয়াজ হয়েছে।

ওর পিছনে।

চরকির মত ঘুরল রানা।

এবার দেখতে পেল।

প্রকাণ্ড! এতই বড়, লাফ দিল ওর হৃৎপিণ্ড। দ্রুত হয়ে উঠেছে

হৃৎস্পন্দন।

পানির ভিতর খাপ পেতে বসে আছে।

নীরব। বিশাল।

রানার একটু উপরে আইসবার্গের পাশে।

দৈর্ঘ্যে কমপক্ষে তিন শ' ফুট। কালো আর গোল। কনিং টাওয়ারের দু'পাশে দুটো স্ট্যাবিলাইজিং ফিন। সিলিণ্ডারের মত শরীরের শেষে গোলাকার নাক।

দৃশ্যটা দেখে দপদপ করতে শুরু করেছে রানার মাথা।

নিজের চোখ বিশ্বাস করতে দ্বিধা হচ্ছে।

চেয়ে আছে সাবমেরিনের দিকে।

দ্রুত হাত-পা নেড়ে উঠতে শুরু করেছে রানা। দশ সেকেণ্ড পর ভুস্ করে ভেসে উঠল। পাঠাগার ডট নেট থেকে ডাউনলোডকৃত।

আইসবার্গের তাক থেকে জানতে চাইল হাবিব, 'আপনি ঠিক আছেন তো, ভাই?'

'না, ভাল নেই,' বলল রানা। আবারও বড় করে দম নিয়ে তলিয়ে গেল।

খুব নীরব চারপাশ।

আগের চেয়ে নেমে এসেছে রানা, অবাক হয়ে দেখল সাবমেরিনটাকে। ওর থেকে তিরিশ গজ দূরে। স্বচ্ছ পানির ভিতর নিথর প্রকাণ্ড সাবমেরিন। যেন বিশাল কোনও শিকারী জানোয়ার।

কাদের, ভাবছে রানা। মন দিল সিগনেচার ফিচার খুঁজবার জন্য।

সরু কনিং টাওয়ার, বো-তে চারটে টর্পেডো পোর্ট। খুলতে শুরু করেছে একটা।

আবারও শোনা গেল: ভ্-ম্-ম্-ম্-ম্-ম্-ম্-ম্-ম্-ম্!

এবার বো-র বামে কী যেন লেখা দেখল। তিনটি ভার্টিকাল শাফট, তাতে ব্যবহার করা হয়েছে তিনটি রং। নীল-সাদা-লাল।

রানা চেয়ে আছে ফ্রেঞ্চ পতাকার দিকে!

দম ফুরিয়ে যেতেই উঠে যেতে লাগল ও, একটু প. ভেসে উঠল।

তাক থেকে চেয়ে ছিল রাশেদ হাবিব, রানাকে দেখেই বলল, 'আপনি ওখানে কী করছেন, ভাই?'

জবাব দিল না রানা, বদলে হাত তুলে ঘড়ি দেখে নিল।

স্টপওয়াচ জানিয়ে চলেছে:

২:৫৭:৫৯

২:৫৮:০০

২:৫৮:০১

'সর্বনাশ!' বিড়বিড় করল রানা। হোভারক্রাফট নিয়ে নানা দিকে ছুটবার সময় একদম ভুলে গিয়েছিল উপকূলের কাছেই থাকবে ফ্রেঞ্চ রণতরী। ওখান থেকে মিসাইল ফেলা হবে উইলকক্স আইস স্টেশনের উপর। এই সাবমেরিনের কোডনেম: কিলার ওয়েইল!

রানা ভুল ভেবেছে। ধরেই নিয়েছিল কিলার ওয়েইল কোনও ফ্রেঞ্চ রণতরী। কিন্তু তা নয়, কিলার ওয়েইল আসলে ফ্রেঞ্চদের সাবমেরিন!

'আমাকে টেনে তুলুন,' বলল রানা।

তাক থেকে হাত বাড়িয়ে দিল রাশেদ হাবিব। এবার শক্ত করে তার কবজি ধরল রানা, দ্রুত উঠবার চেষ্টা করল। দেড় ফুট উঠবার পর বামহাতে খপ্ করে ধরল তাকের কিনারা। কয়েক সেকেণ্ড পর উঠে এল কার্নিসে।

রাশেদ হাবিব ভেবেছিল ওর মতই চুপ করে শুয়ে থাকবে রানা, কিন্তু তা না করে লাফিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে।

অবাক হয়ে চেয়ে রইল হাবিব। পাগলাটে লোকটা ঝেড়ে দৌড় শুরু করেছে। ছুটছে আইসবার্গের আরও চ্যাপ্টা দিকে।

খুবই বিরক্ত হলো হাবিব, কিন্তু উঠে দাঁড়িয়ে পিছু নিল। বরফের স্তূপ টপকে গেছে রানা, চলেছে তিরিশ গজ দূরের কিনারা লক্ষ্য করে। ওদিকের মেঝে ধীরে ধীরে উপরে উঠেছে। ওপাশে আর কিছু দেখল না হাবিব।

খাড়াই বেয়ে ছুটছে মাসুদ রানা। পিছনে ছুটে চলেছে হাবিব। ওদিকে চেয়ে ভাল লাগছে না ওর। ওখানে বরফের খাড়া দেয়াল নেমেছে তিরিশ ফুট নীচের সাগরে। আর উন্মাদ লোকটা আইসবার্গে উঠেও আবার ঝাঁপিয়ে পড়েছে হিমশীতল সাগরে!

ছুটবার ফাঁকে স্টপওয়াচ দেখেছে রানা। টিপটিপ করে তিন ঘণ্টার দিকে চলছে ডিজিটাল ঘড়ি।

একটু পরই মিসাইল ছোঁড়া হবে!

২:৫৮:৩১

২:৫৮:৩২

২:৫৮:৩৩

ঝেড়ে দৌড় দেয়ার সময় ভাবতে শুরু করেছে রানা: এরা উড়িয়ে দেবে উইলকক্স আইস স্টেশন। মেরে ফেলবে ওর দলের সবাইকে! ছোট্ট মেয়েটাও মরবে! থামাতে হবে এদেরকে!

কিন্তু কীভাবে?

একজন মাত্র লোক কীভাবে ধ্বংস করবে সাবমেরিন?

তারপর হঠাৎ করেই বুঝতে পারল একটা বিষয়।

দৌড়ের উপর হোলস্টার থেকে তুলে নিয়েছে ম্যাগহুক, 'এম' লেখা বাটনে চাপ দিয়েছে। ম্যাগহুকের ম্যাগনেটিক্যালি চার্জড্ হেড-এ জ্বলে উঠেছে লাল বাতি।

থাই পকেট থেকে বের করেছে রুপালি ক্যানিস্টার। সবুজের ব্যাণ্ডে লেখা: ট্রাইটোনাল ৮০/২০। একবার ওটা দেখে নিয়েছে রানা। সামান্য ঘুরিয়ে নিয়েছে স্টেইনলেস স্টিলের ঢাকনি। হুশ্

আওয়াজ হয়েছে। খুলে গেছে ঢাকনি, ভিতরে পরিচিত ডিজিটাল টাইমার ডিসপ্লে। পাশেই আর্ম-ডিযআর্ম সুইচ। ট্রাইটোনাল ডেমোলিশন ডিভাইস, যে-কোনও সময়ে ডিযআর্ম করা যায়।

বিশ সেকেণ্ড, ভেবেছে রানা। এরই ভিতর সরতে হবে ওকে।

ট্রাইটোনাল চার্জে বিশ সেকেণ্ডের জন্য টাইমার স্থির করেছে, তারপর ক্যানিস্টার বসিয়ে নিয়েছে ম্যাগহুকের মুখে বাল্‌বের মত ম্যাগনেটিক হেডে। শক্তিশালী চুম্বকে ঠক্‌ শব্দে আটকে গেছে ক্যানিস্টার।

এবড়োখেবড়ো জমি, প্রাণপণে দৌড়েছে রানা, তারপর পৌঁছে গেছে কিনারার কাছে, কোনও দ্বিধা না করেই উড়াল দিয়েছে। আকাশে ভেসে ছিল তিন সেকেণ্ড, তারপর ঝুপ করে পড়েছে সাগরে। পা নীচে রেখে নেমেছে। থরথর করে কেঁপে উঠেছে শীতে।

এই মুহূর্তে ওর চারপাশে অসংখ্য বুদ্বুদ। কয়েক সেকেণ্ড কিছুই দেখল না রানা, তারপর হঠাৎ সরে গেল সব বুদ্বুদ। টের পেল, ইস্পাতের বিশাল সাবমেরিনের নাকের সামনে হাজির হয়েছে।

চট্‌ করে ঘড়ি দেখল রানা।

২:৫৮:৫৯

২:৫৯:০০

২:৫৯:০১

আর মাত্র একমিনিট!

পুরোপুরি খুলে গেছে টর্পেডো টিউবের দরজা। ওটার দিকে রওনা হয়ে গেল রানা। দশ গজ দূরে হাঁ হয়েছে টর্পেডো টিউব।

আশা করা যায় কাজ হবে, ভাবল রানা। তুলে ধরেছে ম্যাগহুক। ওটার নাকে ট্রাইটোনাল চার্জ। আর্ম সুইচ টিপে দিল।

বিশ সেকেণ্ড পর ফাটবে বোমা।

দেরি না করে ম্যাগহুক ফায়ার করল রানা।

লঞ্চার থেকে ছিটকে বেরুল ম্যাগহুক, ওটার পিছনে ছুটল সাদা বুদ্বুদ। খোলা টর্পেডোর দরজা লক্ষ্য করে পানির ভিতর মসৃণভাবে চলেছে হুক।

এক সেকেণ্ড পেরুবার আগেই টর্পেডো পোর্ট থেকে সামান্য নীচে স্টিলের হালে ঠং করে লাগল ম্যাগনেটিক হেড। ওটার সঙ্গে তাজা ট্রাইটোনাল চার্জ। কিন্তু পুরু ইস্পাতের খোল থেকে ছিটকে গেল ম্যাগনেটিক হেড। খুব ধীরে তলিয়ে যাচ্ছে।

হতভম্ব হয়ে গেল রানা। টার্গেটে লাগাতে পারেনি!

ওর মন চাইল, পানির নীচে চিৎকার করে নিজেকে গালি দিতে। এক সেকেণ্ড পর অন্য চিন্তা এল।

সাবমেরিনের ভিতরের লোকগুলো শুনেছে ধাতব আওয়াজ।

আধ সেকেণ্ড পর গ্রিপের কালো বাটন টিপল রানা, রিল করে আনছে ম্যাগনেটিক হেড। আশা করল, ওটা দ্রুত ফিরবে, নইলে ফুরাবে সময়... বিস্ফোরিত হবে ট্রাইটোনাল!

আরেকবার ম্যাগহুক ছুঁড়তে পারবে?

আর মাত্র একবার!

এক সেকেণ্ড পর শব্দটা পেল রানা।

ভ্-ম্-ম্-ম্-ম্-ম্-ম্-ম্-ম্-ম্!

ওর বামে সাবমেরিনের বো-র পাশে খুলে যাচ্ছে আরেকটা টর্পেডো ডোর!

আগে যেটার দিকে তাক করেছিল, তার চেয়ে এটা ছোট।

ছোট টর্পেডো, ভাবল রানা। এগুলো দিয়ে উড়িয়ে দেয় শত্রু সাবমেরিন।

মাত্র কথাটা ভেবেছে রানা, এমন সময় হঠাৎ জোরালো হুউইস! আওয়াজ পেল। নতুন পোর্ট থেকে বেরিয়েছে টর্পেডো! ঘুরতে ঘুরতে আসছে ঠিক ওর দিকেই!

অবাক হলো রানা, ওকে মারতে টর্পেডো ছেড়েছে ফ্রেঞ্চরা!

লঞ্চারে ফিরে এসেছে ম্যাগহুক, চট্ করে ট্রাইটোনালের আর্ম-ডিযআর্ম সুইচ টিপে দিল রানা। বাকি ছিল মাত্র চার সেকেণ্ড। ঠিক তখনই ওর কোমর পাশ কাটিয়ে চলে গেল টর্পেডো। ওটার জোরালো ঢেউ ওকে একবার ডিগবাজি করিয়ে দিয়ে গেছে।

আস্তে করে বুদ্বুদ ছাড়ল রানা। টর্পেডো এতই কাছে, ওর উপর লক করতে পারেনি। পরক্ষণে ওর পিছনে আইসবার্গে গিয়ে লাগল টর্পেডো, সঙ্গে সঙ্গে ডেটোনেট হলো।

আইসবার্গের কিনারে দাঁড়িয়েছে রাশেদ হাবিব, চোখ রেখেছে পানির দিকে, আর ঠিক তখনই বিশ গজ দূরে বিস্ফোরিত হলো টর্পেডো।

এক সেকেণ্ড আগে আইসবার্গের ওদিকটা জমাট ছিল, কিন্তু পর মুহূর্তে সাদা ভূমিধসের মত ঝরঝর করে নামল সাগরে বরফ। যেন খামচি দিয়ে নিয়ে গেছে আইসবার্গের বড় এক অংশ।

'খাইসে!' বড় করে শ্বাস নিল রাশেদ হাবিব।

তখনই আইসবার্গ থেকে বিশ গজ দূরে রানাকে দেখল। বড় করে দু'বার শ্বাস নিল উন্মাদ লোকটা, আবারও তলিয়ে গেল।

টর্পেডো বিস্ফোরিত হওয়ার আওয়াজ এখনও মিলিয়ে যায়নি, বড় একটুকরো আইসবার্গ ঝরে পড়েছে পিছন সাগরে। ওদিকে ফিরেও চাইল না রানা, আবারও তাক করেছে ম্যাগহুক। এবার ভুল করলে চলবে না।

২:৫৯:৩৭

২:৫৯:৩৮

২:৫৯:৩৯

নতুন করে আর্ম সুইচ টিপল রানা, আবারও বিশ সেকেণ্ডের

জন্য ট্রাইটোনাল চার্জ তৈরি হয়ে গেল।

পানির ভিতর দিয়ে ছুটে গেল ম্যাগহুক।

মনে হলো দীর্ঘ সময় ধরে ছুটে চলেছে।

তারপর হঠাৎ করেই ঢুকে গেল টর্পেডো পোর্টের ভিতর।

হ্যাঁ!

গ্রিপে 'এম' বাটন টিপল রানা, টর্পেডো পোর্টের ভিতর সাড়া দিল ম্যাগনেটিক হেড। খসে পড়ল রুপালি ট্রাইটোনাল চার্জ। ম্যাকহুক রিল করতে শুরু করেছে রানা, তারই ফাঁকে ঘুরে গেল। মনে মনে বলল, এবার পালাও, বাপু!

প্রাণপণে সাঁতরাতে শুরু করেছে।

ফ্রেঞ্চ সাবমেরিনের টর্পেডো রুমে থমথমে নীরবতা। তরুণ এক এনসাইন কাউন্টডাউন করছে।

'প্রাইমারি লঞ্চ আর বিশ সেকেণ্ড,' বলল। ইরেজার হিসাবে রাখা হয়েছে নেপচুন-ক্লাস নিউক্লিয়ার টিপড টর্পেডো।

'উনিশ... আঠারো... সতেরো...'

আইসবার্গের কোলে রাশেদ হাবিব দেখল, এইমাত্র ভেসে উঠেছে মাসুদ রানা, অলিম্পিকের সেরা সাঁতারু মাইকেল ফেলপসের গতি তুলে তীরবেগে সাঁতরে আসছে হিমশৈলর দিকে। একহাতে উঁচু করে রেখেছে ম্যাগহুক।

ফ্রেঞ্চ নাবিক কাউন্টডাউন করছে: 'দশ... নয়... আট... সাত...'

রানা বোধহয় ডলফিনদেরও হারিয়ে দেবার প্রতিযোগিতায় নেমেছে। ঝপাঝপ্ পড়ছে হাত। প্রবলভাবে নড়ছে পাদুটো।

সাবমেরিন থেকে সরতে হবে! ট্রাইটোনাল চার্জ থেকে অনেক দূরে। ইমপ্লোশন ওকে টেনে নেবে নিজের দিকে। দশ গজ দূর থেকে ট্রাইটোনাল ফায়ার করেছে, এখন সরে এসেছে বিশ গজ দূরে। আঁচ করছে, আরও পাঁচ গজ গেলে নিরাপদ দূরত্বে সরে আসতে পারবে।

আইসবার্গ থেকে চিৎকার করল হাবিব, 'ভাইরে, কী হয়েছে আপনার? পাগল হয়ে গেলেন কেন!'

'কিনারা থেকে সরুন!' পাল্টা চেঁচাল রানা। 'পালান!'

'পাঁচ... চার... তিন...'

কিন্তু 'দুই' আর বলতে পারল না ফ্রেঞ্চ এনসাইন।

কারণ, ঠিক তখনই টর্পেডো টিউবের ভিতর বিস্ফোরিত হলো ট্রাইটোনাল চার্জ।

রাশেদ হাবিব যেখানে দাঁড়িয়েছে, ওখান থেকে দেখবার মত হলো বিস্ফোরণটা। তার চেয়ে বড় কথা, এমন কিছুর জন্য সে তৈরি ছিল না।

পানির নীচে কালো কী যেন। ওখান থেকে হঠাৎ করেই ছিটকে উঠল সাদা মস্ত মেঘ। কমপক্ষে পঞ্চাশ ফুট উপরে উঠল বিপুল পানি, দুই শ' ফুট উপরে উঠেছে সাদা ফোয়ারা, ধীরে ধীরে পড়তে লাগল নীচে।

পানি-সমতলে রানা দেখল নীচ থেকে উঠে আসছে বিশাল সব নীল বুদ্বুদ। ওসব এসেছে সাবমেরিনের বো-র মস্ত গর্ত থেকে। অসংখ্য শুঁড় তৈরি হলো, যেন টেনে নেবে ওকে। তারপর হঠাৎ করেই তীব্র গতি তুলে বুদ্বুদগুলো ফিরতে লাগল সাবমেরিনের বুকে। রানার মনে হলো হ্যাঁচকা টান দিয়ে ওকে পিছিয়ে নিয়ে

চলেছে কিছু।

ইমপ্লোশন।

ঠিক তখন বিশাল অ্যালিউমিনিয়ামের ক্যানের মত চুপসে গেল প্রকাণ্ড ফ্রেঞ্চ সাবমেরিন। মুহূর্তে চিঁড়ে-চ্যাপ্টা হলো সব। হঠাৎ রানা টের পেল, ওকে আর টানছে না পিছনের পানি। শিথিল করল হাত-পা, চুপ করে ভেসে রইল। নীচে আর কোনও সাবমেরিন নেই।

এর দুই মিনিট পর রানাকে টেনে তুলল রাশেদ হাবিব আইস বার্গের উপর।

বরফে সটান হয়ে শুয়ে পড়ল রানা, রেসের ঘোড়ার মত ফোঁস-ফোঁস শ্বাস ফেলছে। ভিজে চুপচুপে, থরথর করে কাঁপছে শীতে। পরিশ্রমে ঘুমিয়ে পড়তে ইচ্ছা হলো ওর। তখনই মনে পড়ল: ফ্রেঞ্চ সাবমেরিন নেই, কিন্তু ওরা আছে আইসবার্গে। একটু পর হাইপোথারমিয়া ধরবে। এখন বিশ্রাম নেয়ার উপায় নেই।

নয়

ওয়াশিংটন ডি.সি.।

ক্যাপিটল বিল্ডিং। নতুন করে আবারও শুরু হয়েছে ন্যাটো কনফারেন্স।

ইউএস রিপ্রেযেণ্টেটিভ জ্যাক মার্টিন হেলান দিলেন চেয়ারে। মনোযোগ দিয়ে দেখছেন ফ্রেঞ্চ ডেলিগেশনের নেতা জ্যাঁ পিয়েরে কুই-কে। বক্তৃতা দিতে উঠে দাঁড়িয়েছে লোকটা।

'সহ ডেলিগেট্‌স্‌, লেডিজ অ্যাণ্ড জেন্টলমেন,' শুরু করল কুই, 'দ্য রিপাবলিক অভ ফ্রান্স আপনাদেরকে জানিয়ে দিতে চায়, সে তার পূর্ণ সমর্থন নিয়ে নর্থ আটলান্টিক ট্রিটি অর্গানাইজেশনের পাশেই থাকবে। এই মহৎ সংগঠন প্রায় ষাট বছর ধরে পশ্চিমকে রক্ষা করছে। মহান ফ্রান্স আরও জানাতে চায়...'

বকবক করছে লোকটা: সংগঠন হিসাবে ন্যাটোর তুলনা নেই, আর এই সংঘের সদস্য হতে পেরে ফ্রান্স গর্বিত। আস্তে করে মাথা নাড়লেন মার্টিন। সারা সকাল ধরে বিরতি নিয়েছে ফ্রেঞ্চ ডেলিগেটরা, বারবার সময় নিয়েছে, আর এখন হঠাৎ করেই বলতে শুরু করেছে, ন্যাটোর অসাধারণ সুকীর্তির জন্য ওরা কৃতজ্ঞ। ...এর কোনও অর্থ হয়?

বক্তৃতা শেষে বসে পড়ল জ্যাঁ পিয়েরে কুই। এরিক হোমসের দিকে ঘুরে চাইলেন মার্টিন, কোনও মন্তব্য করবেন, তার আগেই চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়ালেন ব্রিটিশ ডেলিগেশনের নেতা সত্যিকারের ভদ্রলোক জর্জ মানরো, পরিশিলিত কণ্ঠে বললেন, 'লেডিজ অ্যাণ্ড জেন্টলমেন, আপনাদেরকে বিরক্ত করবার জন্য দুঃখিত, কিন্তু ব্রিটিশ ডেলিগেশনের তরফ থেকে আমি কিছুটা বিরতি প্রার্থনা করছি।'

ক্যাপিটল বিল্ডিং থেকে সামান্য দূরে, উল্টো দিকে লাইব্রেরি অভ কংগ্রেস দালানের এইট্রিয়ামে ঢুকেছে সান্থা ক্যাসেডিন। তিনটি দালান নিয়ে তৈরি পৃথিবীর সবচেয়ে বড় গ্রন্থাগার এটা। এর একমাত্র কাজ সব ধরনের বই সংগ্রহ করা, এবং তা বিপুল পাঠককে পড়তে দেয়া।

এখন বই পড়তেই এসেছে সান্থা। ওর দরকার রহস্যময় প্রিলিমিনারি সার্ভে নামের বইটি। ওটা প্রকাশ করা হয় উনিশ' শ' আটাত্তর সালে। লেখক ছিলেন শ্যারন স্টোন। আশা করা যায়

বইটি এখানে পাওয়া যাবে।

এনকোয়ারি ডেস্কে অপেক্ষা করছে সান্থা। একটু আগে লাইব্রেরির এক অ্যাটেণ্ড্যান্ট গেছে বইটি খুঁজে আনতে।

লাইব্রেরি অভ কংগ্রেস ক্লোজড্-স্ট্যাক গ্রন্থাগার। এখানে বই খুঁজবার উপায় নেই, আপনাকে নির্দিষ্ট বই এনে দেবে কর্মচারী। এটা নন-সারকুলেটিং লাইব্রেরি, আপনি চাইলে বই বাড়িতে নিয়ে যেতে পারবেন না, গ্রন্থাগারের ভিতর বসে পড়তে হবে।

দশ মিনিটের বেশি পেরিয়ে গেছে, এখনও ফিরে আসেনি অ্যাটেণ্ড্যান্ট। লাইব্রেরিতে আসবার পথে একটা বই কিনেছে সান্থা, এখন ওটা নাড়াচাড়া করছে।

আবারও কাভারের দিকে চাইল:

দ্য আইস ক্রুসেড:
রিফ্লেকশন অন এ ইয়ার স্পেণ্ট ইন
অ্যাণ্টার্কটিকা

ডক্টর. নিনা ভিসার
এসোশিয়েট প্রফেসর অভ জিয়োফিযিক্স,
হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি

সূচনা পড়তে শুরু করেছে সান্থা ক্যাসেডিন।

শুরুতেই লেখিকা প্রশংসা করেছেন হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটির জিয়োফিযিক্স ফ্যাকালটির হেড মরিস ভিসারের। আইস কোরের উপর বিপুল রিসার্চ করেছেন উনি।

এপর্যন্ত পড়ে ভুরু কুঁচকে ফেলল সান্থা। মরিস ভিসার বোধহয় লেখিকার বাবা অথবা স্বামী! আবার পড়তে লাগল সান্থা।

মরিস ভিসারই প্রথম অ্যাণ্টার্কটিকার আইস শেলফ থেকে সিলিণ্ড্রিক্যাল আইস কোর তুলে আনার উপর জোর দেন। তিনি বলেন, আইস কোরের ভিতর আমরা পেতে পারি লক্ষ লক্ষ বছর

আগের আটকা পড়া বাতাস।

প্রথম অধ্যায়ে চলে গেল সাস্থা:

বলা হয়েছে, আইস কোর বিষয়ে গবেষণা করলে বৈশ্বিক উষ্ণতা, গ্রিনহাউস এফেক্ট ও দ্রুত মিলিয়ে যাওয়া ওজন লেয়ারের ব্যাখ্যা মিলতে পারে।

লেখিকার কলমে আবারও এসেছে মরিস ভিসারের কথা। উনি ঊনিশ শ' চুরানব্বুই সালে পুরো বছর কাটান অ্যান্টার্কটিকায়, এক দুর্গম এলাকা থেকে সংগ্রহ করেন আইস কোর।

ওই রিসার্চ স্টেশনের নাম: উইলকক্স আইস স্টেশন।

স্টেশনের ল্যাটিচ্যুড –৬৬.৫° এবং লংগিচ্যুড ১১৫° ২০' ১২"।

কেউ সামনে হাজির হয়েছে টের পেয়ে বই থেকে মুখ তুলল সাস্থা। অ্যাটেণ্ড্যাণ্ট চলে এসেছে।

কিন্তু তার হাত খালি।

'ওখানে বইটা নেই,' আস্তে করে মাথা নাড়ল মেয়েটি।

'নেই?'

'তিনবার দেখেছি,' বলল অ্যাটেণ্ড্যাণ্ট। 'ওই তাকে নেই। প্রিলিমিনারি সার্ভে। লেখিকা শ্যারন স্টোন। বই বের হয়েছে ১৯৭৮ সালে। সরিয়ে ফেলেছে কেউ।'

ভুরু কুঁচকে গেল সাস্থার। এমন হওয়ার কথা নয়।

অ্যাটেণ্ড্যাণ্ট তরুণী মেয়েটির ব্যাজে ওর নাম লেখা: ক্যারল কনোরি। আস্তে করে কাঁধ ঝাঁকাল সে। 'নেই তো নে-ই! মেরে দিয়েছে কেউ।'

একটা কথা মনে পড়তেই উত্তেজিত হয়ে উঠল সাস্থা।

'এমন কি হতে পারে এই মুহূর্তে বইটা পড়ছে কেউ?' জানতে চাইল।

মাথা নাড়ল মেয়েটা। 'না। কমপিউটার বলছে: শেষবার ওটা

ধার নেয়া হয়েছে উনিশ শ' উনআশির নভেম্বরে।'

'উনিশ শ' উনআশির নভেম্বরে,' বিড়বিড় করল সান্থা।

'একেবারে ভুতুড়ে কাণ্ড,' বলল ক্যারল। ওর বয়স হবে বড়জোর বিশ। কলেজে পড়ে। 'যে লোক বই নিয়েছে, তার নাম টুকে এনেছি। ভাবলাম আপনার লাগতে পারে।' কাগজের স্লিপ বাড়িয়ে দিল সে।

ওটা রিকোয়েস্ট ফর্মের ফটোকপি। ঠিক এমনই একটা ফর্ম পূরণ করে জমা দিয়েছে সান্থা, নইলে প্রিলিমিনারি সার্ভের বইটা দেয়া হবে না। লাইব্রেরি অভ কংগ্রেসের প্রতিটি ফর্ম রাখা হয় ফাইলে। এধরনের পরিস্থিতি হতে পারে ভেবেই বোধহয় এই ব্যবস্থা।

রিকোয়েস্ট ফর্মে নেম অভ পার্সন রিকোয়েস্টিং আইটেম-এ লেখা:

ট্রেভল রয়েস।

'মাঝে মাঝে এমন হয়,' আস্তে করে মাথা নাড়ল অ্যাটেণ্ড্যান্ট মেয়েটি। 'ওই ট্রেভলের বোধহয় বইটা এতই পছন্দ, চুরি না করে পারেনি। কোটের পকেটে রেখে বেরিয়ে গেছে। আগে আমাদের বইয়ে ম্যাগনেটিক ট্যাগ থাকত না। গার্ডদের ফাঁকি দিয়েছে সহজেই।'

মেয়েটার কথায় মন নেই সান্থার।

চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। হাতে রিকোয়েস্ট ফর্ম। তিরিশ বছরের বেশি ধরে এই কাগজ পড়ে ছিল লাইব্রেরি অভ কংগ্রেসের কোনও কেবিনেটে। প্রমাণ হিসাবে রয়ে গেছে।

জ্বলজ্বল করে উঠল সান্থা ক্যাসেডিনের দুই চোখ। মনে মনে বলল, 'আমি আপনাকে খুঁজে বের করব, ট্রেভল রয়েস!'

ও জানে না, কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে সাপ বের করবে।

অফিসে ফিরে পরবর্তী দেড় ঘণ্টা পুরনো ফোন ডিরেক্টরি

ঘাঁটাঘাঁটি করল সান্থা। বেশ কয়েকজন ট্রেভল রয়েসকে পেল। এদের প্রায় সবাই সাধারণ লোক। এক এক করে খোঁজ নিতে শুরু করল ও। একজনকে উপযুক্ত মনে হলো ওর।

সান্থার জানা নেই, ১৯৮০ সালে নিউ ইয়র্ক থেকে ফকম্যান পাবলিকেশন প্রকাশিত উইলিয়াম সিলভারম্যানের 'দ্য পেন্টাগন অ্যাণ্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন' বইয়ে রয়েছে এক ট্রেভল রয়েস, ইনিই ফোন ডিরেক্টরির গুরুত্বপূর্ণ সেই সরকারি কর্মকর্তা।

পরের পনেরো মিনিটে কয়েক জায়গায় ফোন করল সান্থা, কোনও তথ্য পেল না। এবার ওর এক পাগলি বান্ধবীকে ফোন দিল। এই মেয়ে আমেরিকান পলিটিক্স-এ এম.এ. করেছে হার্ভার্ড থেকে। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সে জানাল, সান্থা যে ট্রেভল রয়েস সম্পর্কে তথ্য চাইছে, তা পাবে ইয়া মোটা এক বইয়ে।

বান্ধবীকে ধন্যবাদ দিয়ে ফোন রেখে অল স্টেটস লাইব্রেরির সাইটে গিয়ে 'দ্য পেন্টাগন অ্যাণ্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন' বইটি বের করল সান্থা। পড়তে শুরু করে একটু পর বিরক্ত হয়ে সার্চ দিল ট্রেভল রয়েস নাম খুঁজে নেয়ার জন্য।

তিন সেকেণ্ড পর স্ক্রিনে ভেসে উঠল ওই বইয়ের ষষ্ঠ অধ্যায়: 'দ্য পেন্টাগন'।

শুরুতেই দেখা গেল ট্রেভল রয়েসের বিষয়ে লেখা:

'...কেউ তাঁদের কোনও বইয়ে উল্লেখ করেননি, তাঁর মিলিটারি অ্যাডভাইজারদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল রিচার্ড নিক্সনের। বিশেষ করে এয়ার ফোর্সের কর্নেল ট্রেভল রয়েস...' (পৃষ্ঠা— একাশি)

'...ওয়াটারগেট কেলেঙ্কারি শেষে কেউ বলতে পারেনি কর্নেল ট্রেভল রয়েস এসবের সঙ্গে জড়িত ছিল। উনি জয়েণ্ট চিফস অভ স্টাফের সঙ্গে নিক্সনের লিয়াঁজো রক্ষা করতেন। নিক্সন যখন বাধ্য হয়ে অবসর নিলেন, ততদিনে ট্রেভল পূর্ণ কর্নেল। তিনিই ছিলেন

রিচার্ড নিক্সনের দুই কান।

'এটা অবিশ্বাস্য মনে হয়, নিক্সন ১৯৭৪ সালে অবসর নেয়ার পর ট্রেভল রয়েসকে আইনী সমস্যার ভিতর পড়তে হয়নি। এরপর প্রেসিডেন্ট ফোর্ড ও কার্টারের আমলে জয়েন্ট অভ স্টাফের সঙ্গে প্রেসিডেন্টের লিয়াঁজো অফিসার ছিলেন। খুব ঠাণ্ডা মগজের লোক, সবসময় নিজেকে গুটিয়ে রাখতেন। ১৯৭৯ সালে হঠাৎ করেই তাঁর পদ খালি হয়ে যায়।

'কার্টার অ্যাডমিনিস্ট্রেশন থেকে এর কোনও ব্যাখ্যা দেয়া হয়নি। ট্রেভল রয়েস অবিবাহিত, অনেকের ধারণা সমকামী ছিলেন। আরলিংটনে মিলিটারি অ্যাকাডেমিতে একা বাস করতেন। এমন কেউ নেই যে বলবে ট্রেভল রয়েস ছিলেন তার বন্ধু। প্রায়ই আমেরিকা ছেড়ে চলে যেতেন। কখনও জানা যায়নি গন্তব্য। এরপর ১৯৭৯ সালের ডিসেম্বরে হঠাৎ করেই সহকর্মীরা টের পেলেন, উনি তাঁদের সঙ্গে অফিস করছেন না।

'তাঁর খোঁজ পড়ল, কিন্তু আর কখনও ফিরলেন না ট্রেভল রয়েস...' (পৃষ্ঠা— ৮৬)

ব্রিটিশ কমাণ্ডার মেজর জেনারেল জুলিয়াস বি. গুণ্ডারসন এসে দাঁড়িয়েছেন উইলকক্স আইস স্টেশনের পুল ডেকে। একঘণ্টার একটু বেশি হলো দখল করে নিয়েছেন এই স্টেশন। পুরোপুরি আত্মবিশ্বাসী একজন মানুষ।

বিশ মিনিট আগে স্টেশনের ডাইভিং বেল করে পুরো সশস্ত্র কয়েকজন ডুবুরিকে পাঠিয়ে দিয়েছেন নীচে। অবশ্য, আরও নব্বুই মিনিট পর পাতাল-গুহায় পৌঁছবে তারা। এখনও পুলের ভিতর সরসর করে নেমে চলেছে কেবল।

গুণ্ডারসন নিজেও কালো থারমাল ওয়েটসুট পরেছেন। ঠিক করেছেন, দ্বিতীয় দলের সঙ্গে পাতাল-গুহায় নামবেন, নিজ চোখে

দেখবেন ওখানে কী আছে।

গানারি সার্জেন্ট ভাইপার ও দুই বিজ্ঞানীকে দেখে বললেন, 'বেশ, তো এঁরা কারা?' হাসি-হাসি হয়ে গেল মুখ। 'বাহ্, খুব খুশি হলাম, গানারি সার্জেন্ট পল সিংগার দেখছি!'

অবাক হয়েছে ভাইপার। ভাবতে পারেনি ব্রিটিশ কমাণ্ডার ওকে চিনতে পারবে।

'গানারি সার্জেন্ট পল সিংগার,' বললেন গুণ্ডারসন। 'জন্ম বস্টনে, উনিশ শ' তেয়াত্তর সালে। একানব্বুই সালে ইউনাইটেড স্টেটস মেরিন কর্পসে যোগ দাও আঠারো বছর বয়সে; স্মল আর্মস এক্সপার্ট; হ্যাণ্ড টু হ্যাণ্ড কমব্যাট এক্সপার্ট; স্নাইপার। দুই হাজার দুই সালে ব্রিটিশ ইন্টেলিজেন্স প্রথম সন্দেহ করে, তুমি আমেরিকান স্পাই এজেন্সি ইন্টেলিজেন্স কনভার্জেন্স গ্রুপের সঙ্গে জড়িত।

'মনে নেই আমার, কী নামে যেন ডাকে তোমাকে? ...ভাইপার, তাই না? আমাকে বলো দেখি, বিষাক্ত সাপ, মাঝে মাঝেই এ ধরনের বিপদে পড়ো? দেখা যাচ্ছে, তোমার কমাণ্ডিং অফিসার তোমাকে খুঁটির সঙ্গে আটকে রেখে গেছে। কেন? কেন সে শত্রুর মুখে তোমাকে এভাবে ফেলে গেল?'

কোনও জবাব দিল না ভাইপার।

'আমার মনে হয়নি মাসুদ রানা এমন লোক, বিশ্বস্ত অনুচরকে ফেলে পালাবে,' বললেন গুণ্ডারসন। 'নিশ্চয়ই এর কোনও ব্যাখ্যা আছে?' আবারও হেসে ফেললেন তিনি। 'এবার বলো দেখি কারণটা।'

কোনও জবাব দিল না সিংগার। বারবার গুণ্ডারসনের পিছনে ডাইভিং বেলের কেবলের উপর চলে যাচ্ছে ওর চোখ।

ফ্রেঞ্চ বিজ্ঞানীদের দিকে মনোযোগ দিলেন গুণ্ডারসন। 'আর আপনারা যেন কারা?'

মেজাজি ভঙ্গি নিয়ে বলল ম্যাথিউ ফ্যনুয়্যা, 'আমরা রিসার্চ স্টেশন ডুমো ডি'খ-ঈলেখের বিজ্ঞানী। ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমাদেরকে আটকে রেখেছে কোথাকার কে এক মেজর মাসুদ রানা। আমি দাবি করছি আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী...'

'মিস্টার বোউল্‌স্‌...'

কথাটা শেষ হলো না, তার আগেই বিশালদেহী বোউলস পিস্তল উঁচু করল, পরক্ষণে পয়েন্ট-ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জে গুলি করল ম্যাথিউ ফ্যনুয়্যাকে।

ফ্রেঞ্চ বিজ্ঞানীর মাথা বিস্ফোরিত হয়েছে। রক্ত ও মগজ ছিটকে লেগেছে সিংগারের গালে।

স্যাঁ ডেনি পেঁয়েযি ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করেছে।

তার দিকে ঘুরে চাইল গুণ্ডারসন। 'তুমিও ফ্রেঞ্চ?'

ফুঁপিয়ে ওঠা বেড়ে গেল।

'মিস্টার বোউল্‌স্‌,' বলল গুণ্ডারসন।

পেঁয়েযি বুঝে গেছে কী হবে। 'না!' চেঁচিয়ে উঠল। আবারও পিস্তল তুলল পার্কার বোউল্‌স্‌, এক সেকেণ্ড পর সিংগারের অপর গালে লাগল টকটকে রক্ত ও কাঁচা মগজ।

অপ্রশস্ত এলিভেটার শাফটের নীচে ঘুটঘুটে অন্ধকার, গুলির বিকট আওয়াজে চটকা ভেঙেছে নিশাত সুলতানার।

'ধুৎ!' আনমনে ভাবল। আবারও বোধহয় জ্ঞান হারিয়েছিল।

আমাকে সচেতন থাকতে হবে, ভাবল।

যেভাবে হোক...

সঙ্গে আনা স্বচ্ছ প্লাস্টিকের ফ্লুইড ব্যাগের দিকে চাইল। ওটার সঙ্গে সংযুক্ত ওর বাহুর ইণ্ট্রাভেনাস ড্রিপ।

ফুরিয়ে গেছে ফ্লুইড ব্যাগ।

সেটাও বিশ মিনিট আগের কথা।

শিউরে উঠল নিশাত। বড্ড ঠাণ্ডা। দুর্বল লাগছে। বুজে আসছে দুই চোখ।

দাঁত দিয়ে জিভ কামড়ে ধরল নিশাত। ব্যথা পেয়ে আবারও চোখ মেলল।

কয়েক মিনিট এভাবে জেগে থাকল, তারপর আবারও বুজে এল চোখ।

এলিভেটার শাফটের নীচে জ্ঞান হারিয়ে পড়ে রইল নিশাত সুলতানা। একা।

ই-ডেকে পা বাড়াল জুলিয়াস বি. গুণ্ডারসন, সরু হয়ে গেছে দুই চোখ। 'গানারি সার্জেন্ট পল সিংগার। বড় দুষ্ট লোক ছিলে তুমি, ঠিক কি না?'

নীরব থাকল পল সিংগার।

'তুমি কি সত্যিই আইসিজি, বিষাক্ত সাপ? ...সত্যিই বিশ্বাসঘাতক? ...নিজের ইউনিটের বিরুদ্ধে কাজ করেছ? ...আসলে কী করেছ তুমি? অনেক আগেই নিজের কাভার হারিয়েছ, খুন করতে শুরু করেছ নিজ লোক? ...অথচ, স্টেশন তখনও সিকিউর করা হয়নি। বুঝতে পারছি মাসুদ রানা ভীষণ খেপেছে। আর ওই তোমাকে ফেলে গেছে। যাতে আমি ওর কাজটা শেষ করি।'

ঢোক গিলল ভাইপার।

শীতল চোখে লোকটার দিকে চাইল গুণ্ডারসন। 'আমি হলেও এই একই কাজ করতাম, সার্জেন্ট।'

মেজর জেনারেলের পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে এক তরুণ এসএএস কর্পোরাল। 'স্যর।'

'বলো, কর্পোরাল?'

'চার্জগুলো এবার স্টেশনের সীমানায় বসানো হবে।'

'রেঞ্জ কত?'

'পাঁচ শ' গজ, স্যর। আপনার নির্দেশ মত, ঘিরে ফেলা হবে স্টেশন।'

'গুড,' মাথা দোলাল গুণ্ডারসন। উইলকক্স স্টেশনে পৌঁছেই আঠারোটা ট্রাইটোনাল চার্জ বসাতে বলেছে সে। প্রায় বৃত্তাকারে ঘিরে নেয়া হবে স্টেশন। ওগুলোর বিশেষ কাজ আছে।

'কর্পোরাল, কতক্ষণের ভিতর বিস্ফোরক বসাতে পারবে?' জানতে চাইল গুণ্ডারসন।

'ড্রিলিঙের জন্য আরও এক ঘণ্টা নেব, স্যর।'

'ঠিক আছে,' বলল গুণ্ডারসন। 'তারপর সব বসিয়ে দেয়ার পর, আমার কাছে নিয়ে আসবে ডেটোনেশন ইউনিট।'

'ইয়েস স্যর,' বলল কর্পোরাল। 'ও, আরেকটা কথা, স্যর...'

'হ্যাঁ, বলো?'

'স্যর, আমেরিকান হোভারক্রাফট থেকে যে দুই বন্দি পেয়েছি, তাদেরকে কী করব?'

আগেই রেডিয়ো করেছে গুণ্ডারসন, ছোট মেয়েটি এবং ওই লোককে নিয়ে আসতে হবে স্টেশনে।

'ওই মেয়েকে ওর কোয়ার্টারে নিয়ে আটকে রাখো,' বলল গুণ্ডারসন। 'আর লোকটাকে নিয়ে এসো এখানে।'

পাতাল-গুহার আঁধার এক কোণে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে তিশা করিম। ওর হাতের ফ্লাশলাইটের আলো পড়েছে বরফ-দেয়ালে ছোট এক ফিসারের উপর।

বরফের দেয়াল যেখানে নেমে এসেছে, মেঝে ছুঁয়ে ওই ফাটল— বড়জোর দুই ফুট উঁচু, পাশে ছয় ফুটের বেশি হবে না। হামাগুড়ির ভঙ্গিতে বসে ফাটলের ভিতর চোখ চালাল তিশা। আঁধারে কিছুই দেখা গেল না। অবশ্য, আঁচ করা গেল ওদিকে

ফাঁকা জায়গা।

'এই যে!'

ঘুরে চাইল তিশা।

গুহার আরেক প্রান্তে স্পেসশিপের নীচে দাঁড়িয়ে আছে নিনা ভিসার। বারকয়েক হাত নাড়ল। উত্তেজিত স্বরে বলল, 'এই যে! আসুন! একবার দেখে যান!'

উঠে দাঁড়িয়ে রওনা হয়ে গেল তিশা, একমিনিট পেরুবার আগেই পৌঁছে গেল বিশাল কালো স্পেসশিপের পাশে। একই সময়ে হাজির হয়েছে সার্জেণ্ট জনি ওয়াকার। পুকুরের পাশে পাহারা দিচ্ছে লেফটেন্যাণ্ট গোলাম মোরশেদ।

'এটা আপনাদের কাছে কী মনে হয়?' বিমানের পেটের কাছে কী যেন দেখাল নিনা ভিসার।

তার পাশে চলে গেল তিশা, জিনিসটা দেখে ভুরু কুঁচকে গেল। মনে হলো, ওটা কোনও কিপ্যাড ধরনের কিছু।

বারোটা বাটন, তিনটি সারিতে চারটে করে বাটন। বাটনের উপরে চারকোনা কালো স্ক্রিন।

অবশ্য, এই কিপ্যাডে একটা বিষয় বড় অবাক করা।

এসব কি-র উপর কোনও লেখা বা চিহ্ন নেই।

স্পেসশিপের অন্য সব কিছুর মতই কিপ্যাড ও ব্যাকগ্রাউণ্ড কুচকুচে কালো। জিনিসটা ক্যালকুলেটারের মত।

তিশা খেয়াল করেছে, একটা বাটনে চিহ্ন আছে। মাঝের কলামে দ্বিতীয় বাটনে ছোট্ট একটা লাল বৃত্ত।

'জিনিসটা কী হতে পারে?' বলল সার্জেণ্ট ওয়াকার।

'কে জানে!' বলল নিনা ভিসার।

'হয়তো এটা দিয়ে বিমান চালু করা যায়,' বলল তিশা।

'মনে হয় না,' মাথা নাড়ল নিনা ভিসার। 'কখনও কোনও এলিয়েনকে কিপ্যাড ব্যবহার করতে দেখেছেন?'

'আমি কোনও এলিয়েনকে চিনি না,' বলল তিশা। 'আপনি চেনেন?'

কথাটা পাত্তা দিল না নিনা ভিসার। 'কেউ জানে না এটা কী। হয়তো ইগনিশন কি, বা ওয়েপন্স সিস্টেম...'

'অথবা সেলফ-ডেসট্রাক্ট মেকানিজম,' শুকনো স্বরে বলল তিশা।

'আমি কি একটা বাটন টিপে দেখব?' বলল নিনা।

'কিন্তু কোন্ বাটন টিপবেন?' আপত্তি জানাল ওয়াকার।

'আর কোনটা, যেটার ভিতর বৃত্ত আঁকা।'

ওয়াকারের দুই ঠোঁট পরস্পরকে টিপে ধরল। সবার ভিতর সে সবচেয়ে বয়স্ক। সবাই আশা করছে, ও কিছু বলবে। তিশার দিকে চাইল ওয়াকার।

আস্তে করে মাথা নাড়ল তিশা। 'এই জিনিস কী কাজ করে তা দেখবার জন্য আমাদেরকে পাঠানো হয়নি। বলে দেয়া হয়েছে পাহারা দিয়ে রাখতে হবে। আমেরিকান সৈনিকরা এলে আমাদের ছুটি।'

গোলাম মোরশেদের দিকে চাইল ওয়াকার। সে পুল ছেড়ে চলে এসেছে স্পেসশিপের পাশে।

'দিন টিপে, তিশা,' বলল মোরশেদ। 'দেখা যাক কী হয়... নইলে খামোকা কিনব কেন?'

তিশা চুপ করে আছে।

নিনা ভিসারের দিকে চাইল ওয়াকার। মেয়েটা আস্তে করে মাথা দোলাল। 'দেখা যাক কী হয়?'

'বাটন টিপুন,' বলল ওয়াকার।

বড় করে শ্বাস নিল নিনা ভিসার, তারপর লাল বৃত্ত আঁকা বাটন টিপে দেয়ার জন্য হাত বাড়িয়ে দিল। স্পর্শ করল বাটন।

এতে কিছুই হলো না।

চাপ দেয়া শেষে আস্তে করে কিপ্যাড থেকে আঙুল সরিয়ে নিল নিনা ভিসার। মুখ তুলে চাইল স্পেসশিপের দিকে। ভাব দেখে মনে হলো, আশা করেছিল বিমান ভেসে উঠবে, বা কিছু হবে। না, কিচ্ছু হলো না।

তারপর হঠাৎ করেই সুরেলা মৃদু আওয়াজ হলো। কিপ্যাডের উপর জ্বলজ্বল করে উঠল স্ক্রিন।

এক সেকেণ্ড পর স্ক্রিনে দেখা দিল এক সারিতে কী যেন।

'আরে,' বিড়বিড় করল জনি ওয়াকার।

'এটা কী?' কাঁপা স্বরে বলল নিনা ভিসার।

স্ক্রিনে লেখা ভেসে উঠেছে:

২৪১৫৭৮১৭- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

এণ্টার অথোরাইয্ড্ এণ্ট্রি কোড

'নম্বর?' অবাক হয়ে বলল জনি ওয়াকার।

'তাও আবার ইংরেজিতে?' বলল নিনা ভিসার। 'এই জিনিস আসলে কী?'

আস্তে করে মাথা নাড়ল তিশা, রওনা হয়ে গেল ওদিকের ফাটল লক্ষ্য করে, ঠোঁটে মৃদু হাসি।

দশ

বরফ-ঠাণ্ডা আইসবার্গের উপর চিত হয়ে শুয়ে আছে মাসুদ রানা ও রাশেদ হাবিব, শুনছে নিয়মিত বিরতিতে মস্ত সব ঢেউ আছড়ে পড়ছে দুই শ' গজ দূরে ক্লিফের গায়ে।

ওরা ঠিক করেছে, একটু বিশ্রাম নেবে, তারপর দম ফিরে পেলে স্থির করবে কী করা যায়।

কয়েক মিনিট পেরুবার পর কোমরে হাত নিল রানা, কালো ছোট্ট ইউনিটের বাটন টিপে দিল।

'বিপ!' শব্দ তুলল যন্ত্রটা।

'কী করছেন, ভাই?' ওদিকে না চেয়েই জানতে চাইল হাবিব।

'জিপিএস ইউনিট ইনিশিয়ালাইয করলাম,' বলল রানা। এখনও চিত হয়ে পড়ে আছে। 'এটা স্যাটালাইট লোকেশন সিস্টেম, ন্যাভিস্টার গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেমে চলে। মেরিনদের কাছ থেকে পেয়েছি। সবাইকে একটা করে দিয়েছে, ইমার্জেন্সি হলে ব্যবহার করতে।'

'তাতে কী হবে, ভাই?'

'খুঁজে বের করা সোজা হবে। ধরুন আমরা সাগরের মাঝে থাকলেও।'

'তা হলে আমাদেরকে উদ্ধার করতে কেউ আসবে?' জানতে চাইল হাবিব।

'হ্যাঁ, আসবে,' বলল রানা। 'কিন্তু ততক্ষণে আমরা শীতে জমে লাশ। ওরা এসে আমাদের মৃতদেহ নিয়ে যাবে।'

'এই জগতে আমার আপন কেউ নেই, ভাই। বিজ্ঞানী মানুষ, বিজ্ঞানের কিছুটা ক্ষতি হলেও হতে পারে, আর কারও কিছুই এসে যাবে না।' নরম গলায় বলল হাবিব। 'আর মরেই যদি যাই, লাশের কী হবে তা নিয়ে ভাবি না।'

'মারা যাওয়ার আগে কাজ আছে না? নোট লিখব, উইলকক্স আইস স্টেশনে কী ঘটেছে সব জানাব। ফ্রেঞ্চ হামলা, বা গুণ্ডারসনের গুণ্ডামি...'

'ব্যাটাদের শাস্তি হবে তাতে?'

'হতেও পারে।'

'এটা শুনে একটু ভাল লাগছে।'

কনুইয়ে ভর দিয়ে আধ-শোওয়া হলো রানা, ঘুরে চাইল ক্লিফের দিকে। দক্ষিণ সাগরের প্রকাণ্ড সব ঢেউ গিয়ে পড়ছে ওখানে। বিস্ফোরণের বিকট আওয়াজ, তারপর ফিরছে সাদা ফেনা স্‌স্‌ আওয়াজ তুলে।

প্রথমবারের মত এই আইসবার্গের উপর মন দিল রানা। প্রকাণ্ড বরফের চাঁই এটা। এতই ভারী, উন্মত্ত সাগরের মস্ত সব ঢেউ চাইলেও নাচাতে পারছে না একে। দৈর্ঘ্যে কমপক্ষে একমাইল। পানির নীচে কত বড়, কে জানে!

চারকোনা আইসবার্গ, একপাশে বিশাল এক চূড়া। এ ছাড়া অন্যদিক এবড়োখেবড়ো, ফাটল ধরা। রানার মনে হলো, ওরা আছে বরফের তৈরি কোনও চাঁদের জমিতে।

উঠে দাঁড়াল ও।

'কোথা চললেন, ভাই?' জানতে চাইল হাবিব। আরাম করে শুয়ে আছে। 'মরেই যদি যাই, এই জায়গাটা খারাপ কোন্ হিসাবে? আপনি তো আর হেঁটে বাড়ি ফিরতে পারবেন না।'

'দেখি না, হাঁটতে থাকি চলুন,' বলল রানা। 'হাঁটলে শরীর তো অন্তত গরম হবে। হয়তো মাথা থেকে বুদ্ধি বেরিয়ে যাবে, কীভাবে তীরে ওঠা যায়।'

হতাশ হয়ে আস্তে করে মাথা নাড়ল রাশেদ হাবিব, অবশ্য উঠে দাঁড়াল। রানার পাশে হাঁটতে শুরু করেছে। প্রায় বিশ মিনিট হাঁটল ওরা, তারপর টের পেল, ভুল দিকে এসেছে।

এদিকে হঠাৎ করেই শেষ হয়েছে আইসবার্গ। ওপাশে শুধু পশ্চিম দিগন্ত ও নীচে সাগর। সবচেয়ে কাছে তিন মাইল দূরে আইসবার্গ। রানা আশা করেছিল, এক হিমশৈল থেকে আরেকটায় উঠবে, এভাবে পৌছুবে তীরে। সে সম্ভাবনা নেই।

ফিরতি পথ ধরল ওরা। এবার গতি হলো অনেক মন্থর।

হাবিবের ভুরু ও ঠোঁটে জমতে শুরু করেছে মিহি তুষার।

'আইসবার্গ সম্বন্ধে কিছু জানেন?' জানতে চাইল রানা।

'সামান্য।'

'শুনে দেখি, কিছু শেখা যায় কি না।'

'পত্রিকায় পড়েছি, ইদানীং বড়লোকদের ভিতর খুব চালু হয়েছে আইসবার্গ ক্লাইম্বিং। পাহাড়ে না উঠে বরফের চাঁইয়ের উপর... কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, একদিন আপনার পাহাড় গলবে।'

'এসব নয়, বৈজ্ঞানিক কিছু আশা করেছিলাম,' বলল রানা। 'যেমন ধরুন, এসব হিমশৈল কখনও তীরে গিয়ে ভেড়ে?'

'না, কক্ষনো না,' মাথা নাড়ল হাবিব। 'এগুলো অ্যাণ্টার্কটিকার ঠিক মাঝখান থেকে বাইরের দিকে আসে। উল্টো রাস্তায় যায় না। মেইন আইস শেলফ থেকে ভেঙে পড়েছে আমাদের এই আইসবার্গ। তাই এদিকটা এত খাড়া দেখতে পাচ্ছেন। ঝুলতে ঝুলতে বেশি ভারী হয়ে, নিজের ওজন সামলাতে না পেরে ভেঙে পড়ে এরা সাগরে,' হাত দিয়ে চারপাশ দেখাল হাবিব, 'হয়ে যায় এরকম এক-একটা আইসবার্গ।'

'বুঝলাম।' বরফ জমিনের উপর দিয়ে হেঁটে চলেছে রানা।

'কোনও কোনোটা সত্যিই বিশাল হয়। এতই বড় যে ভাবতে পারবেন না। ধরুন আস্ত একটা দেশের চেয়েও বড়। এই হিমশৈলের দিকেই দেখুন। এটা বিরাট। বেশিরভাগ আইসবার্গ দশ থেকে বারো বছর টেকে, তারপর গলে মিশে যায় সাগরে। কিন্তু পরিবেশ ঠিক থাকলে, আর আইসবার্গ প্রকাণ্ড হলে— এটার মত একটা হিমশৈল টিকবে তিরিশ থেকে চল্লিশ বছর।'

'বলতে থাকুন,' বলল রানা।

হাবিব যেখান থেকে ওকে তুলে নিয়েছিল, সেখানে পৌঁছে গেছে ওরা। একটু দূরেই ডুবে গেছে ফ্রেঞ্চ সাবমেরিন।

'হেঁটে কী লাভ, বলুন?' বলল হাবিব। 'আবার ফিরে এসেছি

আগের জায়গায়।'

মৃদু এক চড়াইয়ে উঠছে ওরা। ওদিকে এসে লেগেছিল ফ্রেঞ্চ সাবমেরিনের টর্পেডো।

মনে হলো ওখানে আইসবার্গে মস্ত কামড় বসিয়েছে দৈত্য। ওই টর্পেডো বিস্ফোরণের ফলে প্রচুর বরফ নেমেছে সাগরে। আইসবার্গের গায়ে প্রায় বৃত্তাকার বিশাল এক গর্ত তৈরি হয়েছে। ওখানে খাড়া বরফের দেয়াল নেমে গেছে তিরিশ ফুট নীচের সাগরে।

গর্তের ভিতর চোখ বোলাল রানা। দানব হিমশৈলের পায়ের কাছে হুমড়ি খেয়ে পড়ছে সাগরের ঢেউ।

'আমরা এখানেই মরব, তাই না?' রানার পিছন থেকে বলল হাবিব।

'আমি মরব না,' বলল রানা।

'মরবেন না?'

'না। আবারও ফিরব, দখল করে নেব উইলকক্স আইস স্টেশন। এ ছাড়া আর কোনও পথ নেই।'

'তাই করবেন ভাবছেন?' সাগরের দিকে চাইল হাবিব। 'তো বলুন কীভাবে ওখানে যাবেন?'

জবাব দিল না রানা।

'আপনি দারুণ একটা খোয়াব দেখছেন, মেজর রানা,' বলল হাবিব। 'হাইপোথারমিয়া হলে এমন হয়। এবার ধীরে ধীরে...'

হাবিবের কথায় মন নেই রানার। হাঁটু গেড়ে বসে পড়েছে। টর্পেডোর আঘাত লাগা প্রায়-বৃত্তাকার গর্তের ভিতর চেয়ে আছে।

ওর পাশে এসে দাঁড়াল হাবিব। 'কী দেখছেন, ভাই?'

'মুক্তির পথ,' বলল রানা, 'হাল ছাড়ব কেন?'

রানার দৃষ্টি লক্ষ্য করে চাঁদের মত গোল গর্তে চোখ বোলাল হাবিব। এবার চট্ করে দেখতে পেল।

বরফের খাড়া দেয়ালের দুই গজ নীচে একটা ফ্রোযেন গ্লাসের জানালা!

'এবার আপনার পারকা খুলে ফেলুন,' বলল রানা। নিজেরটা খুলতে শুরু করেছে।

হতবাক হয়ে গেছে রাশেদ হাবিব, কিন্তু ফিরে পেয়েছে আশা। দ্রুত হাতে খুলে ফেলল পারকা।

ব্যস্ত হয়ে উঠল রানা। দুই পারকা ও দুই জ্যাকেট গিঁঠ দিতেই হয়ে গেল বিশ্রী একটা দড়ি।

'আপনি পিছিয়ে শুয়ে পড়বেন, কোমরে এই দড়ি,' বলল রানা। 'আর অন্য প্রান্তে ঝুলব আমি। নামব বরফের ক্লিফ বেয়ে।'

কোনও আপত্তি থাকল না হাবিবের।

দুই মিনিট পর জ্যাকেটের দড়ি কোমরে নিয়ে নেমে পড়ল রানা। চব্বিশ ফুট নীচে বরফ ধুয়ে ফিরছে সাগরের ঢেউ। ফ্রোযেন গ্লাসের জানালার সামনে পৌঁছে গেছে রানা। মনোযোগ দিল ওদিকে।

সন্দেহ নেই, মানুষই তৈরি করেছে এই জিনিস।

অনেক বয়স। জানালার কাঠের চৌকাঠ এবড়োখেবড়ো ও ক্ষত-বিক্ষত। ফ্যাকাসে ধূসর রং ধরেছে। এই জানালা কত আগের, আঁচ করতে পারল না রানা। বোঝা গেল না জানালার ওপাশে কী ছিল। হয়তো মস্ত কোনও দালান ছিল। এখন নেই। সব হারিয়ে গেছে প্রকাণ্ড আইসবার্গের পেটের ভিতর।

রানা ধারণা করছে, জানালার সামনে কমপক্ষে দশ গজ বরফ ধসিয়ে দিয়েছে সাবমেরিনের টর্পেডো, নইলে এদিকটা বেরিয়ে আসত না। হিমশৈলের ভিতর রয়ে গেছে দালানের অন্য অংশ।

বড় করে শ্বাস নিল ও, তারপর একটা পেনাল্টি কিক হাঁকাল। ঝনঝন করে ভেঙে পড়ল জানালার কাঁচ।

ওদিকে ছোট গুহামত। হিপ পকেট থেকে ফ্লাশলাইট নিল,

সুইচ টিপে দাঁতে চেপে ধরে চৌকাঠ ধরে ঢুকে পড়ল ভিতরে।

ওর ফ্লাশলাইটের বাতি গিয়ে পড়েছে ঝুলন্ত কয়েকটি অক্ষরের উপর:

'হ্যাপি নিউ ইয়ার ১৯৬৯!
ওয়েলকাম টু লিটল আমেরিকা-৪!'

এসব লেখা হয়েছে একটা ব্যানারে। গুহার ওদিকে শিথিলভাবে ঝুলছে।

না, এটা কোনও গুহা নয়।

কোনও ধরনের ঘর। চারদেয়াল কাঠ দিয়ে তৈরি। বরফের ভিতর চাপা পড়েছে।

সব উল্টো হয়ে ঝুলছে। পুরো ঘর উল্টে গেছে।

বিদ্‌ঘুটে লাগল রানার। ও দাঁড়িয়ে আছে এই ঘরের ছাতে। এটাই এখন হয়ে দাঁড়িয়েছে মেঝে।

ডানদিকে চাইল রানা। ওদিকে বোধহয় আরও ঘর আছে। কারা ছিল...

'মেজর,' বাইরে থেকে ভেসে এল হাবিবের কণ্ঠ।

জানালা দিয়ে মাথা বের করে উপরে চাইল রানা।

'কী পেলেন? আমি তো শীতে মরে গেলাম,' বলল হাবিব।

'আগে কখনও লিটল আমেরিকা চার-এর নাম শুনেছেন?' জানতে চাইল রানা।

'হ্যাঁ,' বলল বিজ্ঞানী। 'আমেরিকানদের ছোট স্টেশন। ষাট দশকের। উনিশ শ' উনসত্তরে রস আইস শেলফ থেকে ভেঙে পড়েছিল বড় এক আইসবার্গ। ওটার সঙ্গে সাগরে ভেসে যায় ওই দালান। নয় হাজার বর্গ কিলোমিটারের হিমশৈল ছিল। নেভি তিন মাস ধরে ওটাকে খুঁজেছে। তবে আর পায়নি।'

'আমরা পেয়েছি,' বলল রানা।

'তা হলে কি নামব আমি?' জানতে চাইল হাবিব।

'দাঁড়ান, আগে তৈরি হয়ে নিই,' বলল রানা। কয়েক পা পিছনে সরল। 'এবার আস্তে করে ঝুলে পড়ুন। আমি টেনে নেব।'

লিটল আমেরিকা-৪-এর প্রধান ঘরের ছাতে গ্যাঁট মেরে বসে আছে রাশেদ হাবিব, গায়ে জড়িয়ে নিয়েছে পুরু তিনটে উলের কম্বল। নতুন উদ্যমে দুই হাত ঘষছে, ফুঁ দিয়ে চলেছে তালুতে। রানা অন্য কাজে ব্যস্ত। পরনে এখনও ভেজা ফেটিগ। অন্ধকার উল্টানো ঘরগুলোয় ঘুরে বেড়াচ্ছে। ওদের দু'জনের অত সাহস হয়নি যে চল্লিশ বছরের বেশি পুরনো খাবার পেটে পুরবে। সব ছড়িয়ে আছে ছাতে। কোক থেকে শুরু করে নানা খাবারের ক্যান।

'যা শুনেছি, লিটল আমেরিকা-৪ ছিল অনেকটা উইলকক্স আইস স্টেশনের মতই,' বলল হাবিব। 'রিসোর্স এক্সপ্লোরেশন স্টেশন, তৈরি করা হয় উপকূলীয় বরফের শেলফে। লোকগুলোর কাজ ছিল কন্টিনেন্টাল শেলফ থেকে অফ শোর অয়েল ডিপোযিট খুঁজে বের করা। ওরা কালেক্টার নামিয়ে দিত নীচের মাটি থেকে নমুনা সংগ্রহ...'

'বলতে থাকুন,' পাশের ঘর থেকে বলল রানা।

'আপনি কি জানেন কীভাবে উল্টে গেল দালান? আইসবার্গ যখন খসে পড়তে থাকে, কখনও কখনও সবকিছু উল্টে যায়। এটা খুবই যৌক্তিক। আইসবার্গ বেশি ভারী হলে মেইনল্যাণ্ড থেকে ভেঙে পড়ে। নীচের বরফ এতদিন ছিল পানির ভিতর, গরম পানিতে আস্তে আস্তে সরু হয়ে এসেছে বরফ। কাজেই হিমশৈল ভেঙে পড়লে, খুবই ব্যালেন্সড় না হলে, পুরো ডিগবাজি খায়।'

পরের ঘরে নানান জং ধরা জঞ্জালের ভিতর হাঁটছে রানা। মস্ত এক সিলিণ্ডারের মত কেবল-স্পুলার একপাশে কাত হয়ে আছে। ওখানে আরও একটা জিনিস দেখতে পেল রানা।

'নেভি কতদিন ধরে এই স্টেশনটাকে খুঁজেছে?' জানতে চাইল রানা। আগে খেয়াল করে শোনেনি।

'প্রায় তিন মাস।'

'সেটা যথেষ্ট সময় মনে করেন?'

ওই ঘর থেকে জবাব দিল হাবিব, 'যথেষ্টর বেশি। কেন, আপনার কী মনে হয়?'

আস্তে করে দরজা দিয়ে প্রধান ঘরে নামল রানা, সঙ্গে কী যেন এনেছে। হাতে ধাতব কিছু।

'আমেরিকান অভিযাত্রীদের কাছে এই জিনিস থাকার কথা নয়।' মৃদু হাসছে। সাদা কর্ড তুলে ধরেছে। ওটার দিকে চাইল হাবিব। দড়ির মতই, কিন্তু সাদা পাউডার মাখা।

'ডেটোনেটার কর্ড,' বলল রানা। প্যাঁচাতে শুরু করেছে কোমরে। 'ক্লোজ কোয়ার্টার এক্সপ্লোসিভের ফিউজ। এটার সঙ্গে যে পাউডার দেখছেন, সবই ম্যাগনেযিয়াম-সালফাইড।' ম্যাগনেযিয়াম-বেযড ডেটোনেটার কর্ড খুব দ্রুত জ্বলে, ভয়ঙ্কর তাপ ছাড়ে— এতই বেশি যে, ধাতু পর্যন্ত কেটে ফেলে। আজকাল এটা অন্য কাজে ব্যবহার হয়।

'আর এটা দেখুন,' জং ধরা প্রেশারাইয্‌ড্‌ ক্যানিস্টার তুলে ধরেছে রানা। 'ভিএক্স পয়জন গ্যাস। আর এটা...' আরেকটা টিউব দেখাল। 'স্যারিন।'

'স্যারিন গ্যাস?' চমকে গেছে হাবিব। জানে ওটা কী। স্যারিন গ্যাস ভয়ঙ্কর কেমিকেল অস্ত্র। উনিশ 'শ' পঁচানব্বুই সালে জাপানে, টোকিও সাবওয়েতে এক ক্যানিস্টার স্যারিন গ্যাস ফাটিয়ে দেয় এক টেরোরিস্ট গ্রুপ। মারা পড়ে বেশ কয়েকজন। 'ষাটের দশকে এদের হাতে এই জিনিস ছিল?' জানতে চাইল হাবিব।

'হ্যাঁ, ছিল।'

'আর আপনি ভাবছেন কেমিকেল ওয়েপন্স ফ্যাসিলিটি ছিল এই স্টেশন?' জানতে চাইল হাবিব।

'সন্দেহ নেই।'

'কিন্তু... এরা অ্যান্টার্কটিকায় কেমিকেল ওয়েপন্স টেস্ট করছিল কেন?'

'দুটো কারণে,' বলল রানা। 'প্রথম কথা: নিজ দেশে আমেরিকানরা বিষাক্ত গ্যাস ফ্রিযারে রাখে। তা ছাড়া, গ্যাসের টক্সিসিটি কমে উত্তপ্ত পরিবেশে। পরীক্ষার জন্য এমন জায়গা চাই, যেখানে সারা বছর শীত থাকে।'

'আর দ্বিতীয় কারণ?'

'দ্বিতীয় কারণ সোজা,' হাবিবের দিকে চাইল রানা। 'এখানে কেউ দেখছে না এরা কী করছে।'

আবারও পাশের ঘরে চলে গেল রানা। ওখান থেকে বলল, 'এসব গ্যাস এখন আমাদের কাজে আসবে না। কিন্তু অন্য একটা জিনিস আছে, ওটা আমাদের লাগতে পারে। হয়তো ফিরে যেতে পারব স্টেশনে।'

'জিনিসটা কী, ভাই?'

'এই যে,' দরজা দিয়ে আবারও বেরিয়ে এসেছে রানা। হাতে ধুলো ভরা স্কুবা ট্যাঙ্ক।

'এতদিন আগের জিনিস কী...'

হাবিবের কথা শেষ হওয়ার আগেই বলল রানা, 'দেখা যাক কাজ করে কি না।'

'ঠিক আছে। আমাকে কী করতে হবে?'

'ব্রিদিং অ্যাপারেটাস পরিষ্কার করুন। আমি ক্যালিব্রেটিং নিয়ে কাজ করি।'

রানার হাত থেকে ব্রিদিং অ্যাপারেটাস নিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠল হাবিব। ঝাড়ফুঁক শুরু করেছে মাউথপিস, ভালভ ও এয়ার হোসের

উপর।

রানার ভয় অন্যখানে। এতদিনে বিষাক্ত হয়ে উঠতে পারে কমপ্রেস্‌ড্ এয়ার।

বিষাক্ত হয়েছে কি না বুঝবার একটাই মাত্র উপায়।

ওই বাতাসে বড় করে দম নিল রানা, অপলক চেয়ে রইল হাবিবের দিকে। যখন দেখল ধুপ করে পড়ে মরল না, বলল, 'বাতাস ঠিকই আছে।'

পরবর্তী বিশ মিনিট স্কুবা গিয়ার নিয়ে কাজ করল ওরা। প্রায় তৈরি হয়ে গেল সব। কাজের ফাঁকে হাবিব বলল, 'আপনি কি চার্লস মুনের লাশ দেখেছেন?'

কাজ থেকে মুখ তুলে হাবিবের দিকে চাইল রানা। সাগরের পানি দিয়ে দুই মাউথপিস পরিষ্কার করছে বেঁটে বিজ্ঞানী।

'হ্যাঁ, দেখেছি,' নিচু স্বরে বলল রানা।

'কী দেখলেন?' হাবিবের কণ্ঠে জোরালো আগ্রহ প্রকাশ পেল।

দ্বিধা করল রানা। 'দাঁত দিয়ে জিভ কেটে ফেলেছেন উনি।'

'হুম্।'

'খুব শক্ত ভাবে আটকে ছিল চোয়াল। চোখদুটো রক্তলাল।'

আস্তে করে মাথা দোলাল হাবিব। 'আপনাকে কী বলেছে ওরা?'

'নিনা ভিসার জানিয়েছে, আপনি মুনের গলায় হাইপোডারমিক নিডল গেঁথে দেন। লিকুইড ড্রেইন ক্লিনার ঢুকে পড়ে রক্তে। সঙ্গে সঙ্গে মারা যান ভদ্রলোক।'

বোদ্ধার মত মাথা দোলাল হাবিব। 'এবার একবার এটা দেখুন, ভাই।' পারকার বুক পকেট থেকে মোটা বই বের করেছে সে। ওটা পানিতে চুপচুপে ভেজা। রানার দিকে বাড়িয়ে দিল।

ওটা নিল রানা।

বইয়ের কাভারে লেখা: বায়োটক্সিকোলজি অ্যাণ্ড টক্সিন-

রিলেটেড ইলনেস।

'কেউ যদি আপনাকে ড্রেইন ক্লিনার দিয়ে মারতে চায়, প্রথমে আপনার হৃৎপিণ্ড বন্ধ হবে,' বলল হাবিব। 'বেকায়দা ভাবে ঠাস্ করে পড়েই মরবেন। দ্বিতীয় অধ্যায় দেখুন।'

ভেজা পাতা উল্টে দ্বিতীয় চ্যাপ্টারে গেল রানা। শিরোনামে লেখা: টক্সিন-রিলেটেড ইন্সট্যান্টেনিয়াস ফিজিওলজিক্যাল ডেথ।

লেখক পরিচিত সব বিষের নামের তালিকা দিয়েছেন। মাঝে রয়েছে ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ক্লিনিং ফ্লুইড, ইনসেকটিসাইড।

'মূল কথা,' বলল হাবিব, 'ওই ধরনের বিষ প্রয়োগ করলে বাইরে থেকে লাশের কোনও পরিবর্তন দেখা যায় না। আপনার হৃৎপিণ্ড হঠাৎ করেই বন্ধ হবে।' চুটকি বাজাল সে। 'কিন্তু অন্য কোনও বিষে অন্য প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে। যেমন সাগরের সাপের বিষ।'

'সি স্নেক ভেনম?' বলল রানা।

'চ্যাপ্টার নাইন,' বলল হাবিব।

ওই অধ্যায় খুঁজে নিল রানা। ন্যাচারালি অকারিং টক্সিন— সি ফোনা।

'সি স্নেক খুঁজে নিন,' বলল হাবিব।

পাতা ওল্টাতে শুরু করেছে রানা। পেয়ে গেল: সি স্নেক্স্— টক্সিন্স, সিমটম্স্ অ্যাণ্ড ট্রিটমেণ্ট।

'এবার একটু পড়ুন,' বলল হাবিব।

পড়তে শুরু করেছে রানা।

'জোরে পড়ুন, ভাই,' বলল হাবিব।

উচ্চারণ করে পড়তে শুরু করেছে রানা: 'দ্য কমন সি স্নেক (এনহাইড্রিনা সিসেস্টোসা) হ্যায আ ভেনম উইদ এ টক্সিসিটি লেভেল থ্রি টাইম্স্ দ্যাট অভ দ্য কিং কোবরা, দ্য মোস্ট লিথাল ল্যাণ্ড-বেযড স্নেক। ওয়ান ড্রপ (০.০৩ এমএল) ইয এনাফ টু

কিল থ্রি মেন। কমন সিমটম্‌প্‌স্‌ অভ সি স্নেক এনভেনোমেশন ইনক্লুড একিং অ্যাণ্ড স্টিফনেস অভ মাস্‌ল্‌স্‌, থিকেনিং অভ দ্য টাং, প্যারালাইসিস, ভিয়্যুয়াল লস, সিভিয়ার ইনফ্লেমেশন অভ দ্য আই এরিয়া অ্যাণ্ড ডাইলেশন অভ দ্য পিউপ্‌ল্‌স্‌, অ্যাণ্ড মোস্ট নোটেবলি অভ অল, লক-জ। ইনডিড, সো সিভিয়ার ইয লক-জ ইন কেস, দ্যাট ইট ইয নট আননৌন ফর ভিক্টিম্‌স অভ দ্য সি স্নেক এনভেনোমেশন টু...'

রানাকে থামিয়ে দিল হাবিব। নরম স্বরে বলল, 'এবার ওখান থেকেই পড়ুন।'

'...টু সিভিয়ার দেয়ার ওউন টাংস্‌ উইদ দেয়ার টিথ,' পড়া থেকে চোখ তুলে বেঁটে বিজ্ঞানীর দিকে চাইল রানা।

আস্তে করে মাথা দোলাল হাবিব। 'এখন আমাকে খুনি মনে হচ্ছে আপনার, মেজর?'

'আপনি হয়তো হাইপোডারমিক সিরিঞ্জের ভেতর সি স্নেক ভেনম ভরেছেন,' বলল রানা।

'না, ভাই, উইলকক্স আইস স্টেশনে সি স্নেক ভেনম রাখা হয় বায়োটক্সিন্স ল্যাবে, সে ঘর সবসময় তালা দিয়ে রাখা হয়,' বলল হাবিব। 'মাত্র দুই একজন ওই ঘরে যেত। তাদের ভিতর আমি ছিলাম না।'

রানার মনে পড়ল বায়োটক্সিন্স ল্যাবরেটরি বি-ডেকে। ওখানে তিনটে বৃত্ত দিয়ে বায়ো-হ্যাযার্ড সাইন ছিল দরজার উপর।

অন্য চিন্তা এল ওর। নিনা ভিসার বলেছিল: এসব শুরু হওয়ার আগে বি-ডেকে জন প্রাইসের সঙ্গে বায়ো ল্যাবে ছিল সে। ভদ্রলোক এনহাইড্রিনা সিসেস্টোসার নতুন অ্যান্টিভেনম নিয়ে কাজ করছিলেন।'

মন থেকে চিন্তাটা সরিয়ে দিতে চাইল রানা।

না, নিনা ভিসার...

হাবিবের দিকে ঘুরে চাইল রানা। 'আপনার কী মনে হয়, কে চার্লস মুনকে খুন করতে পারে?'

'এমন কেউ, যার পক্ষে বায়োটক্সিন ল্যাবে যাওয়া সোজা ছিল,' বলল হাবিব। 'তার মানেই জন প্রাইস, টমসন অথবা নিনা ভিসার।'

নিনা ভিসার... চিন্তার মোড় ঘুরিয়ে নিল রানা, জানতে চাইল, 'কেন এদের কেউ চার্লস মুনকে খুন করবে?'

'তা আমি জানি না, ভাই,' বলল হাবিব।

'এদের খুন করার মোটিভ কী হতে পারে? আপনার কিছুই জানা নেই?'

'জী-না, ভাই। কিছুই জানি না।'

'কিন্তু আপনার মোটিভ ছিল,' বলল রানা। 'মুন আপনার রিসার্চের তথ্য চুরি করছিল।'

'তাইতে মনে হয় আমিই খুন করেছি, নাকি, ভাই?' বলল হাবিব।

'কিন্তু কেউ আপনাকে ফাঁসিয়ে দিয়ে থাকলে, সে সহজেই ড্রেইন ক্লিনার দিয়ে মুনকে খুন করতে পারত। সেক্ষেত্রে কেন এত ঝামেলা করে সি স্নেকের ভেনম ব্যবহার করল?'

'কথা তো এটাই,' বলল হাবিব। 'কিন্তু বই পড়ে দেখুন। ড্রেইন ক্লিনার ব্যবহার করলে ৫৯% মানুষ মরবে। আর সাগরের সাপের বিষ ব্যবহার করলে ৯৮% মানুষ সঙ্গে সঙ্গে মরবে। আসলে চার্লস মুনকে কোন সুযোগই দেয়নি খুনি, নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছে। বাঁচার উপায় ছিল না তার।'

নীচের ঠোঁট কামড়ে ধরল রানা, কয়েক সেকেণ্ড পর বলল, 'নিনা ভিসার সম্পর্কে কী জানেন?'

'কী জানব?'

'আপনাদের দু'জনের সম্পর্ক কেমন? তাকে পছন্দ করতেন?

বা আপনাকে পছন্দ করত সে?'

'না, আমরা কেউ কাউকে পছন্দ করতাম না।'

'আপনারা কেন পরস্পরকে পছন্দ করতেন না?' জানতে চাইল রানা।

'সত্যিই জানতে চান?' বড় করে শ্বাস ফেলল হাবিব। অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে। 'কারণ, সে আমার খুব ঘনিষ্ঠ এক বন্ধুকে বিয়ে করে। উনি আমার বস্‌ও ছিলেন। আর তাঁকে কখনও ভালবাসেনি নিনা।'

'কেন ভালবাসেনি?' জানতে চাইল রানা।

'মারা যাওয়ার আগে মরিস ভিসার হার্ভার্ডের জিয়োফিযিক্স ফ্যাকাল্টির প্রধান ছিলেন।'

রানার মনে পড়ল, মেরি ওর বাবার কথা বলেছিল ওকে। উনি জটিল সব অঙ্ক শেখাতেন মেয়েকে। কিছু দিন হলো মারা গেছেন ভদ্রলোক।

'একটা গাড়ি দুর্ঘটনায় মারা যান, তাই না?'

'হ্যাঁ,' মাথা দোলাল হাবিব। 'এক মাতাল ড্রাইভার তার গাড়ি চালিয়ে দেয় মরিসের উপর। সঙ্গে সঙ্গে মারা যান।' রানার দিকে চাইল সে। 'আপনি জানলেন কী করে?'

'মেরি বলেছে।'

'মেরি বলেছে...' আস্তে করে বলল হাবিব। 'বড় ভাল মেয়ে। আপনাকে কি বলেছে, ও আমার গডডটার?'

'না, বলেনি।'

'মেরি যখন জন্ম নিল, ওর বাবা আমাকে বললেন, আমি যেন মেরির গডফাদার হই,' বলল হাবিব। 'মরিসের কিছু হলে আমি মেরিকে আগলে রাখব। এরপর সাত বছর বয়সে মা মারা গেলেন ওর। লিভার ক্যান্সার ছিল।'

'এক সেকেণ্ড,' বলল রানা, 'সাত বছর বয়সে ওর মা মারা

গেছে?'

'হ্যাঁ।'

'তার মানে নিনা ভিসার ওর আপন মা নয়?'

'না, মরিসের দ্বিতীয় স্ত্রী নিনা,' বলল হাবিব। 'নিনা ভিসার মেরির সৎ-মা।'

রানার কাছে হঠাৎ করেই সব পরিষ্কার হতে শুরু করেছে। এ কারণেই নিনা ভিসারের সঙ্গে পারতপক্ষে কথা বলে না মেরি। গুটিয়ে রাখে নিজেকে। বাচ্চারা এমনই হয়, মোটেই পছন্দ করে না সৎ-মাকে।

'জানি না কেন নিনাকে বিয়ে করলেন মরিস,' বলল হাবিব। 'জানতাম উনি বড় একা। তা ছাড়া, নিনা ভিসার আকর্ষণীয় তরুণী, সহজেই নিজের দিকে তাঁকে টেনে নিয়েছে। এত ক্যারিয়ারিস্ট বা উচ্চাকাঙ্ক্ষী মেয়ে আর দেখিনি। চোখ দেখলেই বুঝবেন। নিজের জন্য নাম চাই তার। মিশতে চায় মস্ত সব লোকের সঙ্গে। মরিসের চেনা নামকরা সব লোকের সঙ্গে মিশত। স্বামীকে মোটেও ভালবাসত না, জীবনেও মরিসের বাচ্চা নিত না।'

দুঃখের হাসি হাসল হাবিব। 'তারপর মাতাল ড্রাইভার পিষে দিল মরিসকে, আর তখনই নিনার ঘাড়ে এসে পড়ল পিচ্চি মেরি। এই বাচ্চার দায়িত্ব নেয়ার কোনও ইচ্ছা ছিল না ওর।'

'আপনাকে পছন্দ করে না কেন?' জানতে চাইল রানা।

আবারও হাসল হাবিব। 'কারণ মরিসকে আমি বলেছিলাম, এই মেয়েকে বিয়ে করতে যাবেন না।'

আস্তে করে শ্বাস ফেলল রানা। বুঝতে পারছে, ওরা উইলকক্স আইস স্টেশনে আসবার আগে বহু কিছু ঘটেছে ওখানে।

'মাউথপিস দুটো তৈরি?' জানতে চাইল ও।

'হ্যাঁ।'

'আমাদের এই আলাপ চলবে,' উঠে দাঁড়াল রানা। কাঁধে ঝুলিয়ে নিচ্ছে স্কুবা ট্যাঙ্ক।

'এক সেকেণ্ড; ভাই,' ধড়মড় করে উঠে দাঁড়াল হাবিব। 'আপনি আবারও ফিরবেন ওখানে? ফিরতে গিয়ে যদি মারা পড়েন? তা হলে তো আর কেউ বিশ্বাস করবে না আমার কথা।'

'কে বলল আপনার কথা বিশ্বাস করেছি?' বলল রানা।

'আপনি বিশ্বাস করেছেন। আমি জানি।'

'সেক্ষেত্রে আমার সঙ্গে চলুন, খুব খেয়াল রাখুন যেন বেমক্কা না মারা পড়ি,' জানালার দিকে রওনা হয়ে গেছে রানা। চৌকাঠের সামনে গিয়ে সাগরের দিকে চাইল।

ফ্যাকাসে হয়ে গেছে রাশেদ হাবিবের মুখ। 'ঠিক আছে, ভাই, রওনা হওয়ার গতি একটু কমান। আপনার মনে আছে, স্টেশনের পুলের ভিতর ঘুরছে কিলার ওয়েইল? তা ছাড়া, ভয়ঙ্কর এক জাতের সিল আছে ওখানে। ওগুলো কিলার ওয়েইলকেও মেরে ফেলে...'

কান দিচ্ছে না রানা, জানালা দিয়ে চেয়ে আছে দূরে। দক্ষিণ-পশ্চিমে অনেক উঁচু ক্লিফের ওদিকে সামান্য ঝিলিক। ওই বাতি একটু পর পর জ্বলছে। উইলকক্স আইস স্টেশনের রেডিয়ো অ্যান্টেনা থেকেই আসছে ওই সবুজ আলো।

'মিস্টার হাবিব, আপনি সঙ্গে আসতে পারেন, আবার রয়েও যেতে পারেন, কিন্তু আমি ফিরছি,' ঘুরে চাইল রানা। 'উইলকক্স আইস স্টেশন আবারও দখল করে নেব।'

এগারো

ঊনিশ শ' ষাট সালের বিশাল দুই ওয়েটসুট পরে বরফ-ঠাণ্ডা সাগরে পাশাপাশি সাঁতরে চলেছে মাসুদ রানা ও রাশেদ হাবিব। চারপাশে থমথমে নীরবতা। চল্লিশ বছরের বেশি পুরানো স্কুবা গিয়ার কাজ করছে ভাল ভাবেই।

ওদের দু'জনের কোমরে সরু স্টিলের কেবল। উত্তর-পুবের উইলকক্স আইস স্টেশনের এক মাইল দূরের লিটল আমেরিকা-৪-র সিলিণ্ড্রিক্যাল স্পুলার থেকে এসেছে ওই দুটো তার। সতর্ক থাকবার জন্য এই ব্যবস্থা। ওদের কেউ হারিয়ে গেলে, বা আলাদা হয়ে গেলে, আবারও ফিরতে পারবে পরিত্যক্ত স্টেশনে।

লিটল আমেরিকা-৪ স্টেশনে পাওয়া হার্পুন গান এনেছে রানা। এখন সামনে তাক করে রেখেছে।

নীল ক্রিস্টালের মত পরিষ্কার চারপাশের পানি। বরফের উপকূলীয় তাকের নীচ দিয়ে চলেছে ওরা। এদিক-ওদিক বরফের তৈরি স্ট্যালাকটাইটের জঙ্গল।

রানার পরিকল্পনা হচ্ছে: আইস শেলফের নীচ দিয়ে সাঁতরে চলবে ওরা, হাজির হবে উইলকক্স আইস স্টেশনের নীচে। পানির উপর থেকে সবুজ বাতি দেখে এসেছে রানা, তখনই ঠিক করেছে, ওদের পজিশন কী হতে পারে। ওরা সাঁতার কাটবে ওই বাতি লক্ষ্য করে। একবার বরফের তাকের নীচে পৌঁছে গেলে নিজেরাই খুঁজে নিতে পারবে স্টেশনের নীচের পুল।

আপাতত সফেদ বরফের রাজ্যে এগিয়ে চলেছে রানা ও হাবিব। বিদ্‌ঘুটে সব আকৃতি চারপাশে। একেকটা যেন উল্টো পাহাড়ের চূড়া। সব নেমে গেছে চার শ' ফুট নীচে।

ডাইভিং মুখোশের ভিতর ভুরু কুঁচকে ফেলল রানা। ওদেরকে আরও অনেক নামতে হবে, তা হলেই পৌঁছতে পারবে স্টেশনের পুলের নীচে।

বিশাল এবড়োখেবড়ো এক বরফ-পাহাড়ের পাশ দিয়ে নামতে শুরু করেছে ওরা। মুখোশের ভিতর থেকে ধবল বরফের পোক্ত দেয়াল দেখছে রানা। বেশ কিছুক্ষণ পর সাদা বরফের উল্টো চূড়ার পাশে পৌঁছে গেল। চূড়ার নীচ দিয়ে চলেছে, উপরে এবং চারপাশে বরফ-শৃঙ্গ। আধ মিনিট যাওয়ার পর হঠাৎ করেই ধক্ করে উঠল রানার বুক।

ওটা পানিতে ঝুলছে, একটু দূরেই। উইঞ্চ কেবলের শেষে। খুব ধীরে ফিরছে।

ডাইভিং বেল।

আবারও স্টেশনে চলেছে ওটা।

এর মানে কী, বুঝে গেছে রানা। নীচে নিজের দলকে নামিয়ে দিয়েছে ব্রিটিশ কমাণ্ডার গুণ্ডারসন। এখন এসএএস কমাণ্ডোরা উপরে উঠছে পাতাল-গুহার দিকে।

তিশা ও মোরশেদের কথা চট্ করে মনে পড়ল রানার। সতর্ক থাকলে ওরা ঠেকাতে পারবে এসএএস কমাণ্ডোদের হামলা।

আর এদিকে হাবিব আর ও চেপে বসবে ডাইভিং বেলে। বিনা পয়সায় বিনা টিকিটে ফিরবে উইলকক্স আইস স্টেশনের পুলে। এ সুযোগ ছাড়া যায় না।

পানির ভিতর চরকির মত ঘুরল রানা, হাতের ইশারা করল হাবিবকে। পিছনেই ছিল বিজ্ঞানী, একটু আগে উল্টো পাহাড়ের চূড়ার নীচ দিয়ে এসেছে। গতি বাড়াবার ইঙ্গিত করল রানা, নিজে

দ্রুত নাড়ছে দুই পা। ডাইভিং বেলের দিকে চলেছে ওরা।

'নীচে ওরা ক'জন?' নরম স্বরে বলল জুলিয়াস বি. গুণ্ডারসন।

চুপ করে থাকল হোসেন আরাফাত দবির।

হাঁটু গেড়ে বসে আছে ও। পিছনে দুই হাত আটকে দেয়া হয়েছে হ্যাণ্ডকাফে। পুলের পাশে ই-ডেকে নামিয়ে আনা হয়েছে ওকে। মুখ থেকে গলগল করে বেরুচ্ছে রক্ত। প্রায় বুজে এসেছে ফোলা বাম চোখ। মেরিকে নিয়ে দ্রুতগতি হোভারক্রাফট থেকে পড়বার পর ওকে আবারও উইলকক্স আইস স্টেশনে ফিরিয়ে এনেছে ব্রিটিশরা। স্টেশনে পৌঁছতেই ওকে হাজির করেছে ই-ডেকে গুণ্ডারসনের সামনে।

'মিস্টার বোউল্স্,' বলল গুণ্ডারসন।

বিশালদেহী এসএএস কমাণ্ডো প্রচণ্ড ঘুষি বসিয়ে দিল দবিরের চোয়ালে। ছিটকে গিয়ে মেঝের উপর ধুপ্ করে পড়ল দবির।

'নীচে ওরা ক'জন?' বলল গুণ্ডারসন। একহাতে দবিরের ম্যাগহুক।

'কেউ না!' রক্তাক্ত ও ভাঙা দাঁতের ভিতর থেকে বেরুল কথাগুলো। 'নীচে আমাদের কেউ নেই। লোক নামানোর সময় পাইনি আমরা।'

'তাই নাকি?' হাসল গুণ্ডারসন। চিন্তিত চোখে ম্যাগহুক দেখছে। 'মিস্টার দবির, তুমি বড় মিথ্যা বলো। মাসুদ রানার মত সুযোগ্য কমাণ্ডার এত বড় ভুল করবে? তার প্রথম কাজই তো হওয়ার কথা এক স্কোয়াড সৈনিককে পাতাল-গুহায় পাঠিয়ে দেয়া। উইলকক্স আইস স্টেশনে এসেই এই কাজ করেছে সে।'

'তা হলে তাঁকেই জিজ্ঞেস করুন।'

'সত্যি কথা বলো, মিস্টার দবির, নইলে হঠাৎ করেই রেগে উঠতে পারি। আর সেক্ষেত্রে সিংহের মুখে ফেলে দেব তোমাকে।'

'নীচে কেউ নেই,' জোর দিয়ে বলল দবির।

'ঠিক আছে,' হাসল গুণ্ডারসন, ঝট্ করে পল সিংগারের দিকে ফিরল। 'মিস্টার সিংগার, মিস্টার দবির কি সত্যি বলছে?'

মুখ তুলে ভাইপারের দিকে চাইল দবির।

সিংগারকে বলল গুণ্ডারসন, 'মিস্টার সিংগার, মিস্টার দবির মিথ্যা বললে ওকে মেরে ফেলব। আর তুমি যদি মিথ্যা বলো, তোমাকেও ছাড়ব না।'

চোখে আকুতি নিয়ে সিংগারের দিকে চাইল দবির।

ভাইপার বলল, 'ও মিথ্যা বলেছে। নীচে চারজন। তিনজন সৈনিক, চতুর্থজন সিভিলিয়ান।'

'তোর মা বেশ্যা ছিল, শুয়োরের বাচ্চা!' সিংগারের দিকে চেয়ে রইল দবির।

'মিস্টার বোউলস,' প্রকাণ্ডদেহী লোকটার দিকে ম্যাগহুক ছুঁড়ে দিল গুণ্ডারসন। 'এই হারামজাদাকে ঝুলিয়ে দাও।'

খুব ধীরে উঠছে ডাইভিং বেল। ঘণ্টির ভিতর অংশে ঢুকে পড়েছে রানা ও হাবিব। ডাইভিং বেলের ভিতর পানির পুল দিয়ে উঠে এসেছে ওরা, পা রেখেছে ভিতর অংশে। ভিতরে ছোট্ট একটা পুল, ওটাকে ঘিরে ইস্পাতের ডেক।

মাউথপিস সরিয়ে দিল হাবিব, হাঁ করে বাতাস নিতে শুরু করেছে। ফাঁকা ডাইভিং বেলের চারপাশ দেখে নিল রানা। এখন ওর অস্ত্র দরকার। এমন কিছু, যেটা পরে কাজে লাগবে।

ওদিকের দেয়ালে ডিজিটাল ডেপ্থ্ কাউণ্টার। টিকটিক করে উল্টো ঘুরছে। ডাইভিং বেল উঠছে, কাজেই দেখিয়ে চলেছে ৩৬০ ফুট। কয়েক সেকেণ্ড পর দেখাল ৩৫৯ ফুট। তারপর ৩৫৮ ফুট।

'হ্যাঁ!' বেলের আরেক পাশ থেকে বলে উঠল হাবিব।

ঘুরে চাইল রানা। ছোট এক টিভি মনিটরের সামনে

দাড়িয়েছে হাবিব। ছাত থেকে ঝুলছে ওটা। একটা সুইচ টিপে দিয়ে বলল, 'এটার কথা ভুলেই গিয়েছিলাম।'

'কী ওটা?' জানতে চাইল রানা।

'পাগলা আর্লিং কর্গ্যানের আরেকটা খেলনা। মনে নেই বুড়ো লোকটার কথা বলেছিলাম? ওই যে, যে সারাদিন ধরে কিলার ওয়েইল দেখত? বলিনি? কর্গ্যান পানির নীচে ডাইভিং বেলের ভিতর থেকে ওগুলোকে গুনত।'

সাদা-কালো মনিটর আগ্রহ নিয়ে দেখল রানা। হাবিবের ঘরে ই-ডেকের যে দৃশ্য দেখেছে, এখনও তাই। রিট্র্যাক্টেবল সেতুর নীচ থেকে ছবি পাঠাচ্ছে ক্যামেরা।

থমকে গেল রানা। মনিটরে লোকজনের নড়াচড়া!

এসএএস ট্রুপের হাতে উদ্যত অস্ত্র। খুঁটির সঙ্গে পল সিংগার। ধীরে ধীরে ই-ডেকে পায়চারি করছে জুলিয়াস বি. গুণ্ডারসন।

কিন্তু স্ক্রিনে আরেকজনকে দেখে চমকে গেল রানা।

ওই লোক গুণ্ডারসনের পায়ের সামনে পড়ে আছে। পরিষ্কার দেখা গেল মুখটা— সার্জেন্ট হোসেন আরাফাত দবির!

'ঠিক আছে, ওকে ঝুলিয়ে দাও, মিস্টার বোউল্স্,' বলল গুণ্ডারসন। এইমাত্র ম্যাগহুকের কেবল পেঁচিয়ে দেয়া হয়েছে দবিরের দুই গোড়ালিতে।

এরই ভিতর সি-ডেকের সেতুর ওপাশ থেকে ম্যাগহুকের দড়ি ঘুরিয়ে এনেছে আরেক লোক। একটা পুলি তৈরি করা হয়েছে।

আরেক ব্রিটিশ কমাণ্ডোর হাত থেকে লঞ্চার নিল বোউল্স্, ই-ডেক ও ডি-ডেকের মাঝের মইয়ের ধাপে আটকে দিল। এবার কালো বোতাম টিপে দিল। দড়ি টেনে নিতে শুরু করেছে লঞ্চার।

সি-ডেকের সেতুর উপর কাজ শুরু করেছে পুলি। ই-ডেক থেকে উপরে উঠছে হোসেন আরাফাত দবির। উল্টো হয়ে ঝুলছে

সে। হ্যাণ্ডকাফে পিছমোড়া করে আটকে দেয়া হয়েছে দুই হাত। অসহায় ভাবে পুলের উপর ঝুলে গেল বেচারা, পানির দিকে তাক করা মাথা।

'ওরা কী করছে?' জানতে চাইল হাবিব। সাদা-কালো মনিটরে চেয়ে আছে অসহায় রানা।

ওদের অনেক দূরে হোসেন আরাফাত দবির, পুলের উপর নিজ ম্যাগহুক দিয়ে ঝুলিয়ে দেয়া হয়েছে তাকে।

হঠাৎ চমকে গেল রানা ও হাবিব। দুলে উঠেছে ডাইভিং বেল। দেয়ালে হাত রেখে সামলে নিতে চাইল ওরা।

'কী হলো?' চট্ করে জানতে চাইল হাবিব।

জবাব দিতে হলো না রানাকে।

উত্তর আছে জানালার ওপাশে।

ডাইভিং বেল ঘিরে উঠছে কালো-সাদা বিশাল কী সব। বুঝতে দেরি হলো না ওদের, আবারও পুলের ভিতর হাজির হয়েছে কিলার ওয়েইল!

প্রথম ডরসাল ফিন পানি কেটে ভেসে উঠতেই গুঞ্জন উঠল এসএএস কমাণ্ডোদের ভিতর। তারা সংখ্যায় বিশজনের বেশি, উপস্থিত হয়েছে ই-ডেকের চারপাশে।

মাথা নিচু করে পুলের উপর ঝুলছে হোসেন আরাফাত দবির। সে-ও দেখেছে, প্রকাণ্ড কালো সব কিলার ওয়েইল। পানির নীচে পুলের কিনারা দিয়ে ঘুরছে। একবার ছটফট করে উঠল দবির, কিন্তু বুঝে গেল, মুক্তি নেই ওর। দুই হাত ও দুই পা ভালভাবেই আটকানো।

গলা থেকে খুলে আসছে চেইন ও লকেট। ওটা লকেট নয়, খুব ছোট একটি কোরআন শরীফ। সৌদি আরব থেকে এনে

দিয়েছিল ওর শালা। কয়েক সেকেণ্ড পর চেইন ও কোরআন শরীফ টুপ করে নামল পুলের ভিতর, রওনা হয়ে গেল অতল কূপে।

পুলের প্ল্যাটফর্ম থেকে কিলার ওয়েইলের দিকে চেয়ে আছে জুলিয়াস বি. গুণ্ডারসন। 'এবার দারুণ জমবে,' মন্তব্য করল।

হঠাৎ তার সামনে এসে দাঁড়াল এক কর্পোরাল। এই লোকই আগে রিপোর্ট দিতে এসেছিল। 'স্যর, ট্রাইটোনাল চার্জ বসানো শেষ।' পুরু ক্যালকুলেটারের মত ছোট কালো ইউনিট বাড়িয়ে দিল সে। কিপ্যাডে কয়েকটি নম্বর। 'ডেটোনেশন ইউনিট, স্যর।'

ওটা নিল গুণ্ডারসন। 'বাইরের মার্কার দেখে কী মনে হলো?'

'পেরিমিটারে পাঁচজন কর্পোরাল, স্যর। লেসার রেঞ্জফাইণ্ডার নিয়ে পাহারা দিচ্ছে। শেষবার চেক করা হয়েছে একটু আগে। পঞ্চাশ মাইলের ভেতর কেউ নেই, স্যর।'

'গুড,' বলল গুণ্ডারসন। 'ভেরি গুড।'

আবারও পুলের দিকে চাইল সে। পানির বিশ ফুট উপরে ঝুলছে বাংলাদেশ আর্মির সার্জেন্ট হোসেন আরাফাত দবির।

'এবার একটু মজা করার সময় হয়েছে,' বলল গুণ্ডারসন।

'যদি আরও জোরে উঠত,' ডেপ্‌থ্ কাউন্টারের দিকে চেয়ে আছে রানা।

কাউন্টার খুব ধীরে নীচে নামছে। অনেক ধীরে উঠছে ডাইভিং বেল। এখনও পুরো এক শ' নব্বুই ফুট উঠতে হবে। সারফেসে পৌঁছুতে কমপক্ষে সাত মিনিট বাকি।

মনিটরে হোসেন আরাফাত দবিরের দিকে চেয়ে রইল রানা। বিড়বিড় করে কাউকে গালি দিচ্ছে।

'মিস্টার বোউল্‌স্,' ডাক দিল গুণ্ডারসন।

ম্যাগহুকের নির্দিষ্ট বাটন টিপে দিল বোউল্‌স্‌, সঙ্গে সঙ্গে দড়ি ছাড়তে শুরু করল ম্যাগহুক। মাথা নিচু করে পুলের দিকে নামছে হোসেন আরাফাত দবির।

পুলের ভিতর ছলকে উঠছে পানি। নানান দিকে ঘুরছে কিলার ওয়েইল। হঠাৎ ওগুলোর একটা ভেসে উঠল সারফেসে। যেন চেয়ে আছে দবিরের চোখে। ব্লোহোল দিয়ে পানি ছুঁড়ল উপরে।

পানির দিকে নেমে আসছে দবির। পুলের একফুট আগে থেমে গেল ওর মাথা। হঠাৎ করেই ঝাঁকি খেয়ে থেমে গেছে ম্যাকহুক।

'এই যে, মিস্টার দবির!' ডেকের নিরাপদ দূরত্ব থেকে গলা ছাড়ল গুণ্ডারসন।

'কী?' জানতে চাইল দবির।

'রুল ব্রিটানিয়া, মিস্টার দবির!'

আবারও বাটন টিপল বোউল্‌স্‌, পানির নীচে তলিয়ে গেল দবিরের মাথা ও বুক।

পানির নীচে সাদা এক সারি দাঁত দেখল দবির। এইমাত্র ওকে পাশ কাটিয়েছে কিলার ওয়েইলটা!

বিস্ফারিত হয়ে গেল ওর দুই চোখ।

এতগুলো কিলার ওয়েইল!

যেন কালো-সাদা একদল দানবের ভিতর আটকা পড়েছে ও!

চারপাশে ঘুরছে ওই বিভীষিকাগুলো!

হঠাৎ করেই একটা তিমি লক্ষ করল দবিরকে। একই সময়ে তাকে দেখেছে দবিরও। পানির ভিতর ঘুরে গেছে ওটা, অনেক গতি তুলে আসছে।

মাথা নিচু করে পানির ভিতর ঝুলছে দবিরের শরীর। কোথাও যাওয়ার নেই, কিছু করার নেই, নড়তে পারবে না চাইলেও।

ছুটে আসছে খুনি তিমি!

পানির ভিতর থেকে দবির শুনতে পেল না, হই-হই করে উঠেছে এসএএস কমাণ্ডো ইউনিট। বিশাল ডরসাল ফিন ছুটে আসছে দবিরের দিকে।

ডাইভিং বেলের সাদা-কালো মনিটরে চোখ আটকে গেছে রানার।

'দবির,' বিড়বিড় করল রানা। 'কোনও কৌশল...' চুপ হয়ে গেল। বুঝতে পারছে, মানুষটার কিছুই করবার নেই। ওর-ও কিছু করবার নেই!

পিছমোড়া হাতদুটো খুলে নিতে চাইল দবির। কাফ খুলল না।

ওর দিকে তেড়ে আসছে কিলার ওয়েইল।

গতি অনেক বেড়েছে।

এক পাশে কাত হয়ে গেল, হাঁ করল মস্ত চোয়াল।

সাঁৎ করে দবিরকে পাশ কাটাল খুনি তিমি। খসখসে চামড়ার স্পর্শ পেল দবির। শুনতে পেল না, বু, বু, বু বলে আপত্তি তুলছে এসএএস কমাণ্ডোরা।

ডাইভিং বেলের ভিতর স্বস্তির শ্বাস ফেলল রানা।

'এবার আর বাঁচবে না মানুষটা,' রানার পিছন থেকে বলল হাবিব।

'কী বলতে চান?'

'আগেও বলেছি, ওই তিমি পাশ কাটাবার সময় অন্যদেরকে বুঝিয়ে দিয়েছে, এটা আমার শিকার। এবার খেয়ে ফেলবে আপনার সার্জেন্টকে।'

রাগে-ক্ষোভে থরথর করে কাঁপছে দবির। কিছুই কি করবার নেই

ওর?

ছটফট করছে, কিন্তু হাত ছুটিয়ে নিতে পারছে না।

হ্যাণ্ডকাফ খুলতে পারলে...

আবারও সেই খুনি তিমিকে দেখল দবির। দ্বিতীয়বারের মত আসছে!

বিক্ষিপ্ত পানির ভিতর অনেক গতি তুলেছে ওটা, গতি আরও বাড়ছে। বিশেষ কোনও উদ্দেশ্য নিয়ে ছুটে আসছে ওর দিকে। উঁচু ডরসাল ফিন থেকে দু'পাশে ছুটছে স্রোত।

আবারও কিলার হোয়েলের চোয়াল হাঁ হয়ে গেছে। সাদা দাঁত ও লালচে জিভ দেখল দবির।

ওটা যত কাছে আসছে, ভয় বাড়ছে দবিরের।

এবার একপাশে কাত হয়নি ওই তিমি।

আগের মত পাশ কাটিয়েও গেল না।

ভয়ঙ্কর গতি তুলে সাত টন ওজনের তিমি গুঁতো দিল দবিরকে।

কী ওকে আঘাত হানল, বুঝবার আগেই দবিরের মাথা ঢুকে গেল মস্ত তিমির চোয়ালের ভিতর।

ডাইভিং বেলের ভিতর, মনিটরে চোখ রেখে হতবাক হয়ে গেছে রানা।

'হায় আল্লা,' ওর পিছনে মস্ত শ্বাস ফেলল হাবিব।

মনিটরে ভয়ঙ্কর দৃশ্য।

ঝরঝর করে ছিটিয়ে পড়ছে তাজা রক্ত, মিশে যাচ্ছে নীল পানিতে। ঝুলন্ত দবিরের ঊর্ধ্বাঙ্গ চিবাতে শুরু করেছে তিমি। বুক পর্যন্ত খাওয়া শেষে লাশের ঊরুতে কামড় বসাল। দড়ি থেকে ছুটিয়ে আনতে চাইছে দেহাবশিষ্ট। পানির ভিতর শুরু হয়েছে ভয়ঙ্কর সব ঝাঁকুনি। যেন বোটের বাইরে কেউ গ্র্যাপলিং হুক দিয়ে

ধরেছে মাংস, আর তা ছুটিয়ে নিতে চাইছে শ্বেত-হাঙর।

কিছুই ভাবতে পারছে না রানা। মাথা নিচু হয়ে মিশে গেছে বুকে।

ওর পিছনে ছোট পুলের ভিতর হড়হড় করে বমি করল রাশেদ হাবিব।

একটু আগে চলে গেছে তিশা, আবারও ফিরেছে গুহার আরেক প্রান্তে, ফাটলের সামনে। পাতাল-গুহায় বিমানের কিপ্যাডের স্ক্রিনে চেয়ে আছে নিনা ভিসার ও সার্জেন্ট জনি ওয়াকার।

২৪১৫৭৮১৭– – – – – – – – – – – – – – – – –

এণ্টার অথোরাইযড্ এণ্ট্রি কোড

'এটার মাধ্যমে বিমানে ঢুকতে হবে,' বলল নিনা ভিসার।

স্ক্রিনে আঁপাতত আট ডিজিট দেখা যাচ্ছে: ২৪১৫৭৮১৭। তারপর রয়েছে ষোলোটি ফাঁকা ঘর, এগুলো পূরণ করলে মিলবে এণ্ট্রি কোড।

'ষোলোটা অক্ষর বা সংখ্যা পূরণ করতে হবে,' বলল জনি ওয়াকার। 'কিন্তু বুঝব কী করে এণ্ট্রি কোড কী?'

'আরও সংখ্যা বসাতে হবে,' চিন্তিত সুরে বলল নিনা ভিসার। 'সম্ভাবনা বেশি, ওটা কোনও নিউমেরিক্যাল কোড। স্ক্রিনের এই আট সংখ্যা শেষে ওগুলো বসালে কোড পূরণ হবে।'

'আমরা যদি বের করতেও পারি কোড, ফাঁকা জায়গায় সেটা বসাব কী করে?' বলল ওয়াকার।

সামনে ঝুঁকে গেল নিনা ভিসার, কালো কিপ্যাডের প্রথম বাটন টিপে দিল।

এক সেকেণ্ড পর স্ক্রিনে প্রথম শূন্য-স্থানে ভেসে উঠল '১' সংখ্যা।

ভুরু কুঁচকাল ওয়াকার। 'আপনি বুঝলেন কী করে?'

কাঁধ ঝাঁকাল নিনা। 'সহজ। ইন্সট্রাকশন যখন ইংরেজি, তো ধরে নিতে পারি এই জিনিস তৈরি করেছে কোনও মানুষ। তার মানে, কিপ্যাডও মানুষেরই তৈরি। কাজেই বুঝেছি, এটা সাধারণ কিপ্যাড। ক্যালকুলেটার বা টেলিফোনের ডায়ালের মতই সংখ্যা বসাতে হবে। এমনও হতে পারে, এটা যে তৈরি করেছে, সে আর এখানে সংখ্যা বসাতে পারেনি।'

দ্বিতীয় বাটন টিপল নিনা।

'২' সংখ্যা দেখা দিল প্রথম সংখ্যার পরে।

হেসে ফেলল নিনা। আপন মনে বলল, 'ষোলো সংখ্যার কোড, সবমিলে আছে দশটা ডিজিট, এ থেকে বাছাই করে নিতে হবে। ...সর্বনাশ! তার মানে, কমবিনেশন হতে পারে কয়েক ট্রিলিয়ন।'

'আপনি কোড ভাঙতে পারবেন?' জানতে চাইল ওয়াকার।

'জানি না,' বলল নিনা। 'আগে বুঝতে হবে প্রথম আট সংখ্যা দিয়ে কী বুঝিয়েছে। সেক্ষেত্রে হয়তো বেরুবে কোড কী হতে পারে।'

সামনে ঝুঁকল ওয়াকার, প্রথম বাটন একে একে চোদ্দবার টিপতে শুরু করেছে। দ্রুত কমে আসছে শূন্য-স্থান।

হঠাৎ বিপ্ আওয়াজ হলো স্ক্রিনে। এবার স্ক্রিনের নীচে নতুন তথ্য ভেসে উঠল:

২৪১৫৭৮১৭১২১১১১১১১১১১১১১১
ইনকারেক্ট কোড এণ্টার্ড–
এণ্ট্রি ডিনাইড
এণ্টার অথোরাইযড্ এণ্ট্রি কোড

আবারও স্ক্রিনে দেখা দিল আগের সেই আট সংখ্যা। তার

শেষে ষোলোটি শূন্য-স্থান।

হতবাক হয়ে জনি ওয়াকারের দিকে চেয়ে আছে নিনা ভিসার। কয়েক সেকেণ্ড পর বলল, 'আপনি কীভাবে জানলেন এমন হবে?'

হাসল ওয়াকার। 'প্রথমবারে এন্ট্রি কোড বসাতে ভুল হতেই পারে। এটা বেশির ভাগ মিলিটারি এন্ট্রি-কোড সিস্টেমের মত।'

গুহার আরেক প্রান্তে লেফটেন্যান্ট তিশা করিম। বরফের দেয়ালের নীচে, ফাটলের সামনে ঝুঁকে বসেছে, ভিতরে তাক করেছে ফ্লাশলাইট।

এই পাতাল-গুহার বিষয়ে আরও তথ্য চাইছে তিশা। এই গুহা এবং মানুষের তৈরি ওই বিমান 'স্পেসশিপ' ওকে সত্যি খুব আগ্রহী করে তুলেছে। অনেক কথাই মনে আসছে ওর।

ফাটলের ভিতর উঁকি দিল তিশা। উজ্জ্বল আলোয় ওদিকে দেখা গেল আরেকটা গুহা। গোলাকার সুড়ঙ্গ, দেয়াল বরফের, ডানদিকে চলে গেছে। ফাটলের ওপাশে পাঁচ ফুট নীচে মেঝে।

চিত হয়ে শুয়ে পড়ল তিশা, ছেঁচড়ে চলে গেল ফাটলের ভিতর। নতুন এই গুহার মেঝেতে নামতে শুরু করেছে। কিন্তু হঠাৎ করেই পিঠের নীচ থেকে ধসে গেল বরফের মেঝে, বেকায়দা ভাবে ধুপ করে পড়ে গেল তিশা।

মেঝেতে পড়বার সময় 'ধুম!' আওয়াজ হয়েছে। ছোট গুহার ভিতর বারবার ফিরছে ওই আওয়াজ। শুনলে মনে হয় বড় হাতুড়ি দিয়ে লোহার উপর ঘা দেয়া হয়েছে।

ধড়মড় করে উঠে দাঁড়াল তিশা।

পায়ের নীচে কি স্টিল?

মেঝের দিকে মনোযোগ দিল তিশা। মেঝের উপর পাতলা বরফের আস্তরণ। তার ভিতর দিয়ে পরিষ্কার চোখে পড়ল রিভেট।

বিস্ফারিত হলো ওর দুই চোখ। এখানে গোল মাথাওয়ালা রিভেট কোত্থেকে আসে?

জিনিসটা ধাতুর তৈরি।

পুরু মেঝে! রিইনফোর্সড় ধাতু!

ছোট গুহার ভিতর ফ্লাশলাইটের আলো ঘুরিয়ে আনল তিশা। জায়গাটা সিলিণ্ডারের মত। অনেকটা রেলগাড়ির সুড়ঙ্গের সঙ্গে মিল আছে। গোলচে ছাত, যে ফাটল দিয়ে নেমে এসেছে, সেটা ছাড়িয়ে অনেক উপরে উঠেছে দেয়াল। ফাটলের উপরে খুব পাতলা বরফের দেয়াল, আলো পড়ে ওদিকটা স্বচ্ছ কাঁচের মত দেখাচ্ছে।

ফ্লাশলাইটের আলোয় আরেকবার চারপাশ দেখে নিল তিশা। সামনের দিকে গেছে গুহা। তারপর ওর চোখে পড়ল ওটা।

কোনও ধরনের দরজা। ধূসর রঙের, ভারী ইস্পাতের। বরফের দেয়ালে বসিয়ে দেয়া। পুরু কবাট ঢাকা পড়েছে বরফের পাতলা আস্তরণে। দরজাটা জাহাজ বা সাবমেরিনের মস্ত কোনও হ্যাচের মত। কবজাসহ শক্তপোক্ত ধাতব বালকহেডের ভিতর বসানো।

'এটা এখানে কেন!' বিড়বিড় করল তিশা।

বারো

ওয়াশিংটন ডি.সি.তে তৃতীয়বারের মত ফোন করেছে অ্যাডোনিস ক্যাসেডিন, বসে আছে রবিন কার্লটনের ড্রইংরুমে।

দ্য ওয়াশিংটন পোস্টের অফিসে এবার ঠিকই কল রিসিভ করল তার স্ত্রী। 'সরি, ডারলিং।'

'ছিলে কোথায়?' ভুরু কুঁচকে ফেলল ক্যাসেডিন। 'সারা দুপুর ধরে তোমাকে কল করছি!'

'খুব ব্যস্ত ছিলাম, খেয়াল করিনি কল আসছে।' সামান্য বিরতি নিয়ে বলল সান্থা, 'বললেও বিশ্বাস করবে না, কী পেয়েছি।'

এবার খুলে বলল, অল স্টেট্স্ লাইব্রেরির ডেটাবেসে কী দেখেছে। 'সেটি' অফিস থেকে পাওয়া ল্যাটিচ্যুড ও লংগিচ্যুড ব্যবহার করে খুঁজে বের করেছে অ্যান্টার্কটিকার উইলকক্স আইস স্টেশন।

ক্যাসেডিন বের করল 'সেটি' থেকে পাওয়া মূল নোট, কথা শুনতে শুনতে চোখ বোলাতে শুরু করেছে ওটার উপর।

সান্থা আগ্রহ নিয়ে বলছে, ওই আইস স্টেশনে কোন্ ধরনের অ্যাকাডেমিকরা বাস করেছেন। তাঁরা বেশ কিছু পেপার্স বা বই লিখেছেন স্টেশনে থাকাকালীন। লাইব্রেরি অভ কংগ্রেসে গিয়ে শ্যারন স্টোনের বই প্রিলিমিনারি সার্ভে পায়নি, সেটাও জানাল।

'ট্রেভ্‌ল রয়েস নামের এক লোক উনিশ শ' উনআশি সালে বইটা হাপিস করে দেন,' বলল সান্থা।

ভুরু কুঁচকে গেল ক্যাসেডিনের। 'রয়েস? ট্রেভল রয়েস? উনি না জয়েন্ট চিফস অভ স্টাফের অধীনে নিক্সন আমলে...'

'প্রেসিডেন্ট কার্টারের সময়েও,' বলল সান্থা।

ড্রইংরুমে ফিরে এসেছে রবিন কার্লটন। 'ট্রেভল রয়েস সম্পর্কে কিছু বললেন আপনি?'

'হ্যাঁ,' বলল ক্যাসেডিন। মোবাইল ফোনে স্পিকার বাটন টিপল ও। এবার মোবাইল ফোনে ওর স্ত্রী আলাপে যোগ দিতে পারবে। 'ট্রেভল রয়েস। চেনেন বা শুনেছেন এই নাম?'

'শুনেছি,' বলল রবিন কার্লটন। 'উনি এয়ার ফোর্সে ছিলেন।

পুরো কর্নেল হন। উনিশ শ' উনআশি সালে একটা বিমান নিয়ে উধাও হন। আর ফেরেননি।'

'হ্যাঁ, ওই লোকই,' ফোনে বলল সান্থা। 'ক্যাসি, তোমার সঙ্গে কে?'

'ইনি রবিন কার্লটন,' বলল ক্যাসেডিন। 'যার সঙ্গে দেখা করতে আসার কথা ছিল।'

'আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুশি হলাম, মিস্টার কার্লটন,' বলল সান্থা। 'হ্যাঁ, আপনি ঠিকই বলেছেন, ট্রেভল রয়েস রুপালি রঙের এক এয়ার ফোর্স বোয়িং সেভেন-টু-সেভেন নিয়ে উড়াল দেন। উনিশ শ' উনআশি সালের তিরিশে ডিসেম্বরের রাত ছিল ওটা। কোথায় চলেছেন কাউকে বলা হয়নি। আর কখনও ফিরেও আসেননি।'

'কোথায় চলেছেন তার কোনও রেকর্ড নেই?' জানতে চাইল ক্যাসেডিন।

'ওটা ক্লাসিফায়েড, বেইবে,' বলল সান্থা। 'অবশ্য, আমি ভদ্রলোকের ইতিহাস ঘেঁটেছি। ভিয়েতনামে ফ্যান্টম বিমান চালাতেন। উনিশ শ' পঁয়ষট্টি সালে মেকং ডেল্টায় গুলি খেয়ে পড়ে যায় তাঁর বিমান। পুরো এক বছর বন্দি ছিলেন। দুই পা ভেঙে দেয়া হয়। ছিষট্টিতে উদ্ধার পান। এরপর পেন্টাগনে ডেস্কের কাজে বসিয়ে দেয়া হয়। আটষট্টি থেকে শুরু করে চুয়াত্তর পর্যন্ত প্রকিউরমেন্ট ডিভিশনে কাজ করেন। উনিশ শ' বাহাত্তর সালে জয়েন্ট অভ স্টাফের জন্য তাঁকে নিয়োগ দেন নিক্সন। ওই একই কাজ করেন কার্টারের অধীনেও।

'উনিশ শ' সাতাত্তর সালে স্টেলথ প্রজেক্টের সঙ্গে জড়িত হন। এয়ার ফোর্স সিলেকশন কমিটিতে ছিলেন। এঁরাই নর্থ্রপ-বোয়িং কোম্পানির বি-২ স্টেলথ বম্বার বেছে নেন। অফিশিয়াল রেকর্ড অনুযায়ী: ট্রেভল রয়েস টেণ্ডারের অন্য প্রতিযোগী জেনারেল

অ্যারোনটিক্স ও ক্যালিফোর্নিয়ার ছোট এক ইলেকট্রনিক্স কোম্পানি হাইটেক লিমিটেডের পক্ষে ভোট দেন এবং হেরেও যান।'

'তো বলো দেখি, ভদ্রলোক একটা প্রিলিমিনারি ল্যাণ্ড সার্ভে চুরি করতে গেলেন কেন?' বলল ক্যাসেডিন। 'কোথাকার এক ইউনিভার্সিটির বই, সেটা আবার অ্যান্টার্কটিকার কোনও রিসার্চ স্টেশনের উপর লেখা! কারণটা কী?'

'ব্যাপার তো এখানেই,' বলল সান্থা। 'আমার ধারণা বর্তমানের স্টেশন নয় ওটা।'

'এ থেকে কী বুঝব?'

'আমি এখন একটা বইয়ের দিকে চেয়ে আছি,' বলল সান্থা। 'এই বইয়ের লেখিকা লিখেছেন, উইলকক্স আইস স্টেশন তৈরি করা হয়েছে উনিশ শ' একানব্বুই সালে।'

'আচ্ছা?'

'কিন্তু ট্রেভল রয়েস উধাও হন উনিশ শ' উনআশি সালের ডিসেম্বরে।'

'তো?'

'আমার মনে হচ্ছে, ট্রেভল এর অনেক বছর আগে অন্য কোনও স্টেশনে গেছেন। উইলকক্স আইস স্টেশন তখনও তৈরিই হয়নি।'

নীরব হয়ে গেল লাইন। তারপর আবারও বলল সান্থা, 'আমার ধারণা, ওখানে ওগুলো দুটো আলাদা স্টেশন। একই জায়গায় তৈরি করা হয়েছিল। একটা উনিশ শ' আটাত্তর সালে, ওটার কথা লিখেছেন শ্যারন স্টোন। আর দ্বিতীয়টা তৈরি করা হয়েছে উনিশ শ' একানব্বুই সালে।'

'তার মানে, প্রথমটার উপরে তৈরি হয়েছে পরের স্টেশন?' বলল ক্যাসেডিন।

'পরে যারা স্টেশন তৈরি করেছে, তারা বোধহয় জানেও না

নীচে আরেকটা স্টেশন আছে,' বলল সান্থা। 'নিনা ভিসার তাঁর বইয়ে আগের স্টেশনের কথা একবারও উল্লেখ করেননি।'

'আগেরটার নাম কী?' বলল ক্যাসেডিন। 'রয়েস স্টেশন?'

'কে জানে, কী নাম ছিল ওই স্টেশনের,' বলল সান্থা।

'সেটি' থেকে পাওয়া নোট টেবিলে রেখেছে ক্যাসেডিন, আর কার্লটনের চোখ পড়েছে ওটার উপর। তুলে নিয়ে পড়তে শুরু করেছে।

'আমার অবস্থা তো বুঝতেই পারছ,' বলল সান্থা। 'তোমার কী অবস্থা? জরুরি কোনও তথ্য পেলে?'

'তা বলতে পারো,' বলল ক্যাসেডিন। মনে পড়ে গেছে, কী শুনেছে। রবিন কার্লটনের ইউনিটকে মেরে সাফ করে দিয়েছে দ্য ইন্টেলিজেন্স কনভার্জেন্স গ্রুপ।

'আরে!' হঠাৎ টেবিলের ওপাশ থেকে বলে উঠল রবিন কার্লটন। তুলে ধরেছে নোট। 'আপনি এটা কোত্থেকে পেলেন?'

কাগজে লেখা:

'...কপি, ওয়ান-টু-ফাইভ-সিক্স-ওয়ান-সিক্স...'

'...আয়োনোস্ফেরিক সমস্যায় যোগাযোগ হারিয়ে...'

'...সামনের দল...'

'...মাসুদ রানা...'

'... সিক্সটি-সিক্স পয়েণ্ট ফাইভ...'

'...সোলার ফ্লেয়ার বারোটা বাজাচ্ছে রেডিয়োর...'

'...ওয়ান-ফিফটিন, টোয়েণ্টি মিনিট্স্, টুয়েলভ সেকেণ্ড ইস্ট...'

'...কী করে...' কড়কড় করছে। '...চলে যাও, যাতে...'

'...রওনা হয়েছে দ্বিতীয় টিম...'

'সেটি' অফিসে কেন গিয়েছিল, রবিন কার্লটনকে খুলে বলল

ক্যাসেডিন।

'আর এই কোঅর্ডিনেট্স্,' বলল কার্লটন, 'মাইনাস সিক্সটি-সিক্স পয়েন্ট ফাইভ বা ওয়ান-ফিফটিন, টোয়েণ্টি মিনিট্স্, টুয়েলভ সেকেণ্ড ইস্ট— এগুলো অ্যান্টার্কটিকার একটা রিসার্চ স্টেশনের?'

'হ্যাঁ,' বলল ক্যাসেডিন।

শীতল চোখে তার দিকে চাইল কার্লটন। 'মিস্টার ক্যাসেডিন, মেরিন ফোর্সের রিকনিস্যান্স ইউনিট সম্পর্কে আপনি কতটা জানেন?'

'তেমন কিছুই না। শুধু আপনার কাছ থেকে যা শুনেছি।'

'সামনে একটা দল আছে,' আনমনে বলল রবিন কার্লটন।

'হ্যাঁ, তাই তো বলেছে,' কাগজের দিকে চাইল ক্যাসেডিন। 'রওনা হয়েছে দ্বিতীয় টিমও।'

'তার চেয়ে বড় কথা, মাসুদ রানা...' চোখ তুলে চাইল রবিন কার্লটন।

ক্যাসেডিন জানতে চাইল, 'মাসুদ রানা কী? কোনও অপারেশনের নাম?'

'না,' বলল কার্লটন। 'মাসুদ রানা একজন লোকের নাম। সে আগে বাংলাদেশ আর্মির মেজর ছিল। আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। আমাকে যখন পেরুর ওই মন্দিরে খুন করার চেষ্টা চলছিল, তখন কাছাকাছিই ছিল রানা। পরে জেনেছি, কীভাবে যেন খবর পেয়ে ও সাহায্য করতে গিয়েছিল। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও ভেতরে ঢুকতে পারেনি। ওকে আটকে দিয়েছিল ইন্টেলিজেন্স কনভার্জেন্স গ্রুপের দালালরা।'

সে আরও কিছু বলবে, সেজন্য অপেক্ষা করছে ক্যাসেডিন। কিন্তু কিছুই বলছে না কার্লটন।

তারপর হঠাৎ করেই ক্যাসেডিনের চোখে সরাসরি চাইল

কার্লটন। 'আমার বন্ধু এখন ওখানে,' নিচু স্বরে বলল। 'ওখানে!'

'তাতে কী?' জানতে চাইল ক্যাসেডিন।

'ওখানে দ্বিতীয় দল পাঠানো হয়েছে। তার মানে...' চুপ করে গেছে।

অপেক্ষা করছে ক্যাসেডিন এবং তার স্ত্রী।

আবারও কাগজের দিকে চাইল কার্লটন। 'হায় যিশু!' এবার চট্ করে বলল, 'একটু অপেক্ষা করুন। আমাকে এখনই একটা ফোন করতে হবে।'

অপেক্ষা করছে ক্যাসেডিন ও সান্থা। বুক-পকেট থেকে মোবাইল ফোন নিয়ে দ্রুত ডায়াল করল কার্লটন।

'হ্যাঁ, পার্সোনেল ডিপার্টমেণ্ট, প্লিয,' ফোনে বলল। কয়েক সেকেণ্ড পর বলল, 'হ্যাঁ, অ্যান্টার্কটিকা। মেরিন কর্পস। এদের সঙ্গে বাংলাদেশ আর্মির মেজর মাসুদ রানা আছেন। ...তাঁর পারিবারিক সমস্যার কথা... হ্যাঁ, আমি ফোনে অপেক্ষা করছি।'

পুরো একমিনিট পেরুল, তারপর আবারও লাইনে এল কেউ।

'হ্যাঁ, বলুন,' বলল রবিন কার্লটন। 'হ্যাঁ, আমি ওঁর শালা, জর্জ,' চুপ করে শুনছে সে। 'হায় যিশু,' নরম স্বরে বলল, 'হায় ঈশ্বর, ঠিক আছে। ধন্যবাদ।'

পকেটে ফোন রেখে দিল কার্লটন। বিড়বিড় করে গালি দিল কাকে যেন।

'কী শুনলেন?' জানতে চাইল ক্যাসেডিন।

'ইউনাইটেড স্টেট্স্ মেরিন কর্পসের পার্সোনেল ডিপার্টমেণ্ট থেকে জানাল, কয়েকজন মেরিনের সঙ্গে দক্ষিণ সাগরে ট্রেইনিঙে গিয়ে মারা পড়েছেন মেজর মাসুদ রানা। গতকাল সকাল সাড়ে ন'টায় মারা যান। দুঃখজনক দুর্ঘটনার বিষয়টি বাংলাদেশ সরকারকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে।'

'ভদ্রলোক মারা গেছেন?' ভুরু কুঁচকে ফেলেছে ক্যাসেডিন।

'এদের কথা অনুযায়ী,' বলল কার্লটন। 'কিন্তু বাস্তবের সঙ্গে তাদের কথা মিলবে, এমন না-ও হতে পারে। ওদের খাতাপত্রে আমিও তো মৃত।' এক মুহূর্ত ভাবল সে, তারপর বলল, 'দ্বিতীয় দল...'

'তাদের ব্যাপারে কী?'

'এখন উইলকক্স আইস স্টেশনে চলেছে দ্বিতীয় দল।'

'হ্যাঁ, তো?'

'ইউনাইটেড স্টেটস মেরিন কর্পসের তরফ থেকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে, মাসুদ রানা অনেক আগেই মরেছে।' দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মনে হলো কার্লটনকে। 'তার মানে, ওই স্টেশনে অস্বাভাবিক কিছু পেয়েছে রানা। এখন ওকে মেরে ফেলা হচ্ছে বা হবে।'

আবারও স্ত্রীকে ফোন করল ক্যাসেডিন। হাই-হ্যালোর ভিতর গেল না, সরাসরি বলল, 'ঠিক আছে, এবার দেরি না করে পাঠিয়ে দাও।'

'দাঁড়াও, এক সেকেণ্ড,' বলল সান্থা। ক্যাসেডিন শুনতে পেল, ওপাশে কমপিউটারের কি-বোর্ড টেপা হচ্ছে।

'এবার সেণ্ড করে দিলাম,' বলল সান্থা।

এদিকে ড্রইংরুমের আরেক পাশে কমপিউটারের সামনে বসেছে রবিন কার্লটন। কয়েকটা স্ক্রিনে ক্লিক করল, এক সেকেণ্ড পর বেরিয়ে এল ই-মেইল স্ক্রিন।

পাতার নীচে ইনফর্মেশন বার-এ টিপটিপ করছে আলো:

ইউ হ্যাভ নিউ মেইল।

'ওপেন' আইকনে ক্লিক করল কার্লটন।

এক সেকেণ্ড পর মনিটরে বড় একটা পাতা খুলে গেল:

অল-স্টেট্স্ লাইব্রেরি ডেটাবেস

সার্চ বাই কি-ওঅর্ড

সার্চ স্ট্রিং ইউজড:

ল্যাটিচ্যুড –৬৬.৫*

লংগিচ্যুড ১১৫* ২০' ১২"

নং. অভ এণ্ট্রিজ ফাউণ্ড: সিক্স

টাইটেল: 'দ্য আইস ক্রুসেড: রিফ্লেকশন্স অন এ ইয়ার স্পেণ্ট ইন অ্যাণ্টার্কটিকা।' অথার: এন ভিসার, হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি, ২০০৯।

টাইটেল: 'ডক্টরাল থিসিস।' অথার: রবার্ট হিগিন্স, স্ট্যানফর, ১৯৯৯।

টাইটেল: 'ডক্টরাল থিসিস।' অথার: জর্জ হিউবার্ট, স্ট্যানফর, ১৯৯৮।

টাইটেল: 'পোস্ট-ডক্টরাল থিসিস।' অথার: এম ভিসার, ইউএসসি, সিটি, ১৯৯৭।

টাইটেল: 'ফেলোশিপ গ্র্যাণ্ট রিসার্চ পেপার।' এম ভিসার, হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি, ১৯৯৪।

টাইটেল: 'প্রিলিমিনারি সার্ভে।' অথার: শ্যারন স্টোন, লাইবকং, ১৯৭৮।

কার্লটন ও ক্যাসেডিনের জন্য অল স্টেটস্ ডেটাবেস থেকে পাওয়া লিস্ট পাঠিয়ে দিয়েছে সান্থা ক্যাসেডিন।

'কাজের কাজ করেছ,' স্ত্রীকে বলল ক্যাসেডিন।

'তা তো আমি জানিই, কিন্তু ওটা দিয়ে কী করবে তোমরা?' স্পিকার ফোনে জানতে চাইল সান্থা।

'এই লিস্ট থেকে ঠিকানা বের করব,' বলল রবিন কার্লটন। দ্রুত কি-বোর্ডে আঙুল চলছে। 'অ্যান্টার্কটিকায় আমেরিকান যেসব অ্যাকাডেমিক আছেন, তাঁদের ই-মেইল ঠিকানা বের করতে পারলে রানার কাছে ই-মেইল করতে পারব।'

'বেশিরভাগ ইউনিভার্সিটি প্রফেসরদের ই-মেইল থাকে,' স্ত্রীকে বলল ক্যাসেডিন। 'আর উইলকক্স আইস স্টেশনে স্যাটালাইট ফোন না থেকেই পারে না, কাজেই মেসেজ ঠিকই পৌঁছবে।'

হঠাৎ বলে উঠল কার্লটন, 'হ্যাঁ, একটা ঠিকানা পেয়েছি! নিনা ভিসার, হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটির ই-মেইল। এক্সটারনাল অ্যাড্রেসও দিয়েছে: নিনাভিসার @ উইলকক্স.এডু.ইউএস.। এবার এতেই চলবে। ওই স্টেশনে যে-কারও কমপিউটারে মেসেজ পাঠাতে পারব।'

'কাজটা শেষ করুন,' বলল ক্যাসেডিন।

মেসেজ টাইপ করল কার্লটন, তারপর দেরি না করে কাট করে পেস্ট করে দিল। কাজ শেষে খটাস করে টিপে দিল সেণ্ড বাটন।

তেরো

খাটো বরফ-সুড়ঙ্গে, ভারী ইস্পাতের দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে লেফটেন্যান্ট তিশা।

দরজার বুকে জং-ধরা প্রেশার-হুইল। বার কয়েক চেষ্টা করে হুইল ঘোরাতে পারল ও। তিনবার ঘোরাতেই হঠাৎ করেই ভিতর অংশ থেকে এল জোরালো ক্লিক আওয়াজ। সামান্য খুলে গেল দরজা।

দুই হাতে কবাট খুলে ফেলল তিশা। আলো ফেলল ওদিকে।

'সর্বনাশ,' ফিসফিস করে বলল।

ওদিকটা বিমানের হ্যাঙারের মতই বিশাল। এতই প্রকাণ্ড, দূর-প্রান্ত ছুঁলো না ফ্লাশলাইটের বাতি। অবশ্য বোঝা গেল অনেক কিছুই। দেয়াল দেখতে পেয়েছে ও। ওই দেয়াল মানুষের তৈরি।

লোহার দেয়াল সেসব, ভারী রিইনফোর্সড্ গার্ডারগুলো উঁচু করে রেখেছে বিশাল অ্যালিউমিনিয়ামের ছাতকে। প্রায়ান্ধকারে দেখল, নীরবে থম মেরে বসে আছে হলুদ রঙের রোবোটিক বাহু। সিলিঙে সারি দিয়ে হ্যালোজেন বাতি। বিদঘুটে ভাবে মেঝেতে কাত হয়ে পড়েছে বেশ কিছু ধাতব গার্ডার। কয়েকটার শেষ মাথা এবড়োখেবড়ো। আসলে মাঝ থেকে ভেঙে পড়েছে। সব কিছুর উপর পাতলা বরফের চাদর।

পায়ের সামনে একটা কাগজ দেখতে পেল তিশা। ওটা তুলে নিল, ওটা জমে গেছে বরফে। কিন্তু লেটারহেড পড়তে পারল। ওখানে লেখা:

হাইটেক লিমিটেড।

আবারও খাটো সুড়ঙ্গে ফিরল তিশা। ফাটলের সামনে থেমে গলা উঁচু করে ডাকল জনি ওয়াকার ও নিনা ভিসারকে।

দু'মিনিট পর ফাটলের ভিতর দিয়ে গড়িয়ে এল জনি ওয়াকার, ধুপ করে নামল মেঝেতে। তাকে হাতের ইশারা করল তিশা, ফিরে চলেছে পাতাল হ্যাঙারের দিকে।

ইস্পাতের দরজা দিয়ে ঢুকেই থমকে গেল ওয়াকার, বিস্মিত স্বরে বলল, 'এটা আবার এখানে কীভাবে?'

হ্যাঙারে ঢুকে পড়ল ওরা। দুই ফ্লাশলাইটের বাতি বহু দূর গিয়ে পড়ছে। বামে চলল ওয়াকার, ডানদিকে তিশা।

কিছু দূর যাওয়ার পর বরফ ছাওয়া এক অফিস দেখে ওখানে থামল তিশা। দরজার নবে মোচড় দিতেই জোরালো কটকট আওয়াজ হলো। খুব ধীরে খুলে গেল দরজা, ভিতরে পা রাখল ও।

একটু দূরে মেঝের উপর পড়ে আছে কে যেন।

একটা লোক।

দুই চোখ বোজা, মানুষটা পুরোপুরি উলঙ্গ। নীল হয়ে গেছে ত্বক। মনে হলো ঘুমিয়ে পড়েছে।

অফিসের আরেক পাশে ডেস্ক, তার উপর কী যেন। ডেস্কের সামনে চলে গেল তিশা, জিনিসটা লেদারবাউণ্ড কোনও বই।

ডেস্কে আর কিছুই নেই। তিশার মনে হলো, কেউ যেন ইচ্ছা করেই বইটা ওখানে রেখেছে। আশা করা হয়েছে, কেউ ওটা দেখবে।

বইটা তুলে নিল তিশা। প্রচ্ছদ ঢাকা পড়েছে পাতলা বরফের আস্তরণে। কার্ডবোর্ডের মত মোটা হয়ে উঠেছে পাতাগুলো।

বই খুলল তিশা।

কোনও ডায়েরি মনে হলো।

প্রথম এণ্ট্রি পড়তে শুরু করেছে:

৩ জুন, উনিশ শ' আটাত্তর।

সবই ভালভাবে চলছে। কিন্তু এখানে বড্ড শীত! ভাবতে অবাক লাগে, এরা আমাদেরকে এখানে নিয়ে এসেছে ওই অ্যাটাক প্লেন তৈরি করাতে! বাইরের আবহাওয়া ভয়ঙ্কর খারাপ। সর্বক্ষণ চলছে ব্লিযার্ড। কপাল ভাল যে আমাদের হ্যাঙার বরফের নীচে, নইলে ওই পরিবেশে মরেই যেতাম। অবাক কাণ্ড, এই শীত খুবই দরকারী। এতে ভাল থাকে প্লুটোনিয়ামের গ্রেড, নইলে ক্ষতিগ্রস্ত

হতো সিস্টেমের প্লুটোনিয়াম কোর...

ডায়েরির শেষ পাতার কাছে চলে গেল তিশা। পড়তে শুরু করেছে:

১৫ ফেব্রুয়ারি, উনিশ শ' আশি সাল।

কেউ আসছে না। আমি বুঝে গেছি, আর কেউ আসবে না। গতকাল গ্রেগ গুডিং মারা গেল। আর রন গার্টেনের দুই হাত কেটে ফেলতে হয়েছে। ফ্রস্টবাইট।

ভূমিকম্প হওয়ার দুই মাসের বেশি পেরুল, আমরা সবাই হতাশ। কেউ আমাদেরকে উদ্ধার করবে না। কে যেন বলেছিল ডিসেম্বরে ট্রেভল রয়েস আসছে। কই, সে তো আর এল না।

ঘুমাতে গেলে বারবার মনে হয়: এমনও হতে পারে, ট্রেভল রয়েস ছাড়া আর কেউ জানে না যে আমরা এখানে আছি।

আরও কয়েক পৃষ্ঠা পিছিয়ে এল তিশা, তারপর পেয়ে গেল যা খুঁজছে।

২০ ডিসেম্বর, উনিশ শ' উনআশি

আসলেই জানি না কোথায় আছি। গতকাল হঠাৎ করেই শুরু হলো ওই ভূমিকম্প। আগে কখনও এমন দেখিনি। যেন খুলে গেল পৃথিবীর বুক, আর সব কিছু গিলে ফেলল। আমাদেরসহ।

ভূমিকম্প শুরু হওয়ার সময় হ্যাঙারে ছিলাম, কাজ করছিলাম কালো পাখির উপর। প্রথমে থরথর করে কাঁপতে লাগল জমিন, তারপর পায়ের নীচ থেকে ছিটকে উঠল বিশাল বরফের দেয়াল। দেখতে না দেখতে দু' টুকরো হয়ে গেল হ্যাঙার। আমরা কলের পুতুলের মত পড়ে গেলাম মেঝেতে। মনে হলো নীচের দিকে পড়ছি। পড়তেই থাকলাম। এই বিশাল দালানের চেয়ে অনেক

বড় সব বরফের চাঁই দু'পাশ থেকে নামতে লাগল। মাঝে আমরা, যেন বিশাল কোনও গর্তে পড়ছি। উপরে চাইলাম, হ্যাঙারের ছাতে প্রকাণ্ড সব বরফের চাঁই পড়ছে। তুবড়ে গেল ছাত। শুধু বুম! বুম! বুম! আওয়াজে মনে হলো, স্টেশনের নীচে মস্ত কোনও গহ্বর তৈরি হয়েছে। আর আমরা পড়ছি তার ভিতর।

আমরা নীচের দিকে পড়ছি। প্রচণ্ড ঝাঁকি খেয়ে নীচে পড়ছি। প্রকাণ্ড সব রোবোটিক বাহুর একটা ভেঙে পড়ল ডগলাস ক্রেইগের উপর। সঙ্গে সঙ্গে মারা গেল সে। তারপর...

হতবাক হয়ে গেছে তিশা।

এই হ্যাঙার আগে ছিল কোনও আইস স্টেশন।

এখানে খুব গোপনে তৈরি করা হচ্ছিল ওই বিমান। তিশা বুঝতে পারল, ওই বিমানে প্লুটোনিয়াম কোর ব্যবহার করা হয়েছে। আগে এই স্টেশন ছিল বরফ-সমতল থেকে সামান্য নীচে, ঠিক যেমন এখন উইলকক্স আইস স্টেশন! তারপর একদিন এই স্টেশনকে এখানে নামিয়ে আনল ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প।

ডায়েরির শেষ পৃষ্ঠায় চলে এল তিশা।

১৮ মার্চ, উনিশ শ' আশি।

একমাত্র আমিই জীবিত মানুষ। অন্য সবাই মারা গেছে। প্রায় তিন মাস হলো ওই ভূমিকম্প, এরই ভিতর বুঝেছি, আর কেউ আসবে না উদ্ধার করতে। ফ্রস্ট বাইটে নষ্ট হয়ে গেছে ডান হাত। গ্যাংগ্রিনও ধরেছে। এখন আর কোনও সাড়া নেই দুই পায়ে।

এভাবে বাঁচব না। উদ্ধারেরও কোনও আশা নেই। তার চেয়ে এ-ই ভাল, সব পোশাক খুলে শুয়ে পড়ব বরফের মেঝের ওপর। মাত্র কয়েক মিনিট লাগবে মরতে। ভবিষ্যতে যদি এই লেখা কেউ পড়েন, জানবেন আমার নাম স্যামসন ব্যারিমোর। এভিয়েশন

ইলেকট্রনিক্স স্পেশালিস্ট। হাইটেক লিমিটেডে চাকরি করতাম। আমার স্ত্রী মেইমি, লস অ্যাঞ্জেলেসের ড্যাণ্ডিতে থাকে। এক শ' তেরো নম্বর বাড়ি। পরেও ওখানে থাকবে কি না জানি না। আপনি এই লেখা পড়লে, দয়া করে ওকে জানাবেন, আমি ওকে খুবই ভালবাসি। ওর কাছে ক্ষমাপ্রার্থী, ওকে বলে আসতে পারিনি কোথায় চলেছি। কাউকে কিছু বলবার উপায় ছিল না।

উহ্, এখানে কী ভীষণ ঠাণ্ডা! আর কী আশ্চর্য! ট্রেভল রয়েস লোকটা এলই না!

একবার মেঝেতে শুয়ে থাকা লাশের দিকে চাইল তিশা।

স্যামসন ব্যারিমোর।

একাকী মানুষটার জন্য খুব খারাপ লাগছে তিশার। কী কষ্ট পেয়েই না মরেছে। পাশে কেউ ছিল না। কবর হলো এই শীতল সমাধির ভিতর।

হঠাৎ চমকে গেল তিশা, হেলমেট ইণ্টারকমে লেফটেন্যাণ্ট গোলাম মোরশেদের উত্তেজিত কণ্ঠ: 'সার্জেণ্ট জনি ওয়াকার! লেফটেন্যাণ্ট তিশা! এখনই চলে আসুন! পানির নীচে শত্রু ডুবুরি! রিপিট করছি! যে-কোনও সময়ে গুহায় উঠে আসবে শত্রু ডুবুরি!'

সি স্লেডে ভর করে পানির নীচের ওই বরফ-সুড়ঙ্গ বেয়ে উপরে উঠছে এসএএস ডাইভাররা। সংখ্যায় তারা আটজন। টুইন-প্রপেলার সি স্লেডের কারণে সহজে এগুতে পারছে। প্রত্যেকের পরনে কালো ডুবুরি পোশাক।

'ডাইভ টিম বলছি, সাড়া দিন, বেস,' হেলমেট কমিউনিকেটারে যোগাযোগ করল ডুবুরিদের নেতা।

'ডাইভ টিম, বেস থেকে বলছি,' ইণ্টারকমে ভেসে এল জুলিয়াস বি. গুণ্ডারসনের কণ্ঠ। 'রিপোর্ট করো।'

'বেস, সময় এখন ১৯৫৬ ঘণ্টা। ডাইভিং বেল থেকে বেরিয়ে

আসার পর ডাইভিং চলছে চুয়ান্ন মিনিট। আমরা উপরের পানি দেখছি। এবার ভেসে উঠব গুহার ভিতর।'

'খুব সতর্ক থাকবে, ডাইভ টিম। আমরা জেনেছি, গুহার ভিতর তোমাদের জন্য অপেক্ষা করছে চারজন শত্রু। রিপিট করছি, গুহার ভিতর তোমাদের জন্য অপেক্ষা করছে চারজন শত্রু সৈনিক। তাদের ব্যবস্থা নিতে হবে।'

'শুনেছি, বেস। সতর্ক থাকব। ডাইভ টিম আউট।'

খাটো সুড়ঙ্গ থেকে বেরিয়ে এসেছে তিশা ও ওয়াকার, ছুটতে ছুটতে পৌঁছে গেল লেফটেন্যান্ট মোরশেদের পাশে। তিন ট্রাইপডের এমপি-৫ তাক করা হয়েছে পুলের উপর।

কাঁচের মত স্বচ্ছ নীল পানির ভিতর দিয়ে দেখা গেল, নীচ থেকে উঠে আসছে কালো বেশ কয়েকটি মূর্তি।

তিনপাশের বোল্ডারগুলোর পাশে এমপি-৫ নিয়ে তৈরি হয়ে গেল গোলাম মোরশেদ, তিশা ও ওয়াকার। শেষের জন নিনা ভিসারকে পিছনে লুকিয়ে থাকতে বলল।

'কেউ ধৈর্য হারাবেন না,' ইন্টারকমে বলল তিশা। 'আগে পানির উপর মাথা তুলুক, তার আগে পানিতে গুলি করে বুলেট নষ্ট করার দরকার নেই।'

'বুঝতে পেরেছি,' বলল মোরশেদ।

পানির ভিতর কালো ছায়া দেখল তিশা। উঠে আসছে পুকুরের উপর অংশে।

এক ডুবুরি। সামনে ধরেছে সি স্লেড।

ক্রমেই উঠে আসছে। পানির সমতলে উঠবার আগে থামল।

ভুরু কুঁচকে গেল তিশার।

পানির এক ফুট নীচে থেমেছে লোকটা।

কী করছে?

তারপর হঠাৎ করেই ডুবুরির হাত ছিটকে উঠল পানির উপর। এবার পরিষ্কার তার হাতের জিনিসটা দেখতে পেল তিশা।

'নাইট্রোজেন চার্জ!' চেঁচিয়ে উঠল ও। 'সবাই কাভার নিন!'

গুহার জমাট বরফের উপর ঠং করে পড়ল নাইট্রোজেন চার্জ। ততক্ষণে তিশা ও অন্যরা আড়াল নিয়েছে বোল্ডারের পিছনে।

বিস্ফোরিত হলো নাইট্রোজেন চার্জ।

চারপাশে ছলাৎ করে লাগল সুপারকুল্ড লিকুইড নাইট্রোজেন। যেন নীল আঠা, ছুটে এসে লাগল আড়াল নেয়া বোল্ডারগুলোর সামনের দিকে। লাগল গুহার নানাদিকের দেয়ালে। কিছু গিয়ে পড়ল দূরে দাঁড়িয়ে থাকা বিমানের উপর।

ভাল ডাইভার্শন তৈরি করেছে ব্রিটিশরা।

নাইট্রোজেন চার্জ ফাটতেই পানি থেকে উঠে আসতে শুরু করেছে প্রথম এসএএস কমাণ্ডো। কাঁধে তার অস্ত্র, টিপে ধরেছে ট্রিগার।

পুলের সারফেসের কাছে পৌঁছে গেছে ডাইভিং বেল, এখনও ধীরে ধীরে উপরে উঠছে।

গুণ্ডারসন বারবার বলেছে, মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হবে, যৌক্তিক পথে ভাবতে হবে। রাগী নেতা মানেই বোকা লোক, সে একের পর এক ভুল করে খতম করবে তার নিজের দলকে।

মগজে গুণ্ডারসনের কথা ঘুরছে, কিন্তু ওই লোকের কথা এখন শুনবে না ও, ভীষণ জেদ চেপেছে রানার।

ওর সহযোদ্ধাকে কিলার ওয়েইল দিয়ে খাইয়েছে ওই বদমাশ লোকটা। ওই মানুষ নামের জানোয়ারটাকে ছাড়বে না ও। দুই হাতে ছিঁড়ে ফেলবে তার বুক, টেনে বের করে আনবে হৃৎপিণ্ড...

কোমরে পেঁচিয়ে রাখা কেবল খুলে ফেলল রানা, ষাট দশকের ভারী ওয়েটসুট ঝেড়ে ফেলল গা থেকে। খপ্ করে তুলে নিল

এমপি-৫, চেম্বারে ভরে নিল রাউণ্ড। দাঁতে-দাঁত চেপে মনে মনে বলল, ওই হারামজাদাকে যদি মারতে না পারি, আশপাশে যে ক'টাকে পাব, সবগুলোকে শেষ করব।

অস্ত্র লোড করতে গিয়ে ডাইভিং বেলের তাকে দেখেছে ছোট স্যামসোনাইট ক্যারি কেস। জিনিসটা খুলল রানা। ভিতরে এক সারিতে নীল নাইট্রোজেন চার্জ। একেকটা যেন নরম ফোমের উপর যত্নে শুইয়ে রাখা ডিম।

পাতাল-গুহায় যাওয়ার সময় এগুলো রেখে গেছে এসএএস কমাণ্ডোরা, ভাবল রানা। তুলে নিল একটা নাইট্রোজেন চার্জ, রেখে দিল পকেটের ভিতর।

বাইরে চাইল। আপাতত ওদিকে কোনও কিলার ওয়েইল নেই। এক সেকেণ্ড ভাবল, বোধহয় ফিরে গেছে ওগুলো সাগরে।

'কী করছেন, ভাই?' জানতে চাইল রাশেদ হাবিব।

'নিজ চোখেই দেখবেন,' ডাইভিং বেলের গোলাকার ছোট পুলে নেমে পড়ছে রানা।

'আপনি বাইরে যাবেন?' অবিশ্বাস নিয়ে বলল হাবিব। 'আমাকে এখানে রেখে?'

'আপনি ভালই থাকবেন,' নিজের ডেযার্ট ঈগল পিস্তল বিজ্ঞানীর দিকে ছুঁড়ে দিল রানা। 'কেউ যদি আসে, গুলি করে মেরে ফেলবেন।'

খপ্ করে অস্ত্রটা ধরল হাবিব। ওদিকে মন নেই রানার, দ্বিতীয় সেকেণ্ড দেরি না করে নেমে পড়েছে পুলে। চার সেকেণ্ড পর বেরিয়ে এল বাইরের পুলে।

পানি প্রায় জমাট বাঁধবার মত ঠাণ্ডা, কিন্তু পাত্তা দিল না। একহাতে ধরে রেখেছে ডাইভিং বেলের বাইরের একটা পাইপ। এবার ওটা বেয়ে উঠে গেল গোলাকার বেলের ছাতে।

প্রায় পৌঁছে গেছে পানি সমতলে।

এইবার ব্রিটিশ কুকুরের বাচ্চাগুলো দেখবে বাঙালি সৈনিক কীভাবে গুলি করে, গনগনে রাগের ভিতর ভাবল রানা। একবার ভেসে উঠলেই ব্রাশ ফায়ার শুরু করবে। প্রথমে এক পশলা গুলি বিঁধবে জুলিয়াস বি. গুণ্ডারসনের বুকে। হারামজাদা...

উপরে উঠছে ডাইভিং বেল। একটু পর ভেসে উঠবে।

আর বড়জোর পাঁচ সেকেণ্ড, ভাবল রানা। শক্ত করে ধরল এমপি-৫-র গ্রিপ।

বড়জোর দুই সেকেণ্ড...

জোরালো ছলাৎ আওয়াজ তুলে ভেসে উঠল ডাইভিং বেল।

একহাতে উইঞ্চ কেবল ধরেছে রানা, ঝরঝর করে সারা শরীর থেকে ঝরছে শীতল পানি। আরেক হাতে উদ্যত এমপি-৫।

কিন্তু কোনও গুলি করল না রানা। যদি আয়না থাকত, টের পেত ফ্যাকাসে হয়ে গেছে ওর মুখ।

ই-ডেকে কমপক্ষে বিশজন এসএএস কমাণ্ডো ঘিরে ফেলেছে ডাইভিং বেল!

প্রত্যেকের অস্ত্র তাক করা ওর বুক লক্ষ্য করে।

দক্ষিণ টানেল থেকে উঁকি দিল কমাণ্ডার, মেজর জেনারেল জুলিয়াস বি. গুণ্ডারসন। দাঁত বের করে হাসছে লোকটা, একটু একটু নড়ছে কালো দাড়ি। তার উপর চোখ পড়তেই নিজেকে দুনিয়ার সবচেয়ে খারাপ কয়েকটা গালি দিল রানা। রাগ ওর চরম সর্বনাশ করেছে। গাধার মত গোঁয়ার্তুমি করেছে ও। হোসেন আরাফাত দবিরের আকস্মিক মৃত্যু পাগল করে দিয়েছিল ওকে। আর সে কারণেই জীবনের সবচেয়ে বড় ভুলটা করেছে।

'এবার অস্ত্র ফেলে দাও, রানা, নইলে কিন্তু মরবে,' দক্ষিণ টানেল থেকে বেরুল না গুণ্ডারসন।

এক মুহূর্ত দ্বিধা করল রানা, তারপর ছুঁড়ে ফেলল এমপি-৫। ঠং-ঠনাৎ আওয়াজ তুলে পিছলে গেল ডেকে অস্ত্রটা। একটা দীর্ঘ

আঁকশি দিয়ে ডাইভিং বেল ধরল এসএএস কমাণ্ডোরা, নিয়ে এল ডেকের পাশে।

আবারও মগজ খাটাতে শুরু করেছে রানা। এখন ওর মন স্ফটিকের মত পরিষ্কার হয়ে আসছে। পানির উপর উঠেই যখন এসএএস কমাণ্ডোদের হাতে অস্ত্র দেখেছে, এবং সব অস্ত্র ওর দিকেই তাক করা, সমস্ত রাগের ভিতর বালতি বালতি পানি ঢেলে দিয়েছে।

এখন ভাবছে, রাশেদ হাবিব বেরিয়ে না এলেই হয়। লুকিয়ে থাকুক লোকটা ডাইভিং বেলের ভিতর।

ডাইভিং বেল থেকে ধাতব ডেকের উপর রানা লাফিয়ে নামতেই জোরালো ধাতব আওয়াজ হলো। স্বস্তির শ্বাস ফেলল, এসএএস কমাণ্ডোরা ডাইভিং বেল আবারও ছেড়ে দিয়েছে। ওটা চলে গেল পুলের মাঝে। কেউ দেখেনি রাশেদ হাবিবকে।

এসএএস কমাণ্ডোদের বিশালদেহী দু'জন দু'পাশ থেকে খপ্ করে ধরল রানার দুই হাত, মুচড়ে পিঠের উপর তুলে দিল। দুই কবজিতে আটকে দেয়া হলো হ্যাণ্ডকাফ। আরেক এসএএস কর্পোরাল ওকে তল্লাসী করল। পকেট থেকে নাইট্রোজেন চার্জ বের করে নিল। বাদ পড়ল না ম্যাগহুকও।

এবার বীরের মত এল গুণ্ডারসন, রানার সামনে থমকে দাঁড়িয়ে বলল, 'তা হলে আবারও দেখা হলো আমাদের, মাসুদ রানা। তোমাকে দেখেই মনটা ভাল হয়ে গেছে।'

কিছুই বলল না রানা। খেয়াল করেছে, লোকটার পরনে কালো থারমাল ওয়েটসুট।

আরেকদল এসএসএস কমাণ্ডোকে পাতাল-গুহায় নামাবে শালা, ভাবল রানা। সঙ্গে নিজেও যাবে।

'তুমি ডাইভিং বেলের ভিতর থেকে আমাদের দেখছিলে, তাই না?' চওড়া হাসল গুণ্ডারসন। 'কিন্তু আমরাও তোমাকে

দেখছিলাম।' পুলের ধারে ছোট এক ধূসর যন্ত্র দেখিয়ে দিল সে। জিনিসটা দেখতে ক্যামেরার মত, সোজা চেয়ে আছে পানির দিকে।

'চারপাশ কখনও অরক্ষিত রাখতে নেই, রানা,' মিষ্টি করে বলল গুণ্ডারসন। 'তোমার এটা বুঝবার কথা।'

চুপ করে থাকল রানা।

ওর সামনে পায়চারি শুরু করেছে গুণ্ডারসন। 'যখন শুনলাম তুমি এই মিশনে এসেছ, মন বলল তোমার সঙ্গে দেখা হলে মন্দ হয় না। কিন্তু যখন এসে পৌঁছলাম, তুমি লেজ গুটিয়ে পালিয়ে গেলে।' পায়চারি থামিয়ে রানার দিকে চাইল সে। 'তারপর শুনলাম, পালাতে গিয়ে ক্লিফের উপর থেকে পড়ে গেছ। তখন মনে হলো, আর বুঝি রানা বাবুর সঙ্গে দেখা হলো না।'

একদম নীরব রানা। চুপ করে দেখছে পিশাচটাকে।

'কিন্তু এখন জানি, তুমি পুরো সুস্থ,' মাথা নাড়ল গুণ্ডারসন। 'আমি খুশি যে ভুল ভেবেছিলাম। তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে কী যে ভাল লাগছে! আবার খারাপও লাগছে, এমন বাজে পরিস্থিতিতে আমাদের দেখা হলো।'

'আসলে কী বলতে চাও?' প্রথমবারের মত মুখ খুলল রানা।

'খারাপ লাগছে, আমাদের এই দু'জনের একজনকে মরতেই হবে।'

'তোমার আত্মীয়-স্বজনকে বুক ভরা সহানুভূতি জানাব,' বলল রানা।

'বাহ্!' বলে উঠল গুণ্ডারসন। 'এই তো চাই। লড়াই তো করতেই হবে। সবসময় আমার ভাল লেগেছে তোমার এই লড়াকু ভাব। তোমার ভিতর যুদ্ধংদেহী ভাব আছে। তুমি হয়তো আমার মত দুনিয়ার সেরা স্ট্র্যাটেজিক কমাণ্ডার হওনি, কিন্তু চেষ্টা তো করেছ। যা আগে শিখতে পারোনি, পরে শিখতে চেয়েছ, আর তা

করতে গিয়ে নাকের পানি চোখের পানি এক করেছ। কখনও এক পা পিছালেও হাল ছাড়োনি। আজকাল এ ধরনের মানুষ খুব কম পাওয়া যায়।'

চুপ করে আছে রানা।

'অন্তর থেকে একটা কথা মেনে নাও, রানা, এই লড়াইয়ে কখনও জিততে না। সেই প্রথম থেকেই ভুল করছ। এমনকী তোমার দলেই বিশ্বাসঘাতক। সে তোমার প্রতি অনুগত ছিল না।'

পুলের আরেক পাশের খুঁটিতে পল সিংগারের দিকে চাইল গুণ্ডারসন। লোকটার দৃষ্টি লক্ষ্য করে ওদিকে চাইল রানা।

'তুমি ওকে খুন করতে চাও, তাই না?' নিষ্পলক চোখে ভাইপারের দিকে চেয়ে আছে গুণ্ডারসন।

নীরব থাকল রানা।

ঘুরে চাইল গুণ্ডারসন, সরু হয়ে গেছে দুই চোখ। 'সুযোগ পেলে মেরেই ফেলবে, তাই না, রানা?'

শিথিল ভাবে দাঁড়িয়ে আছে রানা।

মনে হলো কী যেন ভাবতে শুরু করেছে ব্রিটিশ কমাণ্ডার। একটু পর আবারও চাইল রানার দিকে। জ্বলজ্বল করে উঠেছে দুই চোখ।

'বলি কী শোনো,' বলল। 'আমি তোমাকে সুযোগ করে দেব। ব্যাপারটাকে খেলাও বলতে পারো। এটা একটা বড় সুযোগও।'

'কথা না পেঁচিয়ে যা বলার বলে ফেলো,' বলল রানা।

'তোমাদের দু'জনকে মেরে ফেলব, কিন্তু একটা সুযোগ দেব দু'জনকেই। চাইলে প্রাণপণ লড়তে পারো। একজন মরলে দ্বিতীয়জনকে ফেলে দেব সিংহের মুখে। তার সম্মান অনেক বেশি।'

প্রাচীন রোমানদের মত খেলতে চাইছে গুণ্ডারসন। ভুরু কুঁচকে

গেল রানার, চাইল পুলের দিকে। আবারও ফিরেছে কালো, উঁচু ডরসাল ফিন। কিনারা দিয়ে ঘুরছে কিলার ওয়েইল।

'ওর হাত খুলে দাও,' ভাইপারের সামনে দাঁড়ানো এসএএস কমাণ্ডোর উদ্দেশে বলল গুণ্ডারসন। 'জেণ্টলমেন, ড্রিলিং রুমে চলো সবাই।'

হ্যাণ্ডকাফে পিছমোড়া করে আটকে রেখেছে রানার দুই হাত। দুই এসএএস কমাণ্ডো ঘাড় ধরে ওকে নিয়ে চলল দক্ষিণ টানেলের দিকে। একমিনিট পেরুবার আগেই গুদাম-ঘর পাশ কাটাল রানা। এক পলক ওদিকে চাইল।

দরজা খোলা। গুদাম-ঘর খালি।

নিশাত ওখানে নেই।

ওর কথা একবারও বলেনি গুণ্ডারসন।

নিশাতকে বোধহয় পায়নি এরা।

দীর্ঘ, সরু টানেল ধরে রানাকে নিয়ে চলেছে দুই কমাণ্ডো। ড্রিলিং রুমের দরজা খোলা। ধাক্কা দিয়ে ওকে ঘরের ভিতর ঠেলে দেয়া হলো। হোঁচট খেয়ে পড়তে গিয়েও সামলে নিল রানা, ঘুরে দাঁড়াল।

কয়েক সেকেণ্ড পর ঘরের ভিতর ঠেলে দেয়া হলো পল সিংগারকে। আগেই তার হ্যাণ্ডকাফ খুলে দেয়া হয়েছে।

ড্রিলিং রুমের চারপাশ দেখে নিতে শুরু করেছে রানা। ঘরের ঠিক মাঝে কালো রঙের মস্ত কোর-ড্রিলিং অ্যাপারেটাস। দেখলে মনে হয় ছোটখাটো অয়েল ওয়েল। কালো কঙ্কালের মত রিগের মাঝে দীর্ঘ, গোলাকার প্লাঞ্জার। ওটা বোধহয় ড্রিলের সঙ্গে বহু নীচে বরফের কোরে নামে।

কোর-ড্রিলিং মেশিনের ওপাশে অন্য এক দৃশ্য চোখে পড়েছে রানার।

একটা দেহ। মেঝের উপর পড়ে আছে।

দুমড়ে-মুচড়ে যাওয়া লাশ, একেবারে রক্তে মাখামাখি— ফ্রেঞ্চ কমাণ্ডো-নেতা জ্যাকুস ফিউভিল। নিজেদের পেতে রাখা ক্লেমোর মাইনের বিস্ফোরণে মরেছে লোকটা।

'জেন্টলমেন,' দরজা থেকে হঠাৎ করেই গমগমে কণ্ঠে বলে উঠল গুণ্ডারসন। ওই দরজা ঢুকবার বা বেরুবার একমাত্র পথ। 'তোমরা এখন বাঁচবার জন্য লড়বে। ঠিক পাঁচ মিনিট পর ফিরব আমি। আশা করি তার আগেই যে-কোনও একজন মরবে। আর যদি দেখি কেউ মরোনি, দু'জনকেই নিজ হাতে গুলি করে মারব। মন দিয়ে শোনো, যদি ঠিকভাবে লড়ো, আর একজন মরে, অন্যজনকে কিছুক্ষণের জন্য বাঁচতে দেব। তার চেয়ে ঢের বড় কথা, সম্মানজনক ভাবে তাকে বিদায় করে দেব পৃথিবী থেকে। কারও কোনও প্রশ্ন?'

'আমার হ্যাণ্ডকাফ খুলবে না?' জানতে চাইল রানা। ওর দুই কবজি এখনও পিছমোড়া করে আটকানো। ভাইপারের হাত মুক্ত।

'আর কোনও প্রশ্ন?' জানতে চাই উদাস গুণ্ডারসন।

এবার আর একটা কথাও বলল না রানা।

'বেশ, যা করবার ঝটপট,' বলল গুণ্ডারসন। দরজা থেকে ঘুরে চলে গেল সে। দড়াম করে বন্ধ হলো দরজা। তালা লাগিয়ে দেয়ার আওয়াজ এল।

দেরি করল না রানা, সিংগারের দিকে চাইল। 'শোনো, ভাইপার, এবার এখান থেকে বেরিয়ে যেতে হলে...'

বুনো মোষের মত এল পল সিংগার, তার কাঁধের প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়ে পিছনে উড়াল দিল রানা, ধড়াস্ করে পড়ল দেয়ালে পিঠ দিয়ে। ফুসফুসে ব্যথা পেয়ে প্রায় দুই ভাঁজ হয়ে গেল। হাঁ করে শ্বাস নিতে চাইল, তারই ফাঁকে দেখল, ওর মুখ লক্ষ্য করে আসছে ভাইপারের খোলা তালু। ঝট্ করে বসে পড়ল রানা। লোকটার প্রচণ্ড থাবড়া পড়ল পিছনের বরফের দেয়ালে।

মাথা খাটাতে শুরু করেছে রানা। স্ট্যাণ্ডার্ড হ্যাণ্ড-টু-হ্যাণ্ড কমব্যাট মুভ নিয়েছে ভাইপার। খোলা হাতে পাঞ্চ করছে। রানার মগজের ভিতর গেঁথে দিতে চায় নাকের হাড়। ওই এক আঘাতেই শেষ হবে ও।

ওকে খুন করবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছে ভাইপার।

এবং সেটা করতে চাইছে পাঁচ মিনিটের ভিতর।

প্রায় মুখোমুখি দু'জন, ঝট্ করে হাঁটু তুলল রানা, পরক্ষণে জোর গুঁতো বসিয়ে দিল লোকটার তলপেটে। দেয়াল থেকে ছিটকে সরে গেল নিজে। হনুমানের মত লাফিয়ে উঠেছে, দুই পায়ের নীচ দিয়ে বের করে নিল দুই হাত।

এখন হ্যাণ্ডকাফে আটকানো হাত দুটো ওর সামনে।

একের পর এক কিক ও পাঞ্চ করতে করতে আসছে ভাইপার। কাফ পরা দুই হাতে লোকটার কিক বা পাঞ্চ ঠেকাতে শুরু করেছে রানা। কয়েক সেকেণ্ড পর আলাদা হয়ে গেল দু'জন, ক্ষিপ্ত বাঘের মত ঘুরতে শুরু করেছে পরস্পরকে।

ঝড়ের মত চলছে রানার মগজ। ভাইপার ওকে মেঝের উপর ফেলতে চাইবে। কিন্তু যতক্ষণ দু'পায়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে, বড় কোনও বিপদ হবে না ওর। হ্যাণ্ডকাফ পরা হাতেও হামলা ঠেকিয়ে দেয়া খুব কঠিন নয়। কিন্তু... একবার মেঝেতে পড়লে কয়েক সেকেণ্ডে ওকে মেরে ফেলবে ভাইপার।

পড়লে চলবে না...

কালো ড্রিলিং অ্যাপ্পারেটাসের কাছে, ঘরের মাঝে পরস্পরকে ঘিরে চক্কর কাটছে ওরা।

হঠাৎ করেই মেঝে থেকে একটা রেঞ্চ তুলল ভাইপার, গায়ের জোরে ছুঁড়ে মারল রানার দিকে। চট্ করে বসে পড়ল রানা, কিন্তু দেরি হয়ে গেছে, ওর মাথার বাম পাশে লেগে ছিটকে গেল রেঞ্চ। দুই সেকেণ্ডে অজস্র নক্ষত্র দেখল রানা, তার আগেই ভারসাম্য

হারিয়েছে।

দুই লাফে এগিয়ে এল ভাইপার, প্রায় উড়ে এসে ট্যাকল করল। আবারও দেয়ালের উপর পিঠ দিয়ে পড়েছে রানা। ওর শিড়দাঁড়া লেগে অন হয়ে গেছে একটা পাওয়ার সুইচ। হঠাৎ করেই চালু হয়েছে ড্রিলিং মেশিনের প্লাঞ্জার, ঘুরতে শুরু করেছে বনবন করে। তীক্ষ্ণ, জোরালো গুঞ্জন ছাড়ছে।

ল্যাং মেরে রানাকে ফেলে দিল ভাইপার, এবার খতম করবে। মেঝেতে পড়েই শরীর গড়িয়ে দিয়েছে রানা। তিন সেকেণ্ড পর ধাক্কা খেল জ্যাকুস ফিউভিলের লাশে, নাকের কাছে এক ইঞ্চি দূরে দেখল মৃত মুখটা।

ক্লেমোর মাইনের বিস্ফোরণে ফালা ফালা হয়ে গেছে লোকটার রক্তাক্ত মুখ।

আর ঠিক তখনই, এক পলকের জন্য রানা দেখল ফিউভিলের জ্যাকেটে কী যেন।

ক্রসবো!

হ্যাণ্ডকাফে আটকানো দুই হাতে ব্যস্ত হয়ে ক্রসবো তুলে নিতে চাইল রানা। এবং খপ্ করে তুলেও নিল ক্রসবো, কিন্তু উঠে বসবার আগেই ওর উপর নেমে এল ভাইপারের ক্র্যাশ-ট্যাকল। পিচ্ছিল মেঝেতে সরসর করে পিছলে গেল দু'জন, ধাক্কা লাগল ড্রিলিং মেশিনে। কানের কাছে জোরালো গুঞ্জন তুলছে ঘুরন্ত প্লাঞ্জার।

মেঝের উপর চিত হয়ে পড়েছে রানা, আর ওর উপর চড়াও হয়েছে ভাইপার। দু'পাশে ছড়িয়ে বসেছে দুই পা।

ভাইপার ক্র্যাশ-ট্যাকল করবার সময়েও ক্রসবো ফেলেনি রানা। এক পলকের জন্য দেখল, এখনও ওর হাতে ক্রসবো। এক সেকেণ্ড পিটপিট করে চাইল ওদিকে।

ওর নাক লক্ষ্য করে প্রচণ্ড ঘুষি বসাল ভাইপার। হাড় মচকে

যাওয়ার মুড়মুড় আওয়াজ পেল রানা। নাক থেকে ছিটকে বেরুল রক্ত, ভেসে গেল মুখ-গলা-বুক। মেঝের উপর ঠাস্ করে পড়েছে মাথার পিছন দিক।

বনবন করে ঘুরছে সব, এক সেকেণ্ডের জন্য জ্ঞান হারাল রানা। পরক্ষণে চমকে গেল— সত্যি যদি চেতনা হারায়, কেউ বাঁচাতে পারবে না ওকে। আরাম করে ওকে খুন করবে ভাইপার।

চট্ করে চোখ মেলল রানা, দৃষ্টি গিয়ে পড়ল তিন ফুট উপরে। ওখানে চলছে ড্রিলিং মেশিনের ঘুরন্ত প্লাঞ্জার!

জিনিসটা ঠিক ওর উপরে!

ঘুরন্ত সিলিণ্ডারের কোনা দেখতে পেল রানা, ওটা দু'দিকে ফাটল ধরা— ওদিকটাই জমাট বরফ কেটে নীচে নামে।

রানা হঠাৎ করেই দেখল প্লাঞ্জারের নীচে চলে এসেছে ভাইপার, ভীষণ রাগে ফুঁসছে, দাঁত খিঁচিয়ে ঘুষি নামিয়ে আনছে ওর মুখ লক্ষ্য করে।

আত্মরক্ষার জন্য মুখের সামনে দু'হাত তুলল রানা, হ্যাণ্ডকাফের চেইন দিয়ে ঠেকাবে হামলা।

ওর উপর চড়ে বসেছে ভাইপার, আর উঠতে পারবে না রানা।

এখন যদি চোখে-মুখে-নাকে একের পর এক ঘুষি...

ওর চোয়ালের উপর নামল ঘুষি।

ঝাপসা হয়ে গেল রানার দৃষ্টি। ঘোলাটে আলোর ভিতর দিয়ে পাগলের মত দেখতে চাইল।

হাত আবারও উপরে তুলেছে ভাইপার, এবার শেষ আঘাত হানবে।

ঠিক তখন ডানদিকে এক পলকে অন্য কিছু দেখল রানা।

ওদিকের দেয়ালে ড্রিলিং মেশিন চালু করবার ওই যে সুইচ। সুইচ প্যানেলে গোল তিনটে বড় বাটন।

কালো, লাল ও সবুজ।

এক পলক পরিষ্কার দেখল রানা কালো বাটন। ওটার নীচে লেখা:

লোয়ার ড্রিল।

এক সেকেণ্ডের দশ ভাগ সময়ে ভাইপারের দিকে চাইল রানা, লোকটার মাথা ঠিক ঘুরন্ত প্লাঞ্জারের নীচে।

ক্রসবো দিয়ে ভাইপারকে লাগাতে পারবে না। কিন্তু, সামান্য সরিয়ে নিতে পারবে দুই হাত, তার ফলে হয়তো...

'ভাইপার, একটা কথা জানো?' বলল রানা।

'কী?'

'আমি তোমাকে খুব নিচু জাতের জানোয়ার মনে করি।'

সামান্য নড়ে উঠল রানার দুই হাত, দেয়ালের কালো বাটনের দিকে তাক করেছে ক্রসবো, পরক্ষণে ট্রিগার টিপে দিল।

এক সেকেণ্ডের এক শ' ভাগ সময়ে দূরত্ব পেরুল তীর, খটাস্ করে লাগল কালো বাটনের মাঝে। ওখান থেকে ছিটকে গিয়ে লাগল দেয়ালে। ওই একই সময়ে ঝট্ করে ড্রিলিং মেশিন ও প্লাঞ্জারের নীচ থেকে মাথা সরিয়ে নিয়েছে রানা। তীব্র গতি তুলে নেমে এল ঘুরন্ত প্লাঞ্জার, সরাসরি নামল ভাইপারের মাথার তালুর উপর।

হাড় ভাঙার অসুস্থকর মড়মড় আওয়াজ পেল রানা, ফচ্ শব্দে ফুটো হলো মগজ, প্রচণ্ড ঝাঁকি খেয়ে নীচে নামল ভাইপারের দেহ— মেঝের উপর ঠাস্ করে পড়ল মাথা। চেপে বসেছে প্লাঞ্জার। ফুটো থেকে গলে পড়ছে থকথকে হলদেটে মগজ। এক সেকেণ্ড পর মাথা ফুটো করে নেমে গেল প্লাঞ্জার বরফের নীচে।

এখনও অবশ লাগছে রানার, কয়েক সেকেণ্ড পর দুই হাঁটুর উপর উঠে বসল। একবার ঘুরে চাইল ভাইপারের দিকে। গেঁথে

গেছে মৃতদেহ, মেশিনের চারপাশে ছিটিয়ে পড়েছে রক্ত। আঁশটে গন্ধে মনে হলো, হাজির হয়েছে কসাইখানায়। চট্ করে থাই পকেটের ভিতর ক্রসবো গুঁজে রাখল রানা। কোনও অস্ত্রের জন্য চোখ বোলাল চারপাশে।

ওর চোখ পড়ল জ্যাকুস ফিউভিলের দেহের উপর। একটু দূরে পড়ে আছে লাশটা। প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে ওখানে চলে গেল রানা, পাশে বসে হাতড়াতে শুরু করেছে পকেটগুলো।

কয়েক সেকেণ্ড পর একটা পকেট থেকে বের করে নিল গ্রেনেড। ওটার উপর লেখা: এম৮এ৩-এসটিএন।

ওর বুঝতে দেরি হলো না ওটা কী।

স্টান গ্রেনেড। ফ্লাশার।

আজ সকালে এই জিনিস ব্যবহার করেছে ফ্রেঞ্চ কমাণ্ডোরা। বুক পকেটে গ্রেনেড রেখে দিল রানা।

ঠিক তখনই, দড়াম করে খুলে গেল ড্রিলিং রুমের দরজা। মেঝেতে চিত হয়ে ধুপ্ করে পড়ল রানা। ভঙ্গি করছে, ভয়ানক ক্লান্ত এবং গুরুতর আহত।

কালো ড্রিলিং অ্যাপারেটাসের নীচে মৃতদেহ এবং ছিটিয়ে থাকা রক্ত। ভাইপারের মাথার উপর ফুটো। লোকটার লাশ দেখে মুখ কুঁচকে ফেলল জুলিয়াস বি. গুণ্ডারসন।

'ছিহ্,' বাচ্চা শাসনের ভঙ্গিতে বলল, 'এমন করে, রানা?'

মেঝেতে শুয়ে এখনও হাঁপিয়ে চলেছে রানা, ওর মুখে ছিটিয়ে পড়া ফোঁটা ফোঁটা রক্ত। কোনও কথা বলল না।

আবারও মাথা নাড়ল গুণ্ডারবাচ্চা। মনে হলো ভীষণ হতাশ। যেন ভাইপারের বদলে রানা মরলেই খুশি হতো।

'ওকে ওখান থেকে তুলে আনো,' নিচু স্বরে বলল গুণ্ডারসন। তাকে পাশ কাটিয়ে এল দুই এসএএস কমাণ্ডো। 'মিস্টার বোউল্‌স্।'

'জী, স্যর।'

'ওকে নিয়ে গিয়ে ঝুলিয়ে দাও।'

চোদ্দ

দক্ষিণ আমেরিকা, চিলি।

স্যান্টা ইনেস থেকে সামান্য দূরে।

স্ট্রেইট অভ ম্যাগেলানের দক্ষিণে এক হাজারেরও বেশি এ ধরনের ছোট দ্বীপ আছে।

অনেক পিছিয়ে থাকা এক জনপদ এটা।

পাঁচ শ' মাইল দূরে দক্ষিণ শেটল্যাণ্ড দ্বীপপুঞ্জ ও ধবল অ্যান্টার্কটিকা।

স্যান্টা ইনেসের সামান্য দূরের এই দ্বীপকে বলা যেতে পারে শেষ জমি, তার দক্ষিণে গেলে সেই বহু দূরের অ্যান্টার্কটিকা, তার আগে আর কোনও জমি নেই।

ছোট ছেলেটার নাম পেদরো, পশ্চিম উপকূলের কাছে খুদে এক জেলে-গ্রামে বাস করে। ওদিকে রয়েছে ছোট এক উপসাগর। নাম দেয়া হয়েছে: রুপালি ঈগলের বাসা।

স্থানীয়রা বলে: ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছর আগে ওখানে নেমেছিল বিশাল এক রুপালি পাখি, ওটার পিছনে ছিল লাল আগুন, সোজা গিয়ে ডুব দিয়েছিল উপসাগরের পানিতে।

যে বৃদ্ধা প্রথম ওটা দেখে, সে সবাইকে জানিয়েছিল: ওই পাখি অনেক জোরে উড়তে গিয়ে ঈশ্বরকে রাগিয়ে দেয়। তা

ছাড়া, দেখতেও ওটা খুব সুন্দর ছিল, সে-কারণে বিরক্ত হন ঈশ্বর। তিনি আগুন দিয়ে দেন পাখির লেজে, ঘাড়টা ধরে ফেলে দেন সাগরে।

এই গল্প কখনও বিশ্বাস করেনি পেদরো। এখন ওর বয়স দশ, শিক্ষিত ছেলে, গ্রামের পাঠশালায় টু-এ পড়ে। এসব গাঁজাখুরি গল্প শুনলে চলবে? আর সবাই বিশ্বাস করে করুক, ও কখনও এসব মানবে না।

আজ উপসাগরে নামবার দিন ওর। ঝিনুক তুলবে, বিক্রি করবে বাবার কাছে। তাতে ওর পকেট-খরচা উঠবে।

সৈকত পাড়ি দিয়ে সাগরে নেমে পড়ল পেদরো, একটু সাঁতরে দূরে সরে ডুব দিল। অনেক নীচে নামতে পারে ও। এখন ভয়ের কিছু নেই, জোয়ার আসছে সাগর থেকে। অনায়াসেই আবারও ফিরতে পারবে তীরে। আশা করছে, অনেক ঝিনুক নিয়ে বাড়ি ফিরবে আজ।

সাগর-তলের বালিতে নেমে পড়ল পেদরো, নীচে চোখ পড়তেই প্রথম ঝিনুক পেয়ে গেল। সঙ্গে আরেকটা জিনিস।

ছোট প্লাস্টিকের একটা টুকরো।

ঝিনুক ও প্লাস্টিকের টুকরো নিয়ে উপরে উঠতে লাগল পেদরো। ভেসে উঠে অদ্ভুত টুকরোটা ভাল করে দেখল। জিনিসটা চারকোনা, ছোট। খুব ঝাপসা হয়ে গেছে, কিন্তু পেদরো পড়তে পারল নামটা:

ট্রেভল রয়েস।

নামের ব্যাজের দিকে ভুরু কুঁচকে চাইল পেদরো। তারপর বিরক্ত হয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল প্লাস্টিকের টুকরো। বড় করে শ্বাস নিয়ে নতুন উদ্যমে ডুব দিল ঝিনুকের খোঁজে।

পনেরো

পাতাল-গুহার ভিতর অন্য এক লড়াই শুরু হয়েছে।

প্রথম এসএএস ডাইভার প্যানি থেকে উঠে আসতেই, তার পিছনে দেখা দিয়েছে দ্বিতীয় কমাণ্ডো, অল্প প্যানিতে চলে এসেছে সে-ও।

উঠে এসেই চারপাশে গুলি শুরু করেছে প্রথমজন। পরের জন হাঁটু পানিতে, কাঁধে তুলে নিয়েছে অস্ত্র। আর ঠিক তখনই পিছন থেকে এল প্রচণ্ড টান। আবারও ঝপাস্ করে পানির নীচে তলিয়ে গেল লোকটা।

প্রথমজন উঠে এসেছে ডাঙায়, এখনও বুঝতে পারেনি তার সঙ্গীর কী হলো। জনি ওয়াকারকে দেখতে পেয়েছে সে, ঝট্ করে ডানদিকে অস্ত্র তাক করল। আর তখনই নিজের বোল্ডারের পিছন থেকে উঠে দাঁড়াল তিশা, বামপাশ থেকে গুলি করে ফেলে দিল লোকটাকে।

দেরি না করে আবারও পুলের দিকে ফিরল তিশা, সি স্লেড নিয়ে পানিতে ভেসে উঠছে একের পর এক এসএএস ডাইভার।

চোখের কোণে আরেকটা জিনিস খেয়াল করেছে তিশা।

নড়াচড়া চলছে ওদিকের বরফ-দেয়ালে।

দশ ফুটি সব গর্তের ভিতর থেকে কালো বিশাল কী যেন মসৃণ ভাবে ঝুপ্ করে নামছে পুলের ভিতর।

বিস্ফারিত চোখে চেয়ে রইল তিশা।

কোনও ধরনের মস্ত জানোয়ার।

মস্ত বড়... দেখতে সিল মাছের মতই। কোনও ধরনের প্রকাণ্ড সিল হতে পারে।

ঠিক তখনই, দ্বিতীয় গর্ত থেকে বেরুল আরেকটা। তারপর আরেকটা। তারপর আরেকটা! গর্ত থেকে পিছলে পানির ভিতর পড়ছে একের পর এক! ছলাৎ-ছলাৎ আওয়াজ হচ্ছে। এসএএস ডাইভারদের চারপাশে নেমে পড়েছে জানোয়ারগুলো।

অবাক হয়ে চেয়ে রইল তিশা।

পুকুরের পানি উন্মাতাল হয়ে উঠেছে। চারপাশে ফেনা, নানা দিকে ছুটছে ঢেউ। টুপ করে ডুবে গেল আরেক কমাণ্ডো। নিজের তাজা রক্তের ভিতর হারিয়ে গেছে। তার ঠিক পাশের লোকটা জোর ধাক্কা খেয়ে সামনে বাড়ল। তার উপর চেপে বসেছে প্রকাণ্ড এক সিল। পানির উপর এক সেকেণ্ড চকচকে কালো পিঠ দেখল তিশা, তারপর লোকটাকে নিয়ে ডুবে গেল ওটা।

দু'একজন এসএএস ডাইভার উঠে এসেছে ডাঙায়, কিন্তু তাদের পিছু নিয়ে পানি থেকে উঠে আসছে বেশ কয়েকটা সিল। এক ডাইভার হামাগুড়ি দিয়ে উঠতে চাইছে বরফের ডাঙায়। যেভাবে হোক পানির কাছ থেকে সরবে, কিন্তু তার পিছনে পানি থেকে উঠে এল সাত টনি এক সিল।

বরফের মেঝেতে থপাৎ আওয়াজ তুলল, পিছনের দুই ফ্লিপারের উপর উঠে দাঁড়িয়েছে। ওটার ওজনে থরথর করে কেঁপে উঠল মেঝে। দ্রুত সামনে বাড়ছে, চোয়ালের ভিতর খপ্ করে পুরে নিল লোকটার দুই পা, মুড়মুড় করে ভাঙল দুই হাড়। বিকট চিৎকার ছাড়ল লোকটা।

কেউ কিছু বুঝবার আগেই তাকে চিবাতে শুরু করেছে সিল।

বড় বড় গ্রাসে গিলছে মাংস ও হাড়। গুহার ভিতর মাংস ছেঁড়ার জোরালো আওয়াজ শুরু হলো।

হতবাক হয়ে চেয়ে রইল তিশা।

ভয়ঙ্কর ভয়ে চিৎকার শুরু করেছে এসএএস কমাণ্ডোরা। ঘেউ ঘেউ করছে সিলগুলো। জীবিত কয়েকজনকে চিবিয়ে খেতে শুরু করেছে এসব দানব।

সিলগুলোর দিকে চেয়ে আছে তিশা। একেকটা গণ্ডারের চেয়েও বড়। কিলার ওয়েইল এত বড় হয় না। বইয়ে এদেরকে দেখেছে, বেলুনের মত গোলচে হয় এদের নাক।

কোনও সন্দেহ নেই এগুলো এলিফ্যান্ট সিল।

ওই দলে ছোট দুটো দেখল তিশা। এদের দাঁত অদ্ভুত। নীচের মাড়ি থেকে উঠেছে দুটো শ্বদন্ত। উপরের ঠোঁট চেপ্টে দিয়ে উঠে গেছে নাকের পাশে। বড় সিলগুলোর এমন দাঁত নেই।

এলিফ্যান্ট সিল বিষয়ে সব তথ্য মনে করতে চাইছে তিশা। এলিফ্যান্ট সিল কিলার ওয়েইলের মতই বড় পাল তৈরি করে, দলের নেতা হয় একটা বড় মর্দা সিল। এদেরকে বলা হয় বুল বা বিচমাস্টার। এদের সঙ্গে থাকে আট বা নয়জনের হারেম। এই মাদিগুলোকে বলে কাউ। এরা বুলের চেয়ে বেশ ছোট হয়।

একটু দূরে মস্ত এক সিলের যৌনাঙ্গ দেখতে পেল তিশা।

এগুলো দলের মাদি!

ছোট দুই সিল এদের বাচ্চা!

ছেলে-বাচ্চা ওগুলো, খেয়াল করল তিশা।

ষাঁড় কোথায় গেছে, ভাবল। ওটা এই মাদিগুলোর চেয়ে অনেক বড় হবে। মাদিই যদি এই আকারের হয়, ওটা কত বড়?

নানা চিন্তা আসছে ওর মনে।

এরা হামলা করল কেন? ওর জানা আছে, এলিফ্যান্ট সিল ভয়ঙ্কর হিংস্র, বিশেষ করে যখন আস্তানা আক্রান্ত হয়।

কিন্তু এখন কেন? আর ওদের উপর হামলা করল না কেন? কয়েক ঘণ্টা আগে নিরাপদে এখানে এসেছে ওরা। এসএএস

কমাণ্ডোদের উপর খেপে গেল কী কারণে?

হঠাৎ আরেকটা চিৎকার হলো পুলের ভিতর, তারপর ঝপাৎ আওয়াজ হলো। নিজের বোল্ডারের পিছন থেকে উঁকি দিল তিশা।

আর কোনও আওয়াজ নেই। থমথম করছে চারপাশ। শব্দ বলতে পুলের পারে ঢেউয়ের ছল-ছলাৎ।

এসএএস কমাণ্ডোদের একজনও বাঁচেনি। পাতাল-গুহার ভিতর হাজির হয়েছে বেশির ভাগ সিল। লাশগুলোর পাশে পৌঁছে দেখছে কী জয় করেছে। তারপর রী-রী করা কড়মড়ে আওয়াজ পেল তিশা, ঘুরে চাইল— লাশের মাংস-হাড় ছিঁড়ে খেতে শুরু করেছে দানব সিল!

সত্যি, সমাপ্ত হয়েছে সবার লড়াই।

উইলকক্স আইস স্টেশনের পুল ডেকে দাঁড়িয়ে আছে রানা। দেহের সামনে হ্যাণ্ডকাফে আটকানো দুই হাত। এক এসএএস কমাণ্ডো ব্যস্ত হয়ে ওর গোড়ালিতে পেঁচিয়ে দিচ্ছে হোসেন আরাফাত দবিরের ম্যাগহুকের কেবল। বামে চাইল রানা, রক্ত মিশ্রিত লাল পানিতে মসৃণভাবে ঘুরছে কিলার ওয়েইলের কালো ফিন।

'ডাইভ টিম, রিপোর্ট,' একটু দূরের এক পোর্টেবল ইউনিটে বলে উঠল এসএএস রেডিয়ো অপারেটার। 'রিপিট করছি। ডাইভ টিম, যোগাযোগ করুন।'

'কিছু বলল ওরা?' জানতে চাইল গুণ্ডারসন।

'জবাব দিচ্ছে না, স্যর। আগে তো বলেছিল গুহার কাছে পৌঁছে গেছে।'

একবার কঠোর চোখে রানার দিকে চাইল গুণ্ডারসন। 'চেষ্টা করতে থাকো,' বলল রেডিয়ো অপারেটারকে। আবারও রানার দিকে ঘুরল ব্রিটিশ কমাণ্ডার। 'গুহার ভিতর ভালই লড়ছে তোমার

লোক।'

'ওরা ওদের কাজ বোঝে,' বলল রানা।

'আচ্ছা?' নাক দিয়ে ঘোঁৎ আওয়াজ করল গুণ্ডারসন। 'তোমার শেষ কোনও ইচ্ছা, রানা? রুমাল দিয়ে চোখ ঢেকে নিতে চাও? সিগারেট? এক ঢোক ব্র্যাণ্ডি?'

প্রথমে কিছুই বলল না রানা, চেয়ে আছে হ্যাণ্ডকাফ পরা দুই কবজির দিকে।

তারপর চট্ করে মুখ তুলে চাইল।

'একটা সিগারেট, প্লিয।'

'মিস্টার বোউল্‌স্। মাসুদ রানার জন্য একটা সিগারেট।'

সামনে বাড়ল বোউল্‌স্, রানার দিকে এগিয়ে দিল এক প্যাকেট সিগারেট। একটা শলা নিল রানা, দু'হাতে তুলল ঠোঁটে। আগুন জ্বেলে দিল বোউল্‌স্। সিগারেটে বড় করে টান দিল রানা।

'ঠিক আছে,' বলল গুণ্ডারসন। 'যথেষ্ট হয়েছে। জেন্টলমেন, এবার ওকে ঝুলিয়ে দাও। ...রানা, তোমাকে চিনতাম, কথাটা ভেবে ভবিষ্যতে ভাল লাগবে আমার।'

এক এসএএস কমাণ্ডো ল্যাং মারল রানাকে। ধুপ্ করে মেঝের উপর পড়ল ও। পাঁচ সেকেণ্ড পেরুবার আগেই ওকে উপরে তুলল ম্যাগহুক। সিগারেট ফেলেনি রানা, উল্টো ঝুলতে ঝুলতে আরেক টান দিল।

থেমে গেছে ম্যাগহুক। নীচে লালচে পানির দিকে চাইল রানা।

ওই রক্ত হোসেন আরাফাত দবিরের। ওর সহযোদ্ধার।

পুলের মাঝে ভাসছে ডাইভিং বেল। একটা পোর্টহোলের ওপাশে রাশেদ হাবিবের মুখ দেখল রানা। লোকটার চোখে ভীষণ আতঙ্ক। ওর দিকেই চেয়ে আছে।

রক্তিম পানির মাত্র তিন ফুট উপরে ঝুলিয়ে দিয়েছে রানাকে।

ঠোঁটে সিগারেট তুলে আরেক টান দিল রানা।

এসএএস কমাণ্ডোরা বোধহয় ধারণা করেছে, লোকটা নিজের সাহস দেখাবার চেষ্টা করছে। ঠোঁট থেকে ঝুলছে সিগারেট, কিন্তু এসএএস কমাণ্ডোরা দেখল না রানার হাত কী করছে।

পরাজিত নায়কের দিকে চেয়ে স্যালিউট দিল জুলিয়াস বি, গুণ্ডারসন। 'রুল ব্রিটানিয়া, রানা।'

'ফাক্ ইয়োর ব্রিটানিয়া!' জবাবে বলল রানা।

'মিস্টার বোউলস,' করমচার মত লাল হয়ে গেল গুণ্ডারসনের গাল, ধমকে উঠল, 'বেয়াদবটাকে নামিয়ে দাও।'

রাং-ল্যাডারের পাশে, ম্যাগহুকের বাটন টিপল বোউলস। লঞ্চারটা দুই ধাপের মাঝে আটকে রাখা। দড়ি ঘুরে এসেছে সি-ডেকের রিট্র্যাক্টেবল সেতুর ওপাশ থেকে, রানা ঝুলছে পুলি থেকে। ওটা থেকেই ঝুলিয়ে দেয়া হয়েছিল হোসেন আরাফাত দবিরকেও।

খুব ধীরে দড়ি ছাড়তে শুরু করেছে ম্যাগহুক।

পানির দিকে নামছে রানা। ওর দুই হাতকে সামনের দিকে আটকে রেখেছে হ্যাণ্ডকাফ। ডানহাতের দুই আঙুলে জ্বলছে সিগারেট।

লালচে পানিতে ডুবতে শুরু করেছে রানার মাথা। তারপর তলিয়ে গেল দুই কাঁধ। তারপর বুক। পেট। পানি স্পর্শ করল দুই কনুই। সতর্ক হয়ে উঠল রানা।

দুই সেকেণ্ড পর কবজি ছুঁলো পানি। আর ঠিক তখনই কাজে নামল ও। সিগারেট তাক করেছে হ্যাণ্ডকাফের দিকে। আগেই পুরু শেকলে জড়িয়ে নিয়েছে ম্যাগনেযিয়াম ডেটোনেটার কর্ড।

একটু আগে ডেকের উপর ডেটোনেটার কর্ড ভাল করেই দেখে নিয়েছে। পরিত্যক্ত লিটল আমেরিকা-৪ স্টেশনে জিনিসটা পেয়েছিল, পরে কবজিতে পেঁচিয়ে নিয়েছে। ভুলে গিয়েছিল ওটার

কথা। এসএএস কমাণ্ডো যখন ওকে তল্লাশী করল, কেড়ে নিল সব অস্ত্র, তখন লোকটাও ভুল করে ওটা সরিয়ে নেয়নি।

রানার কবজি পানির নীচে তলিয়ে যাওয়ার এক সেকেণ্ড আগে ডেটোনেটার কর্ডে লেগেছে জ্বলন্ত সিগারেটের ডগা। পরক্ষণে দুই হাত চলে গেছে পানির নীচে।

লালচে পানির নীচে ফস্ ফস্ করে জ্বলছে ডেটোনেটার কর্ড, উজ্জ্বল সাদা ঝলকানি বেরুচ্ছে ওটা থেকে। জিনিসটা যেন ধারালো কোনও ছুরি, পানির নীচেও হ্যাণ্ডকাফের চেইন মাখনের মত কাটছে। দু' সেকেণ্ড পেরুবার আগেই মুক্ত হয়ে গেল রানার দুই হাত।

ঠিক তখনই রক্তিম পানির ভিতর মস্ত এক চোয়াল দেখল রানা। একবার মাথার চারপাশে ঘুরল বিশাল এক চোখ। সরাসরি ওর দিকে চেয়ে আছে কিলার ওয়েইল। তারপর হঠাৎ করেই উধাও হলো, হারিয়ে গেছে ধোঁয়ার মত লালচে পানির ভিতর।

ধড়াস্ ধড়াস্ করছে রানার হৃৎপিণ্ড। প্রায় কিছুই দেখছে না। চারপাশে যেন ভাসছে লাল রঙের ঘন কুয়াশা।

পানির ভিতর বিদঘুটে আওয়াজ শুরু হয়েছে। মনে হলো চারপাশ থেকেই আসছে।

ক্লিক-ক্লিক। ক্লিক-ক্লিক।

ভুরু কুঁচকে ফেলল রানা। ওই আওয়াজ কীসের? কিলার ওয়েইল ওই আওয়াজ ছাড়ছে?

তারপর বুঝল ও।

সোনার।

বিড়বিড় করে কপালকে দোষ দিল রানা।

ঘোলা পানিতে সোনার কাজে লাগিয়ে ওকে খুঁজতে শুরু করেছে কিলার ওয়েইল। স্পার্ম ওয়েইল, নীল তিমি এবং কিলার ওয়েইল এমন সোনার ব্যবহার করে। জিভ দিয়ে জোরালো শব্দ

করে ওরা। আর পানির ভিতর ছুটে চলা ওই আওয়াজ কোথাও ধাক্কা খেয়ে ফিরলে, পরিষ্কার বুঝে ফেলে জিনিসটা ঠিক কোথায় আছে। একই পদ্ধতি ব্যবহার করে প্রতিটি সাবমেরিন।

লাল মেঘের মাঝে ব্যস্ত হয়ে তিমি খুঁজতে শুরু করেছে রানা। ঠিক তখনই ঘোলা পানিতে ছুটে এল ওর দিকে এক কিলার ওয়েইল।

দুই হাত দ্রুত নাড়তে শুরু করেছে রানা। তিন সেকেণ্ড পর হাজির হলো কিলার ওয়েইল, কর্কশ চামড়া দিয়ে জোর ঘষা মেরে বেরিয়ে গেল।

রানার মনে পড়ল রাশেদ হাবিবের বক্তব্য— শিকার ধরবার আগে নিজের দাবি জানিয়ে দেয় কিলার ওয়েইল।

ঘষা দিয়ে যায় শিকারের গায়ে।

তারপর ফিরে এসে আক্রমণ করে।

তার আগেই কিছু করতে হবে। ঝুলন্ত রানা সিট-আপ করল। কোমর থেকে ভাঁজ হয়ে উঠে এসেছে পানির উপর। রানা শুনল, ই-ডেকের এসএএস কমাণ্ডোরা হই-হই করে উঠেছে। পাত্তা দিল না ও, বুক ভরে দম নিয়েই আবারও ডুব দিল।

বুঝতে পারছে, হাতে একেবারে সময় নেই। যে তিমি ওকে আপন করে পেটের ভিতর রাখতে চাইছে, ওটা যে-কোনও সময়ে ফিরবে।

রানার চারপাশে লালচে পানিতে শুরু হয়েছে ক্লিক-ক্লিক আওয়াজ।

ঠিক তখনই হঠাৎ একটা চিন্তা এল রানার।

সোনার...

কপাল যদি ভাল থাকে... ভাবতে শুরু করেছে ও।

ওটা এখনও আছে? পকেট হাতড়াতে লাগল রানা।

হ্যাঁ, এখনও আছে।

মেরি ভিসারের প্লাস্টিকের অ্যাজমার পাফার বের করল রানা। গায়ের জোরে টিপে ধরেছে রিলিজ বাটন। পাফার থেকে বেরিয়ে আসছে ঘন সব বুদ্বুদ।

এবার কোনও ওজন চাপিয়ে দিতে হবে রিলিজ বাটনের উপর।

এমন কিছু...

গত জন্মদিনে ওকে সুন্দর একটা সোনার চেইন এবং ভারী লকেট দিয়েছে বিসিআই-এর সবাই মিলে, ওটা এখন ওর গলা থেকে নীচের দিকে ঝুলছে। দ্বিধা না করেই চেইন-লকেট খুলে নিল রানা, ব্যস্ত হয়ে পাফারের উপর গিঁট তৈরি করছে। এমন ভাবে বাঁধছে, যাতে চাপ পড়ে রিলিজ বাটনের উপর।

পাফার থেকে বেরুচ্ছে ভারী বুদ্বুদ।

কাজের ফাঁকে রানা টের পেল, চারপাশের পানি ভীষণ দুলছে। লাল কালির মত পানির ভিতর দিয়ে আসছে কিলার ওয়েইল!

ছোট্ট পাফারের উপর কাজ শেষে ওটা ছেড়ে দিল রানা। নীচের দিকে পড়তে শুরু করেছে জিনিসটা। উপরের দিকে ছাড়ছে বুদ্বুদ। কয়েক সেকেণ্ড পর আর পাফারটা দেখতে পেল না রানা।

এর এক সেকেণ্ড পর লাল মেঘের ভিতর দিয়ে এল কিলার ওয়েইল, হাঁ করেছে মস্ত। হতবাক হয়ে চেয়ে রইল রানা। মনে মনে বলল, ওহে রানা, বারবার বাঁচবে এমন আশা করা কি ঠিক?

ওর দিকে বিরাট চোয়াল খুলে ছুটে আসছে কিলার ওয়েইল। এতই দ্রুত, গতি দেখে চমকে যেতে হয়। তিন সেকেণ্ড পর দুই সারি দাঁত ও লালচে জিভ দেখল রানা। সামনে আর কিছুই দেখা গেল না। আরও বড় হলো কিলার ওয়েইলের হাঁ।

তারপর...

হঠাৎ করেই কাত হয়ে গেল কিলার ওয়েইল, সাঁৎ করে রওনা

হয়ে গেল নীচের দিকে। অ্যাজমার পাফার এবং ওটার বুদ্বুদের পিছু নিয়েছে।

মস্ত শ্বাস ফেলল রানা।

মনের গভীরে জানে, কীভাবে কাজ করে সোনার ডিটেকশন সিস্টেম। এটা ভুল ধারণা যে কোনও জিনিসে ধাক্কা খেয়ে ফেরে সোনার তরঙ্গ। আসলে জিনিসটা এবং যেখান থেকে তরঙ্গ ছুঁড়ে দেয়া হলো, তার মাঝের পানির মাইক্রোস্কোপিক বাতাস টের পায় সোনার ব্যবহারকারী।

রানা যখন অ্যাজমার পাফার নীচে ফেলল, ওটা থেকে বেরুতে লাগল বাতাসের বুদ্বুদ, কাজেই সোনার ব্যবহার করে কিলার ওয়েইল পেয়ে গেল নতুন টার্গেট। ক্লিক আওয়াজ তুলে টের পেয়েছে, নীচে রওনা হয়েছে বাতাস। আর তার মানেই, পালাতে শুরু করেছে ওর শিকার। এ কিছুতেই হতে দেয়া যায় না, কাজেই সাধের শিকারকে ধরতে ছুট লাগিয়েছে।

এখন এ নিয়ে ভাবছে না রানা। অন্য কাজে ব্যস্ত।

বুক পকেট থেকে জ্যাকুস ফিউভিলের স্টান গ্রেনেড বের করেছে, টান দিয়ে খুলে ফেলল পিন। তিন পর্যন্ত গুনল, তারপর ঝট্ করে সিট-আপ দিয়ে উঠে এল পানির উপরে। ছুঁড়ে দিল গ্রেনেড, পরক্ষণে আবারও পানির নীচে নামিয়ে নিল মাথা। শক্ত করে বুজে ফেলেছে চোখ।

পুলের পাঁচ ফুট উপরে উঠল গ্রেনেড, এক সেকেণ্ড ওখানে থেকে আবারও নীচে পড়ছে, আর তখনই বিস্ফোরিত হলো ওটা।

পুলের ভিতর থেকে গ্রেনেড উঠে আসতে দেখেছে জুলিয়াস বি. গুণ্ডারসন। কী ঘটছে বুঝবার জন্য এক সেকেণ্ড লাগল তার, কিন্তু ততক্ষণে দেরি হয়ে গেছে।

গুণ্ডারসনের লোক, এবং নিজে সে সবচেয়ে স্বাভাবিক কাজই করেছে, অবাক হয়ে দেখেছে পানি থেকে উঠেছে কী যেন।

গ্রেনেডের দিকে চেয়ে ছিল তারা।

স্টান গ্রেনেড বিস্ফোরিত হওয়ায় প্রকাণ্ড এক ফ্লাশবালব যেন জ্বলে উঠেছে। আপাতত অন্ধ হয়ে গেছে সবাই, ভয়ঙ্কর চমকে গেছে। চোখের ভিতর এক গ্যালাক্সি ভরা তারা ও সানস্পট।

এদিকে আবারও সিট-আপ করল রানা। অবশ্য, এবার উপরে উঠল ক্রসবো হাতে। ওটা রিলোড করা, ট্রিগার টিপলেই চলবে।

এক সেকেণ্ডে টার্গেট খুঁজে নিল রানা, টিপে দিল ট্রিগার।

ই-ডেক মুহূর্তে পেরুল তীর, লেগেছে টার্গেটে। খটাস্ আওয়াজ তুলল ম্যাগহুক লঞ্চারের উপর। রাং-ল্যাডারের দুই ধাপের ভিতর আটকে ছিল লঞ্চার। ছুটে গেল, ছিটকে এল পুলের দিকে।

ম্যাগহুকের দড়ি ঘুরিয়ে আনা হয়েছিল সি-ডেকের রিট্র্যাক্টেবল সেতুর উপর দিয়ে। তখন ছিল পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে। এখন ম্যাগহুক লঞ্চার রাং-ল্যাডার থেকে খসে আসতেই, এবং রানা পুলের মাঝে ভাসমান থাকায়, এদিকের প্রান্তে বিন্দুমাত্র ওজন নেই। পেণ্ডুলামের মত ঝুলতে ঝুলতে পুলের মাঝে রানার হাতের কাছে এসে পড়ল ম্যাগহুক।

খপ্ করে ওটা ধরল রানা, একবার সি-ডেকের সেতুর দিকে চাইল। উপর থেকে ঘুরে এসেছে ম্যাকহুকের দুই প্রস্থ দড়ি। দেরি না করে শক্ত করে দুই হাতে ধরল ও লঞ্চার, টিপে দিল কালো বাটন। রক্ত মিশ্রিত পানি থেকে উপরের দিকে রওনা হয়ে গেছে ও। সেতুর দিকে ওকে টেনে তুলছে ম্যাগহুক। সরসর করে দড়ি গুটিয়ে নিচ্ছে।

দশ সেকেণ্ডে সেতুর পাশে পৌঁছে গেল রানা, হাঁচড়ে-পাঁচড়ে উঠে পড়ল উপরে। ঝটপট খুলে ফেলল গোড়ালির বাঁধন। আর ঠিক তখনই প্রথম এসএএস কমাণ্ডো সাবমেশিন গান তাক করল সেতুর নীচে। অন্যরাও নড়ে উঠেছে অস্ত্র হাতে।

তাদের দিকে ঘুরেও চাইল না রানা, ঝেড়ে দৌড় দিয়েছে। প্রথম এসএএস কমাণ্ডো এক পশলা গুলি পাঠাল সেতুর দিকে।

এদিকে রাং-ল্যাডারের সামনে পৌঁছে গেছে রানা, একেকবারে দুই ধাপ করে টপকে উঠছে বি-ডেকের দিকে। কয়েক সেকেণ্ড পর অবশিষ্ট ক্যাটওয়াকে পৌঁছে গেল। তার আগেই রিলোড করে নিয়েছে ক্রসবো।

ছুটতে শুরু করেছে পুব টানেল ধরে, চলেছে লিভিং কোয়ার্টারের দিকে। আগে পেতে হবে মেরিকে, তারপর খুঁজে বের করবে কীভাবে এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়া যায়।

হঠাৎ সামনের মোড় ঘুরে এল এক এসএএস কমাণ্ডো। চট্ করে তার দিকে ক্রসবো তাক করল রানা, পরক্ষণে টিপল ট্রিগার। ঝটাং করে পিছনে ঝটকা খেল লোকটার মাথা। কপাল ফুটো করে দিয়েছে তীর। কাটা কলাগাছের মত ধড়াস্ করে মেঝের উপর পড়ল লাশ।

লোকটার পাশে থামল রানা, উবু হয়ে তার অস্ত্রগুলো তুলে নিতে শুরু করেছে।

এসএএস কমাণ্ডোর সঙ্গে ছিল এমপি-৫, গ্লক-৭ পিস্তল ও দুটো নীল গ্রেনেড। রানা জানে, শেষেরগুলো নাইট্রোজেন চার্জ। জিনিস দুটোর দখল নিল ও।

এ ছাড়া লোকটার সঙ্গে ছিল হালকা ওজনের রেডিয়ো হেডসেট। ওটাও নিল রানা, পরে নিল দুই কানে। নতুন উদ্যমে ছুটতে শুরু করেছে টানেল ধরে।

এখন মেরি ভিসারকে দরকার।

ওকে কোথায় রেখেছে ব্রিটিশরা?

রানার জানা নেই, তবে আন্দাজ করল, বেচারিকে বি-ডেকেই রাখবে। এই লেভেলেই রয়েছে লিভিং কোয়ার্টার।

বাইরের দিকের গোলাকার টানেলে ঢুকে পড়েছে রানা, উড়ে

চলেছে। এক সেকেণ্ড পর দেখল উল্টো দিক থেকে আসছে দুই এসএএস কমাণ্ডো। সাবমেশিন গানের নল উঁচু করে ফেলেছে তারা, কিন্তু ওই একই মুহূর্তে এমপি-৫ ও গ্লক-৭ থেকে গুলি করল রানা। ছয় রাউণ্ড গুলিবর্ষণে ছিটকে পিছিয়ে গেল দুই কমাণ্ডো, হুড়মুড় করে পড়ল মেঝেতে। ছুটবার গতি কমল না রানার, লাশ পেরিয়ে বাঁক নিল টানেলে। ডানে-বামে চোখ বোলাচ্ছে।

হঠাৎ বামদিকের দরজা খুলে বেরিয়ে এল এক এসএএস কমাণ্ডো, হাতে উদ্যত অস্ত্র। একটা গুলিও পাঠাল সে, কিন্তু বদলে পেল তিনটে গুলি, ক্ষত-বিক্ষত বুক নিয়ে আবারও ছিটকে ঘরের ভিতর গিয়ে পড়ল মৃত শত্রু।

কয়েক সেকেণ্ড পর ঝড়ের গতি তুলে ঘরের সামনে পৌঁছে গেল রানা। ওর জানা আছে, এটা কমন রুম। মাত্র কয়েক ফুট দূরে মেরিকে দেখল। বাচ্চা মেয়েটাকে ঠেলে বেরিয়ে আসছে দুই এসএএস কমাণ্ডো।

দুই হাতে দুই অস্ত্র নিয়ে ঢুকে পড়ল রানা কমন রুমে।

বিধ্বস্ত রানাকে দেখে হাঁ হয়ে গেছে মেরি। বেচারি ধরেই নিয়েছিল ওর প্রিয় মানুষটা মারা গেছে। এখন ওর মনে হলো, ভূত হয়েই ফিরেছে মহৎ হৃদয় মানুষটা।

চেহারার ভয়ঙ্কর খারাপ অবস্থা। চুপচুপে ভেজা। বাঁকা হয়ে গেছে নাক। মুখে নানা ছড়ে যাওয়ার দাগ। বডি আর্মার সব তুবড়ে গেছে।

মেরির পিছনে থমকে গেছে দুই কমাণ্ডোর একজন, অবাক হয়ে দেখছে ঘরে ঢুকেছে ভয়ানক খারাপ চেহারার এক পিশাচ। এসএএস কমাণ্ডো খপ্ করে মেরিকে নিজের সামনে নিয়ে এল। পিস্তলের নল তাক করল মাথার উপর। ওই মেয়ে তার বর্ম।

'আমি ওকে মেরে ফেলব, মেইট,' শান্ত স্বরে বলল। 'চুতিয়া যিশুর কিরে! ওর মগজ ছিটিয়ে পড়বে চারদেয়ালে!'

'মেরি,' নরম স্বরে বলল রানা। লোকটার কপালে পিস্তল তাক করেছে, একইসময়ে দ্বিতীয় কমাণ্ডোর মাথার দিকে চেয়ে আছে ওর এমপি-৫।

'জী?' করুণ শোনাল মেরির কণ্ঠ।

আস্তে করে বলল রানা, 'এবার চোখ বন্ধ করো।'

চোখ বুজে ফেলল মেরি। চারপাশে শুধু আঁধার।

এবার দুটো বুম! বুম! আওয়াজ পেল। জানে না কার অস্ত্র গর্জে উঠেছে। তারপর হঠাৎ করেই পিছনে পড়তে লাগল মেরি। বর্ম হিসাবে ওকে ব্যবহার করতে চাওয়া প্রথম এসএএস কমাণ্ডো এখনও কাঁধ খামচে রেখেছে। একই সঙ্গে মেঝের উপর ধড়াস্ করে পড়ল ওরা দু'জন। আর ঠিক তখনই কাঁধের উপর থেকে সরে গেল ব্রিটিশ লোকটার হাত।

আস্তে করে চোখ মেলল মেরি।

ওর পাশে পড়ে আছে দুই এসএএস কমাণ্ডো। তাদের পা দেখল ও, তারপর কোমর-বুক, তাদের মুখ...

'ওদিকে চাইতে নেই, মেরি,' বলল রানা। মেয়েটির পাশে চলে গেল। 'এসব না দেখলেও চলে।'

মুখ ঘুরিয়ে রানার দিকে চাইল মেরি।

ওকে তুলে দাঁড় করিয়ে দিল রানা, একহাতে আলতো করে ধরে আছে কাঁধ। কোনও কথা বলছে না।

রানার বুকে মুখ গুঁজল মেরি, নিঃশব্দে কাঁদতে শুরু করেছে।

'ছি, কাঁদে না, তুমি না সাহসী মেয়ে,' মেরির মাথায় হাত বুলিয়ে দিল রানা। চাপা স্বরে বলল, 'চলো, এবার এখান থেকে বেরিয়ে যাই।'

ঝটপট অস্ত্রগুলো রিলোড করল রানা, তারপর মেরির হাত

ধরে বেরুল কমন রুম থেকে। বাইরের দিকের টানেল ধরে ছুটতে শুরু করেছে দু'জন। চলেছে পুবের টানেল লক্ষ্য করে। সামনে মোড় নিল ওরা, ওখানেই হঠাৎ থমকে গেল রানা।

বামের দেয়ালে বড় চারকোনা এক কালো কমপার্টমেন্ট। তার উপর মোটা কালিতে লেখা: ফিউজ বক্স।

সকালে ফ্রেঞ্চ কমাণ্ডোরা এখান থেকেই নিভিয়ে দিয়েছিল সমস্ত বাতি।

হঠাৎ পরিকল্পনা খেল গেল রানার মাথায়।

ঘুরে দাঁড়াল, একটু দূরে ফেলে এসেছে বায়োটক্সিন ল্যাব। পাশের দরজায় অ্যালিউমিনিয়ামের প্লেটে লেখা: স্টোরেজ ক্লজিট।

ওখানেই যেতে হবে ওকে।

ওই ঘরের সামনে পৌঁছে গেল রানা, খুলে ফেলল দরজা। ভিতরে রয়েছে মপ্ ও বালতি। একপাশে কাঠের পুরনো তাক, তার উপর রাখা পরিষ্কার করবার নানান ফ্লুইড। চট্ করে প্লাস্টিকের একটা বোতল তুলে নিল রানা, ভিতরে অ্যামোনিয়া।

ক্লজিট রুম থেকে বেরিয়ে প্রায় দৌড়ে পৌঁছে গেল ফিউজ বক্সের সামনে। ডালা খুলতেই দেখল, একের পর এক তার, চাকা ও পাওয়ার ইউনিট।

একটু দূরে, পুবের টানেলে দাঁড়িয়ে আছে মেরি। চেয়ে আছে স্টেশনের সেণ্ট্রাল শাফটের দিকে।

'জলদি করুন,' প্রায় ফিসফিস করে বলল। 'ওরা আসছে!'

নতুন পাওয়া হেডসেটে শুনতে পেল রানা:

'...হজিন্স, রিপোর্ট...'

'...মেয়েটাকে খুঁজছে শালা...'

'...পেরিমিটার টিম, এক্ষুনি ফিরে এসো স্টেশনের ভিতর। এখানে সমস্যা হয়েছে...'

ফিউজ বক্সের ভিতর যে তার খুঁজছে, তা পেয়ে গেছে রানা। টান দিয়ে কেবলের গায়ের প্লাস্টিক পোশাক ছিঁড়ে বের করে নিল তামার তার। এবার পিস্তলের বাঁট দিয়ে মেরে অ্যামোনিয়ার প্লাস্টিকের বোতলে ছোট ফাটল তৈরি করল। বোতল ঠিকভাবে বসিয়ে দিল তারের উপর। এক ফোঁটা এক ফোঁটা করে বোতল থেকে খোলা তারের উপর পড়ছে অ্যামোনিয়া।

দুই সেকেণ্ড পর পর এক ফোঁটা করে অ্যামোনিয়া নামছে খোলা তারের উপর।

ছ্যাঁৎ! ...ছ্যাঁৎ! ...ছ্যাঁৎ! ...ছ্যাঁৎ!

তারের উপর অ্যামোনিয়া পড়তেই টানেল ও গোটা স্টেশনের সমস্ত বাতি একবার নিভছে আবার জ্বলছে। যেন সুইচ দিয়ে অফ অন করা হচ্ছে সব।

অদ্ভুত সেই আলোয় মেরির হাত ধরল রানা, তারপর ছুটতে শুরু করল সেণ্ট্রাল শাফট লক্ষ্য করে। ক্যাটওয়াকে বেরিয়ে আসতেই চলে গেল এ-ডেকে উঠবার রাং-ল্যাডারের সামনে, উঠতে শুরু করল।

দশ সেকেণ্ড পর উঠে এল এ-ডেকের ক্যাটওয়াকে। চলেছে স্টেশনের প্রধান এণ্ট্র্যান্স টানেলের দিকে। গোটা স্টেশনে একবার জ্বলছে বাতি, আবার নিভে যাচ্ছে। একবার আঁধার আবার আলো। আঁধার আবার আলো।

এখন যদি কোনও ব্রিটিশ হোভারক্রাফটের কাছে পৌঁছুতে পারে, ভাবছে রানা, ওটা নিয়ে চলে যেতে পারবে ম্যাকমার্ডো স্টেশনে।

চারপাশে নানা নড়াচড়া চোখে পড়ছে। স্টেশনের ভিতর চিৎকার করে কথা বলছে ব্রিটিশ কমাণ্ডোরা। আঁধার ও আলো ভরা ক্যাটওয়াক ধরে ছুটে চলেছে। রানা ও মেরিকে খুঁজছে তারা।

রানা খেয়াল করেছে, কোনও কোনও এসএএস কমাণ্ডো

ব্যবহার করবার চেষ্টা করেছে নাইট-ভিশন গগল্‌স্।

কিন্তু ওই জিনিস এখন কোনও কাজে আসবে না। স্টেশনের ভিতর বারবার আলো ও আঁধারের খেলা, কেউ নাইট-ভিশন গগলস চালু করতে চাইলে তাকে বোকা বলতে হবে। বাতি জ্বললেই অন্ধ হয়ে যাবে।

মেরিকে নিয়ে প্রধান এণ্ট্র্যান্স প্যাসেজওয়ের সামনে পৌঁছে গেল রানা। আর ঠিক তখনই ছুটতে ছুটতে ক্যাটওয়াকে এসে হাজির হলো এক এসএএস সৈনিক। রানার সঙ্গে জোর ধাক্কা লাগল তার। আরেকটু হলে ক্যাটওয়াকের রেইলিং টপকে নীচে গিয়ে পড়ত রানা।

ক্যাটওয়াকের উপর আছাড় খেয়েছে এসএএস কমাণ্ডো, পরক্ষণে উঠে হাঁটু গেড়ে অস্ত্র তাক করতে চাইল রানার দিকে। একই সময়ে জোরালো লাথি ঝাড়ল রানা তার মুখ লক্ষ্য করে। খটাস্ করে চোয়ালে লাগল শক্ত জুতোর ডগা, হুড়মুড় করে ক্যাটওয়াকের উপর পড়ল সে।

এক লাফে পাশে পৌঁছে গেল রানা। লোকটা বেহুঁশ হয়ে গেছে। কাঁধের পাশে পড়ে আছে বড় কালো একটা স্যাচেল ব্যাগ। ওটা তুলে নিল রানা, ভিতরে চোখ পড়তেই দেখল, পাশাপাশি শুয়ে আছে দুটো রুপালি ক্যানিস্টার। সবুজ ব্যাণ্ডে লেখা: ট্রাইটোনাল ৮০/২০ চার্জ।

রানার মনে পড়ল, আগেও ভেবেছে, কী কারণে ব্রিটিশরা উইলকক্স আইস স্টেশনে এই মাল এনেছে। ওটা খুবই শক্তিশালী বিস্ফোরক, সাধারণত বাড়ি ধসিয়ে দেয়ার কাজে ব্যবহার করা হয়।

গুণ্ডারসন কীজন্যে এনেছে এই জিনিস?

কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে অচেতন লোকটার কাছ থেকে সরে এল রানা। আর তখনই এণ্ট্র্যান্স প্যাসেজওয়ে থেকে হইচই শুনল।

পায়ের শব্দ এগিয়ে আসছে। ক্লিক আওয়াজ তুলে এমপি-৫-র সেফটি সরিয়ে দেয়া হয়েছে।

বাইরে এসএএস কমাণ্ডো, পেরিমিটার টিম...

এখন এসে ঢুকছে স্টেশনের ভিতর।

'মেরি, বসে পড়ো!' চাপা স্বরে বলল রানা। ঘুরেই দুই হাতের অস্ত্র তাক করেছে মেইন এণ্ট্র্যান্সের উপর। আর ঠিক তখনই টানেল থেকে বেরিয়ে এল প্রথম এসএএস কমাণ্ডো।

এক পশলা গুলি রক্তাক্ত বুকে নিয়ে ছিটকে পড়ল লোকটা। দ্বিতীয় ও তৃতীয়জন বুঝেছে, স্টেশনের ভিতর থেকে গুলি আসছে।

'এই পথে আর বেরুতে পারব না!' তাড়া দিল রানা, 'ফিরতি পথ ধরতে হবে, মেরি!'

একহাতে মেয়েটির কোমর জড়িয়ে ধরল ও, ছুটতে শুরু করেছে। পৌঁছে গেল কাছের রাং-ল্যাডারের সামনে। আগেই মেরিকে বলেছে, যেন ওর গলা ধরে ঝুলে থাকে। পিঠে মেরিকে নিয়ে মই বেয়ে নামতে শুরু করল রানা। আবারও চলে এল বি-ডেকে। ডান চোখের এক ইঞ্চি দূরে ইস্পাতের মইয়ের ধাপে লেগে ছিটকে বেরিয়ে গেল একটা বুলেট।

ব্রিটিশ হেডসেটে বেশ কয়েকজনের কণ্ঠ শুনল রানা।

'...শুয়োরের বাচ্চা গেছে...'

'...মেয়েটাকে নিয়ে...'

'...রনসন মারা গেছে। জিভস্ আর চার্লিও...'

'...শালাকে এ-ডেকে দেখেছি...'

এবার রানা শুনল জুলিয়াস বি. গুণ্ডারসনের কণ্ঠ:

'বোউল্‌স্! বাতি! হয় জ্বেলে রাখো, নইলে বন্ধ করে দাও! খুঁজে বের করো চুতিয়া ফিউজ বক্স!'

হুলুস্থুল চলছে স্টেশন জুড়ে। চারপাশে স্থির কোনও বাতি

নেই। একবার জ্বলছে আবার নিভছে।

বি-ডেকের আরেক দিকে কালো ছায়া দেখল রানা।

ওদিকে যাওয়া মস্ত ভুল হবে।

মাঝের কূপের ভিতর উঁকি দিল। দপদপে আলো ও নিকষ আঁধারির ভিতর দেখল সি-ডেকে রিট্র্যাক্টেবল সেতু।

একবার ওখানে যেতে পারলে...

হিসাব কষতে শুরু করেছে রানা।

ওর সঙ্গে একটা গ্লক পিস্তল ও এমপি-৫। এ দিয়ে বিশজন এসএএস কমাণ্ডোকে ঠেকাতে পারবে না।

ওর কাঁধে ঝুলছে এসএএস কমাণ্ডোর কাছ থেকে পাওয়া স্যাচেল ব্যাগ। ওটার ভিতর দুটো ট্রাইটোনাল চার্জ। এ ছাড়া, ম্যাগহুকে চেপে উঠবার পর প্রথম মৃত এসএএস কমাণ্ডোর কাছ থেকে পেয়েছে দুটো নাইট্রোজেন চার্জ।

রানা চেয়ে আছে সরু রিট্র্যাক্টেবল ব্রিজের দিকে। ওটা মাত্র একতলা নীচে। মনে মনে বলল, এবার দেখা যাক খেলা শেষ করা যায় কি না।

জ্বলে উঠছে বাতি, আবার নামছে গাঢ় আঁধার। দু' মিনিট পর মেরিকে নিয়ে সি-ডেকে রিট্র্যাক্টেবল সেতুর উপর এসে দাঁড়াল রানা।

কেউ যদি ওদেরকে দেখেও থাকে, মনে মনে খুশি হবে— একেবারে খোলা জায়গায় হাজির হয়েছে শত্রু। সেতুর উপর এক হাঁটু গেড়ে বসল রানা, দু' মিনিট ধরে কী যেন করল।

কাজ শেষে সরে গেল মেরির পাশে। উবু হয়ে বসেছে দু'জন। কেউ দেখলে ভাববে, ভয়ের চোটে ওখানে গিয়ে গুটিসুটি মেরে বসে পড়েছে লোকটা। কিন্তু আসল কথা হচ্ছে: অসীম ধৈর্য নিয়ে অপেক্ষা করছে রানা।

কয়েক মিনিট পেরুল, তারপর ফিউজ বক্স খুঁজে নিল

ব্রিটিশরা। স্থির ভাবে আবারও জ্বলতে শুরু করেছে বাতি। পুরো স্টেশন জ্বলজ্বল করছে উজ্জ্বল ফ্লুওরেসেণ্ট আলোয়।

একমিনিট পেরুল না, তার আগেই রানা ও মেরিকে আবিষ্কার করল এসএএস কমাণ্ডোরা।

সেতুর উপর দাঁড়িয়ে আছে রানা। সি-ডেকে অবশিষ্ট বিশজন এসএএস কমাণ্ডো ঘিরে ফেলেছে ওকে। শাফটের মাঝে সেতুর উপর মেরি-রানা। চারপাশের ক্যাটওয়াকে পজিশন নিয়েছে ব্রিটিশ কমাণ্ডো দল।

এবার একইসঙ্গে অস্ত্র তাক করল তারা।

এক সেকেণ্ড দেরি না করে মাথার উপর ট্রাইটোনাল চার্জ তুলে ধরল রানা।

ভাল স্ট্র্যাটেজি একটা জাদুর মত। শত্রুকে একটা হাত দেখতে দিন, কিন্তু অন্য হাতে কী করছেন তা যেন বুঝতে না পারে।

'গুলি করবে না,' হেডসেটে গুণ্ডারসনের কণ্ঠ শুনল রানা। 'কেউ ভুলেও গুলি করবে না।'

পঞ্চাশ ফুট নীচে পুল ডেকে গুণ্ডারসনকে দেখল রানা। লোকটা একা। সে ছাড়া এসএএস প্লাটুন উঠে এসেছে সি-ডেকে, ঘিরে ফেলেছে ওদের দু'জনকে।

রানা দেখল, গুণ্ডারসনের পাশে পুলের ভিতর এখন কোনও তিমি নেই। ভাল।

'আর্ম করেছি ট্রাইটোনাল চার্জ,' চেঁচিয়ে বলল ও। 'দুই আঙুলে চেপে রেখেছি আর্ম বাটন! দুই সেকেণ্ডের টাইমার! গুলি করলে হাত থেকে খসে পড়বে চার্জ, আমরা সবাই মরব!'

রিট্র্যাক্টেবল ব্রিজের মাঝে দু'পা ফাঁক করে দাঁড়িয়েছে রানা। ওর দুই পায়ের কাছে উবু হয়ে বসেছে মেরি। মনে মনে বলল রানা, কেউ যেন দেখিস না আমার জুতোয় ফিতে নেই।

এক এসএএস কমাণ্ডো অস্ত্র তাক করেছে মেরির উপর।

'মেয়েটাকে গুলি করো, সঙ্গে সঙ্গে হাত থেকে চার্জ ফেলে দেব,' হুমকি দিল রানা। কথার ফাঁকে চট্ করে ক্যাটওয়াকের অ্যালকোভ দেখে নিল।

লোকগুলো যদি সেতু...

রানার উদ্দেশে গলা ছাড়ল গুণ্ডারসন, 'রানা, এটা খুব দুঃখজনক। তুমি এরই ভিতর কমপক্ষে আমার ছয়জনকে খুন করেছ। মনে কোনও সন্দেহ রেখো না, তোমাকে কষ্ট পেয়ে মরতে হবে।'

'আমাকে এখান থেকে সরে যাওয়ার সুযোগ দিতে হবে।'

'সে-সুযোগ তোমাকে দেয়া হবে না,' বলল গুণ্ডারসন।

'তা হলে সবাই মিলে মরব।'

মাথা নাড়ল গুণ্ডারসন। 'ভুল, রানা। আমি জানি, প্রাণ দিতে দ্বিধা করবে না তুমি। ওই মেয়ের জন্য মরতে দ্বিধা থাকবে না তোমার।'

লোকটা ঠিকই বলেছে, বুঝতে পারছে রানা। গুণ্ডারসন বুঝে গেছে, ধাপ্পা দিচ্ছে ও। আরেকবার অ্যালকোভের দিকে চাইল। ওখানে ব্রিজের কণ্ট্রোল।

ওর চোখ অনুসরণ করছে বোউলস।

এটা রানাও খেয়াল করেছে।

কয়েক সেকেণ্ড পর বোউলস ফিসফিস করে হেডসেটে বলে উঠল, 'বোউলস বলছি। লোকটা কয়েকবার ব্রিজ কণ্ট্রোলের দিকে চেয়েছে। খুব নার্ভাস মনে হচ্ছে।'

শত্রুকে একটা হাত দেখতে দিন, কিন্তু...

'ব্রিজ,' বলে উঠল গুণ্ডারসন, 'ও চায় না সেতু গুটিয়ে নেয়া হোক। মিস্টার বোউলস, সরিয়ে নাও ওই সেতু।'

'ইয়েস, স্যর।'

'ব্রাউন,' বলে উঠল গুণ্ডারসন।
'ইয়েস, স্যর।'
'সেতু সরে গেলেই গুলি করে ফেলে দেবে ওকে। গুলি যেন মাথায় লাগে।'
'ইয়েস, স্যর।'
'হ্যানসন, মেয়েটাকে নেবে।'
'ইয়েস, স্যর।'
রানা দেখল, ধীর পায়ে অ্যালকোভের দিকে রওনা হয়েছে বোউলস। ঢুকে পড়ল ওই দরজা দিয়ে, হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে ব্রিজ গুটিয়ে নেয়ার বাটনের দিকে। পুরো সময় চেয়ে রইল রানা। আগে ব্রিটিশদেরকে বোঝাতে হবে, ও খুব চিন্তিত। তারপর...
শিরার ভিতর ঠাণ্ডা হয়ে আসছে ওর রক্ত। যা ঘটবার হঠাৎ করেই ঘটবে।
অন্য হাতে কী করছেন তা যেন বুঝতে না পারে...
অ্যালকোভে ব্রিজের চৌকো বড় বাটন টিপে দিল বোউলস।
'তুমি তৈরি, মেরি?' চাপা স্বরে বলল রানা।
'হ্যাঁ।'
অ্যালকোভের মেঝের নীচে ক্লিং ধাতব আওয়াজ বেরুল, ঝটকা দিয়ে খুলে গেল সেতুর জোড়া, দু' দিকে ফিরতে শুরু করেছে সরু পাত।
এক সেকেণ্ড পর রানা ও মেরির দিকে গুলি করল দুই এসএএস কমাণ্ডো। কিন্তু তার আগেই ঝপ্ করে নীচে পড়তে শুরু করেছে রানা ও মেরি। ওদের মাথার উপর দিয়ে হুইস্ আওয়াজ তুলে বেরিয়ে গেল গুলি।
শাফটের মাঝে পড়ছে রানা ও মেরি।
যেন ভারী দুই খণ্ড পাথর।
তারপর নামল পানির ভিতর। ডুবে গেল দেখতে না দেখতে।

সব এত দ্রুত ঘটল, সি-ডেকে কেউ বুঝল না কী ঘটছে।

কোনও সময় পেল না কেউ।

দুই জুতোর ফিতায় রিট্র্যাক্টেবল সেতুর দুই মুখোমুখি প্রান্তে নাইট্রোজেন চার্জ বেঁধেছে রানা। এবং সরু দুই পাত ফিরতি পথ ধরতেই, টান খেয়ে খুলে গেছে দুই গ্রেনেডের পিন— এরপর মাত্র কয়েক সেকেণ্ডে বিস্ফোরিত হয়েছে বোমা।

সামান্য সাহায্য দরকার ছিল রানার, তা করেছে এসএএস কমাণ্ডো বোউলস। সে সরিয়ে নিয়েছে সেতু।

এসএএস কমাণ্ডোরা ভুলেও ভাবেনি সেতুর উপর নাইট্রোজেন গ্রেনেড বিস্ফোরিত হতে পারে। সবার চোখ ছিল রানার উপর। শত্রু মাথার উপর তুলেছে ট্রাইটোনাল চার্জ! তাদের জানবার কথা নয় ওই দুটো ডিজআর্ম করা। এক সেকেণ্ড পর দেখেছে, মেয়েটাকে নিয়ে নীচে পড়ছে লোকটা।

শত্রুকে একটা হাত দেখতে দিন, কিন্তু অন্য হাতে কী করছেন তা যেন বুঝতে না পারে।

বরফ-ঠাণ্ডা পানিতে পড়েই মৃদু হেসেছে রানা। এই কৌশল জুলিয়াস বি. গুণ্ডারসন নিজে শিখিয়েছে ওকে!

ষোলো

একইসঙ্গে বিস্ফোরিত হয়েছে দুই নাইট্রোজেন গ্রেনেড। নানাদিকে ছিটকে গেছে সুপারকুল্ড লিকুইড গ্যাস। চারপাশের এসএএস কমাণ্ডোদের কিছুই করবার ছিল না।

বিস্ফোরণের ফলে ভয়াবহ পরিণতি হলো সবার।

অন্য কোনও গ্রেনেডের মত নয় নাইট্রোজেন চার্জ। ত্বক বা মাংস ভেদ করতে হয় না ওটাকে। করুণ ভাবে মারা পড়ে শত্রু।

ওই গ্রেনেডের মূল পদার্থ পানি। ওটা একমাত্র প্রাকৃতিক জিনিস, যেটা ঠাণ্ডা হলে আকারে বাড়তে থাকে। সুপারকুল্ড লিকুইড নাইট্রোজেন খুব দ্রুত ঠাণ্ডা করে মানবদেহকে। রক্তের সেল জমাট বাঁধে। শরীরের সত্তর ভাগ পানি বিস্তার পেতে থাকে। ফলে সারাশরীর জুড়ে শুরু হয় ভয়ঙ্কর হেমোরেজ।

যখন প্রতিটি রক্ত-কোষ বিস্ফোরিত হয়, দেখা যায় বিকট দৃশ্য।

এসএএস কমাণ্ডোদের মুখ আবৃত ছিল না, কাজেই সেখানে গিয়ে লেগেছে সুপারকুল্ড লিকুইড নাইট্রোজেন। সবার মুখই ভয়ঙ্কর ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ফেটে গেছে ত্বক, পেশি, শিরা ও রক্ত-কোষ— সবই বাইরের দিকে ফেটে বেরিয়ে এসেছে।

সারা চেহারা জুড়ে দেখা দিয়েছে কালো সব ক্ষত, ত্বকের নীচে বিস্ফোরিত হয়েছে রক্ত-কোষ। টকটকে লাল হয়ে গেছে দুই চোখ। মুহূর্তে অন্ধ হয়েছে সবাই। শরীরের রোমকূপ থেকে ছিটকে বেরিয়েছে রক্ত।

হাঁটু গেড়ে বসে পড়েছে সবাই, প্রাণপণ চিৎকার করছে গলা ফাটিয়ে।

কিন্তু বেশিক্ষণ ভুগতে হবে না তাদেরকে। তিরিশ সেকেণ্ডের ভিতর বিকল হবে মগজ। রক্ত-কোষ জমাট বেঁধে যাওয়ায় মগজে প্রচণ্ড হেমোরেজ হবে।

মরতেই হবে তাদেরকে, কিন্তু তার আগে কয়েক সেকেণ্ড নরক-যন্ত্রণা কী তা জেনে যাবে।

ই-ডেকে উপরের দিকে চেয়ে থম মেরে দাঁড়িয়ে আছে জুলিয়াস

বি. গুণ্ডারসন।

দুই গ্রেনেডের বিস্ফোরণ শেষ করে দিয়েছে তার গোটা ইউনিটের সবাইকে। স্টেশনের চারপাশে ছিটকে লেগেছে নীল রঙা আঠার মত তরল। বরফ-ঠাণ্ডা নাইট্রোজেন লেগে চিড়চিড় করে ফাটতে শুরু করেছে হ্যাণ্ড রেলিং। বরফের ভিতর মুহূর্তে জমে গেছে ডাইভিং বেলের উপরের কেবল। সুপারকুল্ড লিকুইড নাইট্রোজেন মুহূর্তে ফাটল ধরিয়ে দিয়েছে এত শক্ত কেবলে। ধাতুর উপর আরও দ্রুত কাজ করেছে ওটা। এমন কী ডাইভিং বেলের পোর্টহোল জমে গেল নীল রঙের বরফে।

নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না গুণ্ডারসন।

দুই ঢিলে বিশজন যোদ্ধাকে শেষ করে দিয়েছে মাসুদ রানা!

অবশিষ্ট রয়ে গেছে সে।

ঝড়ের মত চলছে তার মগজ।

ভাল কোনও বুদ্ধি বের করো! কীসের জন্য এসেছ এখানে? দখল করতে হবে স্পেসশিপ। ওটা হাতে পেতে হবে। কী করে সেটা পাবে? একমিনিট...

নীচে অপেক্ষা করছে তার লোক।

কাজেই চলে যেতে হবে পাতাল-গুহায়।

ডাইভিং বেলের উপর চোখ পড়ল গুণ্ডারসনের।

হ্যাঁ...

আর ঠিক তখনই ডাইভিং বেলের ওপাশে রানা ও পিচ্চি মেয়েটাকে দেখল। এইমাত্র নাইট্রোজেনের তৈরি পাতলা বরফের আস্তর ভেদ করে ভেসে উঠেছে। চলেছে দূরের ডেক লক্ষ্য করে।

এসব পাত্তা দিল না গুণ্ডারসন, খপ্ করে পাশ থেকে তুলে নিল স্কুবা ট্যাঙ্ক, পরক্ষণে ঝাঁপিয়ে পড়ল পুলের ভিতর। চলেছে ডাইভিং বেলের দিকে।

মেরিকে পানির উপর উঁচু করে ধরল রানা, নামিয়ে দিল ডেকে।

'ঠিক আছ?' জানতে চাইল।

'আবারও ভিজে গেলাম,' বলল মেরি।

'আমিও,' মৃদু হাসল রানা। ঘুরে গেছে পানির ভিতর। ওর চোখ পড়েছে গুণ্ডারসনের উপর। ডাইভিং বেলের দিকে পাগলের মত সাঁতরে চলেছে লোকটা।

স্টেশনের উপর দিকে চাইল রানা। সব থমথম করছে। বেঁচে নেই কোনও এসএএস কমাণ্ডো। অবশ্য, রয়ে গেছে গুণ্ডারসন। সে ছাড়া নীচের পাতাল-গুহায় আছে তার লোক।

'একটা কম্বল জোগাড় করো,' মেরিকে বলল রানা। 'উপরে যেয়ো না। একটু পর ফিরব।'

'কোথায় চলেছেন?'

'ওই পিশাচের পিছনে,' গুণ্ডারসনকে দেখিয়ে দিল রানা।

ডাইভিং বেলের ভিতর ভেসে উঠল গুণ্ডারসন, ফ্যাকাসে হয়ে গেল মুখ। রানার .৪৪ ক্যালিবারের ডেযার্ট ঈগল অটোমেটিক পিস্তল তাক করা হয়েছে তার কপালে।

দুই হাতে পিস্তল ধরেছে রাশেদ হাবিব। বাঁট এত শক্ত ভাবে ধরেছে, রক্ত সরে গেছে দুই হাতের তালু থেকে।

'সরবেন না,' ধমকে উঠল হাবিব।

খুদে লোকটার দিকে চাইল গুণ্ডারসন। ডাইভিং বেলে আর কেউ নেই। লোকটার পরনে বহু বছর আগের স্কুবা গিয়ার। খুব নার্ভাস মনে হচ্ছে তাকে। পিস্তল হাতে কাঁপছে। হেসে ফেলল গুণ্ডারসন।

পানির নীচে নিজের পিস্তল বের করছে।

ডেযার্ট ঈগলের ট্রিগার টিপে দিল হাবিব।

ক্লিক!

'আগে চেম্বারে গুলি ভরতে হয়,' বলল গুণ্ডারসন, উঁচু করে ধরল নিজের পিস্তল।

হাবিব বুঝেছে কী ঘটবে, দেরি না করে গুণ্ডারসনের পাশের পানিতে ঝপাস্ করে নামল সে। স্কুবা গিয়ার এবং অন্য সবকিছু নিয়েই হারিয়ে গেল পানির নীচে।

ডাইভিং বেলের মেঝেতে উঠে এল গুণ্ডারসন। সোজা চলে গেল ডাইভ কণ্ট্রোলের সামনে। সময় নষ্ট না করে ব্যালাস্ট ট্যাঙ্ক ভরে নিল। কয়েক সেকেণ্ড পর নামতে শুরু করল ডাইভিং বেল।

ই-ডেকে রানা দেখেছে, ডাইভিং বেলের ব্যালাস্ট ট্যাঙ্ক ভরে গেছে।

'হারামজাদা রওনা হয়েছে,' মনে মনে বলল। নিজে চলে গেল রাং-ল্যাডারের সামনে। ঠিক করেছে সি-ডেকে গিয়ে উইঞ্চ কণ্ট্রোল ব্যবহার করে থামিয়ে দেবে ডাইভিং বেল।

এক ধাপ উপরে উঠেছে, এমন সময় উপর থেকে ভয়ঙ্কর আওয়াজ শুনল।

ঝট-ঝটাং!

লিকুইড নাইট্রোজেনের কারণে বরফ হওয়া কেবল মাঝ থেকে ছিঁড়ে পড়েছে!

এক সেকেণ্ডে তলিয়ে গেল ডাইভিং বেল।

বিস্ফারিত হলো রানার দুই চোখ, মইয়ের ধাপ থেকে লাফ দিয়ে নেমেই ঝেড়ে দৌড় দিল। পুলের ধারে পৌঁছতে হবে। আগে কখনও এত দ্রুত দৌড় দেয়নি। বুঝতে দেরি হয়নি ওর, ওই ডাইভিং বেল শেষ ট্রিপ শুরু করেছে। পাতাল-সুড়ঙ্গে পৌঁছুতে হলে এখনই ওটাতে চেপে বসতে হবে। ওর নিজের দলের সবাই মরে গিয়ে থাকলে, এবং গুণ্ডারসন পাতাল-গুহায় পৌঁছে গেলে,

কোনও লড়াই ছাড়া দখল করে নেবে স্পেসশিপ। আগে ওর মনে হয়েছিল, যা খুশি হোক ওই স্পেসশিপের, কিন্তু এখন জানে, জীবন থাকতে গুণ্ডারসনকে জিততে দেয়া যাবে না।

ডেকের শেষ-প্রান্তে পৌঁছে গেছে রানা, দৌড় না থামিয়েই দীর্ঘ ডাইভ দিল। পানিতে পড়বার আগে বড় করে দম নিয়েছে। ওর নীচে হারিয়ে যাচ্ছে ডাইভিং বেল।

তীরের মত পানি ভেদ করল রানা, চার হাত-পায়ে ডুব সাঁতার শুরু করেছে। নেমে চলেছে গভীরে।

উইঞ্চ কেবল নেই, কাজেই আগের চেয়ে দ্রুত নামছে ডাইভিং বেল। অস্বাভাবিক গতিতে সাঁতার কাটতে গিয়ে টনটন করছে রানার হাত-পায়ের পেশি। ডাইভিং বেলের খুব কাছে চলে গেল ও, তারপর খপ্ করে ধরেও ফেলল বাইরের দিকের পাইপিং।

ডাইভিং বেলের ভিতর হোলস্টারে পিস্তল রেখে দিল গুণ্ডারসন, কোমর থেকে খুলে নিয়েছে ডেটোনেশন ইউনিট। চট্ করে সময় দেখে নিল:

৮:৩৭।

টাইমার চালু করে দিল। নিজের জন্য বরাদ্দ দিয়েছে দু'ঘণ্টা। এরই ভিতর পাতাল-গুহায় পৌঁছে যাওয়ার কথা। এই সময়ের পর উইলকক্স আইস স্টেশনের সামনের সব ট্রাইটোনাল চার্জ ফাটতে শুরু করবে।

এবার পকেট থেকে বের করল ন্যাভিস্টার গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম ট্র্যান্সপণ্ডার, টিপে দিল ট্র্যান্সমিট বাটন।

পকেটে রেখে দিল ট্র্যান্সপণ্ডার, খুশি হয়ে হেসে ফেলল। স্টেশনে অনেক লোক হারিয়েছে, কিন্তু পরিকল্পনা বদলে নিতে হয়নি।

একবার আঠারোটা ট্রাইটোনাল চার্জ ফাটলে গোটা উইলকক্স

আইস স্টেশন ভেসে যাবে সাগরে। ওটা হবে নতুন একটা আইসবার্গ। আর তখন গুণ্ডারসনের জিপিএস রিসিভার থেকে তথ্য পেয়ে হাজির হবে রেসকিউ ফোর্স। ওই ব্রিটিশ টিম জানবে কোথায় আছে ওই আইসবার্গ, স্টেশন, গুণ্ডারসন, তার চেয়ে বড় কথা, সহজেই মিলবে ওই স্পেসশিপ।

পানির নীচে প্রতি পলে নেমে চলেছে ডাইভিং বেল।

ওটার ছাতের কাছে পাইপিং ধরে ঝুলে আছে রানা।

এবার একফুট একফুট করে নামতে লাগল ডাইভিং বেলের পাশে। মনে হলো রকেটের মত নামছে বেল, আস্তে আস্তে দুলছে নানা দিকে। টিকে রইল রানা। একটু পর নেমে পড়ল নীচে, ওদিক দিয়েই ঢুকতে হয় পুল ডেকে।

পাঁচ সেকেণ্ড পর ভুস্ করে ভেসে উঠল ছোট পুলের পানিতে। গুণ্ডারসনের উপর চোখ পড়েছে ওর। লোকটার হাতে ডেটোনেশন ইউনিট।

একইসময়ে চরকির মত ঘুরল গুণ্ডারসন, ঝট্ করে বের করল পিস্তল। উবু হয়ে গেল, শত্রুকে গুলি করবার জন্য প্রস্তুত। পানি থেকে উঠে আসতে গিয়েও সে চেষ্টা বাদ দিল রানা। ওর ডানহাতি ঘুষি পড়ল গুণ্ডারসনের কবজির উপর। পিস্তল ধরা তালু খুলে গেল লোকটার। মেঝেতে পড়ে ঝটাং করে ডেকের উপর দিয়ে পিছলে গেল পিস্তল।

পরক্ষণে লাফ দিয়ে পুল থেকে উঠে এল রানা। আর একই সময়ে ক্র্যাশ-ট্যাকল করল গুণ্ডারসন। পিছনের দেয়ালে আছড়ে পড়ল দু'জন। লাথি দিয়ে লোকটাকে সরিয়ে দিতে চাইল রানা, কিন্তু গুণ্ডারসন অনেক বেশি চালু লড়াকু আদমি। গায়ের জোরে রানাকে ঠেসে ধরেছে দেয়ালে। পরক্ষণে নিজে সরে গেল, প্রচণ্ড লাথি বসিয়ে দিল রানার চোয়ালে। ইস্পাতের পাত বসানো বুটের

লাথি ছিটকে দিল রানাকে পিছনে। ডাইভিং বেলের শীতল জানালার কাঁচে ঠাস্ করে লাগল ওর গাল।

ঠিক তখন চোখের সামনে দেখল, জানালার কাঁচে সরু ফাটল তৈরি হয়েছে। ভালভাবে বুঝবার সময় পেল না, আবারও লাথি হাঁকিয়েছে গুণ্ডারসন। পরক্ষণে আবারও। তারপর আবারও। ধড়াস্ করে মেঝের উপর পড়ল রানা।

'তুই হাল ছাড়িস না, নাকি?' বলল গুণ্ডারসন। তার পায়ের কাছে পড়ে আছে রানা। 'কক্ষনো হতাশ হোস্ না!'

'আমার কাজ আমি শেষ করি,' চাপা স্বরে বলল রানা। এখনও উঠে বসতে পারেনি।

গুণ্ডারসনের আরেকটা লাথি পড়ল। তার ইস্পাতের পাত বসানো বুট লেগেছে রানার পাঁজরে। ওই হাড়ে আগেই চিড় ধরেছিল, এবার বোধহয় মট্ করে ভেঙেই গেল। ব্যথায় গুঙিয়ে উঠল রানা।

'তোর এখানে আসাই উচিত হয়নি,' দাঁতে দাঁত চেপে বলল গুণ্ডারসন।

আবারও লাথি মারতে চাইল রানার পেটে। কিন্তু ঝট্ করে দেহ গড়িয়ে দিয়েছে রানা। ওর একটু দূরে গুণ্ডারসনের বুট নামল ইস্পাতের মেঝেতে। ফুলকি উঠল ওখান থেকে।

দু'বার গড়িয়ে সরল রানা, পিঠ ঠেকেছে ডাইভিং পুলের ধাতব রিমে। এবার পরিষ্কার দেখতে পেল ওটা।

একটা হার্পুন গান।

লিটল আমেরিকা-৪ স্টেশন থেকে এনেছিল। পাশেই পড়ে আছে।

কাত হয়ে হার্পুন গান তুলে নিতে চাইল রানা। আর তখনই লাফিয়ে সামনে বাড়ল গুণ্ডারসন, পরক্ষণে ভয়ঙ্কর সাইড কিক করল।

উঠে দাঁড়াতে শুরু করেছিল রানা, কাঁধে লাথি খেয়ে হুড়মুড় করে আবারও পড়ে গেল। এবার পড়েছে ডাইভিং বেলের পুলের ভিতর। কয়েক সেকেণ্ড পর টের পেল, ও বেরিয়ে এসেছে বাইরে!

ওকে পাশ কাটিয়ে সামান্য দুলতে দুলতে নামছে ডাইভিং বেল। বাম হাত বাড়িয়ে একটা পাইপ ধরে ফেলল রানা। টান খেয়ে নীচের দিকে রওনা হয়ে গেল। দুই পায়ে জড়িয়ে নিল পাইপ, যেন নারকেল গাছ বেয়ে উঠবে। ডানহাতে রয়ে গেছে হারপুন গান। একবার দেখল চারপাশ। গভীরে নেমে এসেছে ডাইভিং বেল।

গভীরতা হবে কমপক্ষে এক শ' ফুট। নাকি দু' শ' ফুট?

গোলাকার পোর্টহোলের একটা দিয়ে ভিতরে উঁকি দিল রানা। এটার কাঁচেও সরু সাদা ফাটল।

এক সেকেণ্ড পর টের পেল, উপরে থাকা সময়ে লিকুইড নাইট্রোজেন ফাটিয়ে দিয়েছে ডাইভিং বেলের কাঁচ। ওই যে, ধাতব ডেকে দাঁড়িয়েছে গুণ্ডারসন। রানাকে দেখে একবার স্যালিউট দিল সে, বামহাত তুলে নাড়ল। বুঝিয়ে দিচ্ছে, খেলা শেষ, আমার হাতে ডেটোনেশন ইউনিট।

কিন্তু লড়াই এখনও শেষ হয়নি।

পোর্টহোলের ভিতর দিয়ে গুণ্ডারসনের দিকে চেয়ে রইল রানা। এবার পাল্টা হাত নাড়ল ও। সঙ্গে সঙ্গে শুকিয়ে আমশি হয়ে গেল গুণ্ডারসনের মুখ।

জানালার কাঁচে রানা তাক করেছে হারপুন গান।

দৌড়ে এল ব্রিটিশ মেজর জেনারেল, ওপাশ থেকে কোনও আওয়াজ এল না, কিন্তু ঠোঁট গোল করতে দেখে বোঝা গেল 'নো!' বলছে লোকটা।

এক সেকেণ্ড তাকে দেখে নিয়ে ট্রিগার টিপে দিল রানা।

মুহূর্তে চুরমার হলো কাঁচ।

পরক্ষণে জুলিয়াস বি. গুণ্ডারসনের এত বিদ্যা, এত কৌশল সব ব্যর্থ হয়ে গেল— এরপর আর কোনও কায়দা নেই।

কাঁচকে বিস্ফোরিত করেছে হারপুন গানের ফলা। ডাইভিং বেলের ভিতর ছিল হাই প্রেশার। বদ্ধ পরিবেশ নষ্ট হয়ে যেতেই গোটা সাগরের চাপ এসে পড়েছে ওটার উপর। এত ওজন নেয়ার সাধ্য কোনও ধাতুর নেই।

কাগজের কাপের মত তুবড়ে গেল ডাইভিং বেল। চেপ্টে গেল চারপাশের গোল দেয়াল। হার ম্যাজেস্টির দুর্ধর্ষ এসএএস্-বাহিনীর সর্বোচ্চ নেতা মেজর জেনারেল জুলিয়াস বি. গুণ্ডারসন জুতার নীচে পড়া তেলাপোকার মত চ্যাপ্টা হয়ে মরল মুহূর্তে।

বিধ্বস্ত ডাইভিং বেল ধরে ঝুলছে রানা, নেমে চলেছে আবর্জনার সঙ্গে।

ভাবতে ভাল লাগল ওর, হারামজাদা গুণ্ডারসনের গুণ্ডামি শেষ। এসএএস বাহিনীর সবকটাকে শেষ করেছে ও।

এবার ফিরতে হবে স্টেশনে।

পরক্ষণে ধক্ করে উঠল ওর হৃৎপিণ্ড। মেরুদণ্ড বেয়ে নামল বরফ-ঠাণ্ডা স্রোত। উঠতে হলে শ' ফুটের বেশি পেরুতে হবে। ততক্ষণ শ্বাস আটকে রাখা অসম্ভব। কাজেই এবার ও-ও মরবে। একা, নিঃশব্দে মৃত্যু ছিল ওর কপালে। কেউ জানবে না ও এখানে মারা পড়েছে। লাশও পাবে না কেউ।

ঠিক তখন মুখের সামনে নড়ল একটা হাত। রানা এমন বেমক্কা ভয় পেল যে আরেকটু হলে হার্ট-অ্যাটাক হতো। পরক্ষণে বুঝল, ওটা গুণ্ডারসনের হাত। ডাইভিং বেল থেকে কীভাবে যেন বেরিয়ে এসেছে লোকটা। কিন্তু...

না, জুলিয়াস বি. গুণ্ডারসন নয়।

লোকটা বাঙালি বিজ্ঞানী রাশেদ হাবিব।

রানার এক ফুট উপরে ভাসছে, বাতাস নিচ্ছে চল্লিশ বছর

আগেরও স্কুবা গিয়ার ব্যবহার করে।

রানার দিকে আগ্রহ নিয়ে মাউথপিস বাড়িয়ে দিল সে।

সতেরো

রাত ন'টায় ই-ডেকে পা রেখেছে রানা।

এখন নয়টা চল্লিশ মিনিট। স্টেশনের উপর থেকে শুরু করে নীচ পর্যন্ত সবখানে এসএএস কমাণ্ডোদেরকে খুঁজেছে ও। জীবিত কাউকে পাওয়া যায়নি। জড় করেছে নানা অস্ত্র। এসবের ভিতর এমপি-৫ ও কয়েকটা নাইট্রোজেন চার্জ নিজের জন্য রেখেছে। রাশেদ হাবিবের কাছ থেকে ফেরত নিয়েছে ডেযার্ট ঈগল পিস্তল।

নিশাত সুলতানাকে খুঁজেছে। কিন্তু কোথাও পাওয়া যায়নি তাকে।

যেন উধাও হয়ে গেছে।

এমন কী খুদে লিফটের ভিতরও খুঁজেছে। কেউ নেই।

সব খোঁজাখুঁজি শেষে পরিশ্রান্ত রানা এসে বসেছে পুলের পারে। চব্বিশ ঘণ্টা হলো একফোঁটা ঘুমাতে পারেনি। এখন ভেঙে আসছে শরীর।

ওর পাশে ডেকের উপর পড়ে আছে লিটল আমেরিকা-৪-র স্কুবা গিয়ার, ওটা এনেছিল রাশেদ হাবিব। এখনও ভেজা; সঙ্গে পেঁচিয়ে রয়েছে দীর্ঘ স্টিলের তার। একমাইল দূরের লিটল আমেরিকা-৪ স্টেশন থেকে এসেছে ওই তার। আইস শেলফের নীচ দিয়ে এসে উঠেছে উইলকক্স আইস স্টেশনে। প্রাচীন স্কুবা

গিয়ারের দিকে চাইল রানা, আপন মনে মাথা নাড়ল। ওর পিছনের ডেকে ব্রিটিশদের আনা সি স্লেড। ওগুলো আলট্রা-মডার্ন জিনিস।

উপরে, বি-ডেকে নিজের ঘরে চলে গেছে রাশেদ হাবিব, রানার ক্ষতের চিকিৎসা করবার জন্য আনবে কয়েকটা ব্যাণ্ডেজ, কাঁচি ও ডিযইনফেকট্যান্ট।

রানার পিছনে দাঁড়িয়ে আছে পিচ্চি মেরি ভিসার, মনোযোগ দিয়ে ওর নরম মনের দুঃসাহসী বিদেশি বন্ধুকে দেখছে। চিন্তিত হয়ে পড়েছে মানুষটার জন্য। বড় করে শ্বাস ফেলল রানা, বুজে ফেলল দুই চোখ। মচকে যাওয়া নাক আস্তে করে ধরল, ভীষণ ব্যথা করছে। হ্যাঁচকা টানে ঠিক করে নিল নাক।

'ইশ্‌শ্‌, খুব ব্যথা?' জানতে চাইল মেরি।

'তা বলা যায়, কিন্তু নাক আছে, এই তো বেশি,' হাসতে চাইল রানা।

ঠিক তখন ঝপাৎ আওয়াজ পেল, চরকির মত ঘুরে চাইল ওরা। পুলের ভিতর থেকে লাফিয়ে ই-ডেকে উঠে এসেছে ছোট্ট সিল লিলি । হেলেদুলে রানার সামনে চলে এল ওটা। আস্তে করে মাথায় হাত বুলিয়ে দিল রানা। এতে খুশি হয়ে গড়িয়ে পড়ে গেল সে ডেকে, এবার ওর পেট চুলকে দিতে হবে।

তাই করল রানা।

ওর পিছনে হাসছে মেরি।

আধ মিনিট পর চট্‌ করে হাতঘড়ি দেখল রানা।

সোলার ফ্লেয়ারের কথা মনে পড়ে গেছে। মিস রাফায়লা ম্যাকানটায়ার বলেছিল, সাড়ে সাতটার সময় একটা সোলার ফ্লেয়ার কাটবে। আবারও সুযোগ আসবে রাত দশটায়।

সাড়ে সাতটার সুযোগ হারিয়েছে ও।

আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলে দশটার সময় আরেকটা

সুযোগ পাবে। তখন রেডিয়ো ব্যবহার করে ম্যাকমার্ডোয় জানিয়ে দেবে এখানে কী ঘটছে।

ফোঁস করে শ্বাস ফেলল রানা। অবশ্য, রেডিয়ো করবার আগে অন্য একটা কাজ করতে হবে ওকে।

একটু দূরে পড়ে আছে মেরিন এক হেলমেট। বোধহয় ডাইপারের ছিল। হাত বাড়িয়ে ওটা তুলল রানা, চাপিয়ে নিল মাথার উপর। মুখের সামনে আনল মাইক্রোফোন। 'রানা বলছি। তিশা, জনি ওয়াকার, মোরশেদ— তোমরা শুনতে পাচ্ছ?'

প্রথমে কোনও সাড়া পাওয়া গেল না, তারপর হঠাৎ করেই বলে উঠল নারী কণ্ঠ: 'স্যর! আপনি?'

তিশার কণ্ঠ। 'আপনি কোথায়, স্যর?' জানতে চাইল।

'স্টেশনে।'

'আর এসএএস প্লাটুন?'

'মরেছে সবাই। আবারও স্টেশন ফিরে পেয়েছি। তোমাদের কী অবস্থা? দেখলাম, নীচে গেল গুণ্ডারসনের ডাইভার টিম।'

'বলতে পারেন হঠাৎ ঐশ্বরিক বা নারকীয় সাহায্য পেয়েছি, আমাদের কোনও লোক হারাতে হয়নি। এসএএস কমাণ্ডোরা কেউ বেঁচে নেই। আপনাকে বলার মত অনেক কথা আছে আমার।'

বরফ-গুহার ওই ফাটলের ভিতর দিয়ে চেয়ে আছে তিশা। ব্রিটিশ কমাণ্ডো দলের সঙ্গে লড়াই শেষে ওরা আশ্রয় নিয়েছে ফাটলের খাটো সুড়ঙ্গে। একটু দূরে পড়ে আছে এসএএস কমাণ্ডোদের ক্ষত-বিক্ষত লাশ। কেউ বেঁচে নেই। লোকগুলোর মাংস-হাড় চিবানোর পর বড় গুহার ভিতর নির্বিবাদে ঘুরে বেড়াচ্ছে প্রকাণ্ড সব এলিফ্যাণ্ট সিল। আপাতত কালো বিমানের আশপাশে গিয়ে বসেছে, ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে, ক্যাম্পফায়ারে জমায়েত হয়েছে

একদল স্কাউট।

'ঠিক কীসের মত বললে?' আবারও জানতে চাইল রানা।

'স্পেসশিপের মতই, কিন্তু আসলে মানুষের তৈরি অদ্ভুত সুন্দর কালো একটা বিমান,' বলল তিশা।

'আরও বিশদ বর্ণনা দাও,' ক্লান্ত স্বরে বলল রানা।

সংক্ষেপে তিশা জানাল এই পাতাল-গুহায় কী পেয়েছে। 'স্পেসশিপের' পেটের কাছে কিপ্যাড। বলতে ভুল করল না, হ্যাঙার ও ডায়েরির কথা। ভয়ঙ্কর এক ভূমিকম্পে গোটা স্টেশন তলিয়ে যায় দেড় হাজার ফুট নীচে। তিশার মনে হয়েছে, এটা ছিল টপ-সিক্রেট কোনও মিলিটারি প্রজেক্ট। গোপনে ইউএস এয়ার ফোর্সের জন্য তৈরি করা হচ্ছিল বিশেষ কোনও অ্যাটাক বিমান। ডায়েরির বক্তব্য তুলে ধরল, বিমানের ভিতর রয়েছে প্লুটোনিয়াম কোর।

এরপর তিশা জানাল, কীভাবে এসএএস কমাণ্ডোদের উপর হামলে পড়েছে এলিফ্যাণ্ট সিল। আগেই গুহার ভিতর ছিটিয়ে পড়ে ছিল উইলকক্স আইস স্টেশনের মৃত বিজ্ঞানীরা। ওসব সিল বেরিয়ে এসেছে মস্ত বড় গর্ত থেকে। ভয়ঙ্কর হিংস্র তারা। বর্ণনা দিতে গিয়ে শিউরে উঠল তিশা।

নীরবে সব শুনল রানা। তিশার কথা শেষে বলল, রাশেদ হাবিবের ঘরে মনিটরে কী দেখেছে। ওই সিলের নীচের মাড়ি থেকে বেরিয়েছে দুটো বিশাল শ্বদন্ত, নাকের পাশ দিয়ে উপরে উঠেছে। কথা বলবার সময় আরেকটা দৃশ্য ফুটে উঠল ওর মনে। ভেসে উঠেছে মৃত কিলার ওয়েইল। পেট-বুক-গলা চেরা। যেন ক্ষুরধার দুটো তলোয়ার ফুটো করে দিয়েছে পেট, তারপর উপরের দিকে চিরে দিয়েছে গলা পর্যন্ত।

'এখানেও অমন সিল দেখেছি,' বলল তিশা। 'এগুলো ছোট। কিশোর বয়সী। আপনি বোধহয় দলের মর্দাটাকে দেখেছেন। যা

বললেন, এ থেকে মনে হচ্ছে, নীচের দুই শ্বদন্ত থাকে শুধু মর্দার। নাকের পাশ দিয়ে উঠেছে।'

'হতে পারে,' বলল রানা। এক সেকেণ্ড পর অন্য চিন্তা এল। বোধহয় বুঝতে পারছে, কেন মর্দা এলিফ্যান্ট সিলের অস্বাভাবিক নীচের শ্বদন্ত থাকে।

সত্যিই যদি ওই বিমানে প্লুটোনিয়াম কোর থাকে, এমন হতেই পারে, ওই কোর থেকে সামান্য প্যাসিভ রেডিয়েশন বেরুচ্ছে। আসলে লিক হচ্ছে না, শুধু আবছা ভাবে রেডিয়েশন ছড়িয়ে পড়ছে। যে-কোনও নিউক্লিয়ার ডিভাইসে এমন হয়। হয়তো এসব এলিফ্যান্ট সিল বাসা করেছে বিমানের কাছেই, আর সামান্য পরিমাণের রেডিয়েশন আসছে প্লুটোনিয়াম কোর থেকে। এর ফলে মর্দাগুলোর উপর প্রভাব পড়ছে।

ওর মনে পড়েছে কুখ্যাত রডরিগ রিপোর্ট। নিউ মেক্সিকোর মরুভূমিতে পুরনো এক নিউক্লিয়ার ওয়েপন্স ফ্যাসিলিটি থেকে বেরুচ্ছিল প্যাসিভ রেডিয়েশন। কাছের শহরে দেখা গেল বহু লোক জেনেটিক অস্বাভাবিকতায় ভুগছে। মহিলাদের চেয়ে অনেক বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল পুরুষরা। আঙুল দীর্ঘ হওয়া কমন মিউটেশন। এ ছাড়া, দেখা গেল মানুষের দাঁত বিদঘুটে হয়ে উঠছে। রিপোর্টে বলা হলোঃ পুরুষ হর্মোন টেস্টোস্টেরনে জেনেটিক অস্বাভাবিকতা দেখা দিয়েছে।

এসব সিলেরও বোধহয় তাই হয়েছে, ভাবল রানা।

তারপর ওর মনে পড়ল আরেকটা বিষয়। চট্ করে জানতে চাইল, 'তিশা, বলো তো, এসএএস কমাণ্ডোরা কখন গুহায় পৌঁছায়?'

'ঠিক জানি না, তবে আন্দাজ রাত আটটার দিকে।'

'আর তোমরা?'

'আমরা ডাইভিং বেল ত্যাগ করি দুপুর দুটো দশ মিনিটে।

আরও একঘণ্টা লাগে এখানে উঠে আসতে। ধরুন, তিনটের সময় পৌঁছে যাই।'

বিকেল তিনটা। আর রাত আটটা।

জানা নেই উইলকক্স আইস স্টেশনের বাসিন্দারা ঠিক কখন নেমেছিল পাতাল-গুহায়। কিন্তু রানার মন বলছে, এসব সময়ের সঙ্গে হামলার যোগাযোগ আছে। আঙুল তুলে নির্দিষ্ট কিছু দেখাতে পারবে না, কিন্তু কোনও মিল থাকতেই পারে। পরে হয়তো বোঝা যাবে কেন ওই সময়ে হামলা হয়েছে।

ঘড়ির দিকে চাইল রানা।

৯:৫০।

সোলার ফ্লেয়ারের ফাটল তৈরি হওয়ার সময় হয়ে এল।

'তিশা, আপাতত অন্য কাজে যাব। দশ মিনিট পর সোলার ফ্লেয়ারের ভিতর ফাটল দেখা দেবে। ওই সুযোগে ম্যাকমার্ডোর সঙ্গে যোগাযোগ করব। তোমরা তো নীচে নিরাপদ, একটা কাজ করো, চারপাশ ঘুরে জানাও হ্যাঙারে আরও কী আছে। ওই বিমান সম্পর্কে কিছু পেলে দেরি না করে জানাবে।'

'ঠিক আছে, স্যর।'

হেলমেট মাইকের সুইচ অফ করে দিল রানা। উঠে দাঁড়িয়েছে, এমন সময় অনেক উপর থেকে কে যেন চেঁচিয়ে বলল, 'মেজর!'

মুখ তুলে উপরে চাইল রানা। রাশেদ হাবিব। বি-ডেকের ক্যাটওয়াকে। 'এই যে, ভাই!' গলা ফাটিয়ে ফেলছে লোকটা।

'কী?'

'বিশ্বাস করবেন না, নিজ চোখে এসে দেখে যান!'

তিন মিনিট পর মেরিকে নিয়ে রাশেদ হাবিবের ভাঙা দরজা পেরুল রানা।

কমপিউটারের সামনে দাঁড়িয়ে আছে রাশেদ হাবিব।

‘গোটা সন্ধ্যা ধরে পড়ে আছে!’ রানাকে বলল, ‘কিন্তু মাত্র একটু আগে দেখলাম। নিউ মেক্সিকো থেকে ই-মেইল। পৌঁচেছে সন্ধ্যা সাতটে বত্রিশ মিনিটে। লোকটার নাম রবিন কার্লটন। আপনাকে চিঠি দিয়েছে।’

‘কী নাম বললেন?’ ভুরু কুঁচকে গেল রানার।

‘কী যেন নাম বললাম? ...হ্যাঁ, রবিন মিলফোর্ড। তিন গোয়েন্দা বইয়ের নথি রবিন মিলফোর্ড...’

ভুরু আরও কুঁচকে গেল রানার।

মনিটরের দিকে আঙুল তুলল রাশেদ হাবিব। ‘একটা লিস্ট পাঠিয়েছে। তার আগে-পরে মেসেজ দিয়েছে।’

চিঠি পড়তে শুরু করেছে রানা। কয়েক সেকেণ্ড পর একটু সরু হয়ে গেল ওর দুই চোখ। ই-মেইলে লেখা:

রানা,

আমি তোমার বন্ধু রবিন কার্লটন। মনে পড়ে আমাকে?

খুব সাবধান! তুমি যেখানে আছ, তা নিরাপদ জায়গা নয়। ইউএসএমসি পার্সোনেল ডিপার্টমেণ্ট থেকে জানলাম, তুমি এখন মৃত। ঠিক আমারই মত। দ্বিতীয় টিম রওনা হয়েছে। আসছে তোমাদেরকে শেষ করে দিতে। বাংলাদেশ সরকারকে আগেই জানানো হয়েছে, তুমি মারা গেছ।

তোমার মিশনটাকে টার্গেট করেছে আইসিজি। দ্বিতীয় টিম আসছে তোমাদের শেষ করতে।

চাই না আমার ইউনিটের সবার মত করে মরতে হোক তোমাদের সবাইকেও।

পেরুর কথা মনে পড়ে, রানা?

তোমার সঙ্গে যারা, তাদের ভিতর কেউ আইসিজি থাকলে হয়তো তাকে ঠেকাতে পারবে।

নীচে একটা লিস্ট দিলাম।

এরা আইসিজি।

ট্র্যান্সমিট নং. ৫৯৭-৯৭১৭-০৮১০১।
রেফারেন্স নং. ৪৫৩১
বিষয়: সেনাবাহিনী কর্তৃপক্ষের কাছের কয়েকজন ব্যক্তির নাম।

নাম:	চাকরিস্থল:	ফিল্ড/র‍্যাঙ্ক:
উইলিয়াম বীব।	লিঙ্কন ল্যাব।	নিউক্লিয়ার ফিযিসিস্ট।
জর্জ লোবো লার্সেন।	বার্কলি।	অ্যারোনটিকাল ইঞ্জিনিয়ার।
মাইক গেউল্ড।	নেভি সিল।	লেফটেন্যাণ্ট কমাণ্ডার।
ন্যাট লেদারউড।	আর্মি রেঞ্জার্স।	কর্নেল।
মার্লা হেয়েয।	কলাম্বিয়া।	কমপিউটার সায়েণ্টিস্ট।
সামান্থা রিভস্।	হার্ভার্ড।	ইণ্ডাস্ট্রিয়াল্ কেমিস্ট।
রাস্টি ফেরিস।	মাইক্রোসফট।	সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার।
উইলিয়াম ফেল্পস।	আইবিএম।	হার্ডওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার।
লেস্টার গ্রিম।	ক্রে।	হার্ডওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার।
ভ্যালেনি ফার্গো।	ইউএসএমসি।	কর্পোরাল।
ক্রিস হার্ট।	বোয়িং।	টেকনিশিয়ান।
প্রস্টন স্টোন।	ইউএসসি।	জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ার।
রিপলি জেনড্রন।	জেপিএল।	অ্যারোনটিকাল ইঞ্জিনিয়ার।
অ্যামি কার্ভেল।	লকহিড।	অ্যারোনটিকাল ইঞ্জিনিয়ার।
জ্যাক বোল্ট।	আর্মি রেঞ্জার্স।	সিনিয়র সার্জেণ্ট।
সুয়েড নিলসেন।	ইয়েল।	নিউক্লিয়ার ফিযিস্ট।
নর্মা হবসন।	অ্যারিয।	বায়োটক্সিন।
মাইক গ্যানন।	ইউএসএমসি।	গানারি সার্জেণ্ট।
নিনা অস্টিন।	হার্ভার্ড।	ক্যাপ্টেন।
জাড হর্সফল।	জন্স হপকিন্স।	
কলিন সিম্পসন র‍্যানডলফ।	ইউএনএসসি।	সার্জেণ্ট মেজর।
জিম বেলিংগার।	আর্মালাইট।	ব্যালেস্টিক্স।
এনিস কনরাড।	ইউ.টেক্স।	ইনসেক্টেস.

জনি ওয়োকার।	ইউএসএমসি।	সার্জেন্ট।
অ্যান্ড্রু লিলিওয়েলেন।	আইসিজি।	সার্জেন্ট মেজর।
লি মণ্ট্যানা।	ইউ.কলোরাডো।	কেমিকেল এজেন্টস্।
ম্যাক্স ডাব্লিউ কেইন।	টেক্সাস ল্যাব।	কেমিস্ট।
ফ্রেডারিক সিম্পসন।	প্রিন্সটন।	?
জেনি ফেয়ারওয়েল।	থার্ড মেরিন কর্পস।	?
পল সিংগার।	ইউএসএমসি।	গানারি সার্জেন্ট।
গুয়েন রাসেল।	ইউএসসি।	?
পার্কস আর. শর্ট।	নেভি সিল।	কমোডোর।
পল মর্গান।	ইউএসএমসি।	সার্জেন্ট।
চাক হ্যালুম।	সিসিএ সিএলএও।	সায়েন্টিস্ট।
পলি রিগস্।	উকলা।	জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ার।
অলিভার টার্নার।	ইউএসএমসি।	মেজর।
জন সিমন।	ইউএসএএফ।	ক্যাপ্টেন।

ভাল কথা, রানা, তুমি সভ্য জগতে ফিরলেই অ্যাডোনিস ক্যাসেডিন নামের এক লোকের সঙ্গে যোগাযোগ করবে। সে দ্য ওয়াশিংটন পোস্ট দৈনিক পত্রিকায় কাজ করে। সে জানবে আমি কোথায় আছি।

বিদায়, পারলে শেষ করে দাও ওই কুকুরগুলোকে।

রবিন কার্লটন।

ই-মেইলের দিকে হতবাক হয়ে চেয়ে আছে রানা।

মেরিন অফিস থেকে ওকে বলা হয়েছিল রবিন কার্লটন পেরুতে মারা গেছে।

কিন্তু আসলে ও জীবিত...

ই-মেইলের একটা কপি প্রিন্ট করেছে রাশেদ হাবিব। ওটা বাড়িয়ে দিল। দ্বিতীয়বার চিঠিটা পড়ল রানা।

কীভাবে যেন রবিন জেনেছে, ও আছে অ্যাণ্টার্কটিকায়। এ-ও

জেনেছে, দ্বিতীয় দল আসছে উইলকক্স আইস স্টেশন লক্ষ্য করে। এর চেয়েও বিস্ময়কর, আমেরিকান সরকার থেকে বাংলাদেশ সরকারকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে, ও মারা পড়েছে।

রবিন ওকে পাঠিয়ে দিয়েছে আইসিজির দীর্ঘ তালিকা। এরা সবাই বিশ্বাসঘাতক, দরকার পড়লে অন্য যোদ্ধাদেরকে খুন করে ফেলবে।

ই-মেইল করবার সময়টা দেখে নিল রানা। সাতটা বত্রিশ। স্যাটালাইটের মাধ্যমে এসেছে। তার মানে, সাড়ে সাতটার দিকে পাঠানো হয়েছে। ওই সময় সোলার ফ্লেয়ার সরে গিয়েছিল।

তালিকা আবারও পড়তে শুরু করল রানা।

কয়েকটা নাম যেন চোখে এসে আঙুল দিয়ে খোঁচা দিল।

পল সিংগার। ইউএসএমসি। গানারি সার্জেন্ট। ?

ভাইপার। রানা ভাবতে পারেনি লোকটা আইসিজি হতে পারে। তারপর তালিকায় আছে:

জনি ওয়াকার। ইউএসএমসি। সার্জেন্ট। ?

'সর্বনাশ!' বিড়বিড় করে বলল রানা।

'কী? কী পেলেন?' আগ্রহ নিয়ে জানতে চাইল রাশেদ হাবিব।

চুপ করে আছে রানা।

জনি ওয়াকারও আইসিজি।

হ্যাঙারে অন্যদের সঙ্গে কালো বিমান বিষয়ে তথ্য পাওয়ার জন্য খোঁজাখুঁজি করছে তিশা করিম।

ছোট এক ওঅর্ক শপে নানান স্কিম্যাটিক দেখছে গোলাম মোরশেদ। একটা ডেস্কের পিছনে বসেছে নিনা ভিসার, হাতে পেন্সিল ও কাগজ।

'ভাল নাম দিয়েছে,' নীরবতা ভাঙল মোরশেদ।

'কী?' জানতে চাইল নিনা।

'ভাল নাম দিয়েছে বিমানের— "ছায়া বা দ্য শ্যাডো"।'

'হুম্,' মাথা দোলাল নিনা।

'বিমানে ঢুকবার কোড ভাঙতে পারলেন?' জানতে চাইল মোরশেদ।

'প্রায়,' বলল নিনা। 'আমরা যে নম্বর পেয়েছি, সেগুলো ২৪১৫৭৮১৭। মনে হচ্ছে এগুলোর ভিতর প্রাইম নম্বর ২, ৪১, ৫, ৭। তারপর পেলাম ৮১৭। ৮৭১কে ভাগ করা যায় ১৯ আর ৪৩ দিয়ে। তার মানে ওটাও প্রাইম নম্বর। আবার, ৮৭১ দুটো নম্বরও হতে পারে। ৮১ এবং ৭। অথবা, তিনটা নম্বরও হতে পারে। এখানে এসেই আটকে গেছি। আগে বুঝতে হবে ২৪১৫৭৮১৭ দিয়ে আসলে কী বোঝাতে চেয়েছে।'

'এসব আপনিই বুঝুন,' হাসল মোরশেদ। 'আমার বিদ্যা দিয়ে বেশি দূর যেতে পারব না।'

'এবার দেখা যাক...'

হঠাৎ ওঅর্কশপে এসে ঢুকল জনি ওয়াকার, বলে উঠল, 'ডক্টর ভিসার?'

'বলুন?'

'তিশা পাঠাল। আপনাকে যেতে বলেছে। অফিসে জরুরি কী যেন পেয়েছে। বলছিল, বিমানের কোডবুক হতে পারে।'

'ঠিক আছে,' চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল নিনা, চলে গেল ওঅর্কশপ ছেড়ে।

একা হয়ে গেল মোরশেদ ও ওয়াকার।

বিমানের স্কিম্যাটিকে মন দিয়েছে মোরশেদ। কয়েক সেকেণ্ড পর বলল, 'জানেন, এই বিমান অন্যরকম। এই টার্বোফ্যান পাওয়ারপ্লাণ্টের সুপারক্রুজ কেপেবিলিটি আছে। সঙ্গে আছে

আটটা ছোট রেট্রো জেট। ওগুলো পেটের কাছে। বিমানটা একই জায়গা থেকে উপরে উঠতে বা নামতে পারে। তবে অবাক লাগছে অন্য কারণে— এই দুই পাওয়ারপ্লান্ট চলে সাধারণ জেট ফিউয়েলে।'

'তো?' দরজার কাছ থেকে বলল ওয়াকার।

'কাজেই... বোঝা যাচ্ছে না, প্লুটোনিয়াম কোর কীসের জন্য?' মুখ তুলে ওয়াকারের দিকে চাইল মোরশেদ।

জনি ওয়াকার জবাব দেয়ার আগেই আবারও স্কিম্যাটিকে মন দিয়েছে। কাগজের নীচ থেকে টেনে বের করল হাতে লেখা কয়েকটা নোট।

'আমি বোধহয় বুঝতে পেরেছি,' বলল মোরশেদ। 'আগেই বলেছিলাম তিশাকে। এসব নোটে লেখা: ইঞ্জিনিয়াররা হ্যাঙারে তৈরি করেন নতুন এক ধরনের ইলেকট্রনিক্যালি-জেনারেটেড স্টেলথ মেকানিজম। বিমানের চারপাশে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফিল্ড তৈরি করা হয়। তার জন্য দরকার ছিল অনেক পাওয়ার। ধরুন দুই দশমিক একাত্তর গেগাওয়াট। কিন্তু তা পেতে হলে লাগবে নিউক্লিয়ার রিয়্যাকশন। কাজেই দরকার প্লুটোনিয়াম।' সন্তুষ্ট হয়ে মাথা দোলাল মোরশেদ।

ওর জানা নেই, নিঃশব্দে পিছনে এসে থেমেছে সার্জেণ্ট জনি ওয়াকার।

'দুর্দান্ত এক মিশন শেষ করলাম আমরা,' বলল মোরশেদ। 'স্পেসশিপ, ফ্রেঞ্চ কমাণ্ডো টিম, ব্রিটিশ এসএএস হামলা, গোপন পাতাল ঘাঁটি, প্লুটোনিয়াম কোর... বিশ্বাসঘাতক আইসিজি— সর্বনাশ! একেবারে পাগল যে হয়ে যাইনি, তাই বাপের ভাগ্যি। এবার ঘরের ছেলে...'

জনি ওয়াকারের ছোরা খচ্ করে ঢুকে গেল মোরশেদের কানের ভিতর। থামল গিয়ে মগজের গভীরে।

বিস্ফারিত হলো গোলাম মোরশেদের দুই চোখ। তারপর আস্তে করে ডেস্কের উপর পড়ল ওর মাথা। তার আগেই মারা গেছে।

মগজের ভিতর থেকে রক্তাক্ত ফলা টেনে নিল ওয়াকার। ঘুরে দাঁড়াতে গিয়েই টের পেল, কেউ এসে দাঁড়িয়েছে দরজায়।

হতবাক হয়ে চেয়ে আছে তিশা করিম। দুই হাতে কাগজপত্র। বিস্ফারিত মেয়েটির দুই চোখ।

আঠারো

হেলমেট মাইকে বলে উঠল রানা: 'তিশা! তিশা, সাড়া দাও! মোরশেদ!'

ওদিক থেকে কারও জবাব এল না।

চট্ করে ঘড়ি দেখল রানা।

৯:৫৮।

আর মাত্র দু'মিনিট পর শুরু হবে সোলার ফ্লেয়ারের ফাটল।

'তিশা! মোরশেদ! যদি শুনে থাকো, মনোযোগ দাও, জনি ওয়াকার আইসিজি! আবার রিপিট করছি, জনি ওয়াকার বেঈমান! যখন তখন ছুরি বসিয়ে দিতে পারে পিঠে! ওর দিকে পিঠ দিয়ো না! পারলে অস্ত্র কেড়ে নাও! আমাকে অন্য কাজে যেতে হচ্ছে।'

রেডিয়ো রুমের দিকে ছুটল রানা।

বিশাল হ্যাঙারে ঘুরেই ছুটতে শুরু করেছে তিশা করিম। ওর

পিছনে তেড়ে আসছে সার্জেন্ট জনি ওয়াকার। পাশে বরফ-দেয়াল রেখে দৌড়ে চলেছে তিশা, পিছনের দেয়ালে এসে লাগল এক পশলা গুলি।

বালক্‌হেড দরজা দিয়ে ছিটকে ঢুকে পড়ল তিশা, তারই ফাঁকে কাঁধ থেকে নামিয়ে ফেলেছে এমপি-৫। সরু ফাটলের দিকে চলেছে। একবার ঘুরে কয়েকটা গুলি পাঠাল দরজা দিয়ে। পরক্ষণে পৌঁছে গেল সুড়ঙ্গের মুখে, ফাটল দিয়ে গড়িয়ে বেরিয়ে যেতে চাইল প্রধান গুহায়। পিছন থেকে এল ওয়াকারের কমপক্ষে দশটা গুলি। এইমাত্র দরজা পেরিয়ে এসেছে সে।

তিশার চারপাশের দেয়ালে বিঁধল গুলি। ওর ব্রেস্টপ্লেটে লাগল দুটো। একটা গুলি ফুটো করে দিল কাঁধ। ছেঁড়াখোঁড়া অবস্থা ওই ক্ষতের।

ভীষণ ব্যথায় কাতরে উঠল তিশা। ফাটল পেরিয়ে বেরিয়ে এল বড় গুহায়। অন্যহাতে চেপে ধরেছে কাঁধ, দাঁতে দাঁত পিষে দেখল, আঙুল থেকে টপটপ করে পড়ছে রক্ত। কোনও কারণে এত ব্যথা লাগতে পারে, কখনও ভাবতে পারেনি তিশা।

মুখ বিকৃত করে দেখল, কালো বিমানের কাছে এক পাল সিল। ওকে খেয়াল করেছে ওগুলোর একটা, মাথা উঁচু করল। ওটা মর্দা। বিশাল শরীর। নীচের মাড়ি থেকে উপরে উঠেছে দুই ক্ষুরধার শ্বদন্ত। বোধহয় আধ ঘণ্টা আগে বাড়ি ফিরেছে, ভাবল তিশা।

কুকুরের মত ঘেউ-ঘেউ করে উঠল ওটা। তারপর বিশাল শরীর নিয়ে এগুতে শুরু করল। প্রতি পদক্ষেপে থলথল করে উঠছে বিপুল চর্বির পাহাড়।

তিশার কাঁধের ক্ষতটা ভীষণ জ্বলছে।

ফাটলের দিকে মুখ দিয়ে বরফে পিছলে সরতে লাগল তিশা। এক চোখ ফাটলের উপর, অন্য চোখ এলিফ্যান্ট সিলের দিকে।

বরফের মেঝেতে সরু রক্তের চিহ্ন সামনে ফেলে সরছে। ওটাই জানিয়ে দেবে, ও কোথায় আছে।

অস্ত্র বাগিয়ে ফাটলের ভিতর দিয়ে বেরিয়ে এল জনি ওয়াকার।

আশপাশে নেই তিশা।

মেঝের উপর রক্তের দাগ চোখে পড়ল। ডানদিকে গেছে মেয়েটা। ওদিকে মস্ত এক বরফের বোল্ডার। বোধহয় ওপাশেই পাওয়া যাবে ছেমড়িকে।

রক্তের চিহ্নের পিছু নিল ওয়াকার, কয়েক লাফে চলে গেল বরফের বোল্ডারের ওপাশে, একটানা ব্রাশ ফায়ার করল। কিন্তু ওদিকে কেউ নেই।

লেফটেন্যান্ট তিশা গেল কোথায়?

বোল্ডারের পিছনে, মেঝের উপর পড়ে আছে এমপি-৫।

চরকির মত ঘুরল জনি ওয়াকার।

গেল কোথায় হারামজাদী?

বরফের বোল্ডারের ওদিক থেকে জনি ওয়াকারকে বেরিয়ে আসতে দেখল তিশা। একই সময়ে ওর উপর চোখ পড়েছে লোকটারও।

এখন ফাটলের এক পাশে বসে আছে তিশা, দুই হাতে চেপে ধরেছে ক্ষত। ফুরিয়ে যাচ্ছে সমস্ত শক্তি। একটু আগে ফাটলের বামপাশে সরেছে, মেঝেতে রক্ত পড়তে দেয়নি। তখনই ফাটল থেকে বেরিয়ে এসেছে ওয়াকার। তিশা ভেবেছিল, আবারও ঢুকবে ফাটলের ভিতর, কিন্তু দেহে সে শক্তি নেই।

মুচকি হাসল সার্জেন্ট জনি ওয়াকার, ধীরে ধীরে সামনে বাড়ল। তিশার তিন ফুট আগে থামল, প্রধান গুহার দিকে তার পিঠ।

'তোর মা বেশ্যা ছিল, কুকুরের বাচ্চা!' চাপা স্বরে বলল

তিশা।

কাঁধ ঝাঁকাল ওয়াকার।

'ওটা স্পেসশিপ না, তবুও আমাদেরকে মেরে ফেলছিস তুই,' চট্ করে ওয়াকারের পিছন দিক দেখে নিল তিশা।

'বিমানের জন্য নয়, লেফটেন্যান্ট তিশা, সমস্যা হচ্ছে তোমরা জেনে গেছ আইসিজি কী। কাজেই তোমাদেরকে বাঁচতে দেয়া হবে না।'

ওয়াকারের চোখে চাইল তিশা। 'যা করার কর্!'

লোকটা অস্ত্র তাক করল তিশার বুকে, আর ঠিক তখনই রক্ত হিম করা ভয়ঙ্কর এক গর্জন শোনা গেল।

চরকির মত ঘুরল জনি ওয়াকার, হাঁ হয়ে গেছে মুখ। বিকট গর্জন ছাড়তে ছাড়তে একেবারে ঘাড়ের উপর চলে এসেছে প্রকাণ্ড এক মর্দা এলিফ্যান্ট সিল। প্রতি ফ্লিপারক্ষেপে থরথর করে কাঁপছে গোটা বরফ মেঝে।

এই সুযোগে ফাটলের ভিতর দিয়ে আবারও খাটো সুড়ঙ্গে নেমে গেল তিশা। বেকায়দা ভাবে ধুপ্ করে পড়েছে মেঝের উপর।

অস্বাভাবিক গতি তুলে ওয়াকারের কাছে পৌঁছে গেল মর্দা সিল। কালো বিমান থেকে এদিকে আসতে বড়জোর পাঁচ সেকেণ্ড নিয়েছে।

অস্ত্র তুলেই গুলি শুরু করল ওয়াকার।

কিন্তু দানবীয় সিল অনেক কাছে, এখন গুলি করে ওটাকে ঠেকাবার উপায় নেই কারও।

সুড়ঙ্গের ভিতর উঠে দাঁড়িয়েছে তিশা, দেরি না করে উঁকি দিল ফাটল দিয়ে। এক পলক দেখতে পেল জনি ওয়াকারকে।

পরক্ষণে ভোঁতা 'ধ্যাপ' আওয়াজ হলো। বরফ-দেয়ালে আছড়ে পড়েছে লোকটা। বিপুল ওজন নিয়ে তার উপর চেপে

বসেছে মর্দা সিল। নানা দিকে ফিনকি দিয়ে ছুটল রক্ত।

জনি ওয়াকারের পেটের ভিতর থেকে দুই শ্বদন্ত বের করল মর্দা সিল, পড়পড় করে ছিঁড়ে গেল ওয়েটসুট। ধুপ্ করে মেঝের উপর পড়ল লোকটা। গায়ের উপর দাঁড়িয়ে গেল জন্তুটা, বিকট জোরে হুঙ্কার ছাড়ল— যুদ্ধে তার জয় হয়েছে।

করুণ গোঙানি শুনল তিশা।

এখনও মরেনি জনি ওয়াকার।

আবারও গুঙিয়ে উঠল।

চুপ করে চেয়ে রইল তিশা। মাথা নিচু করল বিশাল সিল, ওয়াকারের বুক থেকে বড় এক চাকা মাংস ছিঁড়ে নিল। খুব মজা করে জীবন্ত মানুষ খেতে শুরু করেছে।

ঠিক দশটা বাজতেই রেডিয়ো রুমে ঢুকল রানা। পিছনে এল মেরি ও রাশেদ হাবিব। রেডিয়ো কন্সোলের সামনে বসল রানা, চালু করল মাইক্রোফোন।

'অ্যাটেনশান, ম্যাকমার্ডো। অ্যাটেনশান, ম্যাকমার্ডো। আমি মাসুদ রানা। শুনতে পাচ্ছেন?'

কোনও সাড়া নেই।

আবারও বার্তা পাঠাল রানা।

ওদিক থেকে কোনও জবাব এল না।

তারপর হঠাৎ করেই খড়মড় করে উঠল স্পিকার। বলে উঠল কেউ: 'মাসুদ রানা, কিং আর্থার বলছি। আপনার বক্তব্য শুনতে পেয়েছি। ওদিকের সিচুয়েশন জানান।'

কিং আর্থার?

ভুরু কুঁচকে গেল রানার। কিং আর্থার মানে মেজর রন হিগিন্স, মেরিন ফোর্সের রিকনিসেন্স ইউনিট ফোরের কমাণ্ডিং অফিসার। রবিন এই লোকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল ওর

নুমা অফিসে। হাসি-খুশি মানুষ। একইসঙ্গে দক্ষ সেনানী। খুব আফসোস করেছিল ঘনিষ্ঠ বন্ধু রবিন কার্লটনের মৃত্যু-সংবাদ পেয়ে।

'কিং আর্থার,' সাড়া দিল রানা। 'সিচুয়েশন জানাচ্ছি। টার্গেট অবজেক্ট আমাদের হাতে। রিপিট করছি, টার্গেট অবজেক্ট আমাদের হাতে। অবশ্য, দলের অনেককে হারিয়েছি। ...এবার আপনার বক্তব্য বলুন। ...আপনারা কোথায়?'

'হোভারক্রাফটে। ধরুন, একমাইল দূরে।'

চমকে গেল রানা। মাত্র একমাইল দূরে?

'অবশ্য, পরবর্তী নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত স্টেশনে ঢুকতে মানা করে দিয়েছে। খুবই কড়া নিষেধ।'

উইলকক্স আইস স্টেশনের বাইরে পৌঁছে গেছে মেরিন ফোর্স। চট্ করে একটা কথা মনে পড়ল রানার। চাপা স্বরে জানতে চাইল, 'আপনারা কতক্ষণ ধরে বাইরে?'

'আটত্রিশ মিনিট,' বলল রন হিগিন্স।

আটত্রিশ মিনিট?

ভুরু আরও কুঁচকে গেল রানার। কথাটা বিশ্বাস করতে মন চাইছে না। কিন্তু মিথ্যা বলবার কোনও কারণও নেই রনের।

রেডিয়ো স্পিকার চুপ, কিন্তু হঠাৎ করেই রানার হেলমেট ইন্টারকমে বলে উঠল চিন্তিত কণ্ঠ। ওই গলা রন হিগিন্সের।

'মিস্টার রানা, আমি গোপনে আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

রেডিয়ো বন্ধ করে দিল রানা, কথা বলে উঠল হেলমেট মাইকে। ক্লোজড-সার্কিট মেরিন চ্যানেল ব্যবহার করছে।

'কিং আর্থার, আপনি ওখানে বসে কী করছেন?'

জুলিয়াস বি. গুণ্ডারসনের সঙ্গে লড়াই করেছে ও, তারপর স্টেশন জুড়ে এসএএস কমাণ্ডোদেরকে খুঁজেছে, আর পুরো সময়

জুড়ে স্টেশনের বাইরে বসে থেকেছে মেরিনরা।

'এখানে নাটক চলছে, মিস্টার রানা। মেরিন, গ্রিন ব্যারেট, এমনকী হাজির হয়েছে গোটা একটা আর্মি রেঞ্জার প্লাটুন। শেষের এরা স্টেশনের একমাইলের ভিতর অংশ পাহারা দিচ্ছে। ন্যাশনাল কমাণ্ড আর জয়েন্ট অভ চিফস তাদের সবধরনের ইউনিট পাঠিয়ে দিয়েছে। কারও বাপের সাধ্য নেই স্টেশনে হামলা করবে। কিন্তু এখানে আসার পর আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছে: সিল টিম না আসা পর্যন্ত চুপ করে বসে থাকতে হবে। আমাকে আরও নির্দেশ দিয়েছে: সিল টিম না আসা পর্যন্ত আমার দলের কেউ স্টেশনের দিকে এক পা বাড়ালে, তাকে যেন গুলি করে ফেলে দেয়া হয়।'

চমকে গেছে রানা।

কয়েক সেকেণ্ড কোনও কথা বলতে পারল না।

পরিস্থিতি ভাল ভাবেই বুঝতে শুরু করেছে।

ঠিক এ-ই ঘটেছিল রবিন কার্লটনের ভাগ্যে। পেরুতে। ইনকা মন্দিরে। রবিন আগে পৌঁছে গিয়েছিল ওখানে। কী যেন পেয়েছিল ওই মন্দিরে। তারপর ওদের পিছনে পাঠিয়ে দেয়া হলো সিল টিমকে। আর এখন এই স্টেশনে ঢুকবে আরেকটা সিল টিম। আমেরিকার সেনাবাহিনীর সেরা এবং নিষ্ঠুর একদল লোক তারা।

হঠাৎ করেই রানার মনে পড়ল রবিন কার্লটনের ই-মেইলের এক অংশ।

ইউএসএমসি পার্সোনেল ডিপার্টমেণ্ট রানাকে মৃত ঘোষণা করেছে।

আস্তে করে ঢোক গিলল রানা। সবই বুঝতে পারছে এখন।

ওদেরকে শেষ করে দেয়ার জন্য পাঠানো হচ্ছে সিল টিম।

বাঁচবে না কেউ। ছোট্ট মেরিও নয়!

'কিং আর্থার, মন দিয়ে শুনুন,' নিচু স্বরে বলল রানা। 'আমার ইউনিটের ভিতর নিজেদের লোক রেখেছিল আইসিজি। আমারই

দলের এক মেরিন খুন করে ফেলেছে তার এক আহত সহযোদ্ধাকে। এখন আমাদেরকে মেরে ফেলার জন্য সিল টিম পাঠাচ্ছে। আমাদেরকে সরিয়ে নেয়ার চেষ্টা করুন।'

রানার মেরুদণ্ড বেয়ে বরফ স্রোত নামছে। মনে পড়েছে, পেরুতে ঠিক এভাবেই সাহায্য চেয়েছিল রবিন কার্লটন।

'আমাকে কী করতে বলেন?' জানতে চাইল হিগিন্স।

'ওদের জানান, এখানে কিছুই পাওয়া যায়নি,' বলল রানা। 'কোনও স্পেসশিপ ছিল না বরফের নীচে। এ-ও বলতে পারেন, এই স্টেশনের নীচে রয়ে গেছে এয়ার ফোর্সের ব্ল্যাক প্রজেক্টের পরিত্যক্ত ঘাঁটি।'

'এমন কিছু বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়, মিস্টার রানা। আমি বরফের ভিতর স্পেসশিপ বা এয়ার ফোর্সের ব্ল্যাক প্রজেক্ট সম্পর্কে কিছুই জানি না।'

'ওই স্পেসশিপের জন্যেই পাগল হয়ে উঠেছে এরা। কিং আর্থার, মন দিয়ে শুনুন: বাধ্য হয়ে ফ্রেঞ্চ প্যারাট্রুপারদের সঙ্গে লড়তে হয়েছে আমাকে। তারপর এসেছে এসএএস কমাণ্ডোদের প্লাটুন, তাদের সঙ্গে ছিল মেজর জেনারেল জুলিয়াস বি. গুণ্ডারসন। আমেরিকানরা আমাদের কাছে সাহায্য চেয়ে এখন উল্টো খুন করতে চাইছে।'

'একমিনিট, মিস্টার রানা।'

ওদিকে নীরবতা ছাড়া কিছুই নেই।

একমিনিট পর রন হিগিন্স বলল, 'মিস্টার রানা, এইমাত্র আর্মি রেঞ্জার কর্নেলের সঙ্গে কথা বললাম। লোকটার নাম ন্যাট লেদারউড। আমাকে বলেছে, দরকার পড়লে আমার দলের সবাইকে খুন করবে তার প্লাটুন। সিল টিম স্টেশনে ঢোকার আগে ওদিকে এক পা বাড়ালে মরতে হবে আমাদেরকে।'

পকেট থেকে রবিন কার্লটনের ই-মেইলের কপি বের করল

রানা, ওটাতে আইসিজি বার্তা-বাহকদের নাম আছে।

শেষের দিকের একটা লাইনের উপর স্থির হলো রানার চোখ:

ন্যাট লেদারউড আর্মি রেঞ্জার্স। কর্নেল। ?

হারামজাদা শুয়োরের বাচ্চা, মনে মনে বলল রানা। ওই একই লোক হাজির হয়েছিল পেরুতে। ন্যাট লেদারউড। আইসিজি।

রন হিগিন্স বলে উঠল, 'শুনুন, মিস্টার রানা। আমি হয়তো স্টেশনে ঢুকতে পারব না, কিন্তু অন্য একটা কথা জানাতে পারি। আধ ঘণ্টা আগে শুনেছি। উপকূল থেকে তিন শ' নটিক্যাল মাইল দূর-সাগরে আছে একটা নুমার জাহাজ। আধঘণ্টা আগে ওখান থেকে যোগাযোগ করে আমার এক বন্ধু। তখন পাশেই ছিল মেরিনদের একটা জাহাজ। ওখান থেকে আকাশে ওঠে চারটে মেরিন হ্যারিয়ার, আড়াই শ' নটিক্যাল মাইল দূরের এক ব্রিটিশ ভিসি-১০ ট্যাঙ্কার বিমানকে ফেলে দেয়। ওটা পালাবার চেষ্টা করেছিল।'

চুপ করে আছে রানা।

ব্রিটিশ ট্যাঙ্কার বিমান এসেছে অ্যাটাক প্লেনের জন্য ফিউয়েল দিতে। রানা ভাবছে, তাতে আমার কী? পরক্ষণে ভাবল, ওদিকে আরেকটা ব্রিটিশ বিমান থাকতে পারে। ওটাও হয়তো অ্যাটাক প্লেন। কোনও বম্বার বা ফাইটার। তেল নিয়েছে ট্যাঙ্কার থেকে। হয়তো ওই বিমানের পাইলট...

সর্বনাশ! চমকে গেল রানা। ওই বিমান আসলে গুণ্ডারসনের ইরেজার!

সাবমেরিন ছিল ফ্রেঞ্চদের ইরেজার, ঠিক সেভাবেই ব্রিটিশ ফাইটারকে বলে দেয়া হয়েছে: নির্দিষ্ট সময়ে জুলিয়াস বি. গুণ্ডারসন যোগাযোগ না করলে উড়িয়ে দেবে উইলকক্স আইস

স্টেশন।

'এয়ার ফোর্সকে ডেকে নেয়া হয়েছে,' বলল রন হিগিন্স। 'অ্যাওয়্যাক্স বিমান ও এফ-২২ ফাইটার সাগরের উপর চোখ রাখছে। বলা হয়েছে, সাগরের উপর আকাশে কোনও ব্রিটিশ ফাইটার থাকলে ওটাকে যে-কোনও মূল্যে ফেলে দিতে হবে।'

সিটে পিঠ ঠেকাল রানা, কুঁচকে গেছে দুই ভুরু। এক হাতে টিপে ধরল কপাল।

চারপাশ থেকে ঘিরে ফেলা হচ্ছে ওদেরকে।

ফাঁদে পড়ে গেছে ওরা। এই ফাঁদ থেকে বেরুবার কোনও উপায় ওর জানা নেই। শীঘ্রি সিল ফোর্স পৌঁছবে। তাদের প্রথম কাজই হবে ওদেরকে খুন করে ফেলা। ওরা যদি কোনও ভাবে তাদেরকে ফাঁকি দেয়, তাতেই বা কী? উইলকক্স আইস স্টেশনে এসে পড়বে ব্রিটিশ ফাইটার বিমানের এয়ার-টু-গ্রাউণ্ড মিসাইল, ছাতু হবে সবাই।

অবশ্য একটা পথ এখনও খোলা, ভাবল রানা।

ওরা স্টেশন থেকে বেরিয়ে যেতে পারে, সিল টিম আসবার আগেই আত্মসমর্পণ করতে পারে কিং আর্থার ওরফে রন হিগিন্সের কাছে। এ কাজ করলে চট্ করে ওদেরকে খুন করবে না অন্যরা। আজ সারাদিন ধরে আবারও শিক্ষা নিয়েছে, আগে বাঁচতে হবে, পরে হয়তো কোনও সুবিধা পাওয়া যাবে।

হেলমেট মাইক চালু করল রানা, 'কিং আর্থার, শুনুন...'

'আয়হায়, মিস্টার রানা... শালারা পৌঁছে গেছে।'

'কারা?'

'সিল টিম। পৌঁছে গেছে। বাইরের পেরিমিটার পেরুতে শুরু করেছে। চারটে হোভারক্রাফট। স্টেশন কমপ্লেক্সে চলেছে।'

উইলকক্স আইস স্টেশন থেকে একমাইল দূরে, দীর্ঘ লাইন তৈরি

করে ছুটছে চারটে হোভারক্রাফট। স্টেশনের আধ মাইল দূরে একটু ছড়িয়ে গেল চার যান, যেন ঘিরে ফেলবে গোটা স্টেশনকে।

স্টেশন লক্ষ্য করে স্বাভাবিক গতি তুলে চলেছে নেভি ব্লু রঙের চার হোভারক্রাফট। মাত্র কয়েক মিনিট পর স্টেশন কমপ্লেক্সের বাইরের দালানগুলো পাশ কাটাল। তাড়াহুড়ো দেখা গেল না এসব হোভারক্রাফটে।

এসব সিল টিমের।

সামনের হোভারক্রাফটের ভিতর সিল কমাণ্ডার রেডিয়োতে বলল, 'এয়ার কণ্ট্রোল, সিল টিম বলছি, আপনাদের রিপোর্ট দিন। কী করতে হবে জানানো হয়েছে। কিন্তু এখনই স্টেশনে ঢুকছি না আমরা। আগে নিশ্চিত করুন ওখানে অন্য কোনও বিপদ হবে না।'

'এয়ার কণ্ট্রোল থেকে বলছি, সিল টিম,' রেডিয়োতে বলল ভারী গলার একজন। 'স্ট্যাণ্ড বাই থাকুন। যে-কোনও সময়ে আমাদের বিমান থেকে রিপোর্ট পাবেন।'

একই সময়ে উইলকক্স আইস স্টেশন থেকে দুই শ' বেয়াল্লিশ নটিক্যাল মাইল দূরে ছয়টা এফ-২২ ইউএসএএফ ফাইটার উড়ছে দক্ষিণ সাগরের আকাশে।

এফ-২২কে বলা হয় বর্তমানের দুনিয়া-সেরা ফাইটার, ওই বিমান এফ-১৫ ঈগলের রাজার মুকুট কেড়ে নিয়েছে। এফ-২২ দেখতে প্রায় এফ-১৫-র মতই, কিন্তু অন্য বিমানের যা নেই, তা আছে ওটার— রেইডার বা অন্য ডিটেকশন প্রযুক্তিকে হাসতে হাসতে পিছনে ফেলে, গোপনে যে-কোনও জায়গায় হাজির হতে পারে।

এফ-২২-র স্কোয়াড্রন লিডার হেলমেট রেডিয়োতে বক্তব্য শুনছে। ওদিকের লোকটার কথা শেষ হতেই স্কোয়াড্রন লিডার বলল, 'ধন্যবাদ, বিগবার্ড। বুঝতে পেরেছি।'

কম্পিউটারাইযড্ ডিসপ্লে স্ক্রিনে খুদে একটা ফোঁটা দেখছে সে। ওটা পশ্চিমে চলেছে। স্ক্রিনের পাশে ফুটে উঠেছে রিডআউট:

টার্গেট পেয়েছি: ১০৩ এনএম ডাব্লিউএনডাব্লিউ

এয়ারক্রাফট ডেজিগনেটেড: ই-২০০০.

অর্থাৎ একটা ই-২০০০ যুদ্ধ-বিমান। বুঝতে দেরি হয়নি স্কোয়াড্রন লিডারের, ওই বিমান ইউরো-ফাইটার ২০০০। দুই ইঞ্জিনের হাই-ম্যানিউভারেবল পকেট ফাইটার। ব্রিটিশ, জার্মান, স্প্যানিশ ও ইতালিয়ান এয়ারফোর্স মিলে তৈরি করেছে।

স্কোয়াড্রন লিডারের স্ক্রিনে যে ফোঁটা, ওটা অলস ভাবে উড়ছে। ওটার পাইলট জানে না স্টেলথ আমেরিকান ফাইটার মাত্র এক শ' মাইল পিছনে।

'ঠিক আছে, বাছারা, আমাদের টার্গেট পাওয়া গেছে,' জানাল এফ-২২-র ক্যাপ্টেন। 'আবারও রিপিট করছি, টার্গেট পাওয়া গেছে। এবার চলো গিয়ে উড়িয়ে দিই ওটাকে।'

•

উইলকক্স আইস স্টেশনে ভীষণ চিন্তিত হয়ে পড়েছে রানা। সিল টিমের কাছে আত্মসমর্পণ অসম্ভব। তাদের বেশিরভাগ লোক আইসিজি। ওদেরকে দেখামাত্র মেরে ফেলবে। এমনকী ছোট্ট মেয়েটিও মাফ পাবে না।

রানা একবার ভেবেছিল, নেমে পড়বে পাতাল-গুহায়। যদি দরকার পড়ে, কালো ওই বিমানকে মুক্তিপণের মত ব্যবহার করবে। কিন্তু পরক্ষণে মনে পড়েছে, পাতাল-গুহায় তো নামতেই পারবে না। ওদের সঙ্গে ডাইভিং বেল নেই। ওটা ধ্বংস হয়ে গেছে।

মেরি ও রাশেদ হাবিবকে প্রায় তাড়িয়ে নিয়ে এ-ডেকের রেডিয়ো রুম থেকে বেরিয়ে এল রানা। সবাইকে নিয়ে নীচের ডেকের দিকে নামতে শুরু করেছে।

‘বাইরে কী ঘটছে, মেজর রানা?’ জানতে চাইল হাবিব।

‘আমাদেরকে মেরে ফেলার ব্যবস্থা চলছে,’ বলল রানা। মেশিনের মত কাজ করছে ওর মগজ। এখন বাঁচবার একমাত্র উপায় কোথাও লুকিয়ে পড়া। সিল টিম চলে যাওয়ার পর বেরুতে হবে গোপন জায়গা থেকে।

তারপর কী করব? নিজের কাছে প্রশ্ন করল রানা। *হেঁটে বাড়ি ফিরব?*

যদি বাঁচতে পারো, পরে কোন সুযোগ বেরিয়ে যাবে।

রাং-ল্যাডার বেয়ে নীচে নামছে রানা, ওর চোখ গিয়ে পড়ল ই-ডেকের পুলে।

ওখানে একটা অদ্ভুত দৃশ্য।

ডেকের উপর আরাম করে ঘুমাচ্ছে মেরির সিল লিলি।

লিলি... ভাবছে রানা।

লিলির ব্যাপারে কী যেন মনে পড়তে চাইছে ওর।

হেলমেট মাইকে বলে উঠল এফ-২২ স্কোয়াড্রন লিডার, ‘বিগবার্ড, গোল্ডেন লিডার বলছি। স্টেলথ মোড ব্যবহার করছি। আন্দাজ বিশ মিনিট পর টার্গেট নাগালে পাবে আমাদের মিসাইল।’

হঠাৎ করে একটা চিন্তা ঢুকেছে রানার মগজে।

ঝট্ করে মেরির দিকে ফিরল ও। ‘মেরি, লিলি কতক্ষণ শ্বাস আটকে রাখতে পারে?’

কাঁধ ঝাঁকাল মেরি। ‘পুরুষ ফার সিল প্রায় এক ঘণ্টা। কিন্তু লিলি ছোট, তা ছাড়া মেয়ে, ও পারে বড়জোর চল্লিশ মিনিট।’

‘চল্লিশ মিনিট...’ হিসাব কষতে শুরু করেছে রানা।

‘কী ভাবছেন?’ জানতে চাইল হাবিব।

‘স্টেশন থেকে পাতাল-গুহায় পৌঁছুতে লাগে কমবেশি দুই

ঘণ্টা,’ বলল রানা। ‘ডাইভিং বেল দিয়ে তিন হাজার ফুট নামতে একঘণ্টা, আরেক ঘণ্টা বরফের সুড়ঙ্গ দিয়ে উঠে যেতে।’

‘হ্যাঁ, তো...’ পুরো কথা শেষ করতে পারল না হাবিব।

তার দিকে চেয়ে আছে রানা। ‘তিশারা গুহার দিকে উঠবার সময় অদ্ভুত একটা কথা বলেছে। ওদের সঙ্গে দেখা করেছে এক অতিথি। সে লিলি। তিশা জানায়, ওদের সঙ্গে পাতাল-গুহা পর্যন্ত গেছে লিলি।’

‘হ্যাঁ। তো?’

‘এখন, লিলি যদি দ্বিগুণ গতি তুলেও ওখানে হাজির হয়, তিন হাজার ফুট নীচে নেমে আবারও বরফ-সুড়ঙ্গ বেয়ে উঠতে অনেক সময় লাগার কথা। ...অত দম পেল কোথা থেকে?’

চুপ করে আছে রাশেদ হাবিব।

পুলের দিকে চাইল রানা। ‘চল্লিশ মিনিট পর দম আটকে লিলির মরার কথা, তা হয়নি। ও জানত মাঝ পথে বাতাস নিতে পারবে।’

একবার রাশেদ হাবিব আরেকবার মেরির দিকে চাইল রানা।

‘অন্য কোনও পথে ওই বরফ-সুড়ঙ্গে পৌঁছে যাওয়া যায়। সেটা কোনও শর্টকাট পথ!’

উনিশ

‘সিল টিম, আমি গোল্ডেন লিডার। টার্গেটের কাছে পৌঁছে গেছি আমরা। আর পনেরো মিনিট পর মিসাইলের আওতায় আসবে

টার্গেটি।'

সিল টিমের হোভারক্রাফটের ভিতর মিলিয়ে গেল কথাগুলো। কেবিনের ভিতর আড়ষ্ট হয়ে বসে আছে সিল দলের সদস্যরা। কারও চোখে-মুখে বিন্দুমাত্র মায়া বা অনুভূতির ছাপ নেই।

ই-ডেকে দুই সঙ্গীকে লো-অডিবিলিটি বেদিং ট্যাঙ্ক দিয়েছে রানা। এরই ভিতর একটা থারমাল-ইলেকট্রিক ওয়েটসুট পরে ফেলেছে মেরি। ওটা এতই বড়, কবজি ও গোড়ালি গুটিয়ে নিতে হয়েছে, নইলে নড়তেই পারবে না। রাশেদ হাবিব আগে থেকেই নিয়োপ্রেন বডিসুট পরনে, ওয়েটসুট পরবার ঝামেলায় না গিয়ে সরাসরি লাবা গিয়ার পরতে শুরু করেছে।

'এবার এগুলো গিলে ফেলুন,' মেরি ও হাবিবের দিকে একটা করে নীল ক্যাপসুল বাড়িয়ে দিল রানা। ওগুলো এন-৬৭ডি অ্যান্টি-নাইট্রোজেন ক্যাপসুল। এই একই জিনিস তিশাদের দিয়েছে। অন্য দু'জনের মত নিজেও একটা ক্যাপসুল পেটে চালান দিল রানা।

কমব্যাট ফেটিগ খুলে ফেলেছে ও, বডি আর্মার ও গানবেল্ট পরে নিল ওয়েটসুটের উপর। ফেটিগের পকেট হাতড়াতে গিয়ে বেরুল বেশ কিছু জিনিস। সেগুলোর ভিতর জরুরি জিনিস বলতে নাইট্রোজেন চার্জ ও নিনা ভিসারের রুপালি লকেট ও চেইন। এগুলো ওয়েটসুটের পকেটে রাখল রানা। দেরি না করে পিঠে ঝুলিয়ে নিল স্কুবা ট্যাঙ্ক।

তিনজনের জন্য তিনটি ট্যাঙ্ক। ভিতরে চার ঘণ্টা চলবার মত স্যাচিউরেটেড হিলিয়াম-অক্সিজেন মিক্স। ৯৮% হিলিয়াম, ২% অক্সিজেন। পাতাল-গুহায় নেমে যাওয়ার আগে বাড়তি চারটে ট্যাঙ্ক ভরে দিয়ে গিয়েছিল তিশা।

লাবা গিয়ার পরে নিল রানা, রাশেদ হাবিব সাহায্য করল

মেরিকে।

সবার আগে পিঠে ট্যাঙ্ক ঝুলিয়ে নিতে পারল রানা, ডেকের উপর চোখ বোলাতে লাগল। ভারী কিছু দরকার। এমন কিছু, যেটা ওদেরকে দ্রুত নীচে নেবে।

যা খুঁজছে, তা পেতে দেরি হলো না।

জ্বলন্ত বি-ডেক থেকে খসে পড়বার সময় ক্যাটওয়াকের বড় এক অংশ এসে পড়েছিল ই-ডেকে, ওটা দৈর্ঘ্যে হবে দশ ফুট। নিরেট ইস্পাতের তৈরি। এখনও সঙ্গে রয়ে গেছে হ্যাণ্ডরেইল।

রাশেদ হাবিব তৈরি হয়ে যেতেই তাকে ডাকল রানা, দু'জন মিলে ক্যাটওয়াকের অংশ নিয়ে এল পুলের পাশে। টেনে নিয়ে যাওয়ার সময় ধাতব ডেকে বিশ্রী আওয়াজ হলো। দুই হাতে দুই কান চেপে রাখল মেরি।

আচমকা ঘুম ভেঙে গেছে লিলির, লাফ দিয়ে উঠে রানার পাশে চলে এল; মনে হলো পোষা কুকুর, মালিকের সঙ্গে হাঁটতে যাওয়ার জন্যে ব্যস্ত।

'লিলি আমাদের সঙ্গে আসবে?' জানতে চাইল মেরি।

'আশা করি, আসবে,' বলল রানা। 'আমাদেরকে দেখিয়ে দেবে কোন্ পথে যেতে হবে।'

কথাটা শুনে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল মেরি, দ্রুত চলে গেল পুলের একদিকের দেয়ালের কাছে, ওখান থেকে নিয়ে এল হার্নেস ও হুক। দেরি না করে লিলির পেটের মাঝে হার্নেস আটকে দিল।

'ওটা কী?' অন্য কাজের ফাঁকে বলল রানা।

'ভাববেন না,' বলল মেরি।

'তুমি কিন্তু খুব কাছে থাকবে,' বলল রানা। হাবিব এবং ও এসে দাঁড়িয়েছে পুলের ধারে, সামনে রেখেছে ক্যাটওয়াকের অংশ। মেরি পাশে এসে রেইলিং ধরবার পর রানা বলল, 'এবার পানিতে ক্যাটওয়াক ফেলব আমরা। রেইলিং ধরে থাকবে।'

ওদের ভঙ্গি এমন, অলিম্পিকের তিন সাঁতারু একইসঙ্গে সুইমিং পুলের শেষমাথায় পৌঁছে গেছে। একবার মেরির কাঁধে হাত রাখল রানা, তারপর যখন বুঝল মেয়েটি পুরোপুরি প্রস্তুত, দুই হাতের তালু দিয়ে ঠেলতে লাগল ক্যাটওয়াকের অংশ।

'হেইহা-হেইয়ো!' চিকন স্বরে হুঙ্কার ছাড়ল রাশেদ হাবিব।

তিন সেকেণ্ড পর পানিতে ঝপাস্ করে নামল ক্যাটওয়াকের টুকরো। ওটার সঙ্গে একইসময়ে নেমে পড়েছে তিন সাঁতারু।

ক্যাটওয়াকের হ্যাণ্ডরেইল শক্ত করে ধরে রাখল ওরা।

বেশ গতি তুলে পানির ভিতর নেমে চলেছে ক্যাটওয়াক। ওরা তিনজন তীরের মত নীচের দিকে নামছে। পা আকাশের দিকে। ওদের পিছনে অনায়াসে আসছে লিলি।

রানা ওর ফ্লাশলাইট জ্বেলে নিল। একবার কবজির সঙ্গে বাঁধা ডেপথ গজ দেখল।

দশ ফুট।

বিশ ফুট।

তিরিশ ফুট।

দ্রুত নেমে চলেছে ওরা। চারপাশ যেন সাদা কোনও দুনিয়া।

নামবার সময় বামদিকের সাদা বরফের দেয়ালে চোখ রেখেছে রানা। একটা গর্ত খুঁজছে ও। ওটা হতে পারে শর্টকাটের প্রবেশপথ। ওদিক দিয়েই পৌঁছে যাওয়া যায় বরফ-সুড়ঙ্গে।

দেখতে না দেখতে এক শ' ফুট নীচে পৌঁছে গেল ওরা। ওই পিল না খেলে এতক্ষণে ওদের রক্তে প্রচুর নাইট্রোজেন জমে যেত, তার মানেই করুণ ভাবে মরতে হতো।

দুই শ' ফুট পেরুল ওরা।

তারপর তিন শ' ফুট।

নীচের দিকে মুখ রেখে নেমে চলেছে ওরা। ক্রমেই আঁধার হয়ে আসছে চারপাশ। বেশি দূরে চোখ চলছে না।

চার শ' ফুট।

পাঁচ শ' ফুট।

এত দ্রুত নেমে চলেছে, নিজেরা বিশ্বাস করতে পারছে না।

ছয় শ' ফুট। সাত শ' ফুট।

আট শ...

হঠাৎ ওটা দেখতে পেল রানা।

'হ্যাণ্ড রেইলিং ছেড়ে দিন!' নির্দেশ দিল। থাবা দিয়ে রাশেদ হাবিব ও মেরির হাত সরিয়ে দিল রেইলিং থেকে।

অন্য দু'জন শুনতে পেয়েছে কথা, সরিয়ে নিয়েছে হাত। সবার নীচ থেকে বিদায় নিল ক্যাটওয়াক। দেখতে না দেখতে হারিয়ে গেল অনেক নীচের সাগরে। আর দেখা গেল না ওটাকে।

সাঁতরে বরফ-দেয়ালের পাশে চলে গেছে রানা।

ওখানে বড় একটা গোল গর্ত। মনে হলো কোনও ধরনের সুড়ঙ্গ, নেমে গেছে অনেক নীচের অন্ধকারে।

রানার পাশে চলে এসেছে লিলি, চট্ করে ঢুকে পড়ল সুড়ঙ্গের ভিতর, অবশ্য কয়েক সেকেণ্ড পর আবারও উঁকি দিল।

দ্বিধায় পড়ে গেল রানা।

রাশেদ হাবিব বোধহয় ওর চোখে দ্বিধা দেখেছে, ইন্টারকমে বলল, 'ওদিকে যাওয়া ছাড়া কোনও উপায় আছে আমাদের?'

'না, নেই,' বলল রানা। সুড়ঙ্গের ভিতরে আলো ফেলল। পরক্ষণে ঢুকে পড়ল ভিতরে।

এঁকেবেঁকে গেছে সরু সুড়ঙ্গ। কোথাও কোথাও খাড়া ভাবে নীচে নেমেছে। সবার আগে চলেছে রানা। ওর পিছনে মেরি ও শেষে রাশেদ হাবিব।

ওয়েট বেল্টের লিড ব্যবহার করে নীচে নামছে বলে কোনও সমস্যা হচ্ছে না ওদের। প্রায় নিঃশব্দে চলেছে।

কিছুক্ষণ পর আরও সতর্ক হয়ে উঠল রানা। চট্ করে ওকে পাশ কাটিয়ে গেছে লিলি। কয়েক সেকেণ্ড পর আর দেখাই গেল না।

ডেপথ গজ দেখে নিল রানা।

পুরো এক হাজার ফুট নেমে এসেছে ওরা।

ডাইভ টাইম এগারো মিনিট।

'বিগবার্ড, গোল্ডেন লিডার বলছি। টার্গেট চলে এসেছে মিসাইলের আওতার ভিতর। আবারও রিপিট করছি: টার্গেট এখন রেঞ্জের ভিতর। এবার অ্যাম্রাম মিসাইল ছুঁড়ব।'

'আপনারা তৈরি হলে মিসাইল ছুঁড়তে পারেন, গোল্ডেন লিডার।'

'ঠিক আছে, বিগবার্ড। ...শোনো তোমরা, মিসাইল লক করেছি। মিসাইল বে খোলা হয়েছে। টার্গেট বোধহয় জানে না আমরা হাজির হয়েছি। ঠিক আছে, গোল্ডেন লিডার বলছি, প্রথম মিসাইল ছুঁড়ছি!'

স্কোয়াড্রন লিডার জয়স্টিকের ট্রিগারে চাপ দিল।

'ফায়ার!'

প্রায় একই মুহূর্তে দীর্ঘ পিছলা চেহারার এক এমআইএম-১২০ অ্যাম্রাম মিসাইল বেরিয়ে এল মিসাইল বে থেকে। এফ-২২ বিমান থেকে বহু দূরে চলে গেল দেখতে না দেখতে।

হঠাৎ স্কোপে মিসাইল দেখল ব্রিটিশ ফাইটার পাইলট।

স্টেলথ এয়ারক্রাফটের বড় সমস্যা হচ্ছে, ওই বিমান রেইডার থেকে অদৃশ্য থাকলেও ওটার ডানা থেকে যে মিসাইল ছুঁড়ে দেয়া হয়, তা পরিষ্কার দেখা যায়। কাজেই এফ-২২, এফ-১১৭এ স্টেথল ফাইটার বা বি-২এ স্টেলথ বম্বার পেটের ভিতর রাখে

মিসাইল।

কিন্তু একবার মিসাইল ছুঁড়ে দিলে তা পরিষ্কার দেখা যায় রেইডারে। কাজেই এফ-২২ ফাইটার অ্যাম্রাম মিসাইল ছুঁড়ে দেয়ার পর মুহূর্তেই তার স্কোপে ই-২০০০ ফাইটার পরিষ্কার দেখতে পেয়েছে সবই।

ব্রিটিশ পাইলট বুঝে গেছে, আর বড়জোর একমিনিট; তারপর মরতে হবে তাকে। সেজন্য ভয় নেই তার মনে, গলা উঁচু করে বলে উঠল, 'মেজর জেনারেল গুণ্ডারসন! মেজর জেনারেল গুণ্ডারসন! রিপোর্ট দিন!'

ওদিক থেকে কেউ সাড়া দিল না।

এমন হওয়ার কথা নয়। গুণ্ডারসন ভাল করেই জানেন, রাত দশটা থেকে দশটা পঁচিশ মিনিটের ভিতর যোগাযোগ করতে হবে। এই পঁচিশ মিনিট সময়ে সোলার ফ্লেয়ার কেটে যাবে, তারপর আবারও রেডিয়ো যোগাযোগ বন্ধ হবে। সাড়ে সাতটার সময় রিপোর্ট দিয়েছেন গুণ্ডারসন। তাতে কোনও ভুল ছিল না। এখন কী হলো?

সেকেণ্ডারি ফ্রিকোয়েন্সিতে যোগাযোগ করতে চাইল ব্রিটিশ পাইলট। ওদিক থেকে কোনও সাড়া নেই। সে সার্জেন্ট বোউলসের সঙ্গে কথা বলতে চাইল। না, তারও কোনও জবাব নেই।

'মেজর জেনারেল গুণ্ডারসন! অন্ধ ফকির বলছি। আমার ওপর হামলা করা হয়েছে! আবারও বলছি, আমার ওপর হামলা হয়েছে! পরের তিরিশ সেকেণ্ডের ভিতর জবাব না দিলে ধরে নেব আপনি মৃত, সেক্ষেত্রে নির্দেশ পালন করব। অর্থাৎ, ওই স্টেশনের দিকে উড়াল পাখি ফায়ার করব।'

মিসাইল লাইটের দিকে চাইল ব্রিটিশ পাইলট। টিপটিপ করছে ওটা। এরই ভিতর এজিএম-৮৮/এইচএলএন ক্রুজ

মিসাইলের কো-অর্ডিনেটস তুলে দিয়েছে সে গাইডেন্স কমপিউটারে, ওটা মিসাইল ফেলবে উইলকক্স আইস স্টেশনের উপর।

মিসাইলের ডেজিগনেটার লেটারে পরিষ্কার দেখা গেল সব।

'এজিএম' মানে এয়ার-টু-গ্রাউণ্ড মিসাইল। ওই মিসাইলের 'এইচ' অর্থাৎ হাই স্পিড, 'এল' লেখা হয়েছে লং রেঞ্জের জন্য, অবশ্য সম্পূর্ণ অন্য অর্থ 'এন'এর।

ওটা দিয়ে বোঝানো হয়েছে ওই মিসাইল নিউক্লিয়ার।

তিরিশ সেকেণ্ড পেরিয়ে গেল। এখনও গুণ্ডারসনের সাড়া নেই।

'মেজর জেনারেল গুণ্ডারসন! অন্ধ ফকির বলছি! লঞ্চ করছি ইরেজার... এখন!' এক সেকেণ্ড পর ট্রিগার টিপে দিল ব্রিটিশ পাইলট। ডানা থেকে ছিটকে সামনে বাড়ল ক্রুজ মিসাইল।

রওনা হয়ে গেছে ওটা। দু' সেকেণ্ড পেরুল না, ব্রিটিশ পাইলট হাত বাড়াল ইজেকশন লিভারের দিকে— কিন্তু ততক্ষণে পৌঁছে গেছে আমেরিকান অ্যাম্রাম মিসাইল, ছুটে এসে গাঁথল ই-২০০০ ফাইটারের পিছনে, আকাশে নানা দিকে ছিটকে গেল জ্বলন্ত জঞ্জাল।

রাতের দিগন্তে উজ্জ্বল কমলা বিস্ফোরণ দেখছে আমেরিকান পাইলট, পরক্ষণে দেখল তার স্কোপে কোনও টিপটিপ করা বিন্দু নেই।

দলের কয়েকজন হৈ-হৈ করে ফুর্তির সুর তুলেছে।

দূর-দিগন্তে কমলা আগুনের গোলক একবার দেখে নিল তাদের নেতা। 'সিল টিম, আমি গোল্ডেন লিডার। শত্রু মারা পড়েছে। রিপিট করছি, শত্রুকে শেষ করে দেয়া হয়েছে। এবার নিশ্চিন্তে স্টেশনে ঢুকতে পারেন।'

সিল হোভারক্রাফটের ভিতর, তাদের স্কোয়াড্রন লিডারের কথা বিস্ফোরিত হয়েছে স্পিকারেঃ 'শত্রু মারা পড়েছে। রিপিট করছি, শত্রুকে শেষ করে দেয়া হয়েছে। এবার নিশ্চিন্তে স্টেশনে ঢুকতে পারেন।'

সিল কমাণ্ডার বলে উঠল, 'ধন্যবাদ, গোল্ডেন লিডার। অল ইউনিট্স্, সতর্ক থাকবে। হেলমেট মাইক ও মাইক্রোফোন ক্লোজড-সার্কিট চ্যানেলে নাও। এবার শুরু হচ্ছে স্টেশনের উপর অ্যাসল্ট।'

রেডিয়ো বন্ধ করে দিল সে, ঘুরে দেখল নিজ লোকদের। 'ঠিক আছে, এবার চলো কোন্ শালার মাকে...'

দক্ষিণ সাগর। এফ-২২ স্কোয়াড্রন লিডার এখনও তার ক্যানোপির ভিতর দিয়ে ব্রিটিশ ই-২০০০ বিমানের ধ্বংস-স্তূপ দেখছে। কমলা আগুন ধীরে ধীরে নামছে পৃথিবীর দিকে, যেন সস্তা তারাবাজি জ্বলছে।

ওদিকে খুশি মনে চেয়ে আছে স্কোয়াড্রন লিডার, তার জানা নেই রেইডার স্ক্রিনে খুব ছোট একটা ফোঁটা— দক্ষিণে চলেছে ওটা অ্যাণ্টার্কটিকার উদ্দেশে। তিরিশ সেকেণ্ড পর ওটা খেয়াল করল সে।

'আরেশ্শালা, ওটা কী?' বলল সে।

আরেকজন বলে উঠল, 'হায় যিশু! ওই প্লেন পড়ার আগে একটা মিসাইল ছুঁড়েছে!'

আবারও সিল টিমের সঙ্গে যোগাযোগ করতে চাইল স্কোয়াড্রন লিডার, কিন্তু ওদিক থেকে কেউ সাড়া দিল না। অ্যাণ্টার্কটিকার ওরা উইলকক্স আইস স্টেশনে লড়াইয়ের জন্য নিজেরদের ভিতর চালু করেছে ক্লোজ্ড্-সার্কিট চ্যানেল।

এর আধ মিনিট পর উইলকক্স আইস স্টেশনের প্রধান দরজা বিস্ফোরিত হলো, ভিতরের দিকে ছিটকে পড়ল সেটা। দুই সেকেণ্ড পর ঝড়ের গতিতে টানেলে ঢুকল সিল টিম। সামনের দিকে ছুটে গেল অজস্র গুলি।

এটা টেক্সবুক-পারফেক্ট এণ্ট্রি। কিন্তু সমস্যা: স্টেশনে জীবিত কেউ নেই!

বিশ

একবার চট্ করে ডেপ্থ্ গজ দেখে নিল রানা।

পনেরো শ' বিশ ফুট।

দলের অন্য দু'জনকে নিয়ে নেমে চলেছে ও। কয়েক মিনিট পর হঠাৎ করেই সরু এক শর্টকাট টানেল দেখল। ওদিক দিয়ে কিছু দূর যাওয়ার পর চওড়া হলো বরফের মাঝের পথ।

আগে কখনও এদিকে আসেনি রানা, কিন্তু বুঝতে দেরি হলো না কোথায় চলে এসেছে।

পানির নীচের ওই টানেলে, ওদিকের দেয়ালে একের পর এক গোলাকার মস্ত গর্ত। ব্যাসে হবে কমপক্ষে দশ ফুট। ওগুলোর কথা আগেই বলেছে নিনা ভিসার। পরে গুহার দিকে উঠবার সময় তিশাও জানিয়েছে। ওগুলো এলিফ্যাণ্ট সিলের গুহা। সবাইকে নিয়ে পাতাল বরফ-সুড়ঙ্গে পৌঁছে গেছে রানা। এখন উপরে উঠলে পাওয়া যাবে কালো বিমানের গুহা।

ঠিক জায়গায় এসেছে, স্বস্তির শ্বাস ফেলল রানা।

বরফ-টানেলে ঢুকে পড়েছে ওরা, এবার উপরে উঠতে শুরু করল। বরফ-দেয়ালের গর্তগুলো পাশ কাটিয়ে যাওয়ার সময় শিরশির করে উঠছে ওদের মেরুদণ্ড।

অস্বস্তি নিয়ে সাঁতরে চলেছে ওরা। অবশ্য, রানা মোটামুটি ভাবে নিশ্চিত, এখন ওদের উপর হামলা করবে না এলিফ্যান্ট সিল। মনে মনে একটা ব্যাখ্যা দাঁড় করিয়েছে ও। একমাত্র তিশার দলের উপর হামলা করেনি ওই দানবীয় সিল। এর একমাত্র কারণ হতে পারে লাবা ট্যাঙ্ক। ওই লো-অডিবিলিটি ব্রিদিং গিয়ার প্রায় কোনও আওয়াজই করে না। উইলকক্স আইস স্টেশনের বিজ্ঞানী বা ব্রিটিশ কমাণ্ডোরা ওই জিনিস ব্যবহার করেনি। কাজেই তাদের উপর হামলা হয়েছে। রানার মনে হয়েছে, এলিফ্যান্ট সিলগুলো আসলে তিশা এবং ওর দলের কারও আওয়াজ পায়নি। সুতরাং হামলাও করতে পারেনি।

কিছুক্ষণ পর উপরে সারফেস দেখতে পেল রানা। মন থেকে এলিফ্যান্ট সিলের কথা মুছে ফেলল, আরেকবার দেখে নিল ডেপথ গজ: ১৪৯০ ফুট।

হাত-ঘড়ি দেখল। এখানে আসতে ওদের লেগেছে মাত্র আঠারো মিনিট। আগে বোধহয় কেউ এত দ্রুত দেড় হাজার ফুট নীচে নামেনি।

পানির ভিতর হঠাৎ করেই শুরু হলো একটা নিচু শিস।

ভাল করেই শুনতে পেয়েছে রানা, আড়ষ্ট হয়ে গেল। ধক্ করে উঠেছে বুকের ভিতর। *বোধহয় ওর, সব চিন্তা-ভাবনা ভুল ছিল!*

পাশে লিলিকে দেখল রানা। ওটাও সব টের পেয়েছে।

কয়েক সেকেণ্ড পর দ্বিতীয় হুইসল বেজে উঠল। একটা লাফ দিল রানার হৃৎপিণ্ড। *প্রকাণ্ড সব সিল জেনে গেছে ওরা এখানে...*

'হাবিব, তাড়াতাড়ি উঠুন!' তাড়া দিল রানা, 'মেরি, জলদি!

পাড়ে উঠতে হবে!'

দ্রুত উঠতে শুরু করেছে রাশেদ হাবিব ও রানা। লিলির গায়ে চাপড় দিল মেরি, বিদ্যুৎ খেলে গেল ছোট সিলের দেহে। উপর দিক লক্ষ্য করে তীরের মত ছুটছে।

উপরে সারফেস দেখল রানা। অপূর্ব, কাঁচের মত পরিষ্কার, শান্ত, ও যেন দেখছে মসৃণ কোনও কাঁচের লেন্সের ভিতর দিয়ে।

চারপাশের শিস আরও তীক্ষ্ণ হয়ে উঠছে। হঠাৎ ঘেউ-ঘেউ শুরু হলো। বড় কোনও পুরুষ কুকুর এমন গর্জন করে। কিন্তু এই শব্দ আরও অনেক গুরুগম্ভীর।

পানির ভিতর চরকির মত ঘুরল রানা, পরক্ষণে সারফেসের দিকে চাইল।

আর ঠিক তখনই, নিথর সারফেস হাজার টুকরো হলো।

চারপাশ থেকে পুলে ঝাঁপিয়ে পড়ছে একের পর এক দানবীয় সিল। পানির নীচের গর্ত থেকে শিস দিচ্ছে আরও কয়েকটা। তারপর বেরিয়ে এল, ধাওয়া শুরু করল রানা ও তার দলের সবাইকে। তীক্ষ্ণ শিস আর ঘেউ-ঘেউ আওয়াজে ভরে উঠেছে নিমজ্জিত টানেল।

সারফেসের দিকে ছিটকে উঠছে লিলি। ওর হার্নেস ধরে আছে মেরি, যেন রোলার কোস্টারে চেপেছে। এঁকেবেঁকে ছুটছে লিলি, শরীর মুচড়ে এড়িয়ে যাচ্ছে এলিফ্যাণ্ট সিলের হাঁ করা চোয়াল। চারপাশ থেকে মেরি ও লিলিকে ধরতে চাইছে দানবগুলো।

হঠাৎ করেই এলিফ্যাণ্ট সিলগুলোর মাঝ দিয়ে উপরের সারফেস দেখল লিলি। ওর হার্নেস শক্ত করে ধরেছে মেরি, কয়েকটা দানবের সামান্য ফাঁক পেয়ে উঠে যেতে চাইল ছোট সিল।

ওদের দু'জনকে চারপাশ থেকে কামড়ে ধরতে চাইছে

এলিফ্যান্ট সিলগুলো। কিন্তু অনেক বেশি দ্রুত লিলি, মেরিকে নিয়ে ছিটকে উঠল সারফেসে, পরক্ষণে উঠে গেল বরফের মেঝেতে। ডাঙায় ধপ্ করে আছাড় খেল মেরি, হাত থেকে ছুটে গেল হার্নেস। চোখের সামনে দেখল, পুল থেকে সরে যেতে শুরু করেছে লিলি।

নিজেও দেরি করল না মেরি, লাফ দিয়ে উঠে ঝেড়ে দৌড় দিল। ওর পিছনে থরথর করে কাঁপছে মেঝে। একবার দৌড়ের ফাঁকে কাঁধের উপর দিয়ে চাইল। পানির নীচ থেকে উঠে এসেছে বিশাল এক সিল, ডাঙায় উঠে তেড়ে আসছে ওর দিকে!

ছুটবার গতি আরও বাড়ল মেরির। আর ঠিক তখনই পা পিছলে পড়ে গেল।

জোরালো থপথপ আওয়াজ তুলে ওর দিকে ছুটে আসছে মাদী একটা এলিফ্যান্ট সিল।

একদম ফাঁকা জায়গায় ধরা পড়েছে মেরি। একবার অসহায় চোখে দেখল ধেয়ে আসা সিলটাকে। আর ঠিক তখনই বুম্! করে উঠল কী যেন!

এলিফ্যান্ট সিলের গোটা মুখ ভরে গেল তাজা রক্তে। চার ফ্লিপার নিয়ে আছড়ে পড়ল ওটা মেঝেতে। আর নড়ছে না। ওটার দেহের উপর দিয়ে দেখা গেল রানাকে। সে আছে পুলের মাঝে, তীর থেকে তিরিশ ফুট দূরে। উঁচু করে রেখেছে পিস্তল। এলিফ্যান্ট সিলের মাথার পিছনে গুলি করেছে।

ভয়ে প্রায় মূর্ছা যাওয়ার অবস্থা মেরির, তারই মধ্যে ভাবল— ওর অদ্ভুত ভাল ওই ভিনদেশি বন্ধু তীরে উঠতে পারবে তো?

লবণাক্ত পানির পুকুরের আরেক দিকে গিয়ে উঠেছে রাশেদ হাবিব, পাশেই সরু কিনারা, সরতে যেতেই হঠাৎ চমকে গেল। ডান গোড়ালিতে শুরু হয়েছে তীব্র ব্যথা। মনে হলো কে যেন পা

ধরে খপ্ করে টান দিল। আবারও হুড়মুড় করে পানির ভিতর পড়ল রাশেদ হাবিব।

পানির নীচে দেখল, ওর ডান পা মুখের ভিতর পুরে নিয়েছে এক এলিফ্যান্ট সিল। ওটা অন্যগুলোর চেয়ে আকারে অনেক ছোট, নীচের মাড়ি থেকে বেরিয়েছে দুটো শ্বদন্ত। ওই জিনিস আগেও দেখেছে হাবিব, বিশাল মর্দা সিলের অমন দাঁত ছিল।

বাম পায়ে জোর কিক ঝাড়ল হাবিব ছোট সিলের নাকে। ব্যথায় ঘোঁৎ করে উঠল ওটা, তাড়াতাড়ি ছেড়ে দিল পা। এই সুযোগ পেয়ে আবারও সারফেসে ভেসে উঠল হাবিব।

এবার ভুল করল না, দুনিয়া-সেরা সাঁতারুর মত তীরের দিকে রওনা হয়ে গেল। দশ সেকেণ্ড পর চট্ করে ধরে ফেলল কাছের পাথর-খণ্ড, হাঁচড়ে-পাঁচড়ে উঠে পড়ল ডাঙায়। বড় একটা সিল তীরের খুব কাছে চলে এসেছিল, মস্ত একটা হাঁ করেও রাশেদ হাবিবের পা ধরতে পারল না।

লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে ছুটতে শুরু করেছে হাবিব।

পুলের কিনারায় পৌঁছবার জন্য পাগল হয়ে উঠেছে রানাও। সাঁতারের ফাঁকে চারপাশের গুহা দেখে নিচ্ছে। পুকুরের এক ধারে মেরি, অন্য পারে রাশেদ হাবিব। কয়েক মুহূর্ত পর দেখতে পেল কালো বিমানটা, সাধারণ ফাইটার বিমানের চেয়ে বড়ই হবে। যেন বিশাল পাতাল-গুহার ভিতর চুপ করে বসে আছে নীরব এক শিকারি পাখি।

প্রাণপণে সাঁতরে চলেছে রানা, কিন্তু এক সেকেণ্ড পর সামনে দেখল সরে যেতে শুরু করেছে পানি। এক সেকেণ্ড পর সেখানে দেখা দিল প্রকাণ্ড এক চোয়াল। বিরাট হাঁ মেলেছে পালের সর্দার, মর্দা সিল! ওটা আড়াল করে দিয়েছে কালো বিমানকে।

এরই ভিতর জোর গতি তুলে রানার দিকে রওনা হয়ে গেছে

মর্দা সিল, চলন্ত গাড়ির মত এসে গুঁতো দিল ওকে। ধাক্কা খেয়ে বুক থেকে ভুস্ করে সব দম বেরিয়ে গেল রানার। বুঝবার আগেই তলিয়ে গেছে।

নীচের ওই দুই শ্বদন্ত আবার রানার বুকে গেঁথে দিতে চাইল মর্দা সিল। রানা বুঝে গেছে, খালি গা হলে সঙ্গে সঙ্গে এই আঘাতে মরত, ফুটো হয়ে যেত বুক, কিন্তু ওর তেমন কিছু হলো না। ওয়েটসুটের উপর বডি আর্মার পরে আছে ও।

মর্দা সিলের দুই দাঁতের হামলা ঠেকিয়ে দিয়েছে কেভলার ব্রেস্টপ্লেট।

পানির ভিতর ওকে পুঁতে ফেলতে চাইছে এলিফ্যান্ট সিল। ঠেলে নীচে নিয়ে চলেছে।

সরে যেতে চাইল রানা, কিন্তু সেটা সম্ভব হলো না। ব্রেস্টপ্লেটের বরাতে মরছে না, কিন্তু ওকে ছাড়ছেও না মর্দা সিল।

ওটার নাকের গুঁতো বুকে নিয়ে পানির ভিতর নামছে তো নামছেই রানা। প্রকাণ্ড জানোয়ারের মুখ থেকে বলকে বেরিয়ে আসছে বড় সব বুদ্বুদ, উপরের দিকে যাচ্ছে।

জলদি কিছু করতে হবে, বুঝতে পারছে রানা।

কিন্তু কী করবে?

পকেটে হাত পুরল, কাজে লাগতে পারে এমন কিছু আছে?

দুই সেকেণ্ড পর পেয়ে গেল যা চাইছে। ব্রিটিশদের আনা নাইট্রোজেন গ্রেনেড! এক সেকেণ্ড ওটা দেখে নিল রানা। ভাবছে, কাজ করবে তো? আবার ভাবল, করবে না কেন!

হ্যাঁচকা টানে গ্রেনেডের পিন খুলে ফেলল ও, ভয়ঙ্কর বোমা পুরে দিল দানবীয় সিলের হাঁ করা চোয়ালের ভিতর।

পরক্ষণে দেরি করল না, সিলের দুই দাঁত ধরে নিজেকে একপাশে সরিয়ে নিতে চাইল। এক সেকেণ্ড পর সাঁৎ করে ওকে পাশ কাটিয়ে চলে গেল মর্দা সিল নীচের দিকে।

দুই সেকেণ্ড পর ওটা টের পেল, সাধের শিকারকে হারিয়েছে। দেরি না করে ঘুরতে শুরু করেছে, এমন সময় ফাটল নাইট্রোজেন গ্রেনেড।

বিস্ফোরিত হলো পুরুষ এলিফ্যান্ট সিলের গোটা মাথা। পরক্ষণে ইমপ্লোশনে ফিরতি পথে রওনা হলো সব। ঠিক তখন অদ্ভুত একটা ঘটনা ঘটল।

মৃত সিলের দেহ থেকে বরফের একটা স্রোত ছড়িয়ে পড়ল চারপাশে।

প্রথমে রানা বুঝল না ওটা কী, পরক্ষণে টের পেল। গ্রেনেডের লিকুইড নাইট্রোজেন পানির ভিতর তীব্র গতি তুলে ছড়িয়ে পড়ছে, মুহূর্তে বরফ করে দিচ্ছে পানিকে!

বরফের স্রোত ছুটে আসছে রানার দিকে। ক্রমেই আরও ছড়িয়ে পড়ছে, যেন কোনও জীবিত প্রাণী, পানির ভিতর বড় হয়ে উঠছে।

বিস্ফারিত চোখে ওদিকে চাইল রানা। টের পেল, ওই স্রোত ওকে ঘিরে ফেললে সঙ্গে সঙ্গে মরবে।

মনে মনে বলল, পালা রে রানা, জান নিয়ে পালা!

ঠিক তখন কী যেন স্পর্শ করল ওর কাঁধ। ঘুরে দাঁড়াল রানা।

লিলি!

খপ্ করে ওটার হার্নেস ধরল রানা, পরক্ষণে ওকে নিয়ে তীব্র গতি তুলতে চাইল লিলি।

ওদের পিছনে ধেয়ে আসছে হিম শীতল বরফ-দেয়াল, ছড়িয়ে পড়ছে পানির ভিতর, গতি এতই দ্রুত যে অবিশ্বাস্য মনে হয়।

সর্বশক্তি দিয়ে সাঁতরে চলেছে লিলি, টেনে নিয়ে যাচ্ছে রানাকে। কিন্তু রানার ওজন মাঝারি সিলের কমপক্ষে দ্বিগুণ, ছোট্ট সিল এখন আর জোরে ছুটতে পারছে না।

জমাট বরফের মৃত্যু এগিয়ে আসছে ওদের দিকে!

লিলি ও রানার পিছু নিয়েছে আরেকটা এলিফ্যান্ট সিল। ওটা বুঝেছে, প্রায় বিনা পরিশ্রমে খাবার মিলবে। কিন্তু ওটাকে ধরে ফেলল বরফের দেয়াল, মুহূর্তে নিজের শীতল পেটের ভিতর চালান দিল মাদী সিলকে।

সারফেসের দিকে উঠছে লিলি, পথের মাঝে এড়িয়ে চলেছে এলিফ্যান্ট সিলগুলোকে। সারফেস দেখতে পেয়েছে লিলি, রানাকে টেনে নিয়ে চলল ওদিকে।

ওদের পিছনে থেমে গেছে বরফের দেয়াল, এখন আর ছড়িয়ে পড়ছে না গ্রেনেডের নাইট্রোজেন। লিলি ও রানার পিছনে পড়ে রইল শীতল মৃত্যু।

ভুস্ করে পানির উপর ভেসে উঠেছে লিলি, এখনও ওর হার্নেস ধরে আছে রানা। কয়েক সেকেণ্ড পর বরফ-মেঝেতে উঠে এল লিলি, ওটার টান খেয়ে ডাঙায় উঠল রানাও। উপুড় হয়ে পড়ে আছে, চট্ করে চিত হলো। আর ঠিক তখনই চোখে পড়ল পানি থেকে উঠে এসেছে আরেকটা এলিফ্যান্ট সিল!

থপথপ আওয়াজ তুলে ওর দিকে ছুটে আসছে!

শরীর গড়িয়ে দিল রানা, মাত্র দুই সেকেণ্ড আগে যেখানে ছিল, সেখানে এসে ধুপ করে হামলে পড়ল এলিফ্যান্ট সিল। লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল রানা, ঘুরেই অন্য দু'জনকে খুঁজল ওর চোখ।

'মেজর! এদিকে! এদিকে! জলদি!' শুনল নিনা ভিসারের তীক্ষ্ণ কণ্ঠ।

ঝট্ করে ঘুরে দাঁড়াল রানা, ওর চোখ গিয়ে পড়ল সরু এক ফাটলের উপর। পঞ্চাশ গজ দূরে ওটা। ভিতর থেকে হাত নাড়ছে নিনা ভিসার।

এরই ভিতর মেরি, রাশেদ হাবিব ও বাচ্চা-সিল লিলি ওদিকে ছুটতে শুরু করেছে। এবার আর দেরি করল না রানা, প্রাণ হাতে নিয়ে ছুটতে শুরু করল। দৌড়ের ফাঁকে দেখল, সরু ফাটলের

ভিতর গড়িয়ে চলে গেল মেরি। কয়েক সেকেণ্ড পর ওর পিছু নিল লিলি। তার পাঁচ সেকেণ্ড পর উধাও হলো রাশেদ হাবিব।

কানের ভিতর হঠাৎ স্ট্যাটিকের আওয়াজ পেল রানা। তারপর ভেসে এল জোরালো কণ্ঠ: '...আপনি কি ভিতরে? মিস্টার রানা, সাড়া দিন!'

ওই কণ্ঠ রন হিগিন্সের।

পানিতে ঝাপটা-ঝাপটি করবার সময় কখন যেন সুইচ অন হয়ে গেছে হেলমেটের।

'কী, মেজর হিগিন্স?'

'হায় যিশু! আপনি ছিলেন কোথায়? গত দশ মিনিট ধরে আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করতে চাইছি।'

'অন্য কাজে ব্যস্ত ছিলাম। কিছু বলবেন?'

'স্টেশন থেকে বেরিয়ে আসুন। দেরি করবেন না।'

'এখন আর তা সম্ভব নয়,' বলল রানা। ছুটে চলেছে।

'আপনি বুঝতে পারছেন না, মিস্টার রানা। একটু আগে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে এয়ার ফোর্স। এখান থেকে আড়াই শ' নটিক্যাল মাইল দূরে একটা ব্রিটিশ ফাইটারকে ফেলে দিয়েছে আমাদের ছয়টা এফ-২২ যুদ্ধ-বিমান। কিন্তু ওই শত্রু বিমান পড়ে যাওয়ার আগে মিসাইল ছেড়েছে।' এক মুহূর্ত থেমে বলল রন হিগিন্স, 'ওই মিসাইল আসছে উইলকক্স আইস স্টেশন লক্ষ্য করে। স্যাটালাইট স্ক্যান থেকে জানা গেছে, ওই মিসাইল রেডিয়েশন ছড়াচ্ছে। ওটা একটা নিউক্লিয়ার মিসাইল।'

কথাটা শুনে চমকে গেছে রানা, কিন্তু দৌড়ের গতি কমল না। ফাটলের সামনে পৌঁছে গেল, শুয়ে পড়ে শরীর গড়িয়ে ঢুকে পড়ল ভিতরে। তৈরি ছিল না, পাঁচ ফুট নীচে ধুপ করে পড়ল।

ধড়মড় করে উঠে দাঁড়াল, অন্য কারও দিকে খেয়াল নেই। থমথমে কণ্ঠে বলল, 'ওটা কখন আসছে?'

'দুই শ' তেতাল্লিশ মাইল দূরে ঘণ্টায় চার শ' মাইল গতি তুলে আসছে। ওরা বলছে, আপনারা মাত্র সাঁইত্রিশ মিনিট পাবেন; তারপর ডেটোনেশন হবে। কিন্তু সেটা নয় মিনিট আগের হিসাব। মিস্টার রানা, শুরু থেকে আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করতে চাইছি, কিন্তু সাড়া দেননি। আপনি মাত্র আটাশ মিনিট পাবেন, তারপর উইলকক্স আইস স্টেশনে এসে পড়বে তাজা নিউক্লিয়ার ওয়ারহেড। আপনি আটাশ মিনিট পাচ্ছেন।'

চট্ করে ঘড়ি দেখে নিল রানা।

'সরি, মিস্টার রানা। আমাকে সরে যেতে হচ্ছে। আমার লোকদের নিরাপদ দূরত্বে নিয়ে যেতে হবে। দুঃখিত, কিন্তু আপনাকে আর কোনও সাহায্য করতে পারছি না।'

'ঠিক আছে, খবরটা জানানোর জন্য ধন্যবাদ।' আরেকবার ঘড়ি দেখল রানা।

রাত দশটা বত্রিশ মিনিট।

আর মাত্র আটাশ মিনিট, তারপর রাত ঠিক এগারোটার সময় এই স্টেশনের উপর পড়বে নিউক্লিয়ার মিসাইল।

সবাই জড় হয়ে দাঁড়িয়েছে ওর সামনে— নিনা ভিসার, মেরি, রাশেদ হাবিব, লিলি। তিশাও আছে, এক মুহূর্ত পর ওকে দেখল রানা। মেয়েটা বরফ-মেঝের উপর বসে আছে। ওর চোখে পড়ল, বেচারির কাঁধে বিশ্রী একটা লাল ক্ষত। প্রায় ছুটে তিশার সামনে চলে গেল রানা।

'জনি ওয়াকার?' আস্তে করে বলল।

মাথা দোলাল তিশা।

'সে কোথায়?' জানতে চাইল রানা।

'মারা গেছে। এলিফ্যান্ট সিলের কবলে পড়েছিল। কিন্তু আগেই গোলাম মোরশেদকে খুন আর আমাকে আহত করেছে।'

'এখন কেমন বোধ করছ?

'খুব খারাপ,' মুখ কুঁচকে ফেলেছে তিশা।

এবার অন্য ক্ষতটা দেখতে পেল রানা। পেটের এক পাশে গুলি খেয়েছে তিশা। বডি আর্মার থেকে একটু দূরে বুলেট গেঁথেছে, দেখে মনে হলো খারাপ ধরনের ক্ষত। পেটে গুলি লাগলে খুব ধীরে ধীরে অনেক ব্যথা পেয়ে মরতে হয়।

'একটু ধৈর্য ধরো,' বলল রানা। 'আমরা তোমাকে এখান থেকে...'

তিশাকে সরিয়ে নিতে শুরু করেছে রানা। মেয়েটা জোরে ঘষা খেল ওর পায়ে।

রানার গোড়ালি পকেট থেকে কী যেন টুন্ করে মেঝের উপর পড়ল।

একটা রুপালি লকেট ও চেইন।

নিনা ভিসারের দিয়ে যাওয়া জিনিস। পাতাল-গুহায় আসবার আগে রানাকে দিয়েছিল। উল্টো হয়ে পড়েছে লকেট, ওটা মেঝে থেকে তুলতে যেতেই রানা দেখল, ওখানে খোদাই করা কয়েকটা অক্ষর:

আমাদের প্রিয় কন্যা
নিনা অস্টিনকে
তোমার তেইশতম জন্মদিনে

বুকের ভিতর ঠাণ্ডা বরফের মত অনুভূতি হলো রানার। চট্ করে পকেট থেকে রবিন কার্লটনের ই-মেইলের কপি বের করল।

আইসিজি গুপ্তচরদের তালিকা পড়তে শুরু করেছে।

একটা লাইনের উপর স্থির হলো ওর চোখ।

অস্টিন, নিনা
হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি

ঝট্ করে নিনা ভিসারের দিকে চাইল রানা। চাপা স্বরে বলল, 'বিয়ের আগে আপনার কুমারী নাম কী ছিল, নিনা?'

নিচু ধাতব আওয়াজ হলো। এইমাত্র একটা অস্ত্র কক করা হয়েছে। প্রায় একই সময়ে দক্ষতার সঙ্গে অস্ত্র তাক করেছে নিনা ভিসার।

একফুট দূরে ধরেছে পিস্তল, রানার মাথা লক্ষ্য করে। অন্য হাতে বের করে আনল মোরশেদের হেলমেট হেডসেট, ওদিকে না চেয়েই বেল্টের ক্লিপের চ্যানেল পাল্টে নিল। হেডসেটে বলে উঠল, 'সিল টিম, আমি নিনা অস্টিন। যোগাযোগ করুন।'

জবাব নেই কারও। ভুরু কুঁচকে ফেলল নিনা।

'সিল টিম, আমি নিনা অস্টিন। সাড়া দিন।'

'এখন আর উপরে কেউ নেই, নিনা,' বলল রানা। দুই হাতে সাবধানে তিশাকে ধরে রেখেছে। 'সবাই চলে গেছে। স্টেশন এখন ফাঁকা। একটা ক্রুজ মিসাইল আসছে। ওটা নিউক্লিয়ার, নিনা। অনেক আগেই ভেগে গেছে তোমার সিল টিম। এবার আমাদেরকেও সরে যেতে হবে, নইলে মরব।'

কথাটা মাত্র শেষ করেছে রানা, এমন সময় নিনা ভিসারের হেডসেটে কর্কশ এক কণ্ঠ বলে উঠল: 'নিনা অস্টিন, আমি সিল কমাণ্ডার মর্গান ট্রোকি। রিপোর্ট করুন।'

প্রচণ্ড তিক্ত হয়ে গেল রানার মন। একবার ঘড়ি দেখল।

১০:৩৫

মাত্র পঁচিশ মিনিট বাকি।

রানার জানা ছিল না, হামলা শুরু করবার সময় সিল টিম স্টেশনের ভিতর ক্লোজড-সার্কিট চ্যানেল ব্যবহার করেছে। কাজেই ওই লোকগুলো জানে না স্টেশন উড়িয়ে দেবে নিউক্লিয়ার মিসাইল।

নিনা অস্টিন বলল, 'সিল কমাণ্ডার, আমার সঙ্গে এই গুহার

ভিতর বাংলাদেশি দুই শত্রু আছে। আসলে তিনটা। এদেরকে গ্রেফতার করেছি।'

'কিছুক্ষণ পর নীচে নামব আমরা, নিনা। আপনাকে প্রয়োজনে খুন করবার অনুমতি দিলাম। সিল টিম, আউট।'

'নিনা, এসব কী করছ?' বলে উঠল রাশেদ হাবিব।

'চুপ, শুয়োর!' ধমকে উঠল নিনা অস্টিন, তার অস্ত্রের নলের ডগা লাগল হাবিবের নাকে। 'ওদিকে গিয়ে দাঁড়াও।' ইশারা করল সে।

হাবিব ও মেরি চলে এল সুড়ঙ্গের আরেক দিকে, রানার পাশে।

রানা খেয়াল করেছে, নিনা অস্টিন আত্মবিশ্বাস ও কর্তৃত্বের সঙ্গে অস্ত্র ধরেছে। আগেও অস্ত্র ব্যবহার করেছে সে।

'তুমি কোথা থেকে এসেছ, নিনা?' জানতে চাইল রানা। 'আর্মি, না নেভি?'

এক মুহূর্ত রানাকে দেখল মহিলা, তারপর বলল, 'আর্মি।'

'কোন্ সেকশন থেকে?'

'রেঞ্জার্স ফোর্স। হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটিতে পড়তে পাঠানো হয় আমাকে। প্রতিটা পরীক্ষা খুব ভালভাবে শেষ করে, সেখানেই পড়াতে শুরু করি।'

'শিক্ষা দেয়ার কাজ শুরু করবার পর আইসিজি যোগাযোগ করে, না আগে?'

'আগেই,' মৃদু হাসল নিনা। 'অনেক আগে। মিস্টার রানা, আইসিজি আমাকে পড়াবার কাজ দেয়। পরে বলা হয় আবারও আর্মিতে যোগ দিতে হবে। ওরা আমার সারাজীবনের জন্য পেনশনের ব্যবস্থা করেছে। তারপর আবার পাঠিয়ে দিয়েছে ইউনিভার্সিটিতে।'

'কী কারণে পাঠাল?'

'ওরা জানতে চেয়েছিল ওখানে কী ঘটছে। বিশেষ করে আইস কোর রিসার্চ বিষয়ে ওদের আগ্রহ ছিল। মরিস ভিসারের মত লোক বরফের ভিতর নানান গ্যাস পাচ্ছিল, আর এসব কেমিকেল গ্যাস সম্পর্কে ওদের জানার দরকার ছিল। শত শত মিলিয়ন বছর আগের ভয়ঙ্কর টক্সিক পরিবেশের গ্যাস পাওয়া গেছে। কার্বন মনোক্সাইড ভ্যারিয়েন্টস্, পিয়োর ক্লোরিন গ্যাস মলিউকিউলার— আইসিজি এসব বিষয়ে জানবে না? এসব গ্যাস যুদ্ধে ব্যবহার করা যায়। কাজেই এই ক্ষেত্রে কাজে নামলাম আমি, কিছু দিনের ভিতর চোখে পড়ে গেলাম মরিস ভিসারের।'

'তথ্য পাওয়ার জন্য ওঁকে বিয়ে করো তুমি?' বলল হাবিব।

সুড়ঙ্গের এক কোণে চুপ করে দাঁড়িয়ে শুনছে মেরি, মুখ শুকিয়ে গেছে।

'সারাজীবন যা চেয়েছি, তাই পেয়েছি,' বলল নিনা। 'মরিসও বিয়েতে গররাজি ছিল না।'

'ওঁকে খুন করেছ?' জানতে চাইল হাবিব। 'ওই গাড়ি দুর্ঘটনা?'

'না, আমি ওকে খুন করিনি,' বলল নিনা। 'আইসিজি ঠিকই ধরেছ, ওটা সাধারণ দুর্ঘটনা ছিল না। একে তুমি নিয়তি বা ভাগ্য বলতে পারো। সে মরে যাওয়ায় আমার ঢের সুবিধা হয়েছে।'

'চার্লস মুনকে খুন করেছ?' জানতে চাইল রানা।

থমকে গেল নিনা, তারপর বলল, 'হ্যাঁ। এটা আমি করেছি।'

'কুত্তির বাচ্চি,' নিচু স্বরে গাল দিল হাবিব।

কথাটা পাত্তা না দিয়ে হাসল নিনা। 'চার্লস মুন মিথ্যাবাদী আর চোর ছিল। লোকটা হাবিবের পাওয়া তথ্য নিজের বলে চালাবে ভেবেছিল। তাতে আমার কোনও আপত্তি ছিল না। কিন্তু হাবিব যখন পনেরো শ' ফুট নীচে ধাতু পেল, আর মুন আমাকে বলল, ওই তথ্যটাও সে ছেপে দেবে সায়েন্টিফিক জার্নালে। তখন

বুঝলাম, এটা হতে দিতে পারি না। আগে জানাতে হবে আইসিজিকে।'

'আগে জানাতে হবে, তাই না?' তিক্ত শোনাল রানার কণ্ঠ।

'আমাদের কাজ সবচেয়ে আগে সবকিছু জানিয়ে দেয়া।'

'কাজেই তুমি চার্লস মুনকে খুন করলে,' বলল রানা। 'সাগরের সাপের বিষ ব্যবহার করলে। এমন ব্যবস্থা করলে, যাতে সবাই মনে করে রাশেদ হাবিব খুনি।'

বেঁটে বিজ্ঞানীর দিকে চাইল নিনা। 'দুঃখিত, হাবিব, কিন্তু খুব সহজেই তোমাকে ফাঁসিয়ে দেয়া গেছে। মুনের সঙ্গে সারাক্ষণ ঝগড়া করতে। আর সে রাতে যখন ঝগড়া করলে, এরপর ওই সুযোগ আর ছাড়তে পারি?'

চট্ করে ঘড়ি দেখে নিল রানা। 'নিনা, কথাটা শোনো: জানি তুমি আমাকে বিশ্বাস করতে চাইবে না, কিন্তু এখান থেকে বেরিয়ে যেতে হবে। নইলে সবাই মরব। একটা নিউক্লিয়ার মিসাইল আসছে আমাদের দিকে। নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ যে...'

'কোনও মিসাইল আসছে না,' ধমকে উঠল নিনা। 'সত্যি যদি আসত, সিল টিম এখানে থাকত না।'

রানা আরেকবার ঘড়ি দেখল:

১০:৩৬

হতাশ লাগছে ওর। অনেক সময় নষ্ট করে ফেলছে ওরা। নিনা অস্টিনের হাতের পুতুল হয়ে গেছে। অন্তত সাত ফুট দূর থেকে পিস্তলের মুখে ওদেরকে আটকে রাখবে বদ মেয়েলোকটা, তারপর একটা নিউক্লিয়ার মিসাইল এসে শেষ করবে ওদের সবাইকে।

আবারও ঘড়ি দেখল রানা।

স্ক্রিনে এইমাত্র ১০:৩৭ মিনিট হলো।

রানার জানার কথা নয়, ব্রিটিশ কমাণ্ডার, মেজর জেনারেল

জুলিয়াস বি. গুণ্ডারসন উইলকক্স আইস স্টেশনকে অর্ধচন্দ্রের মত ঘিরে ফেলেছিল ৮০/২০ ট্রাইটোনাল চার্জ দিয়ে, তার উদ্দেশ্য ছিল এই স্টেশনকে আইসবার্গ বানিয়ে দেয়া।

আজ রাত আটটা সাঁইত্রিশ মিনিটে ডাইভিং বেলের ভিতর ডেটোনেশন ইউনিটে দুই ঘণ্টার জন্য টাইমার সেট করেছে গুণ্ডারসন।

একইসময়ে আঠারোটা ট্রাইটোনাল চার্জ বিস্ফোরিত হয়েছে। এর ফলে চারপাশে শুরু হয়েছে প্রলয়। তিন শ' ফুটি তুষারের গেইজার আকাশে উঠল। কান ফাটানো মড়মড় আওয়াজ উঠল বরফের প্রান্তরে। আইস শেলফে অর্ধেক চাঁদের মত একটা বড় জায়গা জুড়ে ফাটল ধরেছে। তারপর বিকট মড়াৎ আওয়াজ তুলে স্টেশন ও নীচের সব কিছু নিয়ে আইস শেলফ থেকে সরে গেল এদিকের বরফ-জমি। উইলকক্স আইস স্টেশন নিয়ে তিন কিউবিক কিলোমিটার বরফ-খণ্ড সরে গেল সাগরে। কিন্তু এত বড় হিমশৈলকে খুব একটা নাড়াতে পারল না ক্ষিপ্ত চল্লিশ ফুটি ঢেউ।

এদিকে পাতাল-গুহার ভিতর দুনিয়া যেন কাত হয়ে গেছে। চারপাশের দেয়াল ও ছাত থেকে ঝরঝর করে পড়ছে বরফের চাঁই। আঠারোটা ট্রাইটোনাল চার্জ বিস্ফোরণের আওয়াজটা প্রচণ্ড বজ্রপাতের মত শোনা গেল।

রানা প্রথমে ভাবল, স্টেশনের উপর নিউক্লিয়ার মিসাইল পড়েছে। মস্ত ভুল তথ্য দিয়ে গেছে মেজর রন হিগিন্স, আরও আধঘণ্টা আগেই রওনা হয়েছে ওই মিসাইল। কিন্তু কয়েক সেকেণ্ড পর বুঝল, ওই ভয়ঙ্কর আওয়াজ অন্য কোনও কিছুর। নিউক্লিয়ার বোমা পড়লে এতক্ষণে সবাই ওরা মরত।

হঠাৎ আরও কাত হয়ে গেল খাটো সুড়ঙ্গ। ভারসাম্য হারিয়ে টলে পড়ল নিনা অস্টিন। আর এই সুযোগটা নিল রাশেদ হাবিব, এক লাফে সামনে বেড়েই ট্যাকল করল মেয়েটাকে। পা পিছলে

বরফের মেঝেতে ধুপ্ করে পড়ল দু'জন। কিন্তু পরের সেকেণ্ডে হালকা হাবিবকে গা থেকে ঝেড়ে ফেলল নিনা লাথি মেরে।

এখনও তিশাকে ধরে আছে রানা, বেচারিকে দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে আস্তে করে বসিয়ে দিল ও, তারপর সোজা হয়ে দাঁড়িয়েই পা বাড়াল নিনা অস্টিনের দিকে। ওই একই সময়ে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল বিশ্বাসঘাতিনী মেয়েটা, ঘুরেই অস্ত্র তাক করল রানার কপালে।

'দুঃখিত, মিস্টার রানা,' দাঁতে দাঁত চিপে বলল নিনা, 'তোমাকে ভাল লেগেছিল।'

চারপাশের নানা শব্দের ভিতর খাটো সুড়ঙ্গে কান ফাটানো আওয়াজে গর্জে উঠল পিস্তল।

একুশ

নিনা অস্টিনের বুক থেকে ফোয়ারার মত রক্ত ছিটকে বেরুতে দেখেছে রানা। কাঁচাগোল্লা হয়ে গেছে মেয়েটার দুই বিস্ফারিত চোখ, হাঁটু ভেঙে ধুপ্ করে বসল, ওখান থেকে মেঝেতে শুয়ে পড়ল, মৃত।

ডেযার্ট ঈগলের নল থেকে এখনও ধোঁয়া বেরুচ্ছে, রানার উরুতে ঝুলন্ত হোলস্টারে পিস্তলটা রেখে দিল তিশা। অস্ত্র বের করবার সুযোগ হয়নি রানার, কিন্তু সুযোগ ছিল তিশার, হাঁটু গেড়ে বসে আছে ও।

অবাক হয়ে দৃশ্যটা দেখছে মেরি, হাঁ হয়ে গেছে মুখ। চট্

করে ওর পাশে চলে গেল রানা, নরম স্বরে বলর, 'ঠিক আছ তো? তোমার মা...'

'ও আমার মা ছিল না,' বড় শান্ত স্বরে বলল মেরি।

'আমরা না হয় এ নিয়ে পরে আলাপ করব?' বলল রানা। 'বাইশ মিনিট পর গোটা এলাকা হাওয়ায় মিলিয়ে যাবে।'

আস্তে করে মাথা দোলাল মেরি।

'মিস্টার হাবিব,' বলল রানা, চারপাশের দেয়াল থরথর করে কাঁপতে দেখছে। 'জানেন কী ঘটছে?'

'না, বুঝতে পারছি না,' বলল রাশেদ হাবিব।

কথাটা মাত্র শেষ করেছে, হঠাৎ কাত হয়ে গেল সুড়ঙ্গ, ডেবে গেল দশ ইঞ্চি।

'মনে হচ্ছে মেইন ল্যাণ্ড থেকে খসে পড়েছে আইস শেলফ,' বলল হাবিব। 'এটা আইসবার্গ হয়ে উঠেছে।'

'আইসবার্গ...' বিড়বিড় করল রানা। মগজ খাটাতে শুরু করেছে। কয়েক সেকেণ্ড পর হাবিবের দিকে চাইল। 'সিলগুলো এখনও রয়ে গেছে গুহার ভিতর?'

ফাটলের ভিতর দিয়ে উঁকি দিল হাবিব। কয়েক সেকেণ্ড পর বলল, 'না, নেই। পালিয়েছে।'

আবার তিশার সামনে থামল রানা, পাঁজাকোলা করে মেয়েটিতে তুলে নিল, চলে এল ফাটলের সামনে। 'আমি ধারণা করেছি ওরা থাকবে না। পালের সর্দার মরেছে। ওরা এখন তাকে খুঁজতে গেছে।'

'আমরা এখান থেকে বেরুব কী করে?' জানতে চাইল হাবিব।

ফাটল দিয়ে তিশাকে বাইরে ঠেলে দিল রানা, মুখ ফেরাল রাশেদ হাবিবের দিকে। চোখদুটো জ্বলজ্বল করছে।

'আমরা উড়ে বেরুব। মেরি, এসো, এবার বেরুতে হবে।'

মেরি চলে আসতেই ওকে ফাটলের কাছে তুলে ধরল রানা।

মেয়েটা ওদিকে চলে যেতেই এবার প্রধান গুহায় উঠল হাবিব। সবার শেষে রানা।

বিশাল, কালো বিমান রাজকীয় ভঙ্গিতে বসে আছে পাতাল-গুহার মাঝে। নীচে নেমেছে ঈগলের চঞ্চুর মত ওটার নাক। পিছনে কনকর্ডের ডানার মত সংযুক্ত ডানা। গুহার ছাত থেকে পড়ছে বরফ-খণ্ড, ফিউজেলাজে পড়ে নানা দিকে ছিটকে যাচ্ছে।

মেরি ও রাশেদ হাবিবকে এগুতে ইশারা করেছে রানা, নিজে তিশাকে দুই হাতে তুলে পিছু নিয়েছে। থরথর করে কাঁপছে মেঝে। দুই মিনিট পেরুবার আগেই কালো বিমানের পেটের নীচে পৌঁছে গেল ওরা।

তিশা আঙুল তুলে কিপ্যাড দেখিয়ে দিল। 'এই যে কিপ্যাড।'

সবুজ রঙে জ্বলজ্বল করছে এণ্ট্রি কোড স্ক্রিন:

২৪১৫৭৮১৭ – – – – – – – – – – – – – – – – –

এণ্টার অথোরইযড এণ্ট্রি কোড

'তোমরা কেউ কোড বুক পেয়েছ?' তিশাকে প্রশ্ন করল রানা।

'না, কোড ভাঙার চেষ্টা করছিল নিনা অস্টিন, কিন্তু মনে হলো জানে না কিছুই।'

'তার মানে কোড আমরা জানি না,' বলল রানা।

'না, জানি না,' সায় দিল তিশা।

'এখন?' বলল রাশেদ হাবিব।

রানার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে মেরি, চোখ রেখেছে স্ক্রিনে। কয়েক সেকেণ্ড পর বলে উঠল, 'আরেহ্, এটা তো ফিবোনাচ্চি নাম্বার।'

'কী নাম্বার?' একই সময়ে জানতে চাইল রানা ও তিশা।

গম্ভীর মুখে কাঁধ ঝাঁকাল মেরি ভিসার। '২৪১৫৭৮১৭। এটা ফিবোনাচ্চি নাম্বার।'

'সেটা কী?' জানতে চাইল রানা।

'ফিবোনাচ্চি এক ধরনের সিকোয়েন্সের নাম্বার,' বলল মেরি। 'এই সিকোয়েন্সে প্রতিটা সংখ্যা হয় আগের দুটো সংখ্যার যোগ ফল।' অবাক চোখে ওকে দেখছে অন্যরা। 'আমার বাবা আমাকে শিখিয়েছিলেন। কারও কাছে কলম আর কাগজ আছে?'

হ্যাঙারে পাওয়া ডায়েরি পকেট থেকে বের করে দিল তিশা। হাবিবের কাছে কলম আছে। প্রথমে ওটা থেকে কালো রঙের পানি বেরুল, তারপর কাজ করতে লাগল কালি। ডায়েরিতে সংখ্যা লিখতে শুরু করেছে মেরি।

কাজের ফাঁকে বলল, 'এই সিকোয়েন্স হয় এরকম: ০, ১, ১, ২, ৩, ৫, ৮, ১৩। এভাবে বাড়তে থাকে সংখ্যা। আগের দুটো সংখ্যা যোগ দিয়ে বের হয় তৃতীয় সংখ্যা। তারপর দ্বিতীয় আর তৃতীয় সংখ্যা থেকে বের হয় চতুর্থ সংখ্যা। দাঁড়ান, কোড বের করতে আমার একমিনিট লাগবে...' অঙ্ক কষতে শুরু করেছে মেধাবী মেয়েটি।

রানা একবার দেখে নিল ঘড়ি: ১০:৪০

আর মাত্র বিশ মিনিট, তারপর আসছে নিউক্লিয়ার মিসাইল।

ডায়েরিতে হিসাব কষছে মেরি। রানাকে হাবিব বলল, 'আপনি এখান থেকে বিমান নিয়ে বেরুবেন কী করে?'

আনমনে বলল রানা, 'ওদিকের পুকুরের ভিতর দিয়ে। তার আগে গুহার আকাশে ভেসে উঠতে হবে।'

'কী বললেন?' অবাক-চোখে রানাকে দেখল হাবিব।

কিন্তু এখন আর তার দিকে মন নেই রানার। মেরির হাতের ডায়েরি দেখছে। সংখ্যাগুলো পড়তে শুরু করেছে:

০, ১, ১, ২, ৩, ৫, ৮, ১৩, ২১, ৩৪, ৫৫, ৮৯, ১১৪, ২৩৩, ৩৭৭, ৬১০, ৯৮৭, ১,৫৯৭, ২,৫৮৪, ৪,১৮১, ৬,৭৬৫, ১০,৯৪৬, ১৭,৭১১, ২৮,৬৫৭, ৪৬,৩৬৭, ৭৫,০২৫,

১,২১,৩৯৩, ১,৯৬,৪১৮, ৩,১৭,৮১১, ৫,১৪,২২৯, ৮,৩২,০৪০, ১৩,৪৬,২৬৯, ৩৫,২৪,৫৭৮, ৫৭,০২,৮৮৭, ৯২,২৭,৪৬৫, ১,৪৯,৩০,৩৫২, <u>২,৪১,৫৭,৮১৭</u>

'তা হলে আমরা পেলাম আপনার এই সংখ্যা,' ক্লাস টিচারের মত ভঙ্গি করে বলল মেরি: '২,৪১,৫৭,৮১৭।'

'সিকোয়েন্সের শেষের অন্য সব সংখ্যা?' জানতে চাইল রানা।

আবারও অঙ্ক কষতে শুরু করল মেরি।

৩,৯০,৮৮,১৬৯, ৬,৩২,৪৫,৯৮৬...

কিছুক্ষণ পর নিশ্চিত কণ্ঠে বলল, 'হ্যাঁ, এটাই।'

ডায়েরি নিল রানা, সংখ্যাগুলোর দিকে চাইল। সবমিলে ষোলোটা সংখ্যা। কিপ্যাডে ষোলোটা শূন্য-স্থান। কিপ্যাডের বাটন এবার টিপতে শুরু করল রানা। কাজটা শেষ হতেই স্ক্রিনে 'বিঈপ!' আওয়াজ হলো।

স্ক্রিনে এখন চব্বিশটা সংখ্যা:

২৪১৫৭৮১৭৩৯০৮৮১৬৯৬৩২৪৫৯৮৬
এণ্ট্রি কোড অ্যাকসেপটেড। ওপেনিং দ্য শ্যাডো

অদ্ভুত সুন্দর কালো বিমানের ভিতর থেকে ইলেকট্রনিক 'ভ্রম' আওয়াজ হলো। রানা দেখতে পেল, বিমানের পেটের কাছ থেকে নেমে আসছে সরু এক সিঁড়ি।

চট্ করে মেরির কপালে চুমু দিল হাবিব, মৃদু হেসে বলল, 'কখনও ভাবিনি অঙ্ক আমার প্রাণ বাঁচাবে। জলদি চলো।'

অন্য সবাই বিমানের পেটে উঠে যেতে তিশাকে নিয়ে উঠল রানা। চারপাশ দেখে নিল। এটা কোনও মিসাইল বে। দুটো ত্রিকোণ র‍্যাকের ভিতর ছয়টা মিসাইল। একেক র‍্যাকে তিনটে করে।

মিসাইল বে'র একপাশের মেঝেতে তিশাকে শুইয়ে দিল ও।

সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে দেখল, বেকায়দা ভাবে থপথপ করে সিঁড়ি বেয়ে উঠেছে লিলি। পাশের দেয়ালে বাটন পেয়ে টিপে দিল রাশেদ হাবিব, নিঃশব্দে উঠে এল কালো সিঁড়ি। সামনে বেড়ে ককপিটের দিকে চলল রানা। 'তিশা, এই বিমানের নাম কী?'

পিছনের মেঝে থেকে বলে উঠল তিশা, কণ্ঠে ব্যথার ছাপ: 'দ্য শ্যাডো। এটা স্টেলথ বিমান। কীভাবে লুকিয়ে থাকবে জানি না। বোধহয় প্লুটোনিয়ামের কারণেই।'

ককপিটে ঢুকে চমকে গেল রানা।

ককপিট যেন ভবিষ্যতের কোনও মহাকাশযানের। ঊনিশ শ' ঊনআশি সালের বিমান, বুঝবার উপায় নেই। অবশ্য, যুদ্ধ-বিমান গত কয়েক দশকে খুব উন্নত হয়নি। হয়তো এক্সপেরিমেণ্ট করতে গেলে হাজার হাজার কোটি টাকা লাগে বলেই। ডানদিকে একটা সিট। অন্যটা বামে এবং পিছনে। ওখানে বসবে রেইডার অপারেটার বা গানার। ককপিট বেশ ঝুঁকে আছে নীচের দিকে। গানারের দেড় ফুট নীচে পাইলটের সিট। ওখান থেকে চারপাশ পরিষ্কার দেখবে পাইলট।

দেরি না করে পাইলটের সিটে বসল রানা। ধুপ আওয়াজ শুনল। ছাত থেকে বড় এক খণ্ড বরফ পড়েছে ক্যানোপির উপর।

কন্সোলের দিকে চাইল রানা। চারটে কমপিউটার মনিটর, স্ট্যাণ্ডার্ড কণ্ট্রোল জয়স্টিক, সামনে অসংখ্য বাটন, ডায়াল ও ইণ্ডিকেটার।

ওর মনে হলো হাই-টেক কোনও জিগসও পাযলের ভিতর ঢুকেছে। ভয় পেয়ে গেল, বুঝতে পারছে এই জিনিস চালাতে পারবে না। শিখতে অনেক সময় লাগবে। আঠারো মিনিটে তা সম্ভব নয়।

অবশ্য, দ্বিতীয়বার মনোযোগ দিয়ে কন্সোলের দিকে চেয়ে বুঝল, বসনিয়ায় যে হ্যারিয়ার নিয়ে আকাশে উঠত, ওটার সঙ্গে

অনেক মিল আছে এই বিমানের কন্সোলের। মনে মনে বলল, মানুষ তৈরি করেছে এটা। একেবারে অন্য রকম হবে কেন?

ইগনিশন সুইচ খুঁজে নিতে ষোলো সেকেণ্ড লাগল। বিমান চালু করতে চাইল, কিন্তু কিছুই ঘটল না।

'ফিউয়েল ফিড,' বিড়বিড় করে বলল রানা। 'ফিউয়েল ফিড পাম্প করতে হবে।'

ফিউয়েল ফিড বাটন খুঁজতে শুরু করেছে রানা। কয়েক সেকেণ্ড পর পেয়েও গেল। পাম্প করল ওটা। এবার ইগনিশন সুইচ আবারও টিপল।

কিছুই ঘটছে না।

তারপর হঠাৎ করেই বিকট ভ্রুম্‌ম্‌ম্‌ম্‌ আওয়াজ শুরু হলো।

দ্য শ্যাডোর দুই টারবাইন ইঞ্জিন গর্জে উঠেছে। রক্তে অ্যাড্রেনালিনের বান টের পেল রানা। ওর মনে হলো, জেট ইঞ্জিনের আওয়াজ আগে কখনও শোনেনি।

ইঞ্জিন রেভ করতে শুরু করল। খুব দ্রুত তপ্ত করে তুলতে হবে ইঞ্জিনগুলোকে।

আর সময় নেই।

হাত-ঘড়ি দেখল: ১০:৪৫

ইঞ্জিন গরম করছে। সাধারণত বিশ মিনিট সময় দিতে হয়, কিন্তু দ্য শ্যাডোর জন্য দশ মিনিট বরাদ্দ করল। মনের ভেতর থেকে তাগিদ: দেরি হলে এখন যে-কোনও সময়ে মরবে ওরা।

ইঞ্জিন তপ্ত হয়ে উঠছে, গুহার এদিকের বরফ-দেয়াল গলতে শুরু করেছে। ঝরঝর করে পানি ঝরে পড়ছে কালো বিমানের উপর। পাঁচ মিনিট রেভ করবার পর ভার্টিকাল টেক-অফ সুইচ খুঁজল রানা।

ভেক্টর থ্রাস্ট কোথায়?

আধুনিক ভার্টিকাল-টেক-অফ হ্যারিয়ারের মত ফাইটার

বিমানে ডিরেক্টেবল বা ভেক্টর থ্রাস্টার থাকে।

'থ্রাস্টার কই, তিশা?' ব্যস্ত হয়ে জানতে চাইল রানা।

'নেই, স্যর,' পিছন থেকে বলল আহত মেয়েটি। 'তার বদলে রেট্রো-ফায়ারিং জেট আছে! রেট্রো চালু করার বাটন খুঁজুন!'

খুঁজতে শুরু করেছে রানা। ওর চোখ পড়ল আরেকটা সুইচের উপর। ওখানে লেখা: ক্লোক মোড।

ভুরু কুঁচকে গেল রানার।

জিনিসটা কী?

দু' সেকেণ্ড পর অন্য একটা বাটন দেখল। ওটার উপর লেখা: রেট্রোস।

বাটন টিপে দিল রানা।

এক সেকেণ্ড পর ভেসে উঠতে শুরু করল বিমান। কিন্তু পরের সেকেণ্ডে একটা ঝাঁকি খেল। পিছন থেকে গোঙানির মত আওয়াজ এল। আর নড়ছে না বিমান।

ঘুরে ককপিটের ক্যানোপি দিয়ে চাইল রানা। বিমানের দুই টেইল ফিন ভাল ভাবেই আটকা পড়েছে বরফের দেয়ালের ভিতর।

দশ সেকেণ্ড পর আফটারবার্নার বাটন পেল। টিপে দিল বাটন।

টুইন থ্রাস্টারের ভিতর থেকে ছিটকে বেরুল তপ্ত বাষ্প। বিমানের পিছনের বরফের দেয়াল গলতে শুরু করেছে।

মৃদু কাঁপছে দ্য শ্যাডো।

খুব দ্রুত গলে গেল পিছনের বরফ-দেয়াল। ছাড়া পেয়ে গেছে বিমান।

আরেকবার ঘড়ি দেখল রানা।

১০:৫৩

আবারও নীচের দিকে কাত হলো গোটা গুহা।

'এখনই না!' মনে মনে বলল রানা। 'আর মাত্র কয়েক মিনিট চাই! মাত্র কয়েক মিনিট!'

ইঞ্জিন গরম করে তুলছে। ঘড়ির দিকে চেয়ে রইল: ১০:৫৪

তারপর পেরিয়ে গেল আরেকটা মিনিট।

১০:৫৫

সময় হয়েছে, নিজেকে বলল রানা। এবার...

আবারও রেট্রো বাটন টিপল। বিমানের পেটের নীচে আট রেট্রো জেট একইসঙ্গে চালু হলো। নীচের দিকে ছিটকে দিল দীর্ঘ সাদা গ্যাসের বাষ্প।

এবার প্রকাণ্ড পাতাল-গুহার ভিতর বরফ-মেঝে থেকে ভেসে উঠল দ্য শ্যাডো। পঞ্চাশ ফুট উপরে উঠে থামল রানা। বাইরে মড়মড় আওয়াজ শুরু হয়েছে। থরথর করে কাঁপছে গুহা। ছাত থেকে খসে পড়ছে বড় বড় বরফের চাঁই। ধুপধাপ পড়ছে বিমানের উপর।

চারপাশে যেন কেয়ামত শুরু হয়েছে।

রানা ঘড়ি দেখল: ১০:৫৬

দ্য শ্যাডোর টিনটেড-গ্লাস ক্যানোপির ভিতর দিয়ে চেয়ে রয়েছে। মাতালের মত টলছে প্রকাণ্ড গুহা। ওর মনে হলো, গোটা আইস শেলফ গিয়ে পড়েছে সাগরে। সরে গেছে মেইনল্যাণ্ড থেকে।

'আপনি কী করছেন, ভাই?' মিসাইল বে-র পিছন থেকে বলল হাবিব।

'আগে উল্টে যাক আইসবার্গ, সেজন্য অপেক্ষা করছি,' বলল রানা।

হঠাৎ তিশার গোঙানির আওয়াজ শুনল। প্রায় ধমকে উঠল: 'ডক্টর হাবিব! ওকে চিকিৎসা দিন! ...মেরি! তুমি এখানে চলে এসো! তোমার সাহায্য দরকার!'

বিমানের ককপিটে এসে ঢুকল মেরি। চেপে বসল গানার সিটে। 'আমাকে কী করতে হবে, আঙ্কেল?'

'ওদিকের ওই স্টিক দেখো,' বলল রানা। 'ওটার সঙ্গে ট্রিগার আছে।'

সামনেই কণ্ট্রোল স্টিক দেখল মেরি। 'পেয়েছি।'

'এবার ওটার ট্রিগারে চাপ দাও।'

কণ্ট্রোল স্টিকের ট্রিগারে চাপ দিল মেরি।

বিমানের দুই ডানার নীচ থেকে অতি উজ্জ্বল দুটো আলো ছিটকে গেল। গুহার সামনের দিকের দেয়ালে লাগল দুটো ট্রেসার বুলেট, ওখান থেকে ছিটকে বেরুল সাদা দুটো মেঘ।

'গুড শুটিং,' উৎসাহ দিল রানা। 'সবাই সতর্ক থাকো, শক্ত করে কিছু ধরো, যে-কোনও সময়ে উল্টে যাবে গুহা। ..মেরি, আমি বললে ট্রিগার টিপে ধরবে। না বলা পর্যন্ত ছাড়বে না।'

'জী,' ছোট্ট করে বলল মেরি।

ক্যানোপি দিয়ে বাইরে চাইল রানা। ভেঙে পড়ছে বরফের ছাত। ওরা যে সুড়ঙ্গ দিয়ে এখানে এসে উঠেছে, সেই লবণাক্ত পুকুরের পানি ছলকে গিয়ে লাগছে বরফের দেয়ালে।

মাত্র এক সেকেণ্ড পর অকল্পনীয় ভাবে নীচে নামল গোটা গুহা। সোজা নীচে নামছে সব। নাটকীয়ভাবে কাত হতে লাগল গুহা। ওই মুহূর্তে রানা বুঝল, গোটা উইলকক্স আইস স্টেশন নিয়ে মেইনল্যাণ্ড থেকে আলাদা হয়ে গেছে আইস শেলফ।

ওটা এখন হয়ে উঠেছে আইসবার্গ।

অপেক্ষা করো, নিজেকে বলল রানা।

এখন যে-কোনও সময়ে...

আবারও কাত হলো গুহা।

এবার আগের চেয়ে অনেক বেশি কাত হয়েছে। মাত্র তিন সেকেণ্ডে এক শ' আশি ডিগ্রি উল্টে গেল পুরো গুহা।

মাঝে মৌমাছির মত ভাসছে দ্য শ্যাডো!

পুরো উল্টে গেছে আইসবার্গ!

পুরো ডিগবাজি দিয়েছে পাতাল-গুহা!

হঠাৎ উপরের চওড়া সুড়ঙ্গ দিয়ে নামতে লাগল বিপুল পানি। একটু আগে পাতাল-গুহায় ঢুকতে ওই পথে আসতে হতো।

বরফের সুড়ঙ্গ এখন আর সাগরের সঙ্গে যুক্ত নয়, ওটার মুখ তাক করা আকাশে। ওই পথেই বেরুতে হবে রানাকে।

বরফ-সুড়ঙ্গ দিয়ে জলপ্রপাতের মত পানি নেমে আসতেই একপাশে বিমান সরিয়ে নিয়েছে। ত্রিশ সেকেণ্ড পর থামল পানির বর্ষণ। দুই ডানার হ্যালোজেন সার্চ লাইট জ্বেলে নিল রানা, জয়স্টিক টেনে নিল নিজের দিকে। সাড়া দিল যুদ্ধ-বিমান, একটু দুলতে দুলতে পিছিয়ে গেল।

ছাতের দিকে বিমানের নাক তাক করেছে রানা।

'ঠিক আছে, মেরি! এবার গুলি শুরু করো!'

ট্রিগার টিপে ধরল মেয়েটি।

দ্য শ্যাডোর দুই ডানা থেকে ছিটকে বেরুল ধপধপে সাদা আগুন, অতি উত্তপ্ত ট্রেসার বুলেট ছিঁড়েখুঁড়ে দিচ্ছে সুড়ঙ্গের দেয়াল। টানেলের ভিতর বরফের বাড়তি অংশ থাকলে তা উড়ে যাবে।

মেরি গুলি শুরু করতেই থ্রাস্টার ব্যবহার করেছে রানা। চড়ুই পাখির মত সুড়ঙ্গে ঢুকেই আকাশের দিকে নাক তুলেছে যুদ্ধ-বিমান। ঠিক তখনই পিছনে বিকট আওয়াজে ধসে পড়ল প্রকাণ্ড গুহার বর্তমানের ছাত।

দ্য শ্যাডোর দুই ডানার মেশিনগান থেকে বেরুচ্ছে অজস্র ট্রেসার বুলেট। বরফ-সুড়ঙ্গের বাধা ছিটকে দেবে। মসৃণ হতে হবে সামনের পথ। খাড়া ভাবে উঠছে কালো বিমান।

সুড়ঙ্গের ভিতর রানা পিছনে ফেলছে সাদা মেঘ। সামনের

সুড়ঙ্গ চেপে এলেই কাত করছে বিমানকে। আশা করছে, মেরির ট্রেসার বুলেট বাধা দূর করবে।

বিমানের মিসাইল বে-র পিছন-দেয়ালে গুটিসুটি মেরে শুয়েছে তিশা ও হাবিব, কিছুই করবার নেই ওদের। বিমান থেকে ছুটছে অসংখ্য বুলেট। চারপাশে বিস্ফোরণের আওয়াজ। টানেল বেয়ে উঠছে দ্য শ্যাডো। রানা যেন রেসের গাড়ির ড্রাইভার। ভয়ের অনুভূতি হারিয়েছে, চাপা উত্তেজনা নিয়ে ছুটছে প্রচণ্ড গতি তুলে।

হঠাৎ বিমানের পিছনে শুরু হলো সুড়ঙ্গে বিপুল ধস, ভেঙে পড়ছে চারপাশের বরফ-দেয়াল। যে-কোনও সময়ে বিমানটাকে গিলে নেবে ওই বরফ-ধস।

চারপাশে বুম! বুম! বুম! আওয়াজ।

দ্রুতগামী বিমানের পিছনে সুড়ঙ্গ-প্রাচীর থেকে নীচে পড়ছে মস্ত সব বরফের চাঁই। এদিকে টানেলের উপর অংশে লাগছে বুলেট, পরিষ্কার করছে পথ, কিন্তু পিছন থেকে ধেয়ে আসছে সুড়ঙ্গের ভয়ঙ্কর ধস।

ককপিটে রানার মনে হলো, কোনও ভিডিয়ো-গেম খেলছে ও। পিছন সিটে চোখ বুজে ট্রিগার টিপে বসে আছে মেরি। সাঁই-সাঁই করে পিছনে পড়ছে সুড়ঙ্গ। উপর থেকে বড় চাঁই পড়তে দেখলে বিমানকে কাত করে নিচ্ছে রানা।

সরু চোখ করে সামনে চেয়ে আছে। সুড়ঙ্গের দেয়াল মসৃণ করছে বুলেট, তৈরি করছে পথ। পরের সেকেণ্ডে দেখা যাচ্ছে ওই পথ পেরিয়ে এল যুদ্ধ-বিমান। হঠাৎ বুম! করে বিকট আওয়াজ হলো। ধসে পড়েছে গোটা সুড়ঙ্গ। আর ওই একই সময়ে রানা দেখল চারপাশে আকাশ।

আইসব্যার্গের সুড়ঙ্গ থেকে ছিটকে বেরিয়েছে দ্য শ্যাডো, খাড়া ভাবে উঠতে লাগল আকাশে। একবার কাঁধের উপর দিয়ে পিছনে চাইল রানা। এখন আর উইলকক্স আইস স্টেশন নেই। ওখানে

উল্টে যাওয়া প্রকাণ্ড এক আইসবার্গ।

আগে যেটা আইস শেলফ ছিল, এখন তা হিমশৈল। পানির শত শত ফুট তলের বরফের তীক্ষ্ণ সব চূড়া এখন আকাশের দিকে মাথা তুলেছে, যেন পাহাড়ের শৃঙ্গ।

অনেক নীচে কালো এক মস্ত গর্ত। ওটাই সেই সুড়ঙ্গ। ওখান থেকে ছিটকে বেরিয়ে এসেছে ওদের যুদ্ধ-বিমান।

হঠাৎ সাগরের কাছে নড়াচড়া দেখল রানা। জিনিসটা সরু এবং সাদা, লেজে দীর্ঘ আগুন নিয়ে ছুটে চলেছে নতুন আইসবার্গ লক্ষ্য করে।

ক্রুজ মিসাইল।

গর্জন ছাড়তে ছাড়তে উঠছে দ্য শ্যাডো, এবার বিমান সোজা করে নিল রানা। নীরবে নীচে চেয়ে রইল।

এক সেকেণ্ড পর আইসবার্গের বুকে গিয়ে বিঁধল নিউক্লিয়ার-টিপড মিসাইল। তিন সেকেণ্ড কিছুই হলো না, তারপর ডেটোনেট করল নিউক্লিয়ার ডিভাইস।

দ্য শ্যাডোর অনেক নীচে বিস্ফোরিত হলো পারমাণবিক বোমা, অত্যুজ্জ্বল আলো ধাঁধিয়ে দিল ওদের চোখকে।

মুহূর্তে গুঁড়ো হয়ে গেল জমাট-বাঁধা বরফের পাহাড়, ভয়ঙ্কর শক ওয়েভে বাতাসে মিলিয়ে গেল সুড়ঙ্গ। ব্লাস্ট ওয়েভ নেমে গেল সাগরের দিকে। পথে যা পেল, বাষ্প করে দিল। প্রকাণ্ড সব ঢেউ তৈরি হলো সাগরে। তীরের দিকে ছুটল ভয়ঙ্কর বান। ভয়ানক ভাবে দুলিয়ে দিতে লাগল প্রকাণ্ড আইসবার্গকে, যেন ভঙ্গুর খেলনা নিয়ে খেলছে দুষ্টু বাচ্চা। মস্ত কোনও নিউক্লিয়ার ব্লাস্ট হয়নি, মাত্র সাড়ে তিন কিলোমিটার র‍্যাডিয়াসের। কিন্তু আসলে ছোট কোনও নিউক্লিয়ার এক্সপ্লোশন বলতে কিছুই নেই।

ওটার কাজ শেষ হয়নি।

হঠাৎ প্রকাণ্ড এক ব্যাঙের ছাতা তৈরি হলো নীচে। অস্বাভাবিক

দ্রুত গতি তুলে উঠে আসতে লাগল আকাশ বেয়ে। মনে হলো যে-কোনও সময়ে খপ্ করে ধরবে যুদ্ধ-বিমানকে।

আবারও বিমান খাড়া করে নিল রানা, তীর বেগে উঠতে লাগল উপরে। যেভাবে হোক ওই ব্যাঙের ছাতা পিছনে ফেলতে হবে। তীব্র গতিতে ছুটে আসছে কালো মেঘ। আকাশ চিরে গর্জন ছাড়তে ছাড়তে উঠছে দ্য শ্যাডো। পূর্ণগতি নিয়ে কাজ করছে দুই জেট ইঞ্জিন। রানা বুঝল, ওরা হারতে বসেছে। ভীষণ গতি তুলে উঠছে ব্যাঙের ছাতা, যে-কোনও সময়ে গিলে নেবে ওদেরকে।

তারপর ঘন কালো মেঘের চূড়া শেষসীমায় পৌঁছে গেল। মাত্র পঁচিশ ফুট উপরে রইল বিমান, এখনও উঠছে নিরাপদ দূরত্বে যাওয়ার জন্য।

কয়েক সেকেণ্ড পর বাঁক নিল রানা, সোজা রওনা হয়ে গেল সাগরের দিকে।

বাইশ

বহু নীচে সাগর রেখে ছুটে চলেছে দ্য শ্যাডো, নাক তাক করেছে উত্তরদিকে। চারপাশে কুচকুচে আঁধার, বহু দূর-দিগন্তে আবছা কমলা আলো। প্রকাণ্ড ব্যাঙের ছাতার মত মেঘ পিছন দিগন্তে ফেলে এসেছে রানা।

কিছুক্ষণ পর অটোপাইলট বাটন পেল্ল, ওটা এনগেজ করে মিসাইল বে-তে ফিরল তিশার খবর নেয়ার জন্য।

ও কেমন আছে?' জানতে চাইল রাশেদ হাবিবের কাছে। মেঝেতে শুয়ে আছে তিশা, ভীষণ ফ্যাকাসে মুখ। জলপাইয়ের মত ত্বকের রং কেমন ম্লান। চোখ বুজে আছে।

'অনেক রক্ত হারিয়েছে,' বলল হাবিব। 'হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া জরুরি।'

ঠিক তখন চোখ মেলল তিশা। আস্তে করে বলল, 'আমরা জিতলাম তো?'

অবাক চোখে ওকে দেখল রানা ও হাবিব।

মৃদু হাসল রানা, 'হ্যাঁ, আমরাই জিতেছি, তিশা। কেমন বোধ করছ?'

'ভয়ঙ্কর খারাপ, স্যর,' আবারও চোখ বুজে ফেলল তিশা।

চাপা শ্বাস ফেলল রানা। ভাবতে শুরু করেছে কোথায় যাবে। সবচেয়ে ভাল হয় কোনও জাহাজে নামতে পারলে। সেক্ষেত্রে...

হ্যাঁ... সাগরের ওদিকে কোথাও আছে নুমার জাহাজ। ওখানে থাকবেন নুমা চিফ জর্জ হ্যামিলটন। ওখানে ওদের কোনও বিপদ হবে না।

ঘুরে ককপিটের দিকে রওনা হবে, এমন সময় তিশার বুক পকেটে ডায়েরি দেখল রানা। ওটা অর্ধেক বেরিয়ে আছে।

ওটা নিল ও, দ্রুত ফিরে এল ককপিটে। দেরি না করে বসল পাইলটের সিটে। দ্য শ্যাডোর রেডিয়ো চালু করল। 'নুমা ভেসেল। নুমা ভেসেল। মাসুদ রানা... মাসুদ রানা বলছি। ডু ইউ কপি?'

অন্য দিক থেকে কোনও সাড়া নেই।

আবারও রেডিয়ো করল রানা। কোনও জবাব এল না। ডায়েরির উপর চোখ পড়ল ওর। ভাঁজের ভিতর কয়েকটা আলগা কাগজ। তিশা বোধহয় জরুরি কোনও কাগজ রেখেছে।

একটা পাতা বের করে চোখ বোলাল। ওখানে লেখা:

ডিজাইন প্যারামিটার্স ফর দ্য বি-৭এ দ্য শ্যাডো

এই অ্যাটাক এয়ারক্রাফটের রয়েছে সম্পূর্ণ কনভেনশনাল এবং ইলেকট্রনিক ইনভিযিবিলিটির ক্ষমতা। এটি রেট্রোগ্রেড থ্রাস্টার সিস্টেম ব্যবহার করে, অর্থাৎ এসটিওভিএল। রয়েছে মালটিপল-লঞ্চ বিভিআর মিডিয়াম-টু-লং-রেঞ্জ (২৫০ এনএম) এয়ার-টু-এয়ার/এয়ার-টু-গ্রাউণ্ড মিসাইল। উনিশ শ' সাতাত্তর সালের প্রথম দিন এই যুদ্ধ-বিমানের জন্য ২৫৩-৭৭২-১ টেণ্ডারে যোগ দিয়েছে জেনারেল অ্যারোনটিক্স লিমিটেড এবং হাইটেক লিমিটেড।

পাতার নীচে সংক্ষিপ্ত অক্ষরগুলো লিখে দেয়া হয়েছে।

এসটিওভিএল অর্থাৎ, শর্ট-টেক-অফ/ভার্টিকেল-ল্যাণ্ডিং। বিভিআর অর্থাৎ, বিঅণ্ড ভিশুয়াল রেঞ্জ।

বুঝতে দেরি হয়নি রানার, অনেক দূর থেকে মিসাইল পৌঁছবে টার্গেটে, এবং লক্ষ্যভেদ করতে কোনও অসুবিধাও থাকবে না। বিমান অদৃশ্য বলতে বোধহয় রেইডার এই বিমানকে কখনও ধরবে না।

ভুরু কুঁচকে গেল রানার। আবার পড়ল প্রথম লাইন।

কনভেনশনাল ইনভিসিবিলিটি বলতে কী বোঝাতে চাইছে?

পরের কাগজে চোখ বোলাল। মনে হলো হাইটেক লিমিটেডের টেণ্ডার পেপার। ওখানে লেখা:

হাইটেক লিমিটেডের দেয়া বিশেষ কিছু সুবিধা

মাঠ পর্যায়ে হাইটেক লিমিটেডের বিজ্ঞানীরা দেখেছেন, রেইডার থেকে অদৃশ্য হওয়ার জন্য নানা কাজ করা যেতে পারে। রেইডার ধরতে পারে না এমন রং ব্যবহার করা যেতে পারে। এফ-১১৭এ স্টেলথ ফাইটারের মত খাড়া ফিউজেলাজ তৈরি

সম্ভব। রেইডার ক্রস-সেকশন কমিয়ে আনাও যায়। কিন্তু কনভেনশনাল ইনভিযিবিলিটি অর্জন এখনও পর্যন্ত অসম্ভব। কিন্তু ঠিক তাই করবে যুদ্ধ-বিমান বি-৭এ দ্য শ্যাডো।

হাইটেক লিমিটেড এমনই একটি সিস্টেম তৈরি করেছে। ওই ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফিল্ড সম্পূর্ণ আড়াল দেবে বিমানকে। মানুষ দেখবে না কিছুই। ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফিল্ড পাল্টে দেবে বিমানের চারপাশের মলিকিউয়াল স্ট্রাকচার, অর্থাৎ নির্দিষ্ট আলোর কারণে নকল দৃশ্য দেখবে সবাই। একইসঙ্গে এই বিমান এড়িয়ে যাবে রেইডার তরঙ্গকে। শুধু তাই নয়, এই বিমান...

চমকে গেছে রানা, চোখ সরু করে পড়তে শুরু করেছে। কিছুক্ষণ পর যা খুঁজছে, পেয়ে গেল।

হাইটেক ওটার নাম দিয়েছে, ক্লোকিং ডিভাইস।

এই সিস্টেম ব্যবহার করলে বিমান থাকবে রেইডারের আওতার বাইরে, একইসঙ্গে কেউ দেখবে না এই বিমানকে উড়তে। এতদিন ধরে শত্রু রেইডার ফাঁকি দিয়েছে স্টেলথ বিমান, কিন্তু লোকের চোখ এড়াতে পারেনি। চল্লিশ মাইল দূর থেকেও বিলিয়ন ডলারের স্টেলথ অ্যাওয়্যাক্স দেখা যায় বাড়ির জানালা দিয়েও।

কিন্তু এই বিমান সব উল্টে দেবে। নকল আলো বেরুবে এটা থেকে, পরিষ্কার আকাশ দেখবে মানুষ, কিন্তু পাইলট তখন চোখের সামনে দিয়ে চলেছে নিজের মিশনে।

বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে রানার। কিন্তু মনের গভীরে টের পেল, এই অদ্ভুত ঘটনা ঘটতেও পারে। অত্যন্ত জোর দিয়ে লেখা হয়েছে টেণ্ডারে।

রেফ্র্যাকশন, মনে মনে বলল রানা। ফিশবাউলে এমন দেখা যায়। আলো ওখানে পড়ে অন্যরকম হয়ে যায়। এটা হয় কারণ

ওই পানির চেয়ে বাতাস অনেক হালকা। বিকৃত হয় আলো, দেখা যায় মাছ আছে অন্য জায়গায়।

কিন্তু বাতাসে রেফ্র্যাকশন?

হয়তো সম্ভব। ভারী বাতাসকে আর্টিফিশিয়ালি ইলেকট্রিসিটি দিয়ে বদলে দেয়া হবে।

কিন্তু করবে কীভাবে?

নিশ্চয়ই কোনও কৌশল বের করেছে।

তারপর ওর মনে পড়ল প্লুটোনিয়াম কোরের কথা।

এই নতুন বৈপ্লবিক সিস্টেমে নিউক্লিয়ার মলিকিউল দিয়ে পাল্টে দেয়া হবে বাতাস?

পরের প্যারাগ্রাফ পড়তে শুরু করল রানা। ওর মনে হলো সরকারী টেণ্ডার জিতে নেয়ার জন্য কথাগুলো লেখা হয়েছে:

এটা মেনে নিতে হবে, দ্য শ্যাডোর ক্লোকিং সিস্টেম ব্যবহার করতে বিপুল পরিমাণ নিজ পাওয়ার লাগবে। জেনারেল অ্যারোনটিক্স লিমিটেড ও হাইটেক লিমিটেডের পরীক্ষায় দেখা গেছে, ছুটন্ত বিমানের চারপাশের বাতাস বদলে নেয়ার জন্য প্রয়োজন দুই দশমিক একাত্তর গেগাওয়াট ইলেকট্রোম্যাগনেটিক এনার্জি। এটা পাওয়া সম্ভব শুধু নিয়ন্ত্রিত পারমাণবিক রিয়্যাকশন থেকে। এই কারণে...

নিচু সুরে শিস বাজাল রানা। জেনারেল অ্যারোনটিক্স আর হাইটেক ইউএস এয়ার ফোর্সের জন্য যে বিমান দিতে চেয়েছে, ওটার ভিতর থাকবে নিউক্লিয়ার রিয়্যাক্টর। কোনও সন্দেহ নেই বিমানটা তৈরি করেছে অ্যাণ্টার্কটিকায় গিয়ে।

ডকুমেণ্টেশন নামিয়ে রাখল ও, আবারও রেডিয়ো চালু করল।

'নুমা শিপ... নুমা শিপ... মাসুদ রানা বলছি'। রিপিট করছি, নুমা শিপ, আমি মাসুদ রানা। দয়া করে...'

হঠাৎ করেই ককপিট রেডিয়োতে ভেসে এল একটা কর্কশ কণ্ঠ: 'আনআইডেণ্টিফায়েড এয়ারক্রাফট, আপনি বলছেন নিজের নাম মাসুদ রানা। ধরে নিচ্ছি আপনি ওই বিমানের পাইলট। আমি গোল্ডেন লিডার, ইউএস এয়ার ফোর্স।'

রেইডার স্ক্রিনে চাইল রানা। অ্যান্টার্কটিকার উপকূল থেকে প্রায় দুই শ' নটিকাল মাইল সরে এসেছে, কিন্তু রেইডার স্ক্রিনে কিছুই নেই।

চমকে গেছে রানা, দূরের ওই বিমান স্টেলথ মোড অপারেট করছে।

'গোল্ডেন লিডার, আমি ইউএস এয়ার ফোর্সের আনমার্কড প্রোটোটাইপ ফাইটার-বম্বার নিয়ে উড়ছি। কারও ক্ষতি করব না।'

ক্যানোপির বামদিকে চোখ পড়ল ওর। দিগন্তে ছয়টি বিন্দু ভাসছে।

'আনআইডেনটিফায়েড এয়ারক্রাফট, আপনি আমাদের এস্কোর্টে ফিরবেন ইউএস নেভি ক্যারিয়ার লিংকনে, ওখানে নামবেন আপনি।'

'গোল্ডেন লিডার, আমি আপনাদের এস্কোর্ট চাইছি না,' বলল রানা। 'আমি...'

'আনআইডেনটিফায়েড এয়ারক্রাফট, সেক্ষেত্রে আমরা মিসাইল ছুঁড়তে বাধ্য হব।'

এক সেকেণ্ড দ্বিধা করল রানা, তারপর বলল, 'গোল্ডেন লিডার, নিজেকে আইডেণ্টিফাই করুন।'

'কী বললেন?' ত্যাড়া স্বরে বলল লোকটা।

'আপনার নাম কী, গোল্ডেন লিডার?'

'আমার নাম ক্যাপ্টেন জন সিমন, ইউনাইটেড স্টেটস এয়ার ফোর্স। এবং হুকুম করছি: আপনি এখনই আত্মসমর্পণ করুন। আমরা আপনাকে ঘিরে ফেলছি।'

সিমন, ভাবল রানা। পকেট থেকে কাগজ বের করল। দ্রুত চোখ বোলাতে শুরু করেছে। চোখ আটকে গেল ওর শেষের লাইনে:

জন সিমন। ইউএসএএফ। ক্যাপ্টেন। ?

এটা কি আইসিজিদের কনভেনশন?

বুকের ভিতর হিম হয়ে এল রানার।

আর ঠিক তখনই ছয়টি এফ-২২ ফাইটার বিমান চারপাশ থেকে ঘিরে ফেলল ওকে। দুটো সামনে, দুটো দু'পাশে, পিছনে দুটো। যথেষ্ট দূরত্ব বজায় রাখছে। আন্দাজ দুই শ' গজ সরে চলছে সমান্তরালে। রানার রেইডার স্ক্রিনে কোনও ফোঁটা নেই, কিন্তু নিজ চোখে দেখছে ওগুলোকে।

কয়েক সেকেণ্ড পর তীক্ষ্ণ গুঞ্জন এল ককপিট স্পিকার থেকে।

একটা এফ-২২ ওর উপর মিসাইল লক করেছে।

'আপনি কি চান, ক্যাপ্টেন সিমন?' জানতে চাইল রানা।

'আমাদের কাজ আপনাকে নিরাপদে ইউনাইটেড স্টেটস ক্যারিয়ার লিংকনে পৌঁছে দেয়া।'

'আপনি কি মিসাইল ছুঁড়বেন?'

'আমাদের কাজ আরও কঠিন করে তুলবেন না, মিস্টার রানা।'

'জানতে পারি কেন মিসাইল লক করলেন?'

'বাধ্য হলে মিসাইল ছুঁড়ব আমরা।' কর্কশভাবে হাসছে লোকটা। 'আপনি শেষ, মাসুদ রানা।'

রানার চোখ ফিরল ডিসপ্লের উপর। তিন সেকেণ্ড পর-টিপে

দিল 'ক্লোক মোড'।

মনে মনে বলল, আমাদের হারাবার কিছুই নেই।

মাত্র এক সেকেণ্ড পর দুই শ' গজ পিছনে একটা এফ-২২ যুদ্ধ-বিমান উগরে দিল মিসাইল।

তেইশ

কয়েক সেকেণ্ড পর যা ঘটল, তা অবিশ্বাস্য।

ছয় যুদ্ধ-বিমান বহরের নেতা ক্যাপ্টেন জন সিমন তার এফ-২২-র ক্যানোপি দিয়ে সামনে চেয়ে আছে। সাগরের উপরের আকাশে ভোঁতা কমলা আলো। কালো এয়ারক্রাফটের টেইল থ্রাস্টার জ্বলজ্বল করছে।

জন সিমনের বিমানের ডানা থেকে রওনা হয়েছে বাষ্পের মত সাদা আগুন নিয়ে মিসাইল, চলেছে কালো ফাইটারের দিকে। এবার টার্গেটে গিয়ে লাগবে।

কিন্তু টলমল করে ওঠা আলোয় হঠাৎ করেই নীচে নামতে শুরু করল কালো বিমান। ওটার চারপাশে যেন ভাপ উঠছে। দুপুরের রোদে দূরের পাক্কা সড়কে এমন মরীচিকা দেখা যায়। পরক্ষণে হঠাৎ করেই হারিয়ে গেল কালো বিমানটা। যেন কোনও পর্দা নেমে এসে আড়াল করে দিয়েছে ওটাকে।

এক সেকেণ্ড পর দেখা গেল, ওই বিমান আর ওখানে নেই।

টার্গেট হারিয়ে পাগল হয়ে উঠেছে ক্যাপ্টেন সিমনের মিসাইল।

প্রথম টার্গেট হারিয়ে দ্বিতীয় টার্গেট খুঁজতে শুরু করেছে।

রানার দ্য শ্যাডোর সামনে ভাসছিল দুই এফ-২২-র একটা, সোজা গিয়ে ওটার টেইলপাইপের ভিতর সেঁধে গেল মিসাইল। সঙ্গে সঙ্গে বিস্ফোরিত হলো ফাইটার। অন্ধকারাচ্ছন্ন আকাশে চারপাশে ছিটকে গেল উজ্জ্বল কমলা আগুন।

থতমত খেল সিমন, হেডসেটে চিৎকার করে আলাপ শুরু করেছে অন্যান্য পাইলট।

'...স্রেফ মিলিয়ে গেল।'

'কী করে...'

'...গেল কই?'

'শালা হঠাৎ করে...'

নিজের স্কোপ দেখল সিমন। রেইডারে কালো বিমান নেই। ওটা খুঁজতে শুরু করল তার চোখ। আকাশে কালো বিমানকে থাকতেই হবে। কোথায় গেল? কিন্তু কোথাও তো...

তারপর দেখতে পেল সে।

অন্তত ভাবল, দেখতে পেয়েছে।

কমলা রঙের দূর-দিগন্তে মরীচিকার মত কী যেন দুলতে দুলতে হারিয়ে গেল। ওটা যেন ঘষে দেয়া কাঁচের লেন্স, দিগন্তের উপর। ওখানে বারবার বলকে উঠছে বাতাস।

নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারল না জন সিমন।

দ্য শ্যাডোর ভিতর এরই ভিতর একের পর এক সুইচ টিপতে শুরু করেছে মাসুদ রানা।

ওই মিসাইল ওকে শেষ করতে পারেনি। রেডিয়োতে শুনতে পেল পাইলটদের বক্তব্য। পাঁচ এফ-২২ ওকে দেখছে না। এবার সময় হয়েছে পাল্টা জবাব দেয়ার।

'মিস্টার হাবিব, তিশাকে এখানে নিয়ে আসুন! লিলিকেও!'

নুমা শিপ দ্য অরিগন মাত্র পঁচাশি নটিক্যাল মাইল দূরে। বারো মিনিট লাগবে ওখানে পৌঁছুতে।

ঝলমলে সবুজ আলো আসছে ডায়ালগুলো থেকে, কমলারঙা দূর-দিগন্তের দিকে চেয়ে আছে রানা। ক্লোকিং ডিভাইস অফ করে দিল। চালু করল অটোপাইলট। বড় করে শ্বাস ফেলল। ছেঁড়া-ছেঁড়া ভাবে মনে পড়ছে গত চব্বিশ ঘণ্টার সমস্ত ঘটনা।

প্রথমে এল ফ্রেঞ্চরা। তারপর ব্রিটিশ। এল আইসিজি। ওর নিজের লোক একে একে মরল। এমন এক মিশনে ওকে পাঠানো হলো, যা কখনও সফল হবার নয়। একের পর এক প্রিয় মুখ চোখের সামনে ভেসে উঠছে। দবির, নিশাত আপা, মোরশেদ, হাক্সলে...

এই মানুষগুলো মরল আমেরিকার জনা কয়েক ক্ষমতালোভী রাজনৈতিক ও সামরিক নেতাদের নীচতার কারণে। তাদের চাই এক্সট্রা-টেরেস্ট্রিয়াল টেকনোলজি— বন্ধু-শত্রু সবাইকে খুন করে হলেও।

বুকটা ভারী হয়ে উঠল রানার। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে বসে রইল, তারপর সামনে ঝুঁকে কয়েকটা সুইচ টিপল। স্ক্রিনে দপদপ করতে লাগল লেখা:

'মিসাইল আর্মড। টার্গেটিং...'

আরেকটা সুইচ টিপল রানা।

'ম্যানুয়াল টার্গেটিং সিলেক্টার।'

স্ক্রিনে নিজ হাতে ঠিক করে দিল টার্গেট। জয়স্টিকের বাটন টিপে সিলেক্ট নিশ্চিত করল।

স্ক্রিনে আরও কয়েকটা অপশন এসেছে। ঠাণ্ডা মগজে নিজের পছন্দের অপশন সিলেক্ট করল রানা।

এবার টিপে দিল জয়স্টিকের ট্রিগার।

মিসাইল বে-র র‍্যাক ঘুরতে শুরু করেছে। এক সেকেণ্ড পর ষষ্ঠ মিসাইল নেমে গেল নীচের আকাশে। চালু হয়ে গেছে থ্রাস্টার, কয়েক মুহূর্ত পর দূর-দিগন্তের আকাশে হারিয়ে গেল মিসাইল। সোজা উঠে চলেছে কালো মহাশূন্যের দিকে।

দক্ষিণ সাগরের মাঝে চুপ করে দুলছে নুমার জাহাজ দ্য অরিগন।

মাঝারি আকারের জাহাজ ওটা। দৈর্ঘ্য পাঁচ শ' বিশ ফুট। জাহাজের মাঝে সুপারস্ট্রাকচার। নুমার টেকনিশিয়ানরা ওই অংশের নাম রেখেছে 'দ্বীপ'। পিছনের ডেকে নামতে পারে দুটো কপ্টার। এমনিতে যে যার কাজে ব্যস্ত থাকে ডেক হ্যাণ্ডরা। কিন্তু আজ গোটা ডেক ফাঁকা। কোথাও কিছু নড়ছে না।

ভুতুড়ে মনে হচ্ছে জাহাজটাকে।

পিছনের হেলিপ্যাডে খুব ধীরে নামছে দ্য শ্যাডো। ডেকের দিকে আগুনের মত গরম গ্যাস ছুঁড়ছে আট রেট্রো। মাত্র এক মিনিটের মাথায় আলতো ভাবে হেলিপ্যাডে নেমে এল কালো যুদ্ধ-বিমান।

ক্যানোপির ভিতর দিয়ে চাইল রানা।

কোথাও কোনও নড়াচড়া নেই। যেন সবাই চলে গেছে জাহাজ ত্যাগ করে। দীর্ঘশ্বাস ফেলল রানা। এমনই হবে, ভেবেছিল।

'ঠিক আছে, এবার নেমে পড়তে হবে,' বলল।

রাশেদ হাবিব ও মেরি ককপিট থেকে বেরিয়ে গেল। তাদের পিছু নিয়েছে লিলি। রানা আগেই বলে দিয়েছে, তিশাকে নিয়ে নিজে নামবে।

ককপিট থেকে বেরিয়ে আসবার আগে, কাঁধে ঝুলন্ত স্যাচেল থেকে রুপালি একটা ক্যানিস্টার নিল রানা।

ওই ট্রাইটোনাল চার্জের টাইমার দশ মিনিটে স্থির করল, তারপর রেখে দিল পাইলটের সিটে। এবার পাঁজাকোলা করে তুলে নিল তিশাকে, ককপিট থেকে বেরিয়ে এল মিসাইল বে-তে। সাবধানে দ্য শ্যাডো থেকে নেমে পড়ল।

জাহাজের ডেকে ওরা এই ক'জন ছাড়া কেউ নেই।

ম্লান কমলা গোধূলীর আলোয় কালো বিমানের সামনে দাঁড়িয়ে ওরা। ওদের সঙ্গে যারা উইলকক্স আইস স্টেশনে গিয়েছিল, তাদের কেউ আর নেই।

নাক নিচু করে চেয়ে আছে বিশাল শিকারি পাখির মত দ্য শ্যাডো। কালো ডানা নীচের দিকে নেমে এসেছে। অ্যান্টার্কটিকার ম্লান আলোয় একবার ওটার দিকে চাইল রানা, তারপর দীর্ঘশ্বাস চেপে সবাইকে হাতের ইশারা করল। সুপারস্ট্রাচকারের দিকে হাঁটতে শুরু করল মেরি ও হাবিব। তিশাকে বুকে তুলে সাবধানে চলেছে রানা। সবার পিছনে থপথপ করে আসছে লিলি, এদিক ওদিক চেয়ে অবাক হয়ে দেখছে বিশাল জাহাজ।

প্রায় পৌঁছে গেল ওরা 'দ্বীপ' নামের সুপারস্ট্রাকচারের পিছন অংশে। তখনই বড় একটা দরজা খুলে গেল, উজ্জ্বল আলো এসে পড়ল ডেকের উপর। একজন বেরিয়ে এসেছে। ছায়ার মত, তবুও বয়স্ক ভদ্রলোককে চিনতে দেরি হলো না রানার।

নুমার চিফ, অবসরপ্রাপ্ত অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন।

চার বছর আগে আমেরিকার বর্তমান প্রেসিডেন্ট তাঁকে নিজ ভাইস-প্রেসিডেন্ট করতে চেয়েছিলেন। নুমা ত্যাগ করতে রাজি হননি হ্যামিলটন।

রানা সামনে এসে দাঁড়াতেই ক্লান্ত হাসলেন তিনি। 'তোমাকে নিয়ে আলাপ করছে অনেকে।'

ভুরু কুঁচকে গেল রানার। এমন শীতল অভ্যর্থনা আশা করেনি। সাধারণত ওকে বুকে জড়িয়ে ধরেন হ্যামিলটন। বলেন,

'মাই বয়, কেমন চলছে?'

'জাহাজের আর সবাই কোথায়, অ্যাডমিরাল?' জানতে চাইল রানা।

'ওদেরকে ওরা...' বলতে শুরু করেও থেমে গেলেন হ্যামিলটন। হঠাৎ দরজা দিয়ে বেরিয়ে এসেছে এক লোক। অ্যাডমিরালকে ঘষা দিয়ে রানার সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

এই লোককে আগে কখনও দেখেনি রানা। মাথা ভরা পাকা চুল, সাদা গোঁফ, ঢালের মত বুক। লোকটার পরনে নেভির নীল ইউনিফর্ম। বুক পকেটের উপর অসংখ্য মেডেল। লোকটার বয়স হবে ষাট মত, আন্দাজ করল রানা।

'ও, তা হলে এই সেই মাসুদ রানা,' বিধ্বস্ত যুবককে আপাদমস্তক দেখল সে। দু'হাতের ভাঁজে তিশাকে রেখেছে রানা।

'রানা,' আড়ষ্ট স্বরে বললেন হ্যামিলটন, 'ইনি অ্যাডমিরাল চাক হিউবার্ট, জয়েন্ট চিফস অভ স্টাফে নেভির রিপ্রেযেন্টেটিভ। চারঘণ্টা আগে জাহাজের কমাণ্ড নিজের হাতে তুলে নিয়েছেন।' থমথম করছে হ্যামিলটনের মুখ।

নিঃশব্দে শ্বাস ফেলল রানা।

জয়েন্ট চিফস অভ স্টাফ, অ্যাডমিরাল— ভাল।

আইসিজি সম্পর্কে যা বুঝেছে, ওই সংগঠনের মাথা বা মগজ বলতে জয়েন্ট চিফস। ও এখন চেয়ে আছে আইসিজির এক প্রধান হর্তাকর্তার দিকে।

'ঠিক আছে!' গলা উঁচু করল অ্যাডমিরাল চাক হিউবার্ট, 'এবার বেরিয়ে এসো তোমরা!'

পরক্ষণে হুড়মুড় করে সুপারস্ট্রাকচারের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল একদল লোক। পরনে তাদের নীল কভারল, হাতে উদ্যত অস্ত্র। দ্রুত চলে গেল তারা দ্য শ্যাডোর সামনে, ঘিরে ফেলল।

কড়া চোখে রানাকে দেখল অ্যাডমিরাল হিউবার্ট। 'দেখা

যাচ্ছে এই মিশন সময়ের পুরোপুরি অপচয় নয়। আপনার সঙ্গে এফ-২২-র ডগফাইটের কমেন্টারি শুনেছি। ক্লোকিং ডিভাইস, না? ভালই! বিনিময়ে আপনাদেরকে সহজ মৃত্যু উপহার দেয়া হবে।'

পিছনের ডেকের দিকে চাইল রানা। নীল কভারল পরা লোকগুলোর কয়েকজন উঠে গেছে দ্য শ্যাডোর ভিতরে।

'মিস্টার হ্যামিলটন,' বলল রানা, 'আমার সঙ্গের এই মেয়েটি গুরুতরভাবে আহত।'

আস্তে করে মাথা দোলালেন নুমা চিফ। গলা সামান্য উঁচু করে বললেন. 'ডেক হ্যাণ্ড, মেয়েটিকে ইনফারমারিতে নিয়ে যাও।'

দরজার ওপাশ থেকে এল এক তরুণ নুমা হ্যাণ্ড, রানার হাত থেকে সাবধানে তুলে নিল তিশাকে, চলে গেল সুপারস্ট্রাকচারের ভিতর।

মেরি ও হাবিবের দিকে চাইল রানা। 'আপনারা ওর সঙ্গে যান। লিলিকেও নেবেন।'

আস্তে করে মাথা ঝাঁকাল হাবিব, মেরিকে নিয়ে ঢুকে পড়ল দ্বীপের বুকে। দরজা পেরুনোর সময় একটু ইতস্তত করল লিলি, তারপর থপথপ আওয়াজ তুলে চলে গেল। নিজেও ওদিকে পা বাড়াল রানা, কিন্তু তখনই দ্য শ্যাডোর নীচ থেকে চিৎকার শোনা গেল।

'অ্যাডমিরাল!' হেঁড়ে গলায় ডাক দিয়েছে নীল কভারল পরা এক লোক। আঙুল তুলে কালো বিমান দেখাল সে।

'কী?' দ্রুত পায়ে বিমানের দিকে চলেছে চাক হিউবার্ট।

তার অনুচরের হাতে ট্রাইটোনাল ৮০/২০ চার্জ। ওটা পাইলট সিটে ফেলে এসেছিল রানা। কভারল পরা লোকটার সামনে পৌঁছে গেল অ্যাডমিরাল, মনে হলো না ওই বোমা দেখে বিচলিত হয়েছে। পঞ্চাশ গজ দূরে দাঁড়িয়ে আছে রানা, ওর দিকে ঘুরে চাইল সে। 'প্রমাণ নষ্ট করতে চাও, না?'

লোকটার হাত থেকে চার্জ নিল অ্যাডমিরাল, প্রেসারাইয্ড্ ঢাকনি খুলল, শান্ত ভঙ্গিতে ডিজআর্ম সুইচ টিপে দিল।

রানার দিকে চেয়ে হাসল। 'বহুবার জিতেছ, মাসুদ রানা, অনেক মানুষ মেরেছ, কিন্তু আমাকে হারানো এত সহজ নয়।'

কালো বিমানের সামনে দাঁড়িয়ে আছে অ্যাডমিরাল। নিষ্পলক চেয়ে রইল রানা। 'স্যর, আপনার জাহাজের ডেক নষ্ট করার জন্য দুঃখিত,' নিচু স্বরে বলল জর্জ হ্যামিলটনকে।

গভীর ভাবে চিন্তা করছিলেন নুমা চিফ, জানতে চাইলেন, 'কী যেন বললে, মাই বয়?'

জবাব দিল না রানা। ঠিক তখনই তীক্ষ্ণ একটা আওয়াজ শুরু হলো। পরক্ষণে কেউ বুঝবার আগেই দশগুণ বেড়ে গেল আওয়াজ। যেন দুনিয়ার বুকে ভয়ঙ্কর কোনও বজ্র পাঠিয়েছেন স্বয়ং স্রষ্টা। এর এক সেকেণ্ড পর দ্য শ্যাডোর ষষ্ঠ মিসাইল আকাশ চিরে চার শ' মাইল বেগে নেমে এল।

ফেটে পড়ল কালো বিমান, চারপাশে ছিটকে গেল লক্ষ টুকরো। ওটার উপর ওঠা লোক, বা দশ গজের ভিতর যারা ছিল, মুহূর্তে মারা গেল সবাই। দ্বিতীয় বিস্ফোরণ হলো বিমানের ফিউয়েল ট্যাঙ্কের কারণে। লাল আগুনের মস্ত বল উঠে গেল আকাশে। নানাদিকে ছুটতে লাগল আগুনের গোলা। মনে হলো খপ্ করে গিলে ফেলল অ্যাডমিরাল চাক হিউবার্টকে। আগুনের তাপ এতই বেশি, মুহূর্তে পুড়ে গেল লোকটার সারাশরীরের চামড়া।

মুরগির কাবারের মত ভাজা ভাজা হয়ে ডেকের উপর আছড়ে পড়ল লোকটা, তার আগেই মারা পড়েছে।

চব্বিশ

কিছুক্ষণ আগে অরিগনের ব্রিজে এসেছেন নুমা চিফ, অ্যাডমিরাল (অব.) জর্জ হ্যামিলটন। জাহাজ দক্ষিণ-সাগর চিরে পুবে চলেছে। ওদিক থেকে ভোরের সূর্য ওঠে।

রানার হাতে ধোঁয়া ওঠা কালো কফির মগ, একবার চুমুক দিল।

তিনঘণ্টা হলো নিজ মিসাইলের আঘাতে বিস্ফোরিত হয়েছে কালো বিমান, দ্য শ্যাডো।

ইনফারমারিতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে তিশাকে। আরও খারাপ হয়েছে ওর শারীরিক অবস্থা। প্রচুর রক্ত হারিয়েছে, আধঘণ্টা হলো কোমার ভিতর চলে গেছে।

নুমা চিফের স্টেটরুমে উঠেছে রাশেদ হাবিব ও মেরি ভিসার, দশমিনিট পেরুবার আগেই ঘুমিয়ে পড়েছে।

ডেকের নীচে ডাইভ প্রিপারেশন পুলে মহানন্দে জলকেলী করছে বাচ্চা সিল লিলি।

ডেক থেকে সুপারস্ট্রাকচারে ঢুকে প্রথমেই বাথরুমে গিয়ে হট শাওয়ার নিয়েছে রানা, তারপর ধার পাওয়া ট্র্যাকসুট পরে বেরিয়ে এসেছে।

নুমা চিফ জর্জ হ্যামিলটনের নির্দেশে অপেক্ষা করছিলেন দক্ষ ডাক্তার, রানাকে জোর করে ধরে নিয়ে গেছেন ইনফারমারিতে। ক্ষতগুলো পরিষ্কার করেছেন, তারপর মেরামত করেছেন পাঁজরের

ভাঙা হাড়। রানাকে বলেছেন, উন্নত চিকিৎসা দরকার। একবার হাওয়াই দ্বীপে পৌঁছে গেলেই হাসপাতালে ভর্তি করে দেবেন। আপাতত কয়েকটা পেইন কিলার দিয়েছেন। ওগুলো গিলে নেয়ার কিছুক্ষণ পর রানার মনে হয়েছে, নাহ্, কোথায়, কখনও কোনও সমস্যা ছিল না ওর।

ডাক্তারের কাছ থেকে ছাড়া পেয়ে অচেতন তিশার কটের পাশে থেমেছে রানা। চুপ করে ওখানেই বসে ছিল, তারপর ব্রিজে আসতে খবর পাঠালেন নুমা চিফ।

ব্রিজে পৌঁছে রানা দেখল, নুমা চিফ চেয়ে আছেন দূর-সাগরে। পাশে গিয়ে দাঁড়াতেই ঘুরে দাঁড়ালেন উনি, বললেন, 'ম্যাকমার্ডো থেকে খবর এসেছে, রানা। প্রায় বিধ্বস্ত এক মেরিন হোভারক্রাফট ওখানে পৌঁচেছে। পাঁচজন আরোহী ছিল। ড্রাইভার এক বাঙালি সৈনিক, সঙ্গে চারজন বিজ্ঞানী। এঁরা জানিয়েছেন, উইলকক্স আইস স্টেশন থেকেই এসেছেন। ...দু'জন নুমার বিজ্ঞানী। থ্যাঙ্কস্, রানা।'

আস্তে করে মাথা দুলিয়েছে রানা। নাজমুল ওর দায়িত্ব ঠিক ভাবেই পালন করেছে।

নরম স্বরে জর্জ হ্যামিলটন বললেন, 'অ্যাণ্টার্কটিকায় কী ঘটেছে খুলে বলবে আমাকে?'

মনে মনে কথাগুলো গুছিয়ে নিল রানা, তারপর বলতে শুরু করল। প্রথমে এল ফ্রেঞ্চ কমাণ্ডো, তারপর ব্রিটিশ এসএএস, শেষে হাজির হলো আইসিজি। দ্য শ্যাডোকে খুঁজে পেল ওরা। বাদ দিল না প্রাক্তন মেরিন মেজর রবিন কার্লটনের কথাও।

সব শুনবার পর থেকে চুপ হয়ে গেছেন জর্জ হ্যামিলটন, কী যেন ভাবছেন। থমথম করছে ব্রিজ, কেউ কিছু বলছে না।

আরেক চুমুক কফি নিল রানা। ব্রিজের পিছনে প্যানোর‍্যামিক জানালা, ওদিক দিয়ে দূরে চোখ গেল ওর। স্টার্নের ডেকে মস্ত

এক কালো গর্ত। দ্য শ্যাডোর উপর ওখানে পড়েছিল মিসাইল। পুড়ে কালো হয়ে গেছে ধাতব ডেক, এখানে ওখানে ঝুলছে তার ও কেবল।

ডেকের দুরবস্থার জন্য নুমা চিফের কাছে দুঃখ-প্রকাশ করেছে রানা। অখুশি মনে হয়নি ভদ্রলোককে। অ্যাডমিরাল চাক হিউবার্ট জোর করে তাঁর জাহাজ দখল করে নিয়েছিল। তারপর যখন হ্যামিলটন শুনলেন রানা এবং ওর দলের সবাইকে মেরে ফেলতে চেয়েছে আইসিজি, ওই অ্যাডমিরাল বা আইসিজির জন্য সামান্যতম করুণা আসেনি তাঁর মনে।

হেলিপ্যাডের গর্তটার দিকে চেয়ে আছে রানা। একটু আগে শেষ হওয়া মিশনের কথা আবারও ভাবতে শুরু করেছে। প্রিয় কয়েকজনকে হারাতে হয়েছে। খচখচ করছে ওর মন। ওদের তো এখানে আসবারই কথা ছিল না। আমেরিকাকে নেতৃত্ব দেয়া একদল বদমাসের জন্য সাদা মনের কয়েকজন মানুষ মারা গেল।

'স্যর,' ডাকল এক তরুণ রেডিয়ো-ম্যান।

একইসঙ্গে ওদিকে ঘুরে চাইলেন হ্যামিলটন ও রানা।

ব্রিজের সঙ্গে সংযুক্ত কমিউনিকেশন রুমে আলোকিত টেবিলের ওপাশ থেকে বলে উঠেছে তরুণ: 'স্যর, অদ্ভুত একটা তার পেলাম।'

'কে এবং কী লিখেছে?' ওদিকে পা বাড়ালেন হ্যামিলটন, পাশে রানা। আলোকিত টেবিলের সামনে গিয়ে থামল ওরা।

'কোনও জিপিএস ট্র্যান্সপণ্ডার সিগনাল, স্যর,' বলল তরুণ। 'অ্যান্টার্কটিকার একেবারে তীর থেকে আসছে। মেরিন কোড সিগনাল, স্যর।'

একটু সামনে ঝুঁকে গেল রানা। আলোকিত টেবিলের উপর কমপিউটার-জেনারেটেড ম্যাপ। একটা লাল বিন্দু টিপটিপ করছে উপকূলের কাছে। পাশে লেখা: '০২'।

ভুরু কুঁচকে গেল রানার। ওর মনে পড়ছে, পরিত্যক্ত লিটল আমেরিকা-৪ স্টেশনের কাছে নিজের ন্যাভিস্টার গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম ট্র্যান্সপণ্ডার চালু করেছিল। দলের নেতা হিসাবে ওর জিপিএস ট্র্যান্সপণ্ডারের কোড ছিল '০১'। দবির ছিল '০৫'। এক সেকেণ্ড পর রানা মনে পড়ল ওই কোড '০২' কার জিপিএস ট্র্যান্সপণ্ডার।

'মিস্টার হ্যামিলটন,' উত্তেজিত স্বরে বলল রানা। 'আমার সেকেণ্ড ইন কমাণ্ড নিশাত সুলতানা বেঁচে আছে!'

পুবে সূর্যোদয়ের দিকে ছুটে চলেছে দ্য অরিগন।

রানার বক্তব্য শুনে ম্যাকমার্ডো স্টেশনে যোগাযোগ করেছেন নুমা চিফ জর্জ হ্যামিলটন। ওই স্টেশনে তাঁর বিশ্বস্ত মেরিন দল রয়েছে, দেরি না করে তারা একটা প্যাট্রল বোট নিয়ে উপকূলে চলে গেছে নিশাত সুলতানাকে তুলে নেয়ার জন্য।

তার পর দিন প্রশান্ত মহাসাগরে প্রবেশ করল দ্য অরিগন। প্যাট্রল বোট থেকে একটা কল পেল রানা। তারা উপকূল থেকে সামান্য দূরে এক আইসবার্গের উপর পুরনো এক স্টেশনে নিশাতকে পেয়েছে। এই দলের সবার পরনে ছিল এয়ারটাইট রেডিয়েশন সুট।

প্যাট্রল বোটের স্কিপার আরও জানাল, নিশাত সুলতানা প্রচণ্ড হাইপোথারমিয়ায় ভুগছে। সামান্য রেডিয়েশনও লেগেছে। তাকে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছে।

কথাগুলো শুনছে রানা, এমন সময় তীক্ষ্ণ চিৎকার শুনতে পেল। ওদিকে ক্ষেপে উঠেছে কেউ। এক সেকেণ্ড পর কণ্ঠ চিনতে পারল রানা।

'কার সঙ্গে কথা বলছেন? মাসুদ রানা? আপনার মাইক্রোফোন আর মাইক দিন!'

পাঁচ সেকেণ্ড পর লাইনে এল নিশাত।

রানা সুস্থ আছে শুনে খুশিতে কেঁদে ফেলল সে।

রানা জানতে চাওয়ায় বলল, প্রথমে এলিভেটার শাফটে লুকিয়ে ছিল, তারপর চেতনা হারায়। ঘুম ভাঙে গুলির আওয়াজে। সিল টিম চিৎকার করে কথা বলছিল। তারপর শুনতে পেয়েছে কিং আর্থার ওরফে রন হিগিন্সের সঙ্গে রানার কথা। নিউক্লিয়ার-টিপড ক্রুজ মিসাইল আসছে উইলকক্স আইস স্টেশন লক্ষ্য করে।

এরপর এলিভেটার শাফট থেকে বেরিয়ে এসেছে নিশাত, তখনও স্টেশনের ভিতর সিল টিম, কিন্তু মস্ত ঝুঁকি নিয়ে চলে গেছে পুল ডেকে। তার আগে স্টোররুম থেকে জোগাড় করেছে কয়েকটা ফ্লুইড ব্যাগ। পুল ডেকে পৌঁছবার পর পেয়ে গেল রাশেদ হাবিবের পুরনো স্কুবা গিয়ার। ওটা পড়ে ছিল পুলের ধারে। ট্যাঙ্কের সঙ্গে তখনও ভাল করেই জড়িয়ে রাখা ছিল কেবল।

ওই কেবল ও শেষ ব্রিটিশ সি স্লেড নিয়ে নেমে পড়ল পুলে। তার অনুসরণ করে একসময় পৌঁছে গেল এক মাইল দূরের লিটল আমেরিকা-৪-এ।

নিশাতের কথা শুনে হতবাক হয়ে গেছে রানা। কয়েক সেকেণ্ড পর বলল, 'আপা, এটা শুধু আপনার পক্ষেই সম্ভব।'

এবার জানিয়ে দিল, ওদের দেখা হবে পার্ল হারবারে।

নিশাত বলল, 'আমি আসছি, স্যর!'

'আপনাকে কিন্তু ঘুমের কড়া ওষুধ দেয়া হয়েছে,' ডাক্তারের আপত্তির কণ্ঠ এল। 'এভাবে না ঘুমালে...'

প্রায় ধমকে উঠল নিশাত, 'আমার ভাইকে খুঁজে পেয়েছি, এখন ঘুম হবে আমার? আপনি বোঝেন...'

অবশ্য ডাক্তারের অনুরোধে, শেষপর্যন্ত রানার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে লাইন কেটে দিল সে।

পঁচিশ

পাঁচদিন পর হাওয়াই দ্বীপের পার্ল হারবারে ভিড়ল দ্য অরিগন।

টিভি ক্যামেরা নিয়ে ডকে ভিড় করে অপেক্ষা করছে বেশ কয়েকটি চ্যানেলের সাংবাদিকরা। দৈনিক পত্রিকার কলাম ও ফিচার লেখকদের ভিড় কম হয়নি। ক্লিক-ক্লিক আওয়াজ উঠছে ফটো সাংবাদিকদের ক্যামেরা থেকে। দু'দিন আগে দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরে একটা চার্টার বিমান নিয়ে দ্য অরিগনের পোড়া ডেকের ছবি তুলে এনেছে এরা। একজনের সঙ্গে ভিডিয়ো ক্যামেরা ছিল। সে এখন রাজা। নিউজ চ্যানেলগুলো লাখ লাখ ডলারে ওই দৃশ্য কিনে নিয়েছে। এবার নুমার সবার পেট থেকে গল্পটা বের করতে ডকে হাজির হয়েছে সবাই।

গ্যাংওয়ের উপর এসে দাঁড়িয়েছে রানা। দেখছে, দুই মিডশিপমেন স্ট্রেচারে করে সরিয়ে নিয়ে গেল তিশাকে। বেচারি এখনও কোমায়। কাছের এক মিলিটারি হাসপাতালে নেয়া হচ্ছে ওকে।

রানার পাশে এসে দাঁড়াল রাশেদ হাবিব ও মেরি।

'কী খবর, মেরি?' বলল রানা।

'হাই,' হাসল পিচ্চি মেয়ে। বিপদ কেটে যাওয়ায় উচ্ছল। একহাতে ধরে রেখেছে হাবিবের কবজি, যেন বাচ্চার হাত ছাড়বে না মা।

মার্লন ব্র্যাণ্ডোকে নকল করল হাবিব, 'কে জানত? আমি

একদিন সত্যিই গডফাদার হয়ে উঠব!'

মৃদু হাসল রানা।

ঝট্ করে পিছনে ঘুরে চাইল মেরি। 'আরেহ্, গেল কোথায়...'

এক সেকেণ্ড পর ডোরওয়েতে দেখা দিল লিলি, থপথপ করে এসে থামল রানার পাশে। নাক গিয়ে গুঁতো দিতে শুরু করেছে হাতে। একেবারে চুপচুপে ভেজা।

'জাহাজের ডাইভ প্রিপারেশন পুলে আনন্দে কেটেছে ওর দিন,' বলল হাবিব।

'তাই তো মনে হচ্ছে,' আলতো করে লিলির কান চাপড়ে দিল রানা। খুশিতে জিভ বের করে নাক চেটে নিল লিলি, তারপর গড়িয়ে পড়ে গেল। আর উপায় নেই, কাজেই এক হাঁটু গেড়ে বসল রানা, পেট চুলকে দিতে লাগল।

'অ্যাডমিরাল বলেছেন, ও আপাতত এখানে থাকতে পারে, পরে ভাল কোনও বাড়ি খুঁজে দেবেন,' বলল মেরি।

'গুড,' সায় দিল রানা। শেষবারের মত লিলির পেট চুলকে দেয়ার পর উঠে দাঁড়াল। সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়ল লিলিও, ফিরে চলল পছন্দের পুলের দিকে।

রাশেদ হাবিবের চোখে চাইল রানা। 'মিস্টার হাবিব, আমার একটা প্রশ্ন ছিল।'

'বলুন?'

'স্টেশনের ডুবুরিরা পাতাল-গুহায় যেতে কোন্ সময়ে ডাইভ দিয়েছিল?'

'কোন্ সময়?'

'হ্যাঁ, সময়টা জানতে চাইছি। তখন দিন ছিল, না রাত?'

'উম্ম্, যতটা মনে পড়ে রাত। ধরুন, রাত নয়টার দিকে।'

আস্তে করে মাথা দোলাল রানা।

'বলুন তো কেন জানতে চাইলেন?' বলল হাবিব।

'আমি বোধহয় জানি কেন ওই সময়ে হামলা করেছিল এলিফ্যান্ট সিল।'

'বলুন তো দেখি?'

'মনে আছে আপনার, একমাত্র তিশার দলের কেউ আক্রান্ত হয়নি।'

'হ্যাঁ। তা ঠিক।'

'আর আমি তখন বলেছিলাম, ওরা লো-অডিবিলিটি ব্রিদিং গিয়ার ব্যবহার করেছে।'

'তা আপনি বলেছেন,' বলল হাবিব। 'তো? আমরাও তো ওই একই জিনিস ব্যবহার করেছি। তারপরও তো হামলা করল।'

'তা ঠিক,' দুষ্টু হাসল রানা। 'কিন্তু এখন জানি কেন হামলা করেছে। আমরা ডাইভ দিয়েছি রাতে।'

'তো?'

'বিজ্ঞানী, গুণ্ডারসনের ডাইভার বা আমরা রাতেই নেমেছি। বিজ্ঞানীরা নয়টার সময়, গুণ্ডারসনের লোক আটটার সময়, কিন্তু তিশার দল নেমেছে দুপুর দুটোয়। শুধু ওরাই দিনে নেমেছে।'

বুঝতে শুরু করেছে হাবিব। 'তা হলে আপনি বলতে চাইছেন ওইসব সিল নকটারনাল?'

'হ্যাঁ, আমার ধারণা ওরা দিনে ঘুমায়।'

আস্তে করে মাথা দোলাল হাবিব। সাধারণত দেখা যায়, হিংস্র বা বিষাক্ত প্রাণী রাতেই জেগে থাকে, দিন কাটিয়ে দেয় ঘুমিয়ে।

'ভাল কথাই বলেছেন,' বলল হাবিব। 'আবার কখনও রেডিয়েশন-ইনফেক্টেড এলিফ্যান্ট সিলের ডেরায় গেলে কথাটা মনে রাখব।'

হাসছে মেরি। রানা গ্যাংওয়ে বেয়ে নামতে শুরু করতেই ওরা দু'জনও পিছু নিল।

সিঁড়ির নীচে দাঁড়িয়ে আছে মাঝ বয়সী এক মেরিন সার্জেন্ট।

রানা নেমে আসতেই খটাস্ করে স্যালিউট দিল সে। 'স্যর, আপনার জন্য গাড়ি পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে।'

'সার্জেন্ট, আমি এখন লেফটেন্যান্ট তিশা করিমকে দেখতে হাসপাতালে যাব। কেউ যদি মনে করে অন্য কোথাও যাব, ভুল ভাবছে।'

'তাতে আমার কোনও অসুবিধে নেই, স্যর,' হাসল সার্জেন্ট। 'আমাকে বলে দেয়া হয়েছে, আপনি, মিস্টার হাবিব আর মিস মেরি কোথাও যেতে চাইলে, আপনাদেরকে পৌঁছে দিতে হবে।'

আস্তে করে মাথা দোলাল রানা, চাইল হাবিব ও মেরির দিকে। কাঁধ ঝাঁকিয়ে ওরা জানিয়ে দিল, ওদের কোনও আপত্তি নেই।

'গাড়ি পেলে তো ভালই,' বলল রানা। 'পথ দেখান, সার্জেন্ট।'

ওদেরকে নীল এক বুইকের দিকে নিয়ে চলেছে সার্জেন্ট। ওই গাড়ির জানালা কালো রঙের। পৌঁছে গিয়ে দরজা খুলে ধরল লোকটা। ভিতরে ঢুকে পড়ল রানা।

আগেই ওপাশে বসে আছে আরেক লোক। তার হাতে উদ্যত পিস্তল দেখে আড়ষ্ট হয়ে গেল রানা।

'চুপ করে বসুন, মিস্টার রানা,' চাপা স্বরে বলল সার্জেন্ট-মেজর অ্যান্ড্রু লিলিওয়েলেন। সাবধানে সিটে বসল রানা। সামনের সিটে উঠেছে রাশেদ হাবিব ও মেরি, লোকটার হাতে পিস্তল দেখে চমকে গেছে ওরা।

বেঁটে লোক লিলিওয়েলেন, ক্লিন-শেভ করা মুখ। ঘন কালো ভুরু দুটো ঝোপের মত। পরনে দিনের খাকি মেরিন ইউনিফর্ম।

যে সার্জেন্ট রানাদের এখানে এনেছে, সে ড্রাইভিং সিটে বসে পড়েছে, গাড়ি চালু করে রওনা হয়ে গেল।

মেরিন কর্পসের নন-কমিশণ্ড সর্বোচ্চ পদের অফিসার বলল,

'আমরা খুবই দুঃখিত, মিস্টার রানা। কিন্তু আপনি বা আপনার সঙ্গে এরা ছেঁড়া সুতোর মত। আমরা এসব সুতোয় গিঁঠ দেব।'

'আসলে কী বলতে চান?' জানতে চাইল রানা।

'আপনি জানেন আমরা আইসিজি।'

'আমি নুমার চিফ অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটনকে আপনাদের কথা বলেছি,' বলল রানা। 'আপনারা আমাদেরকে মেরে ফেলতে চাইলে সেটা সহজ হবে না।'

'হয়তো এখনই মেরে ফেলব না,' বলল লিলিওয়েলেন। 'কিন্তু ঠিক সময়ে... হ্যাঁ। ...আবার এদিকটাও ভেবে দেখুন, আপনি আমাদের জন্য মস্ত হুমকি। আমরা চাই না আপনি সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলুন। আপনি হয়তো বলে দেবেন উইলকক্স আইস স্টেশনে কী ঘটেছে। তা আমরা হতে দিতে পারি না। মিডিয়া সে তথ্য পাবে, যেটা আমরা আইসিজি ওদেরকে দেব।'

'আমরা তো অন্য দেশের লোক, কিন্তু ভাবতে অবাক লাগে, আপনারা নিজেদের লোকই মেরে সাফ করছেন,' বলল রানা।

'আপনি আমাদের কাজ বোঝেননি, মিস্টার রানা,' বলল লিলিওয়েলেন।

'বুঝেছি। আপনারা নিজের লোক খুন করে দেশ ও দশের উন্নতি করছেন।' তিক্ত হাসল রানা।

'হা যিশু, আপনার মুখে এসব শুনতে ভাল লাগছে না। আপনার তো ওখানে থাকারই কথা নয়।' কর্কশ স্বরে হাসল লোকটা। 'এভাবে দেখুন, অন্য সবার আগে কীভাবে উইলকক্স আইস স্টেশনে পৌঁছলেন?'

চট্ করে রানার মনে পড়ল, জর্জ হ্যামিলটন ওর বসের মাধ্যমে সাহায্য চেয়েছিলেন নুমার বিজ্ঞানীদেরকে সরিয়ে নেয়ার জন্য। পরে ম্যাকমার্ডো স্টেশনে আণ্ডারসেক্রেটারি অভ ডিফেন্স ব্রিফ করেন ওকে।

যেন ওর মন পড়ছে লিলিওয়েলেন, আবারও হাসল। 'এসব সিভিলিয়ান কী-ই বা বোঝে, বলুন?'

'জর্জ হ্যামিলটন আপনাদেরই অ্যাডমিরাল ছিলেন,' বলল রানা।

'যখন ছিলেন তখন ছিলেন, এখন তো তিনি সিভিলিয়ান। আসলে এসব সিভিলিয়ানরা আপনাকে শেষ করে দিল। আপনি ওই স্টেশনে যাওয়ার ছয়ঘণ্টা পর গোটা স্টেশন দখল করে নিতে পারতাম আমরা আইসিজি ভরা আর্মি রেঞ্জার দিয়ে। অনেক আগেই শেষ করে দিতে পারতাম ফ্রেঞ্চদেরকে। ব্রিটিশরা ওদিকে ভুলেও যেত না। কিন্তু ফ্রেঞ্চদের সঙ্গে লড়াই শুরু হলে আমাদের আমেরিকান সৈনিক বেশি মরত। সেই ক্ষতির ভিতর পড়তে হলো না।' মাথা নাড়ল লোকটা। 'আপনি আপনার লোক নিয়ে ওখানে ছিলেন। আপনার সঙ্গে আইসিজির লোক দিয়ে দিয়েছিলাম আমরা। প্রথম কথা, সেরা জিনিস আমাদের হাতে আসতে হবে। তা যদি সম্ভব না হয়, ওই জিনিসের প্রমাণ উধাও করে দিতে হবে। এটা জাতীয় নিরাপত্তার জন্যই দরকার।'

'আপনারা নিজেদের দেশের ছেলেদেরও মেরেছেন,' বলল রানা।

'সেটা বাধ্য হয়ে। কেউ ভুল জায়গায় ভুল সময়ে চলে গেলে শাস্তি পাবে, এটাই স্বাভাবিক। ...যাক, আপনাকে এসব বলছি কেন, একটু পরই তো আপনাকে মেরে ফেলব।'

ডক ইয়ার্ডের বাইরের বেড়ার সামনে গার্ড স্টেশন, ওখানে পৌঁছে গেছে বুইক। কিন্তু বুম গেট নামানো। জানালার কাঁচ নিচু করল ড্রাইভার সার্জেন্ট। বুম গেটের গার্ডের সঙ্গে কথা বলল।

কিন্তু তিন সেকেণ্ড পর হঠাৎ করেই লিলিওয়েলেনের ওদিকের দরজা হ্যাঁচকা টানে খুলে গেল। বাইরে দাঁড়িয়ে আছে কমপক্ষে দশজন সশস্ত্র নেভাল পুলিশ। প্রত্যেকের অস্ত্র তাক করা দুই

আমেরিকানের কপালে।

'এই যে স্যর, আপনি বেরিয়ে আসুন দেখি,' সামনের লোকটা বলল।

মুখ কালো হয়ে গেল সার্জেন্ট-মেজর লিলিওয়েলেনের। 'বাছা, তুমি জানো কার সঙ্গে কথা বলছ?' ঘড়ঘড় করে উঠল তার কণ্ঠ।

'না, ও জানে না,' গাড়ির বাইরে পরিচিত কণ্ঠ শুনল রানা। 'কিন্তু আমি জানি তুমি কে।' দরজার পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন নুমা চিফ জর্জ হ্যামিলটন। রানার চোখে চাইলেন, দৃষ্টিতে স্নেহ। 'মাই বয়, তুমি ঠিকই বলেছিলে। এবার একটা একটা করে কান ধরে মিলিটারি থেকে এদেরকে বের করার ব্যবস্থা নেব আমরা সবাই।'

'অ্যাডমিরাল, ও কি এসেছে?' গাড়ি থেকে নেমে এল রানা।

রাশেদ হাবিব ও মেরিও নেমে পড়েছে।

'ওই যে দেখো!' হাসলেন হ্যামিলটন।

তাঁর দৃষ্টি অনুসরণ করে ঘুরে গেল রানা। নেভাল পুলিশদের মাঝ দিয়ে হেঁটে আসছে রবিন কার্লটন, ঠোঁটে চওড়া হাসি।

সার্জেন্ট-মেজর অ্যাণ্ড্রু লিলিওয়েলেন এবং সঙ্গে আসা সার্জেন্টকে বের করে আনা হলো গাড়ি থেকে। হাতে আটকে দেয়া হলো হ্যাণ্ডকাফ। সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো তাদেরকে।

বন্ধুর দিকে পা বাড়াল রানা।

অবশ্য তিন পা যেতে না যেতেই পরস্পরকে জড়িয়ে ধরল ওরা। ওদের পাশে এসে থেমেছে এক দম্পতি।

এদেরকে আগে কখনও দেখেনি রানা।

ওকে আরেকবার বুকে পিষে ছেড়ে দিল রবিন কার্লটন, বলল, 'এঁরা অ্যাডোনিস ও সান্থা ক্যাসেডিন। দ্য ওয়াশিংটন পোস্টের সাংবাদিক। আর ইনি মাসুদ রানা।'

অ্যাডোনিস হাত বাড়িয়ে দিতেই করমর্দন করল রানা।

আগেই ওদের পরিচয় হয়েছে মোবাইল ফোনে। রানার কাছ থেকে তথ্য পেয়ে একটা চার্টার বিমান ভাড়া নেয় অ্যাডোনিস ও সান্থা, ঘুরে আসে দ্য অরিগনের উপর দিয়ে। ভিডিয়ো করেছে মিসাইলের আঘাত করা জায়গার।

'এবার সব ভালভাবে শেষ হলে হয়,' বলল অ্যাডোনিস।

মৃদু হাসছেন নুমা চিফ। 'খারাপ সব কিছুই শেষ হয়,' বললেন। 'রানা আগে থেকে না বললে ওই দুই পীরকে ধরা যেত না। ওদের পেট থেকে অনেক কিছুই বেরুবে। ...আর কার্লটন, তোমাকে কয়েকদিন অপেক্ষা করতে হবে, তারপর আবার যোগ দেবে চাকরিতে।'

'এবার আপনাদেরকে নিয়ে ফিচার লিখছি আমরা দ্য ওয়াশিংটন পোস্টে,' বলল অ্যাডোনিস। 'আশা করি আপনাদের সাক্ষাৎকার দেবেন।'

'আমার আপত্তি নেই,' বললেন জর্জ হ্যামিলটন। 'তবে রানার বোধহয় আপত্তি থাকতে পারে। ওর বস্ অনুমতি না দিলে...'

আগ্রহ নিয়ে রানার দিকে চেয়ে আছে অ্যাডোনিস।

'পরে বসের সঙ্গে আলাপ করে জানাব,' বলল রানা। মেরি ও হাবিবকে দেখাল। 'এরা উইলকক্স আইস স্টেশনের বিষয়ে দারুণ সব তথ্য দিতে পারবে।'

খুশি হয়ে হেসে ফেলল দম্পতি।

জুলাইয়ের পঁচিশ তারিখে দুনিয়ার সবচেয়ে বিক্রিত দৈনিক পত্রিকা দ্য ওয়াশিংটন পোস্টের প্রথম পাতায় ছাপা হলো রানার বন্ধু রবিন কার্লটনের ছবি। বুকের সামনে ধরেছে একটা ছবি, সঙ্গে ইউনাইটেড স্টেটস মেরিন কর্পসের দেয়া অফিশিয়াল ডেথ সার্টিফিকেট।

হেডলাইনে লেখা:

ইউএস মিলিটারির বক্তব্য অনুযায়ী, ইনি অফিশিয়ালি মৃত

রাশেদ হাবিব ও মেরির কাছ থেকে পাওয়া তথ্য নিয়ে উইলকক্স আইস স্টেশনের উপর তিন পাতা লেখা হয়েছে। পরের দুই পাতা আইসিজি সম্পর্কে। পাঠকদের জানানো হয়েছে, কীভাবে এলিট মিলিটারির ভিতর নিজেদের লোক ঢুকিয়ে দেয়া হয়। কীভাবে খুন করা হয় সাধারণ অফিসার ও সৈনিকদেরকে।

এই বিশাল ফিচারে ফ্রেঞ্চ বা ব্রিটিশ হামলার কথা বেমালুম ভুলে যাওয়া হয়েছে।

নানা ট্যাবলয়েডে অবশ্য বলা হয়েছে, উইলকক্স আইস স্টেশনে নিজেদের মিলিটারি পাঠিয়েছিল অন্য কয়েকটি দেশ।

দ্য ওয়াশিংটন পোস্টের প্রতিযোগী এক পত্রিকায় লেখা হলো: দ্য ওয়াশিংটন পোস্টের মালিক ক্যাথারিন গ্রাহামের সঙ্গে দেখা করেছেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট স্বয়ং, তিনি অনুরোধ করেছেন, উইলকক্স আইস স্টেশনের কারণে যেন বিশেষ কিছু দেশের সঙ্গে আমেরিকার কূটনৈতিক সম্পর্ক ব্যাহত না হয়, তা দেখবেন।

হয়তো সেকারণেই একবারও ব্রিটেন বা ফ্রান্সের বিষয়ে সামান্যতম মন্তব্য আসেনি দ্য ওয়াশিংটন পোস্ট পত্রিকায়। লেখা হয়েছে, উইলকক্স আইস স্টেশনে তুমুল লড়াই হয়েছে। কিন্তু জানা যায়নি শত্রুপক্ষ কারা ছিল।

মাসুদ রানা সম্পর্কেও একটি লাইনও লেখা হয়নি।

সাংবাদিকরা হিংসা করতে শুরু করেছে অ্যাডোনিস এবং ওর স্ত্রীকে। সবাই বুঝে গেছে, ওই কাহিনি কমপক্ষে দেড় মাস ধরে সেরা কলামে ছাপা হবে। এই সম্মান দশ জনমেও পায় না বেশির ভাগ সাংবাদিক।

পরদিন পার্ল হারবার ত্যাগ করল নুমা জাহাজ দ্য অরিগন। সেই

দিনই ওয়াশিংটনে শেষ হলো ন্যাটো কনফারেন্স।

প্রতিটি টিভি চ্যানেল ও দৈনিক পত্রিকায় আর্টিকেল বেরুল। আমেরিকান, ব্রিটিশ ও ফ্রেঞ্চ কূটনীতিকরা পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছেন ক্যাপিটল বিল্ডিঙের সিঁড়ির ধাপে। হাসি মুখে করমর্দন করছেন, পাশেই তাঁদের জাতীয় পতাকা। তাঁরা বলেছেন, কমপক্ষে আরও বিশ বছর চলবে এই মহান ন্যাটো সংগঠন।

ফ্রেঞ্চ রিপ্রেযেন্টেটিভ জ্যাঁ পিয়েরে কুই-র কথা কোট করা হয়েছে: 'দুনিয়ার সবচেয়ে বড় এবং শক্তিশালী সংগঠন আমাদের এই ন্যাটো।' কেন এই সংগঠন এতদিন টিকবে, জিজ্ঞেস করলে তিনি জানান: 'আমরা সবাই ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বের কারণে পরস্পরকে গভীর ভাবে বিশ্বাস করি।'

পার্ল হারবার নেভাল হসপিটালে প্রাইভেট একটা রুমে নিথর শুয়ে আছে তিশা। বুজে আছে চোখ। জানালা দিয়ে সামান্য রোদ আসছে। তিশা এখনও কোমার ভিতর।

'তিশা! তিশা?' বলে উঠল এক মহিলা কণ্ঠ।

আবছা কণ্ঠ শুনতে পেল তিশা। খুব ধীরে মেলল চোখ। পাশের কটে শুয়ে ওর প্রিয় নিশাত আপা।

'আর ঘুমায় না, তিশা।' মিষ্টি করে হাসল নিশাত।

চোখ বুজে এসেছিল, আবারও জোর করে নিশাতের দিকে চাইল তিশা। 'কেমন আছেন, আপা? আমরা কোথায়?'

'তার চেয়ে বড় কথা, দেখো কে এসেছে তোমাকে দেখতে,' হাসছে নিশাত।

'কে?'

বামদিকে মাথা কাত করল নিশাত। জানালার পাশে অতিথির চেয়ারে বসে আছে মাসুদ রানা। ঘুমিয়ে কাদা।

'ওঁর পাঁজর মেরামত হওয়ার পর থেকে ঠায় বসে আছেন,'

নিচু স্বরে বলল নিশাত। 'বলেছেন, তুমি জেগে না ওঠা পর্যন্ত থাকবেন এখানেই।'

রানার দিকে অপলক চেয়ে রইল তিশা। ওর মনে হলো, দুনিয়ার সেরা মিষ্টি একটা শিশু ঘুমাচ্ছে অকাতরে।

মৃদু হেসে ফেলল তিশা।

–ঃ সমাপ্ত ঃ–